

আবর্তি

মাসিক পত্রি আবর্তি পাচনী ।



শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত ।



ষষ্ঠ বর্ষ ।

১৩১২ মাঘ হইতে ১৩১৩ পৌষ পর্য্যন্ত ।



মন্নমনসিংহ মুহুদ্ বজ্রালয় হইতে

শ্রীরজনীকান্ত পণ্ডিত কর্তৃক

প্রকাশিত ।



মূল্য দেড় টাকা ।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী ।

বিষয়	লেখক
অগ্নি পরীক্ষা (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ,
জ্যোতিষ সংস্কার (কবিতা)	শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়
অশ্রু	সম্পাদক
আমি কে (কবিতা)	”
আরতি (কবিতা)	শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত
আরতি (কবিতা)	শ্রীউষাপ্রমোদিনী বসু
আগিবে সুদিন (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ,
ঈশা ধীর চট্টগ্রাম অধিকার	সৈয়দ মুকুল হোসেন
একখানি পুরাতন কাগজ,	শ্রীরসিকচন্দ্র বসু
একটা আলো (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
একটা তারার প্রতি (কবিতা)	”
এসিয়ার জাগরণ	শ্রীস্বপ্নেশী—
গুণো মরিব, আমি মরিব	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত
কবিতা	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ,
কাহ্নকুজ	শ্রীরেতীমোহন গুহ, এম-এ, বি-এল,
কালীধ্যানের আধ্যাত্মিক ভাবার্থ	শ্রীহর্গদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন ৩০৫, ৩২
কাহিনী	শ্রীকেশবদাস মজুমদার ৩৮, ৭
কুবি	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ,
চন্দ্র	”
চন্দ্রগুপ্ত	শ্রীব্রজসুন্দর সাহা
ছোট ভাতার প্রতি আশীর্বাদ (কবিতা)	শ্রীযতী শ্রুতিবালা সেন
ঢাকাই মলমল	সৈয়দ মুকুল হোসেন
তুমি ও সে (কবিতা)	শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী
তুমি না ডেকেছ (কবিতা)	শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়
মেওয়ারন মনোয়ার ধা	সৈয়দ মুকুল হোসেন
মেঘবালা (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত
নবজীবন	শ্রীব্রজসুন্দর সাহা
নবযুগ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ, ২৬৩, ২৭৫, ৩৪
নাটক, উপভাস ও ইতিহাস	শ্রীকামিনীকুমার সেন এম-এ, বি-এল, ২৪
নৃতন (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ, ১১
নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ, ১৭
মেতৃগণের কর্তব্য	সম্পাদক ১২
মেঘ	শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ২৩৩

পলাতক (গল্প)	শ্রীপাঁচকড়ি দে	১০০, ১৩৩
পলায়িত (কবিতা)	শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক বি-এ,	৬৩
পাটলিপুত্র	শ্রীব্রজসুন্দর সাম্রাণ	১৪২
পুরাতন স্থান	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	১১৫
পূজার ফুল (সঙ্গীত)	ক্ষেপা বাউল	১১৮
প্রকৃতি (কবিতা)	শ্রীউমাপ্রমোদিনী বসু	৬৪
প্রণয়ীযুগল (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ	২৮৯
প্রত্যাখ্যাতা (কবিতা)	শ্রীবোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩১২
প্রবাসে (কবিতা)	শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ বি-এ,	২৩২
প্রাচীন ভারতের বায়ু বিজ্ঞান	শ্রীস্বদেশী—	২০৪
শৈশবচন্দ্র (উপহাস)	... ৫৮, ১১৮, ১৫৪, ১৭৮, ২১৪, ২৬৭	
স্কমচন্দ্র (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ,	৬৫
সুবন্ধ	শ্রীরেবতীমোহন গুহ এম-এ, বি-এল,	৫০
দাকালার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুরবস্থা	শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ,	২২২
বৈষ্ণবপুরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত	শ্রীবোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩৪২
বীরপূজা	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ	১২৯
বুদ্ধ ঘোষ	শ্রীরেবতীমোহন গুহ এম-এ, বি-এল,	৬৬
বৃহস্পতি	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ,	২৭২
বহু-বিবাহ	"	৮৫
ভক্ত তপস্বী	শ্রীপ্রতিভাময়ী দেবী	২৬২
ভারতে কার্পাস	শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার এম-এ, বি-এল,	২৩
ভুরগুট রাজ্য	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	১৬১
মহাত্মা আনন্দমোহন বসু,	শ্রীশরৎকুমার সেন গুপ্ত	২২৫
মাতৃমূর্ত্তি (কবিতা)	শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত	১৯৫
স্নানবের প্রেম (কবিতা)	শ্রীনগেন্দ্রবালা সরস্বতী	৯১
স্বাময়ণের সভা	শ্রীকামিনীকুমার সেন এম-এ, বি-এল,	১২
মিলি (কবিতা)	অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত	২২
শ্রীমঙ্গাগবদগীতা ও মার্কণ্ডেয়	শ্রীহর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্ববুদ্ধ ১১০, ১৪২, ১৬৫, ২০৩	
পুণ্ড্রাঙ্গদগত চণ্ডী	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ,	৩৩৭
শনৈশ্চর	মোঃ আবদুল করিম	২৮৫
শ্রীহরিনাম স্তব	শ্রীব্রজসুন্দর সাম্রাণ	৭৩
সতীদাহ	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	৪১
সহমরণ	সম্পাদক	১২৭, ১২৮
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার	৩২, ৯৫, ২৭৪
	শ্রীকামিনীকুমার সেন	২৬

সারস্বত সমিতি	শ্রীকেশবনাথ মজুমদার	২৭
সাধারণ উপস্থাপন	শ্রীকামিনীকুমার সেন এম্-এ, বি-এল	৩১৩
সাহিত্যসেবার প্রয়োজন	"	৩৩
সাঙ্খ্যাতার	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ,	১৮৭
স্বভাষিতাবলী	শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী	৮৯, ১২৬, ২২০
স্বর্ঘ্য	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ,	২০৫
স্বর্গ-কুসুম (কবিতা)	শ্রীমতী সুরচিবালা সেন	২৫৭
স্বর্গ মঙ্গলচণ্ডী,	শ্রীআবদুল করিম ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৮১
স্বর্গের আউট যাত্রা	শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ সান্যাল	১৩
স্বর্গের বঙ্গবিজয়	"	৪৩

ষষ্ঠ বর্ষের লেখক ও লেখিকাগণের নাম (বর্ণানুসারে)

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার	শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী।
এম্-এ, বি-এল।	শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন গুপ্ত
শ্রীমতী অম্বুজানন্দারী দাসগুপ্ত।	" যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ,
শ্রীযুক্ত আবদুল করিম।	" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
" উপেন্দ্রচন্দ্র রায়।	" পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী।
শ্রীমতী উষা প্রমোদিনী বসু।	" রসিকচন্দ্র বসু।
শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন	" রামপ্রাণ গুপ্ত
এম্-এ, বি-এল।	" রেবতীমোহন গুহ
" কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্-এ।	এম্-এ, বি-এল।
" কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়।	" ব্রজেন্দ্র নাথ সান্যাল।
" কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ।	এম. আর. এ. এস।
" কেশবনাথ মজুমদার	" শরৎকুমার সেন গুপ্ত।
এম, আর, এ, এস।	শ্রীমতী সুরচিবালা সেন।
" জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।	শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র সিংহ বি-এ।
" দুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বব্রত।	" সৈয়দ মুকল হোসেন।
" ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।	" হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।
" যোগেন্দ্রনাথ সরস্বতী।	" হেমচন্দ্র চক্রবর্তী।
" পাঁচকড়ি দে।	

৫ম বর্ষের মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৬৯	শ্রীমতী সরস্বালী মোতায়দ	চণ্ডীপাশা	১৥০
৬৬৯	শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র আচার্য্য ষ্টেশন মাস্টার	সিংজানী	১৥০
৬৪৫	শ্রীকান্ত দে		১৥০
৬৫০	যোগিনীমোহন বসু হেড্ কনেটবল	সিংজানী	১৥০
৬৫৪	চন্দ্রকুমার রায় বি, এল,	হবিগঞ্জ	১৥০
৬৬৩	সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার	রংপুর	১৥০
৭২৫	ভারতচন্দ্র আচার্য্য মোকদার	সদর	১৥০
৭১১	আনন্দনাথ রায়	সুবন্দী	১৥০
৬৯৯	যুগিষ্ঠিরচন্দ্র নাথ পোষ্ট মাস্টার	ইটনা	১৥০
৬৯৭	গিরিশচন্দ্র সরকার	গোবরজানী	১৥০
৭০৯	রাজেন্দ্রমোহন মৌলিক	পাইকুড়া	১৥০
৭১৫	সৈয়দ আজিজুল হক জমিদার	বোলাই	১৥০
৫৯৮	শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বিশ্বাস	ইটনা	১৥০
৬৯০	মোলবী ওয়াজেদালী খান পুণি জমিদার	করটিয়া	১৥০
৭১১	মাবুদুল জব্বার	বনগ্রাম	১৥০
	শ্রীনাথ রায় ম্যানেজার	মুন্সীগাছা	১৥০
	মহিমকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	ঐ	১৥০
	সুরেন্দ্র প্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী	কৃষ্ণপুর	১৥০
	শ্রীমন্তেন্দ্র গোস্বামী বি, এল,	কিশোরগঞ্জ	১৥০
৫০	ভৈরবচন্দ্র রায়	ঐ	১৥০
৬৬২	যজ্ঞেশ্বর রায়	বাজিতপুর	১৥০
৫২২	মদনমোহন দত্ত প্রীভার	দৈখরগঞ্জ	১৥০
৪৪২	হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী	সুবর্ণখালী	১৥০
৫৭০	ভারিগীশকর রায়	সেরপুর	১৥০
৪৯৮	গোপালদাস চৌধুরী	ঐ	১৥০
৪৫৮	সত্যীশচন্দ্র চক্রবর্তী	মুন্সীগঞ্জ স্কুল, ময়মনসিংহ	১৥০
৭৬	জঃ কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী	বাজিতপুর	১৥০

৪৩৬	হেমচন্দ্র রাউত	নেত্রকোণা	
৪০৭	অমরচন্দ্র চক্রবর্তী	ঐ	
৩২৪	রেবতীকুমার দে কবিরাজ	গোবিন্দপুর	১৥০
৩২২	ভগবানচন্দ্র মজুমদার	উত্তর	১৥০
৪৪৯	ডাঃ বিজয়নাথ ভাট্টা	দেওয়ানগঞ্জ	১৥০
২৯৮	মহারাজা সুর্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর	মুক্তাগাছা	১৥০
২১৩	ভূর্গাদাস দত্ত চৌধুরী	রায়হম	১৥০
৩১৪	কুমুদিনীকান্ত বানার্জী	গৌরীপুর	১৥০
৩১৭	ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী	কালীপুর	১৥০
৩৮৯	অভয়চন্দ্র ঘোষ মানেজার	আধারবাড়ী	১৥০
৪০৮	মহম্মদ রফিকউদ্দিন খাঁ	পাইকুড়া	১৥০
৪৪৬	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি, এ, ডিঃ, মাঃ,	ঢাকা	১৥০
৪২৭	রামচরণ পণ্ডিত	কালীপুর	১৥০
২১৭	বরদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এঃ, সিঃ, মার্জিন	সদর	১৥০
১৬৫	লোকনাথ দে মোক্তার	ঐ	১৥০
১১৯	কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মোক্তার	ঐ	১৥০
১২৪	গগনচন্দ্র রায় মোক্তার	ঐ	১৥০
১৭২	কৃষ্ণকুমার চক্রবর্তী মোক্তার	ঐ	১৥০
৪০০	বৈকুণ্ঠচন্দ্র ভৌমিক	রত্নপুর	
৪২১	ডাঃ যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী	ফুলবাড়িয়া	
৪৪১	কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী মানেজার	কৃষ্ণপুর	
১৬১	কালীশঙ্কর গুহ প্রিন্টার	সদর	
৩৬৩	বীরভদ্রচন্দ্র চৌধুরী	বাসাবাড়ী, গৌরীপুর	১৥০
৪২৪	চন্দ্রকুমার ভৌমিক	ভবানীপুরের কাচারী, হুগাপুর	১৥০
৬৫০	কুলসুমসেনা খাতুন	শ্রামপুর, থলিফাবাড়ী	১৥০
৬৫৭	কালীপদ নাগ	টেলিগ্রাফ, গাষ্টার পাত্তিরালা ইষ্টেট	১৥০
২২৬	জগত্তনায়ক পত্রনবিশ	শ্রীপুরবাড়ী	১৥০
১৮১	বিপিনচন্দ্র রায় এম, এ	সদর	১৥০
৬৩১	চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী মোক্তার	ঐ	১৥০
২৫১	অভয়চন্দ্র দত্ত প্রিন্টার	ঐ	১৥০

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ষষ্ঠ বর্ষ। { ময়মনসিংহ, মাঘ ১৩১২। { প্রথম সংখ্যা

আরতি।

নাথী বিদ্যাদায়িনী—নমসি হাং।

অয়ি—কল্যাণময়ি ভারতি!

আজি—নব আরোজনে বজ্রভবনে

হবে তোমার আরতি।

কল—দীন নিদ্রিত সন্তান আজি নবীন প্রভাতে জেগেছে!

কিবা—নবীন রবির নবীন কিরণ আননে আননে জেগেছে!

নব উৎসাহে পূর্ণ সকলি,

আপনা স্বপ্ন দিতে চায় বলি,

আশার আলোক উঠিয়াছে জলি—

তের কি মোহন মূর্তি।

অয়ি—মঙ্গলময়ি ভারতি!

আজি—দেখ গো চারিদিক কপা কটাক্ষে আপনা মোহন দেখেছে!

কিবা—নব আভরণে সাজিয়াছে আজ নব বঙ্গের গেছে!

তোমারি কাব্য, এস ভিত্তাস,

কবী রাজনীতি—সাহস বিভাষ,

অঙ্গে অঙ্গে মাধুরী বিকাশ—

নব লাবণ্য ক্ষুরতি!

অয়ি—মঙ্গলময়ি ভারতি।

আজি—নব আরোজনে বজ্রভবনে

হবে তোমার আরতি!

কৃষি ।

“কত রত্ন বিলুপ্তিত পদতলে

কত কাচ শিরের নিভুষণ-রে।”

ভারতবর্ষ রত্ন-প্রসারিনী বলিয়া চিরদিন ভূবনবিখ্যাত ! বাস্তবিক ভারতবর্ষকে কমলার অতুল পনভাণ্ডার বলিলে অত্যাঙ্কিত হয় না । এমন সুজলা-সুফলা, শস্ত-জামলা দেশ পৃথিবীতে আর নাই । প্রকৃতি আপন অনন্ত ঐশ্বর্য ভারতের নানা স্থানে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে । ভারতে সকলই রহিয়াছে ; কেবল আমাদের দোষেই আমাদের অভাব । যেমন সকল নৌদ্রব্যের সার সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার দেহ গঠিত হইয়াছিল, তেমনি সকলবিধ পনসম্পদের একত্র সমবায়ে এই পুণ্য ভারত-ভূমির উপাদান প্রস্তুত হইয়াছে । কিন্তু আমরা রত্ন চিনি না । ঐছ আভরণ করিবার কৌশল আমরা শিক্ষা করি নাই । আমাদের জ্ঞান নাই, চেষ্টা নাই, অধ্যবসায় নাই, সেই জন্যই আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা । অতুল পনভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াও আমরা পথের ভিখারী । বিদেশী বণিকেরা যত্ন ও বুদ্ধিবলে এদেশ হইতে কোটিপুতি হইয়া দেশে ফিরিতেছে ।

এ দেশের অধিকাংশ লোকই বিদ্যাশিগ্গর করে ধনলাভের আশায় । কিন্তু কিরূপে ধনার্জন করিতে হয় তাহা অতি অল্প লোকেই জানে । আমরা চাকুরীকেই ধনলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছি । প্রায় পোনে ষোল আনা শিক্ষিত লোক আইন-বাবসায় এবং চাকুরিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছে । কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি অর্গোপার্জনের সুদিস্তৃত পথগুলির প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে না । এখন ‘বারে’ আর স্থান নাই, চাকুরিও অতিশয় ছন্নভ হইয়াছে, তাই সম্প্রতি কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে । এ চৈতন্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে দেশে মঙ্গল ।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের বহুদর্শী পণ্ডিতগণ অগ্নীতির অজান্তে সা উপনীত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী তদর্কঃ কৃষিকর্ষণি

তদর্কঃ রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ ।

এই ক্ষুদ্র শ্লোকটির মধ্যেই সমস্ত Political Economy-র সার রহিয়াছে । আমাদের বুদ্ধি ও কচি নিভাত্ত বিকৃত হইয়াছে তাই মহা

উপেক্ষা করিয়া এখন তিস্তাকোট স্থায়ী মনে করিতেছি। বিশেষতঃ বর্তমানে আমরা বিহারায় যে শিক্ষা লাভ করি তাহা কেবল তিস্তারই উপযোগী; কিন্তু স্বাধীনভাবে জীবিকা নিৰ্বাহের নিত্যন্ত প্রতিকূল। সে বাণিজ্য এবং কৃষিক্ষিক্ষাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্বাসিত করিয়া দিয়াছে আধুনিক সুসভ্য জাতি সেই বাণিজ্য এবং কৃষির উপরই উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। এমন সমকাল, উর্বরা, বিস্তৃত দেশ আর নাই। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে সর্বদিন শস্ত্রো উপযোগী ক্ষেত্র সুসভ্য। এদেশে শস্যমণ্ডি ছড়ান দিলে সুখমণ্ডি ঘরে আসে। ভারতবর্ষে কৃষিই যে জীবিকা গানের সর্বপ্রধান এবং সহজ উপায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই জন্য অতি পূর্বেই এ দেশের অধিবাসীরা কৃষির উপকারিতা সমাক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। “কৃষি-পরাশর” নামক প্রাচীন কৃষিশাস্ত্রে লিখিত আছে—“যিনি কৃষিকর্ম করেন তাহার কখনও অভাব হয় না, অথবা তাহাকে কাহার নিকট প্রার্থনা করিয়া লব্ধতা স্বীকার করিতে হয় না।”

বহু সহস্র বৎসর পূর্বে কৃষি সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন আমরা তাহারই উত্তরাধিকারী হইয়াছি। কিন্তু এ পর্যন্ত নূতন কোন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারি নাই। তাহার কারণ কৃষিকার্যটা নিরক্ষর অজ্ঞলোকের হাতে হস্ত করিয়াই দেশের লোক নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। কৃষিকার্যের সাহিত্য অসভ্য অন্ধনয় একপ্রকার নীচজাতির নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে তাই বিদ্যাভিমাত্রী শিক্ষিত লোকেরা সেহাটিকে অগ্রসর হন না। আশঙ্কিত কৃষকেরা বংশপরম্পরাগত নিয়মে জমি চাষ করিয়া আসিতেছে। পূর্বপুরুষগণ যেরূপে জমির “পাট” করিয়া আবাদ করিত তাহারও তদ্রূপই করিতেছে; তদতিরিক্ত কিছু করবার তাহাদের ক্ষমতা নাই। এখন পর্যন্তও এই অজ্ঞ কৃষকেরাই দেশকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু আর পারিতেছে না।

দেশের বর্তমান অবস্থা।

এখন ভীষণ জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকই এখন ভারতের কৃষিজাত শ্রীর উপর নির্ভর করিতেছে। দেশ শাসনসম্বন্ধীয় ব্যয় নিৰ্বাহের জন্য বৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার চাউল, গম প্রভৃতি বা বিলাতে প্রেরিত হইতেছে। এই ব্যয় (Home-charges) আবার

দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে । ভারত উপর “গদাধর বাণিজ্য” প্রসাদে বিদেশী বণিকগণ ভারতবাসীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া স্বদেশে শাস্তান করিতেছে । এবং তথায় বিক্রয় করিয়া প্রভূত ধনোপার্জন করিতেছে । আমাদের অবস্থা কিরূপ ভীষণ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । আমাদের ভীকন-মরণ সমস্তা উপস্থিত । এখন আর পূর্বাবলম্বিত কৃষিপণালীর উপর নির্ভর করিয়া চাওয়া পা কলে চলিলে না ।

চারের উপযোগী ফেলের সংখ্যা বদূচ্ছা বৃদ্ধ করা যায় না । অতএব আন্তরিক্ত প্রয়োজন মঙ্গলনের জন্য এই জমি হইতে চার পাঁচশত শত উৎপন্ন করিয়া লইতে হইবে । ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করিলে চলিলে না । বৈজ্ঞানিক উপায় উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে ।

কৃষি-বিদ্যালয় ।

নিবন্ধের কৃষকদের সাধারণ অভিজ্ঞতা দ্বারা কৃষি উন্নতি হইবে না । শিক্ষিত লোক কৃষিকার্য্য মনোনিবেশ না করিলে সফল ফলিতের আশা অদূর পরাহত । ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সুমাত্র দেশে কৃষিক্ষেত্র দিবার জন্য বহু বিদ্যালয় আছে । এই সকল বিদ্যালয় হইতে যাহারা বিশেষ পারদর্শী হইয়া বাহির হন তাহারা স্বয়ং কৃষিকার্য্য করেন এবং দেশে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিয়া শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন । ছাত্রের বিষয় কৃষিক্ষেত্রের কোন সুব্যবস্থা এদেশে হয় নাই ।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা-জুঁড়িঙ্গের পর একবার কৃষির উন্নতির জন্য সরকার বাহাদুর যত্ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু কল কিছুই হয় নাই । ১৮৭৬ সালে বিহারে হুজিঙ্গের পর ইহার কারণানুসন্ধান ও নিরাকরণের উপায় স্থির করিবার জন্য বিলাত হইতে এক “কমিশন” আসিয়াছিল । সেই কমিশন ভারত-গবর্ণমেন্টকে কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিয়াছিল ; সার এন্টন ই. ডনের সময় প্রতি বৎসর হুজিঙ্গন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারী বিখ্যাত ছাত্রকে কৃষিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিলাত প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল । দপ্তরাজ্য ছাত্রও বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাদের অর্জিত জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার ব্যবস্থার অভাবে দেশের কোন উপকার হয় নাই ।

আজ কয়েক বৎসর হইল বঙ্কান, শ্রীপুর, ভূমরাও এবং শিবপুরে “কৃষিক্ষেত্র” খোলা হইয়াছে । তাহাতে দেশের নানা স্থানের ভূমির

হইতেছে । কোন স্থান কোন শস্ত্র অধিক উপযোগী এবং কোন সার ব্যবহার করিয়া কিরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা বৎসরান্তে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য নিরূপণে প্রকাশিত হইতেছে । এই প্রকারে কৃষিক্ষেত্রের জ্ঞান দেশে বিস্তৃত হইতে পারিবে । অশিক্ষিত কৃষকেরাও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি করিয়া সুফল লাভ করিতে সমর্থ হইবে । এক বৎসর হইল গবর্ণমেন্ট “পুষাতে” একটা উচ্চ অঙ্গের কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন । এই কলেজ দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোক কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিবে । এই সকল কৃষিবিদ্যাজিজ্ঞ ব্যক্তি যখন বিলাতের জায় এদেশে কৃষিকার্য্য পরিচালন ভার গ্রহণ করিবেন তখন কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে এবং দেশের অবস্থাও ভাল হইবে এরূপ আশা করা যায় ।

কৃষি সম্বন্ধে বীক্ষণশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তির যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার স্থানসম্মত উল্লেখ করা নাই হইতেছে ।

মূর্ত্তিকা ।

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে বলিতে গেলে সর্ব্ব প্রথমেই মূর্ত্তিকার কথা বলা আবশ্যিক । মূর্ত্তিকার অবস্থা ও তাহার উপাদান বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা চাই নতুনা সকল শ্রম এবং যত্ন পণ্ড হইবে ।

ভূমির উর্ব্বরতা সাধারণতঃ তাহার গঠনের উপর নির্ভর করে ; মূর্ত্তিকার গঠন বলিলে যে যে উপাদানে উহা গঠিত তাহাই বুঝিতে হইবে । সকল ক্ষেত্রের গঠন একরূপ নহে । ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মাটির গঠন স্বতন্ত্র । মাটির গঠনের উপরই ফসল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ।

রাসায়নিক বিশ্লেষণদ্বারা দেখা গিয়াছে মূর্ত্তিকায় পটাস, ফসফরিক এসিড নাইট্রোজেন, কার্বনিক এসিড, সৌচূর্ণ, অঙ্গার, প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান রাখিয়াছে । সকল মাটিতে এই সকল উপাদান সমপরিমাণে বিদ্যমান থাকে না । এই জন্যই সকল ভূমি সমান উর্ব্বর নহে ।

মূর্ত্তিকার উপাদানকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা বাইতে পারে—যথা, ‘অঙ্গারক’ ও ‘অনঙ্গারক’ । জীবজন্তু ও উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষকেই প্রধানতঃ মূর্ত্তিকার অঙ্গারক অংশ বলা যায় ; ইহা ব্যতীত সকল পদার্থই অনঙ্গারক । অঙ্গারক পদার্থ উদ্ভিদের জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে । একপ্রকার মূর্ত্তিকা আছে তাহাতে অঙ্গারক অংশ অত্যন্ত অধিক । এই মূর্ত্তিকাকে ইংরেজীতে Humous বলে । অঙ্গারক পদার্থের নুনানিক্য অনুসারে জমির অমূর্ত্তিকারতা ও উর্ব্বরতা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে ।

মাটিতে প্রধানতঃ চারিটা পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা কঁদম (Clay) বালুকা (Sand), চুন (Lime) ও অজারক বা জৈবপদার্থ (Humous) । এই কয়েকটা নামগ্রীৱ কোন একটা মৃত্তিকার কাজ করিতে পারে না । সকল ক্ষণিক একত্র হইলে উদ্ভিদের পোষণকার্য্য করিতে সমর্থ হয় । ক্ষেত্রে যাহাতে কোনটির অভাব না হয় তজ্জন্ত দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । যখন যে পদার্থটা ব্যয়িত হইয়া গাইবে তখন সেই পদার্থটা পূরণ করিয়া দেওয়া কর্তব্য । কোন একটির অভাব হইলে উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না ।

ভূমি কর্ষণ ।

আমাদের যেমন জীবনরক্ষার জন্ত খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি উদ্ভিদেরও খাদ্যের প্রয়োজন । উদ্ভিদেরাও উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য না পাইলে ক্রমে দুর্বল হইয়া মরিয়া যায় । বীজ অঙ্কুরিত হইলেই উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে থাকে । ক্ষেত্রে উদ্ভিদের জীবনধারণোপযোগী তরল পদার্থ আছে তাহা উদ্ভিদ মূলদ্বারা আকর্ষণ করিয়া লয় । জলে সলতে নিমজ্জিত করিলে যেমন জল কৈশিকাকর্ষণ (Cohesion) বলে উদ্ধে উঠিতে থাকে তেমনি কৈশিকা-কর্ষণে মূলদ্বারা রস বৃক্ষের সর্বাবয়বে বাস্তব হয় । মৃত্তিকা ভাল করিয়া কর্ষণ না করিলে জমিতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য থাকিলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় দৃঢ় মৃত্তিকায় প্রবেশ করিতে না পারাতে উদ্ভিদ খাদ্যসংগ্রহ করিতে অসমর্থ হয় । অতএব ভূমিকর্ষণ প্রথম উদ্ভিদ উদ্ভবকে মৃত্তিকা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে সাহায্য করা ।

দ্বিতীয় কথা—মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইয়া ভালরূপে চূর্ণীকৃত হইলে সূক্ষ্মকিরণ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া ভিতরের রস উপরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে । এবং বায়ু মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে । কর্ষিত জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রদ্বারা অক্সিজেন (Oxygen) প্রবেশ করিয়া মৃত্তিকাস্থিত সলফ্যুরেটেড্ হাইড্রোজেন (Sulphuretted Hydrogen) এবং হিউমিক্ (Humic Acid) এসিড্ প্রভৃতি উদ্ভিদের অনিষ্টকারী পদার্থকে পোষণোপযোগী করিয়া তুলে । অক্সিজেনের (Oxygen) আর এক গুণ এই যে ইহা ভূমিতে নাইট্রেট্ (Nitrate) প্রস্তুত করিয়া থাকে । Nitrate উদ্ভিদের প্রধান সহায় ।

তৃতীয় কথা—পূর্বেই বলিয়াছি উদ্ভিদ মূলদ্বারা ভূমি হইতে সার পদার্থ আকর্ষণ করিয়া লয় । সুতরাং যতদূর মূল যায় ততদূর পর্য্যন্ত মাটির সার

নিঃশেষিত হইয়া যায়। সেই মাটিতে উদ্ভদের জীবনধারণোপযোগী পদার্থ আর থাকে না। ভূমি কৰ্ষণ করিলে অসার মাটি নীচে পড়িয়া যায় এবং নীচের নূতন উর্বর মাটি উপরে উঠে। আবার অসার জমি নীচে পড়িয়া পুনরায় নবশক্তি লাভ করে। ফুঃখর বিষয় আমাদের দেশে যে ভাবে ক্ষেত্র কৰ্ষণ করা হইয়া থাকে তাহাতে উল্লিখিত উদ্ভদ্ব্য সাপিত হয় না; সেট হেতু তেমন সফল লাভ হয় না এবং জমিও দিন দিন নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। দেশী ক্ষুদ্র কালবৃত্ত লাজলদ্বারা ভাল কৰ্ষণ হয় না। বিলাতি লাজল অথবা শিবপুরের লাজল কৃষির পক্ষে খুব উপযোগী কিন্তু দেশের গরুর অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, এই ক্ষুদ্রকায় হুর্কল গরু সেই সব ভারী লাজলদ্বারা কৰ্ষণ করিতে অসমর্থ। গরুর অবস্থা ভাল করিবার জ্ঞাত সকাগ্রে বদ্ববান হইতে হইবে।

সারের কথা।

পূর্বেই বলিয়াছি ভূমির স্বাভাবিক উর্বরতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। সে ক্ষেত্র পূর্বে আট মণ ধান হইত সেই ক্ষেত্র হইতে এখন সাত মণ উৎপন্ন করিতে হইবে নতুবা আর অন্নোভাব ঘুচিবে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। বর্তমান শতাব্দীতে ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশে কৃষিকার্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। রাসায়নিক কৃষিবিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে কৃষির যুগান্তর আরম্ভ হইয়াছে। কৃষি-রসায়ন বিশেষভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলে উদ্ভিদের সহিত জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতির যে বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা সহজেই জানিতে পারা যায়। সুতরাং কৃষি-রসায়নের মূল সূত্রগুলি জানিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যিক।

জড় পদার্থ কতগুলি উপাদানের সমষ্টি মাত্র। একটা বৃক্ষকে বিশ্লেষণ করিলে অঙ্গার, উদজান, অল্পজান, সোরাজান, কস্ফরান্, গন্ধক, ক্লোরিন্, মিলিকস্, কেলসিয়াম্ প্রভৃতি মূল পদার্থ পাওয়া যায়। এই সকল জীবনধারণোপযোগী পদার্থ উদ্ভিদেরা দ্বিবিধ উপায়ে প্রাপ্ত হইয়া থাকে—পত্রদ্বারা বায়ু হইতে গ্রহণ করে এবং মূলদ্বারা মৃত্তিকা হইতে প্রাপ্ত হয়। একটা উদ্ভিদকে পোড়াইয়া ফেলিলে যাহা উড়িয়া গিয়া বায়ুতে মিশে তাহা উদ্ভিদ বায়ু হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং যাহা ভস্মরূপে পড়িয়া থাকে তাহা মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল। জড় পদার্থের ধ্বংস নাট, কেবল রূপান্তর হয় মাত্র। সুতরাং ইহা সহজেই বোধগম্য যে, যে জমিতে যে উদ্ভিদ রোপণ করা হয় সেই জমির পক্ষে সেই উদ্ভিদের ভস্ম, সারের কার্য্য করে যে হেতু ভস্ম

উক্ত উদ্ভেদের পোষ্যগোপনোগী পদার্থ প্রচুর পরিমাণ বিদ্যমান থাকে । কৃষকেরা ইহা পরিষ্কার না থাকায় উদ্ভিদারা জালানিকারী করে এবং ছাতি ফেলিয়া দেয় ।

গোময় সার ।

আমাদের দেশের কৃষকেরা ‘গার’ বলিলে কেবল গোময়কেই বুঝিয়া থাকে । তাহার গোময় ভিন্ন অন্য কোন ‘গার’ ব্যবহার করে না । প্রায় সকল দেশেই গোময় সাররূপে ব্যবহার হইয়া থাকে । পাশ্চাত্য কৃষিদে পণ্ডিতরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন গোময়সারে উদ্ভেদের জীবনধারণোপযোগী প্রায় সকল পদার্থই বিদ্যমান আছে । কিন্তু এদেশের কৃষকেরা গোময় কিরূপে রাখিতে হয় তাহা জানে না । সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, গৃহস্থের গোবর গোশালা হইতে সরাইয়া কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে জড় করিয়া রাখিয়া দেয় । দাকার মত সেইস্থান হইতে গোময় নয়া ক্ষেত্রে ফেলা হয় । এই শুপাকৃত গোবরের উপর দিয়া সারা বৎসরের রোঙ্গ বৃষ্টি যায় । এই জন্য গোবরের সারাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবার পূর্বেই বৃষ্টির জল দোত হইয়া যায় অথবা রোঙ্গের উদ্ভাপে নষ্ট হয় ।

গোময় অপেক্ষা গোমূত্রে অধিক সার । কিন্তু কৃষকেরা একথা জানে না বলিয়া গোমূত্র বা চোনা নষ্ট হইতে দেয় । কুববদ্যা-বিশারদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় এম্-এ, এম, আর্, জি, এন্, গোময় সম্বন্ধ লিখিয়াছেন—“একটি ভাল গরু হইতে বৎসরে প্রায় ২৫০ মণ গোময় এবং ফেলা-ছড়া ও মাটিতে শোষিত অংশ বাদ দিলেও অন্ততঃ একশত মণ গোমূত্র পাওয়া যায় ।২৫০ মণ গোময় ও ১০০ শত মণ গোমূত্র হইতে ক্ষেত্রের সারসার মিতাস্ত উপযোগী সন্ধ্যা সার প্রায় ১৭০ মণ পাওয়া যায় অর্থাৎ ৩৫০ মণ মিশ্রিত মল ও মূত্র শুকাইয়া গিয়া ১৭০ মণ খাটি সারে দাঁড়ায় ।”

তিনি লিখিয়াছেন—“বর্ধমানের পরীক্ষা ক্ষেত্রে খানের চাষে প্রতি বিঘায় এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে—

ধান	বিচালি	লাভ
বিনা সারে ৬৮	১০২৮	৬৩ পাই

১৭ মণ গোময় সারে—অর্থাৎ প্রতি বিঘায় এক গাড়া গোময় সারে ১০ আনা মাত্র ব্যয় হইয়াছে অথচ উহাতে ১৯৮/০ আনার উপস্থিত পাওয়া গিয়াছে । সারের খরচ বাদে বিঘা প্রায় উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ১৯৮ টাকার কম হয় নাই । আর সারহীন ক্ষেত্রে সেইস্থানে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ৬৩ পাই মাত্র হইয়াছে ।

অতএব বিধাপ্রতি এক গাড়ী গোময় সার দিয়া প্রায় ১৩ টাকা লাভ করা হইয়াছে। সুতরাং ১৭০ মণ গোময় সারে ১৩০ টাকা লাভ হইবার কথা। কাছা হইলে দেখা যাইতেছে যে একটা গরুর গোময় ও গোমুখ সংগ্রহ করিয়া রাখিলে বৎসর ১৩০ টাকা লাভ করা যায়।

পূর্বোক্ত লেখক গোময় সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন—“গমের চাষেও গোময় সার বজায় পরীক্ষাক্রমে ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। বিনা সারে ডুমরাওন ক্ষেত্রে বিধাপ্রতি ৪৫ সের মাত্র গম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেইস্থলে গোময় সারে ৯৭ সের গম হইয়াছে।

পাটের চাষের গোময় সারে নেক্রপ ফল পাওয়া গিয়াছে অল্প কোন সারে তদ্রূপ পাওয়া যায় না। বিনা সারে প্রতি বিঘায় তিন মণেরও কম খাঁটি পাট হইয়াছে। অত্যাচ্ছন্ন সারে অর্থাৎ সোরা, ভাড়া, শুঁড়া, রেড়ির খঁড়ি ইত্যাদিতে ইহার দ্বিগুণ আড়াই গুণ ফল হইয়াছে বটে; কিন্তু গোময় সারে প্রায় ইহার তিন গুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।”

যাপারধঃ এক বিঘা জমির জন্য এক গাড়ী গোময় সার প্রদান করিলেই যথেষ্ট হয়।

টাটকা গোবর জমিতে ফেলা উচিত নহে। তাহাতে উঁই ও অত্যাচ্ছন্ন বিষকর পোকের উপদ্রব হইতে পারে। আবার যে মন গো মহিষ পতিত জামতে চরে এবং পরিপক্ব বাজবৃত্ত ঘাস খায় তাহাদের গোময় নানানকার আগাছার বীজে পরিপূর্ণ থাকে; সেই গোবর ক্ষেত্র ফেলিলে আগাছায় ক্ষেত্র ভারত্বা যায়। এরূপ অবস্থায় গোবর পোড়াইয়া ভস্ম ফেলাই উচিত।

গো ম.হ.বর বিষ্ঠা অপেক্ষা ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতির বিষ্ঠা অধিক হেজস্বায়া। কারণ তাহাতে জলের ভাগ কম। পাশ্চাত্যদেশে ক্ষেত্র কর্ষণের পূর্বে কয়েকদিন ক্ষেত্রে ভেড়ারপালকে চরিতে দেওয়া হয়।

গোশালায় অনিষ্টদূরে গর্ত করিয়া গোময় রাখা উচিত। রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার উপর একখানি চালা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া কর্তব্য। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র চৌবাচ্চা করিয়া গোময় এবং গোমুত্র সংগ্রহ করা হয়। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে কোন প্রকারেই সার পদার্থের অপচয় হইতে পারে না। পূর্বেই বলিয়াছি গোময় অপেক্ষা গোমুত্রে অধিক সার। সুতরাং গোময় এবং গোমুত্র একত্র গর্ত করিয়া রাখিলে গড়াইয়া যাইতে পারে না। চৌবাচ্চায় রাখিলে-তো আর কথাই নাই।

সোরা ।

সোরা সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সোরার কার্য্য অতি শীঘ্রই দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু উপকারিতা স্থায়ী নহে । বীজ অক্ষুরিত হইলেই সোরা ক্ষেত্রে ফেলা কর্তব্য । সোরা ক্ষেত্রে ফেলিয়াই জলসিঞ্চন করিতে হয় নতুনা ফল পাওয়া যায় না । প্রতি বিঘা জমির জন্য তিন মণ সোরার প্রয়োজন । সোরার মূল্য অধিক সেই জন্য সচরাচর সোরা সাররূপে ব্যবহার করা হুঃসাধ্য । যে সকল ফসলে অধিক লাভের সম্ভাবনা সেই সকল ফসলের জন্য সোরা ব্যবহার করা উচিত ।

হাড়ের গুঁড়া ।

হাড়ের গুঁড়া সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহা সকল ফসলের পক্ষে সমান উপকারী নহে । পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যে সকল উদ্ভদের মূল ভক্ষণ করা যায় তাহাদের পক্ষেই হাড়ের গুঁড়া বিশেষ উপকারী । হাড়ের গুঁড়া কমল বুনিবার ২৩ মাস পূর্বে ক্ষেত্রে ফেলা কর্তব্য । প্রতি বিঘার জন্য আড়াই মণ হাড়ের গুঁড়ার আবশ্যক । হাড়ের ভস্মও ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু সারের হিসাবে তাহা হাড়ের গুঁড়া অপেক্ষাও নিকট ।

কাঠের ছাই ।

কাঠের ছাই অতিশয় তেজস্কর সার । ইহাতে অধিক পন্ধিমাণ 'কার্বান' পদার্থ আছে । বহু প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে কচু ও ওল প্রভৃতি গাছে ছাই সাররূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে । ছাই দ্বারা ঐ সকল উদ্ভিদের যথেষ্ট পুষ্টি হইয়া থাকে । শসা, কুমড়া, লাউ, বেগুন প্রভৃতির গাছে ছাই দিলে বৃদ্ধি সতেজ হয় । ছাই গাছের পাতায় ছড়াইয়া দিলে পোকা সকল মরিয়া যায় । যে সকল গাছের মূল খাওয়া যায় উহাদের পক্ষে ছাই অতি উৎকৃষ্ট সার ।

রেড়ির খৈল ।

রেড়ির খৈলে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী সার আছে । ধান, আলু ও পাটের চাষে রেড়ির খৈল দ্বারা যথেষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে । ভারতবর্ষের নানা স্থানে ধান ও আলুর চাষে রেড়ির খৈলের সার দেওয়া হয় । রেড়ির খৈল ইক্ষুর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী । ইক্ষুর ক্ষেত্রে কেবল খৈল না দিয়া তাহার সহিত হাড়চূর্ণ মিশাইয়া দিলে অধিক ফল পাওয়া যায় ।

বর্ধমান আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে ধাতুর পক্ষে কোন সার বিরূপ উপযোগী সে বিষয় পরীক্ষা হইয়াছিল । নিম্নে তাহার ফল সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল ।

প্রতি একরে (৩ বিঘা)

ধান।

বিচালি।

১০০ মণ গোময় সারে	প্রায় ৫০ মণ	প্রায় ৭৭ মণ।
বিনা সারে	১৮ ”	৩৪ ”।
৬ মণ রেড়ি পৈলে	৩৬ ”	৫৮ ”।
৫০ মণ গোময় সারে	৩৫½ ”	৫৪ ”।
৩ মণ হাড়ের গুঁড়ায়	৪৭ ”	৫৮ ”।
৬ মণ ” ”	৫১ ”	৬৫ ”।
৩ মণ হাড়ের গুঁড়া } ৩০ সের সোরা }	৫৩ ”	৭৫½ ”।

উল্লিখিত পরীক্ষায় আর্থিক লাভ বা লোকসান কিরূপ হইয়াছিল তাহা নিম্নস্থ তালিকায় পরিদৃষ্ট হইবে।

মূল্য; আবাদের খরচ; ফসলের দাম; লাভ

১০০ মণ গোময় সারে	৫/০	২৯৮/০	১১৬/০	৮১৮/০
বিনা সারে	...	২৯৮/০	৪৪৮/০	১৪৮৮/০
৬ মণ রেড়ির পৈল	১২/০	৩২৮/০	৮৯৮/০	৪৪৮/০
৫০ মণ গোময় সার	২৮/০	২৭৮৮/০	৮৬৮/০	৫৬৮/০
৩ মণ হাড়ের গুঁড়া	৪৮/০	২৮৮/০	১০৯৮/০	৭৬৮/০
৬ ” ” ”	৯/০	২৮৮/০	১১৮৮/০	৮১৮/০
৩ মণ হাড় গুঁড়া } ৩০ সের সোরা }	৮৮/০	২৮৮/০	১৩৭৮/০	১০১৮/০

ইহাতে দেখা যাইতেছে, হাড়ের গুঁড়া ও সোরার মিশ্রণে ফসল অধিক জন্মিয়াছে এবং লাভও যথেষ্ট হইয়াছে। অথচ এই সারের মূল্য বৎসমান্ত্র বিঘা প্রতি ২৮০ আনার অধিক নয়। উদ্ভিদ সারের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, গোময় সার অপেক্ষা তদ্বারা অধিক ফল পাওয়া যায়। যে জমিতে ধানগাছ রোপণ করিতে হইবে, তাহাতে পাট ও শণের বীজ রোপণ করিতে হয়। ধান বখন রোপণ উপযোগী হইবে সেই সময়ে পাট বা শণ গাছ সমেত চাষ দিবে। এমনি ভাবে চাষ দিতে হইবে যে ঐ সমস্ত গাছ জমির সহিত মিশিয়া যায়। তাহার পর যেখানে ধানের বীজ বপণ করা হইয়াছিল সেখান হইতে ধান গাছ উপড়াইয়া ঐ চাষ দেওয়া জমিতে আনিয়া রোপণ করিতে হইবে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীবতীজনাথ মজুমদার।

রামায়ণের সভ্যতা

বা

হিন্দু-সভ্যতার বাস্তবিক-যুগ ।

জনসেজর বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—

“কথং বিরটনগরে সমপূৰ্ণ-পিতামহাঃ ।

অজ্ঞাত বাসমুখিতা দুঃখোদন ভয়াদিতাঃ ॥”

সেইরূপ প্রত্যেক হিন্দু-সভ্যতার পূৰ্বপুরুষের ইতিহাস অবগত হইতে স্বভাবতই কুতূহল জন্মে । অদ্য আমরা রামায়ণের সভ্যতা বা বাস্তবিক যুগের বিষয় আলোচনা করিব ।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, আজকাল যুরোপে ইতিহাস এক অভিনব প্রণালীতে লিখিত হইতেছে । তা সে ইতিহাস ব্যক্তিগতই হউক বা জাতিগতই হউক । এখন, অমুক রাজা এতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, অমুক মনে অমুক যুদ্ধ হইয়াছিল ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি তত লক্ষ্য রাখা হয় না । কিরূপে একটা জাতির উত্থান ও পতন হইল, সভ্যতালোক কিরূপে ধীরে ধীরে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া একটা জাতীয় জীবনে প্রসার লাভ করিল, ইহাই ঐতিহাসিকের মূখ্য প্রতিপাদ্য হইয়াছে ।

ফরাসী পণ্ডিত টেইন বলিয়াছেন :—“জর্মানিদেশে শত বর্ষের, এবং ফরাসিদেশে গত ষাট বৎসরের মধ্যে ইতিহাসে এক যুগান্তর ঘটিয়াছে । ইহা জাতীয় সাহিত্য অব্যয়নেরই একমাত্র ফল ।”

মার্কিন পণ্ডিত এয়ার্সন বলিয়াছেন :—“প্রত্যেক মানুষাই সমগ্র জগৎ হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারে । এমন যুগ নাই, মানব সমাজের এমন অবস্থা নাই, অথবা ইতিহাসে এমন কল্পপ্রণালী নাই, যাহার সহিত প্রত্যেকের জীবনের কিছু না কিছু সাদৃশ্য না আছে । * * * প্রত্যেক জাতিরই জীবন একই ভাবে তাহার সাহিত্যে, মহাকাব্যে বা গীতিকাব্যে, তাহার নাটকে, দর্শনে পূর্ণ মাজায় প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে ।”

সুবিখ্যাত ফরাসী সমালোচক সাঁবুফ্ বলিয়াছেন :—“সাহিত্য কেবল কল্পনার খেলা নহে” ইহা জাতীয় চরিত্রের সুন্দর প্রতিবিম্ব ।

তবেই দেখা যাইতেছে যদিও হিন্দুজাতির ইতিহাস বলিতে এক “রাজতরঙ্গিণী” ভিন্ন আর কিছু নাই, (এবং তাহা কেবল কাশ্মীর-রাজবংশের ইতিহাস মাত্র)

তথাপি তিনুর প্রাচীন সাহিত্য হইতে যে টুকু ইতিহাস সংগ্রহ করা যায়, তাহাতেই প্রাচীন সভ্যতার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাউতে পারে।

বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক গোট কিঙ্ক এ সকল ব্যাপারের বড় পক্ষপাতী নহেন। হোমর প্রণীত ইলিয়দ্ কাব্য হইতে তাৎকালিক গ্রীক সভ্যতার চিত্রাঙ্কণ বিষয়ে তিনি বলেন যে উহা অতীতের কাল্পনিক চিত্র মাত্র। ("That past which was never present")। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে গোট সাহেবের ঐ অভিমত যুক্তিবৃত্ত নহে। এতদ্বিষয়ে টেইন প্রভৃতি মনোবীণণ যাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা উপরে উল্লিখিত হইল।

সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া মোক্ষমূলের প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে হিন্দু-সভ্যতার চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন, তাহা সকল সময়ে নির্ভুল না হইলেও মোটামোটি সত্য মনেহ নাই। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিখ্যাত "প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস" ঐ প্রণালীর উপর নির্ভর করে। আরও একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে যদিও সময় সময় তাদৃশ চিত্রে চিত্রকর আদর্শ অঙ্কণে ব্যস্ত থাকে বলিয়া যাহা ছিল তাহা না লিখিয়া, যাহা হওয়া উচিত তাহাই লিপিবদ্ধ করে, তথাপি যাহার আদৌ ভিত্তি নাই বা অস্তিত্ব ছিল না তাহা কিছুতেই সন্নিবিষ্ট করিতে পারে না। টেলিগ্রাফ, মটোর শকট প্রভৃতি আধুনিক আবিষ্কিয়া। কষ্ট, এ সকলের উল্লেখ ত প্রাচীন গ্রন্থে দেখি না। যাহার একবারেই অস্তিত্ব নাই, কল্পনাও তাহা অঙ্কিত করিতে পারে না। সুতরাং আমরা রামায়ণ-মহাকাব্য হইতে যে চিত্র উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইতোছ তাহা স্থূলতঃ যথার্থ বলিয়া নিঃসন্দেহে গৃহীত হইতে পারে।

আমাদের দেশের পণ্ডিতগণও রামায়ণ মহাভারতকে "ইতিহাস" বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই "ইতিহাস" অর্থ History নহে। উহার বুৎপত্তি— ইতিহা+আস অর্থাৎ "ইতিহা" বা পরম্পরাগত জনশ্রুতির "আস" আসন বা সঞ্চয়। সুতরাং এই মতে রামায়ণের অন্তঃ গল্পাংশ, জনশ্রুতির সন্নিবেশ। ইহাতে মহর্ষি বায়ীকি স্বয়ং রামের সমসাময়িক বলিয়া নিজেকে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং অবশ্যই অবোধ্য প্রভৃতির বর্ণনা তাঁহার প্রত্যক্ষ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সমগ্র রামায়ণ পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, ইহাতে তিনটি সভ্যতার দিবস বর্ণিত হইয়াছে যথা :—

১। অযোধ্যা বা আর্ক্য-সভ্যতা ।

২। কিক্কিয়া বা মধ্যপ্রদেশের অনার্য সভ্যতা ।

৩। লক্ষ্য বা ভারতের দক্ষিণ দীর্ঘান্তের অনার্য সভ্যতা ।

তাহার প্রত্যেকটাই দুইটুকু আছে। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ । অর্থাৎ ইংরেজিতে বাহ্যকে Material civilization বলে তাহার চিত্র এবং ফরাসী পণ্ডিত বিখ্যাত গিজো বার্তাকে “History of the inner man” অর্থাৎ জাতির চরিত্রগত ইতিহাস বর্ণনা করেন—এই উভয় বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে ।

সহজ ভাষায় বর্ণনা করিলে, মধ্যযুগে একদিকে যেমন দালান-কোঠা, উদ্যান, দীঘা প্রভৃতির চিত্র দিয়াছেন, অপরদিকে সঙ্গে সঙ্গে জাতির নৈতিক চরিত্র কিরূপ ছিল তাহাও দেখাতরাছেন । আনাদের উল্লিখিত এই বিষয়-বিভাগ অরণ্য রাখিয়া আমরা মধ্যযুগে তিনটি সভ্যতারই সংক্ষেপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব ।

(১) অযোধ্যা ।

প্রথমতঃ আর্ক্য-সভ্যতার বহিরাবরণ দেখা যাউক । কবি অযোধ্যাপুরীতে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা নিয়ে কতক উদ্ধৃত হইল :—

“কোশল দেশে সর্বলোক-বিখ্যাত অযোধ্যা নাম্নী নগরী আছে । যে নগরীকে মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং নির্মাণ করিয়াছিলেন । যে নগরী মহাপথে সুবিভক্ত, ষাটশ যোজন আয়ত, ত্রি-যোজন বিস্তৃত । বাহার সুবিভক্ত রাজপথ-গুলি নিরন্তর জলসিক্ত ও কুমুমাবকীর্ণ থাকিত । * * * সেই নগরী কবাট-ভোরগাধিত, সুবিভক্তকুঙ্গপথপরিশোভিত, নানা-বস্ত্র-অস্ত্র-সম্বিত ।

* * * তাহাতে ধ্বজশালী উচ্চ অট্টালিকা, শতরী, উদ্যান ও আশ্রয়কানন ছিল । তাহার চতুর্দিকে মেথলার আয় শাল বৃক্ষের সারি । তাহার সর্বত্রই জী-অভিনীত নাট্যগৃহে পরিপূর্ণ । চারিদিকে গম্বীর জল-পরিখা । * * * গৃহসমূহ নিকটে নিকটে অগম্য ছিল, তাহার কোন স্থানই বাসগৃহ শূন্য ছিল না ।” ইত্যাদি—[আদিকাণ্ড, পঞ্চম সর্গ, পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ ।]

সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও প্রচুর :—

“দীর্ঘায়ুঃ নরাঃ সর্বৈ ধর্মসত্যব্চ সংশ্রিতাঃ ।

সহিতা পুত্র পৌত্রৈশ্চ নিত্যং জীভিঃ পুরোত্তমৈঃ ॥

অর্থ—মনুষ্যগণ সেই পুরীতে পুত্র, পৌত্র ও পদ্মীগণের সহিত দীর্ঘায়ু, ধর্মরত ও সত্যপরায়ণ হইয়া কালযাপন করিতেন ।

আমরা মহাভারতের বর্ণিত সমাজের সহিত তুলনা করিলে, রামায়ণের আৰ্য্য-সমাজকে অনেক বিষয়ে প্রশান্ত দেখিতে পাই। যদিও রচনা হিসাবে রামায়ণ মহাভারতের পূর্বদত্ত বর্ণনা আজকাল স্থিরীকৃত হইয়াছে—তথাপি মহাভারতের সমাজ প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। কি বিবাহ-পদ্ধতি, কি ব্রাহ্মণ-ক্সত্রিয়ের সম্পর্ক, কি অশ্বাশ্ব কতিপয় আচার-ব্যবহার, সকল বিষয়েই দেখা যায় যে রামায়ণের সমাজে সব গোলমাল মিটিয়া গিয়া এক শাস্ত্র আসিয়াছে। তবে একরূপ অসুখিত হয় যে যদিও মহাভারত রামায়ণের পরে রচিত (অন্ততঃ কতক অংশ সন্দেহ নাই), তথাপি মহাভারতে ভারতের পাক্কাল প্রদেশের সমাজের বিষয় যে বর্ণিত আছে তাহা হইতে প্রাচীনতর রীতিকে অনুসরণ করিতেছিল। এবং অযোধ্যার সমাজ তাহার বহু পূর্বই সভ্যতার আরও এক সোপানে উন্নীত হইতে পারিয়া ছিল।

রামায়ণের আৰ্য্য-সমাজের সহিত আমরা যখন প্রথম পরিচিত হই, তখন ব্রাহ্মণ, ক্সত্রিয়ের নমস্কার্য্য প্রভু হইয়াছেন। রাজর্ষি জনক আছেন কিন্তু তিনি বৃহদারণ্যকোপনিষদের জনকের ভ্রাতৃ ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন না। এই অধ্যায়ে ক্সত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভের বিষয় বর্ণিত আছে। কিন্তুপে বশিষ্ঠের হোম ফেলু শবলাকে হরণ করিতে বাইয়া বিশ্বামিত্র সৈন্যসহ পরাভূত হইয়াছিলেন—ব্রাহ্মণের নিকট নতশীর্ষ হইয়াছিলেন, তাহাই কবি দেখাইয়াছেন। তপস্বী দ্বারা অবশ্যই তিনি ব্রাহ্মণত্বে অধিকারী হইয়াছিলেন—কিন্তু ইহা আরও প্রাচীন কিংবদন্তী। সুগ্ৰাহ বিশ্বামিত্র যে ক্সত্রিয় ছিলেন তাহা বলিতেই হইবে। আমাদের যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে ঋগ্বেদে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ বা ক্সত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হন নাই। তাঁহার পুত্র মধুচ্ছন্দা প্রথম ও অশ্বাশ্ব সৃষ্টির ঋষি। বাহা হউক, অনেকটা আধুনিক ভাবে অযোধ্যার সমাজ গঠিত হইয়া গিয়াছে এই আমরা প্রথম দেখিতে পাই।

“ক্সত্রঃ ব্রহ্মমুখং চাগীৎ ঠৈশ্চা ক্সত্রমহুভবত।

শূদ্রা স্বকস্মিনরতা ক্সত্রীন্ বণাহুপচারিণঃ ॥

অর্থ—“ক্সত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাবাহ, বৈশ্যগণ ক্সত্রিয়ের আজ্ঞাবাহ, শূদ্রগণ ক্সত্রিয়ের সেবারূপ স্ববশ্মে নিরত ছিল।” [১। বষ্ট সর্গ]

তখন ব্রাহ্মণ ক্সত্রিয়ে এতই প্রভেদ হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ, ক্সত্রিয় ব্যবহৃত রথে চড়িতেন না তিনি দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইতেছেন—

“ব্রাহ্মণ রথবরং যুক্ত মাংস্বায় সুদ্বহরতঃ।” অযোধ্যাকাণ্ড—৫ম সর্গ। ৪র্থ শ্লোক।

অতঃপর এ সমাজে যে স্বাধীন বন্দ্যচিত্ত ও আচরণ হইতে পারে না ইহা বলা বাহুল্য। তাই শব্দ পুত্র বিজোচিত ভগ্নতা করিতে বাইরা মুণ্ডপাত লাভ করিতেছে এবং স্বয়ং রাজারই হস্তে ।

তস্মিন্ শূদ্রে ততে দেবাঃ সৈন্ধাঃ সাধিপুরুগমাঃ ।

সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং তে শশংসু মুহু মুহু ॥ *

উত্তরকাণ্ড—৮৯ সর্গ । ৫ম শ্লোক ।

শূদ্রের কি হইল জানি না কিন্তু ব্রাহ্মণের অকাল-মৃত-পুত্র পুনর্জীবিত হইয়াছিল ।

প্রাচীন ভারতের আট প্রকার বিবাহ প্রচলিত নাই । কিন্তু দশরথের বহু বিবাহ আছে ;—কবি ইহার কুফলও দেখাইয়াছেন । রাম প্রভৃতির চারি জাতার সকলেরই এক এক পত্নী । ইহাদের গাইন্দ্য জীবন তাই বড় সুখময় । ইহারই ছায়া নইরা ভবভূতি লিখিয়াছিলেন—

† “ইয়ং গেহে লক্ষ্মী রিয়মমৃতবর্নির্নয়নয়োঃ ।

অসাবিত্তাঃ স্পর্শো বপুসি বহুলশ্চক্ষন রসঃ ॥”

এ সমাজে অমূল্য বিবাহ নাই । মহাভারতে কিন্তু ভূরি ভূরি । বিরাট রাজ, বিচিত্রবীর্ষ্য, ভীমার্কুণ প্রভৃতি ইহার মধ্যেই উদাহরণ ।

কবি তাঁরপর সমৃদ্ধ গ্রামের বর্ণনা করিয়াছেন :—

“পরে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, ... বেদধ্বনি নিনাদিত, ধন-ধাত্ত-সমখিত, দাতৃগণ সমাকীর্ণ, নিভীক, পুষ্পোদ্যান ও আত্মকাননদ্বারা পরিশোভিত, চৈত্যা-মুপ-সমাবৃত, নির্মল জলাশয়-সম্পন্ন, ছই-পুট-জনাকাং, বহু-গোকুলপরিব্যাপ্ত, গ্রাম সকল অতিক্রম করিলেন ।”

অযোধ্যাকাণ্ড । ৫০ সর্গ ।

আহা ! শুনিলেও মন শীতল হয় । ভারতের এমন দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দিনে, পূর্ব পুরুষের গোম্য সমৃদ্ধি শুনিয়া চোখে জল আসে । “ছইপুটজনাকাং” ;—নিশ্চয়ই অকালমৃত্যু প্রভৃতি আপদ ছিল না, বোধ হয় দেশোৎসন্নকারী ম্যালেরিয়াও ছিল না ।

* । সেই শূদ্র নিহত হইলে অগ্নিশমুখ ইজাদি দেবগণ “সাধু সাধু” বলিয়া কাকুৎস্থরামকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

† । ইনি (সীতা) গৃহের লক্ষ্মীপত্নী, ইনি নয়ন যুগলের অমৃত-শলাকা, ইহার স্পর্শ শরীরে যেন চন্দনরস সিঞ্জন করে ইত্যাদি—উত্তর চরিত ।

ভাষ্যের উন্নত সভ্যতার উপযোগী বহুতর বিলাস-সামগ্রীর কৰ্মাণ্ডি মহাকবি উল্লেখ করিয়াছেন। যখন শ্রীত-প্রেমিক ভরত রাজ্যের বিপুল সৈন্য নইরা কাম-সন্দেহার চিত্রকূট বাইতেছিলেন তখন তাঁহাকে পশ্চিমদে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিতে হয়। মহাদেবী স্বামী বেগবলে রাজোচিত সমস্ত বিলাসোপচার দ্বারা সঙ্গত ভরতকে দংকৃত করিয়াছিলেন :—

“গাভী সকল কামজ্বা ও বৃক্ষ সকল মধুসবী তইয়াছিল। দীর্ঘিকা সকল স্থানীপক্ষে উত্তপ্ত বৃগ, ময়ূব ও কুক্কট মাংসে পরিব্যাপ্ত হইল। স্নান নিষিদ্ধ সহস্র সহস্র অন্নপাত্র, নিযুক্ত পরিমিত ভোজন পাত্র, অকুন্দ সংখ্যক হস্ত প্রফালনোপযোগী পাত্র, জলপান পাত্র, সুসাজিত দাঁিপাত্র সকল * * * প্রচুর পরিমাণে ছিল।

“আমলকী চূর্ণ, সুগন্ধি কক (গটল) প্রভৃতি স্নানীয় দ্রব্য ; অগ্রভাগে কুর্চ যুক্ত ষেতবর্ণ দন্ত-কাঠ সকল (tooth brush), কটুরাতে সংরক্ষিত ঘর্ষিত চন্দন (sandal cosmetic), ধোত বসন সকল এবং সহস্র কাঠপাত্রকা ও চর্মপাত্রকা। অন্নন-করওকা (স্নানপাত্র), অঙ্গপ্রস্থান কুর্চ (brush) ছত্র, ধনু, কবচ (mail coat) বিচিত্র শয্যা ও আগন তথায় দৃষ্ট হইল।”

তারপর রাজ্য-শাসন প্রণালী :—রাজা স্বয়ং রাজ্যের ছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার অশাসন শুণেই হউক বা অজ্ঞ কোন কারণেই হউক তাঁহারই অমুদত্ত হইত। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার পূর্বে রাজা দশরথ প্রজাবন্দ ও অদীন নৃপ-ভগবৎকে সাদরে আহ্বান ও সমর্চনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হউক ইহাতে আপনাদের অভিপ্রায় কি? তাঁহার সকলেই রামের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া একবাক্যে রাজার কথার অনুমোদন করিলেন। কিন্তু যখন কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে রাজার মত পরিদর্শিত হইল, যখন রামকে বনবাস দিতে রাজা অনিচ্ছাসেও তিরীকৃত করিলেন, তখন এই প্রকৃতিপুঞ্জ কোথায় ছিল? রামের সম্রাটগণ যেমন নীর উত্তরাধিকারী হুত্বের পূর্বে স্বয়ং নিয়োগ করিতেন, তেননই অসোধ্যাপতি, রামকে নিয়োগ করিয়া ঘটনাচক্রে ভরতের যৌবরাজ্যে অনুমতি দিতে বাধ্য হন।

এস্থলে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে নৃপ ও রাজা একাদিপতি ছিলেন, যদিও রামের সম্রাটদের মত বা উৎকৃষ্ট প্রথম জন্মের মত তিনি “মহাভীষেবতা” পদ বা divine rights চাহিতেন ও লাভ করিতেন, তথাপি তাঁহাকে স্বর্বি-ধিগের সভাবলদী হইতে হইত। উহা নানি রাজ্যের প্রজাশক্তির পার্শ্বসেট

ছিল। এ কথা রামায়ণ সম্বন্ধে আমরা স্বীকার করি না। রামায়ণে সেরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। রাজবন্দ্য সংহিতায় রাজকাৰ্য্যে রাজার সহায়তা করিতে “ব্রাহ্মণ পরিষৎ” এর বিষয় উল্লিখিত আছে। অশ্বাশ্ব ধর্ম সংহিতায়ও এরূপ দেখা যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে উহা ধর্মাদিকরণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। রাজ্য শাসন বা আমরা আজকাল political administration বলিতে যাহা বুঝি সে সম্বন্ধে উহা প্রযোজ্য নহে। তবে কেবল প্রজার মনোরঞ্জনার্থ রাম সীতাকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা প্রজাশক্তির নিকট অবনত মন্তক হইয়া নহে।

রাজা কৃষি ও বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি জানিতেন উহাই রাজ্যসমৃদ্ধির ভিত্তিস্বরূপ।

রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

“কচ্ছিতে দরিতাঃ সর্কে কৃষ গোরক্ষজোনিনঃ।

বার্ভায়াং সাম্প্রত্যং তাত, লোকোহয়ং স্বথমেবতে ॥”

রাজনীতি, হিন্দুরাজ্যে চিরকালই “রক্ষণশীল” বা conservative.

বহু বলিয়াছেন—

“যেনাস্ত পিতরো য়াতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।

তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন রিষতে ॥”

রামও ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

“যাং বৃত্তিং বর্জতে তাতো যাক্ নঃ প্রপিতামহাঃ।

তাং বৃত্তিং বর্জসে কচ্ছিৎ যা চ সৎপথগা শুভা ॥”

রাজ্যশাসন বহু মন্ত্রিতে বিভক্ত হইত। মন্ত্রিগণ অধিকাংশই ব্রাহ্মণ জাতীর ছিলেন। এবং মন্ত্র-শক্তি প্রভৃতি যে সকল রাজনীতি অবলম্বিত হইত তাহা অধুনাতন রাজনীতি হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে।

এখন আভ্যন্তরীণ সভ্যতার বিষয় কিছু বলিয়া আমরা আর্য্যসভ্যতার উপসংহার করিব। প্রথমতঃ আমরা সৌভ্রাজ্য দেখিতে পাই। নৈতিক চরিত্রও অতি উন্নত। পরস্বাপহরণ দূরে থাকুক, রাম স্বয়ং পিতৃদত্ত রাজ্য অল্পেণ তুণের মত পরিত্যাগ করিলেন। ভরত, রামকে রাজ্য পূর্ণগ্রহণ করাইতে ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া স্বয়ং সন্ন্যাসভ্রম অবলম্বন করিলেন। আমরা দেখিতে পাইব, অনার্য্য সভ্যতার এই সৌভ্রাজ্য নাই—এমন উদারতার সম্পূর্ণ অভাব।

কবি বলিতেছেন :—“অবোধা নগরীতে নারী কি নর সকলেই ধর্মশীল,

জিতেন্দ্রিয়, প্রমুদিত এবং শীল ও চরিত্রে মতর্ষির জায় নিখাল ছিল। অতএব কখন কেহ সেট নগরিতে কামুক, নৃশংস, কদর্যস্বভাব, মুখ কি নাস্তিক পুরুষকে দেখতে পাইত না।” ইত্যাদি—আদিকাণ্ড : ৬ সর্গ।

(২) কিকিঙ্ক্যা।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ইহা মধ্যভারতের অনাধা সভ্যতা। সুগ্রীব যে রাজ্যভোগ করিতেন তাহার বহরাবরণ আখ্যা সভ্যতারই অন্তর্করণ মাত্র। কিকিঙ্ক্যা অর্থ পর্কত-গুহা বিশেষ। সুগ্রীবের বিপুল ভোগৈশ্বর্য সম্পন্ন প্রাসাদ ইহার মধ্যেই অবস্থিত। ইহা পাঠককে হোমরকথিত Cave-people দিগের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।

কপি-যেনোপতিগণের প্রাসাদরাজি বর্ণনা করিয়া মতর্ষি বলিয়াছেন :—

“পাণ্ডুরাজপ্রকাশানি গন্ধমালাযুতানি চ।

প্রভৃত্বনবাভ্যানি স্ত্রীরত্নৈঃ শোভিতানি চ।”

অর্থ :—গুহ্যমন্দের মত প্রকাশমান, গন্ধদ্রব্য ও মান্য সমন্বিত, প্রচুর বন বাস্তবুত ও শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণ সমলঙ্কৃত।

কবি অসোধ্য-সমাজ বর্ণনার স্বেকপ নানা বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এখানে তেমন কিছুই নাই। সুগ্রীব সর্বেসর্ব্বা রাজা। বাহু সভ্যতাও যে খুব উন্নত তাহা নহে। তবে আখ্যাজাতির অন্তর্করণে যতটুকু হইয়াছে তাই মাত্র।

কিন্তু, চারিত্রিক ও নৈতিক সভ্যতার কিকিঙ্ক্যা বহু পশ্চাত্তপদ। রাম, বালিহস্তাক্রম দুর্ভাষ্য করিলেন বটে কিন্তু সুগ্রীব, বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা ভুলিয়া বিলাসে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। পরে রামের ক্রোধ ও অস্বীকৃতিভাজন হইলে তাঁহার অকল্যাণ হইবে, তাই বন্ধুকার্য্যে ত্রুতী হইতেছেন। রাম, লক্ষ্মণের মুখে, সুগ্রীবের কার্য্যশৈথিল্য দেখিয়া বলিয়া পাঠাইলেন :—

“ন স সঙ্কচিতঃ পহু! বেন বালী হতো গতঃ।”

বালী নিহত হইয়া যে পথে গমন করিয়াছে, মনে রাখিও সুগ্রীব! সে পথ এখনও বন্ধ হয় নাই।

তারপর সৌভ্রাতের কথা আর কি বলিব? বালী যতকাল বাঁচিয়াছিলেন ততদিন সুগ্রীব প্রাণতরে পর্কতে পর্কতে, সমুদ্রতীরে, গিরিগর্ভে লুকাইয়া থাকিতেন। পরে যখন রামের সাহায্যে বালী নিহত হইলেন, তখন সুগ্রীব কেবল ভ্রাতৃরাজ্য নহে, ভ্রাতৃবধুও হরণ করিয়া নীতি ও সৌহার্দ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন! অবশ্যই তারপর সুগ্রীব সুদূরদেশে বহু চরিত্র-সাহায্য দেখাইয়াছেন

কিন্তু তাহা দার্শনিক রসিকের সহিতব্যাপ্ত। চন্দন সাহচর্যে নীতিগাটক ও চন্দনজ্ঞ লভিত্ব করে।

এ সমাজে হুমুমান একটী আদর্শ চরিত্র। জুভাগাজুগে বঙ্গদেশে এই মহাশয়ার নাম সকলেরই হাজির। আমরা হুমুমানকে কেবল দীর্ঘ-লাঙ্গল-বিশিষ্ট কদলীভক্ষক ও সাগরলঙ্ঘনকারী প্রভুত বলিগা মনে করি। থাকি। জানি না, কীতিগাম হতার জন্ম দায়ী কি না। কিন্তু বাস্তবিক সৃষ্ট হুমুমান, মহাপণ্ডিত, মহাদীপ, প্রবীণ এবং আদর্শ প্রভুগরণ। তাই পশ্চিম অঞ্চলে মহাবীরের এত সম্মান। হুমুমানের নীতিজ্ঞান ও চরিত্রবলের নিকট আধুনিক শিক্ষিতসমাজ শিবত্ব গ্রহণ করিলে উষ্ট্র ভিন্ন অনিষ্ট হতবে না। অঙ্গরাজ্যে যখন কপিপুঞ্জ-রাবণান্তঃপুরে বিশ্বতুঙ্গ-রাবণ-রমণীগণকে দেখিতেছেন, অর্ঘ্য ভাবিতেছেন—

ছিঃ বড় অশ্রয় করিতেছি।

“নহি মে পরদারাগাং দৃষ্টির্বিষয়বক্তী।

অরক্ষাক্রময়া দৃষ্টঃ পরদারপরিগ্রহঃ।

তস্মৈ প্রোক্তরত্ন চিন্তা পুনরত্মা মনস্কিনঃ।

নিশ্চিন্তৈকান্তচিত্তস্তকার্যনিশ্চয়-দর্শিনী॥

কামং দৃষ্টা ময়া সর্বা বিশ্বস্তা রাবণক্লেশতঃ।

ন তু মে মনসা কিঞ্চিদৈকান্তমুপপদাত্তে॥

মনোহি হেতুঃ সর্বেষামক্ষয়ান্নাং অবর্তণে।

ভুভাভুভাস্ববদ্বাসু তচ্চ মে সুবাবস্থিতম॥”

সুন্দরকাণ্ড। ১১। ৪০-৪৩

“বড় হুমুমানের নীতিজ্ঞান।

(৩) লক্ষ্য।

কবি লক্ষ্যর বাহু সভার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার নিকট অযোধ্যাও পরিণত। যে বিপুল অট্টালিকা, স্বর্ণপুরী, উদ্যান, সরোবর, আরাম, সেনাগার প্রভৃতি রাবণের বিশাল সম্পদ ঘোষণা করিতেছে তাহার নিকট স্বর্ণ-নিভবও লজ্জার মলিন। লক্ষ্য “স্থিতিবিশ্রব পুং মধোনঃ।” অশোক-বাণিকার বর্ণনার নিকট আধুনিক ভেঁদেন গাভেঁদেনও পরাজিত। চতুর্দশ লুটর বিলাসকানীন সমৃদ্ধ ভারতের প্রাসাদও মহাবীর উদ্ভীষ্ট কলমার নিকট লাহিত। বিলাসী পরজীহারক রাবণের অন্তঃপুর বাইরের ডন-আমানের বা আর-নিস্তের লাইট অব-এসরতে বুদ্ধের অন্তঃপুরের সহিত তুলিত হইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বনবাসী তপস্শ্রী-নরত মহর্ষি ওরূপ বিলাস-লীলার চিত্র কেমন করিয়া অঙ্কিত করিলেন । বস্তুতঃ দৈবী-প্রতিভার অসাধ্য কি আছে ?

কিন্তু এই সকল ব্যক্তি-আধরণ ভিতরের অর্থঃ ও বীভৎস জীবন গোপন রাখিতে সমর্থ হয় নাই । লঙ্কার রাজ্য অধর্ম্ম-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত । মনুষ্য-জন্মের যতগুলি পাপপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে রাবণ এবং তাহার পরিবারস্থ প্রায় সকলেরই তাহা বিদ্যমান ।

আত্মসংযম অযোধ্যার ধর্ম্ম । যথেষ্টচার লঙ্কার নীতি ।
সীতা বলিতেছেন :—

“আত্মানং নিয়মৈ স্তৈ স্তৈ কর্ষয়িত্বা প্রযত্নতঃ ।

প্রাপ্যন্তে নিগুণৈশ্চো ন স্থান্নভতে সুখম্ ॥” অরণ্যাকাণ্ডম্ ৩১শী

“রাবণ-সেই সীতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে :—

† “স্বধর্ম্মো রক্ষসঃ ভীকু সর্বদৈব ন সংশয়ঃ

গমনং বা পরজ্ঞাণং হরণং সস্ত্রমাখ্যচ”

* * * * *

‡ পিব বিহর রমস্ব ভূজ্জু ভোগান্ মরি লল ললনে যথা সুখং ত্বং

ধন-নিচয়ং প্রদিশাতি মেদিনীং চ । ত্বয় চ সমেতা ললন্ত ললনান্তে ॥”

রাম বনবাসী হইলে, তরতও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন । রাবণ নিহত হইলে বিভীষণ দ্বিক্রান্তি না করিয়া ভাতৃরাজ্যে বা আত্মীয়ের আশ্রানে স্বরং অভিযুক্ত হইলেন । সুগ্রীব ও বিভীষণ একত মস্ত্রে দীক্ষিত ।

অধর্ম্মের রাজ্যে ধর্ম্মের প্রভাব নাই । তাই বিভীষণ পদাহত হইয়া দামরথি রামের শরণগত হইলেন ।

ধর্ম্মের লেশ নাট বলিয়া মহর্ষি, রাবণ-সংসারকে বীভৎসবর্ণে চিত্রিত

* সুদৃঢ় মানবেরা অতিশয় যত্ন সহকারে নিয়মদ্বারা শরীর কুশ করিয়া ধম্মলাভ করেন ; কারণ শারীরিক সুখপ্রদ উপায়দ্বারা সুখ-হেতু ধম্মলাভ করা যায় না ।

† ভীকু! বলপূর্ব্বক পরপত্নী হরণ বা পরদার-গমন রাক্ষসদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ।

‡ পুন, বিহার ও বিষয়ভোগে নিরত হইয়া নিজের মনোমতজনে ধরা ও ধনরাজি দান কর । ললনে ! তোমার বাহাতে সুখ হয় তুমি আমার নিকটে তাহা প্রার্থনা কর ; পরে তোমার আত্ম-বান্ধবগণ আসিয়া অভিলষিত বিষয় লাভ করুক । (সুন্দরকাণ্ড । ২১শী)

করিয়াছেন। এমন কি রাক্ষসদিগের নামগুলি পর্যন্ত বীভৎস। রাবণ (লোক-বিভ্রাসক); কুম্ভকর্ণ (কণসের মত কাণ বাহারি); অতিকায়; মহোদর; ভালজ্ঞা; সরমা (কুকুরী); শূর্ণনখা (কুলোর মত নখ বার) ইত্যাদি আর কত বলিব ?

ধর্মের নিকট অধর্মের চিরকালই পরাজয়। রাবণের এমন ইচ্ছোপম ঐশ্বর্য থাকিতেও, রাবণ সবংশে নিহত হইয়াছিল। কবি দেখাইলেন, অধর্ম গৌরবের অতি উন্নত শিখরে আরোহণ করে বটে, কিন্তু তাহার কারণ আর কিছু নহে যত উর্ধ্বে তাহার উন্নতি তত নিয়ে তাহার পতন।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিমাছি যে উন্নতশীল আর্য্যসভ্যতা ধর্মের প্রতিষ্ঠিত এবং অনার্য্যসভ্যতা অধর্মমূলক। লাক্ষ আবরণ, সদৃশ হইলেও, অভ্যন্তর বড় বিভিন্ন। অনার্য্যসভ্যতা যে আর্থ্যেরই অল্পকরণ তাহার মাত্র আর একটা উদাহরণ আমরা না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

বিরোধ রাক্ষস রামকর্তৃক নিহত হইলে তাহার দেহের সংকার সম্বন্ধে বলিতেছে—

“অবটে চাপি মাং রাম নিক্ষিপ্য কুশলী ব্রজ।

রক্ষসাং গত সম্বানাং এষ ধম্মঃ সনাতনঃ ॥

অর্থ—হে রাম তোমার কল্যাণ হউক। তুমি আমার দেহ গর্ত্তে প্রোথিত করিয়া এখান হইতে প্রস্থান কর। কেন না গতগ্রাণ রাক্ষসদিগের উহাই সনাতনরীতি। (অর্থাৎ কবর দেওয়া)। কিন্তু আর্থাভ্যুত্থানে রাবণের মৃতদেহ সংকৃত হইতেছে :—

“রাক্ষসগণ হুঃখিতচিত্তে রাক্ষস-রাজকে পবিত্র স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক, রাজবাস্তুরণের উপর বেদোক্ত বিধানানুসারে চন্দনকাঠ, পদ্মক, উল্লীর ও চন্দন-দ্বারা অগ্নিকোণে চিতা নিৰ্ম্মাণ করিল * * * তৎপরে শাস্ত্রজ মহর্ষিগণের বিধানানুসারে পবিত্র পণ্ড হননপূর্ব্বক তাহার চর্ম্মদ্বারা রাক্ষসরাজের মুখ আবৃত করিলে * * * বিভীষণ বথাবিধি অগ্নি প্রদান করিলেন।” লঙ্কাকাণ্ড । ১১৩ সর্গ।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতের এমন হৃদ্যনে প্রাচীন সজ্জা, আচার পদ্ধতি, রীতিনীতির বহুই আলোচনা করা যায় ততই আমাদের কল্যাণ হইবে। আমাদের কি অভুল সম্পদ ছিল, কি চরিত্রের বল ছিল, নৈতিক জীবনে আমরা সভ্যতার কি উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছিলাম তাহাই স্মরণ করিয়া আমরা ধন্য হইব।

শ্রীকামিনীকুমার সেন।

ভারতে কার্পাস ।

ভারতবর্ষ ও উজ্জ্বল তুলার আদিস্থান। চীন ও জাপানে রেশম এবং ইউরোপে পশমের উন্নতি অনেক দিন হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট শাল, গালিচা প্রভৃতি হইয়াছে বাট কিন্তু ইউরোপের (উল) পশম যে প্রকার পরিষ্কৃত, নরম ও বর্ণযুক্ত, ভারতে তাহা কোম সময়েই হয় নাই। টাকার মসলিন জগৎব্যাপ্ত ও তুলনা রহিত। যেখানে বাছা সম্ভব, পৃথিবীতে অনেক সময়ে সেখানে তাহাই হইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গের জল বায়ু বস্ত্র বয়নের অঙ্গুল; তাই তথায় সুন্দর বস্ত্র-শিল্প উন্নতির চরম সাগর উপনীত হইয়াছে। ঢাকার মসলিন কিশোরগঞ্জের তজাব এক সময়ে বিদেশ হইতে অনেক অর্থ এ দেশে আনিয়াছে।

পূর্ববঙ্গে যে তুলা হইতে সুন্দর মসলিনের সূতা প্রস্তুত হইত, তাহা জন্মিত কোথায়? জন ক্রফোর্ড "History of the Indian Archipelago" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—মেঘনার তীরে ৪০ মাইল লম্বা ও ৩ মাইল প্রস্থ স্থানে মসলিনের তুলা জন্মিত। ডাক্তার রকমবার্গ তাহার হস্তলিখিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর এই তুলার চাষ হইত এবং তাহার আঁশও অপেক্ষাকৃত লম্বা ছিল। এখন উন্নতবস্ত্র লম্বা আঁশযুক্ত তুলার্যারা যে সুন্দর সূতা প্রস্তুত হয়, তাহা মসলিনের সূতা ৪টি একত্র করিলে বাছা হয় তাহার সমান। এই সূতা টাকুরার সাহায্যে হস্ত দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে মোটা যেটা তাহা ২৫০ নম্বরের নীচে নহে। আর সুন্দর যেটা তাহা ৩৫০ নম্বরেরও উপরে। কি প্রকারে অপেক্ষাকৃত ছোট আঁশের তুলা হইতে এই সূতা প্রস্তুত হইত তাহা ইউরোপীয় শিল্পকরের ধারণার অতীত। বর্তমান সময়ে যে সূতার কল আছে, তদ্বারা ঐ প্রকার তুলা হইতে এত সুন্দর সূতা প্রস্তুত করা অসম্ভব।

কেবল বাঙ্গালার নহে, ভারতের সর্বত্রই তুলা জন্মে। দেশভেদে তুলা নামাঙ্গকার। এক সময়ে মেক্সিকোর কলের জন্ত সে তুলার প্রয়োজন হইত, তাহার অধিকাংশ ভারতবর্ষ হইতে বাইত। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের লোকে আমেরিকার তুলার কথা জানিত না। ঐ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে এক জাহাজে ৮ বস্তা তুলা আইসে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পরে ৭০১৪৫৬ বস্তা তুলার আমদানী হয়। আমেরিকার তুলা ভারতের তুলাকে পরাজিত করিয়াছে। আমেরিকার কৃষকেরা উন্নত এণালীর কৃষির সাহায্যে তুলার চাষের উন্নতি করিয়া তুলার একচেটির ব্যবসায় স্থাপন করিয়াছে। তাহার

উচ্চাঙ্গত মেসেক্টারের নিকট দাম নিতেছে। এবার শতকরা পনের টাকা দাম চড়াইয়াছে। সেই সঙ্গে বিলাতী সূতা ও কাপড়ের দাম চড়িতেছে। তাহাতে ইংরেজ অনেকটা গিৰত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে তুলার উপযোগী স্থান অচু্য পরিমাণ থাকিতে ইংরেজ কেন আমেরিকার মুখাপেক্ষী হইবেন, এই প্রশ্ন শুনা যাইতেছে। স্থানে স্থানে কৃষ পরীক্ষাক্ষেত্রে তুলার চাষ হইতেছে। ডিস্ট্রিক্ট-এসোসিয়েশন স্থাপন করিয়া তুলার বীজ বিতরণের ব্যবস্থা হইতেছে। এই প্রায় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে একবার উঠিয়াছিল। তখন একবার ভারতে তুলার চাষের চেষ্টা হইয়াছিল।

মেজর জেনারেল জন ব্রিজন তাঁহার “কটন ট্রেড অব ইণ্ডিয়া” গ্রন্থে বেপাইয়াছেন—ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল না। কিন্তু ভাষ্যবায় গবর্ণমেন্ট শিখমুক ও সিপাহী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া কৃষ উন্নতি চেষ্টায় ফাস্ত থাকেন। অধুনা গুজরগণ গবর্ণমেন্টের কৃষ বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। আমেরিকার ধন-কুপের মেস ফিপস ভারতে কৃষ উন্নতিকল্পে ৪ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তুলার চাষের প্রতি কৃষ বিভাগের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

দেশের লোকের চেষ্টা না করিলে শুধু গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় কৃষ উন্নতি হইতে পারে না। তুলার চাষের উপর যোকের দৃষ্টি পড়া স্বদেশী আন্দোলনের একটি গুরু-ফল। অনেকে মনে করেন—কবে এ দেশে তুলার চাষ হইবে কবে ঐ সকল তুলার কল-কারখানায় ব্যবহৃত হইয়া যক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হইবে।—যে অনেক দিনের কথা। এ দেশের কৃষক ভাল মন্দটা বেশ বুঝে, বস্ত্র-তাটা বুঝে না সভ্য। নূতন প্রণালীতে আঁকের চাষ, আঁকের কল তাহারা কেমন পরিচাছে। পাটের চাষ করা দিনের। ৩ বৎসরের মধ্যে দেশময় তুলার চাষ হইয়া যাইতে পারে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ কোনও ফার্মসী ইজ প্ল্যা কোনও বাগানে একটা বীজ ফেলিয়াছিলেন; ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তজিষ্ঠ হইতে একশত পঞ্চাশ হাজার বস্তা তুলার রপ্তানা হইয়াছিল। আজ তিন বৎসর মাত্র বাটা-ডাঙ্গ প্রভৃতি আমেরিকার ঘিণে সি-আয়লগু-তুলার চাষ হইতেছে। ১৯২২ সনে তথায় ৪০০ একর, ১৯২৩ সনে ৪০০ একর, ১৯২৪-৫ সনে ১৪০০ একর চাষ হইয়াছে। বিদেশ হইতে বীজ আনিয়া ভারতবর্ষে রোপণ করা যায়। তাহার উপযোগী স্থান ভারতে আছে। যিহু-প্রদেশে ইজপ্তর তুলার বেশ জন্মতেছে। বিদেশ হইতে বীজ না আনিয়া এ দেশের স্বভাবজাত উৎকৃষ্ট তুলার চাষ করাই সম্ভব। বিদেশ হইতে বীজ আনিতে তাহা এ দেশের-জগদায় উপযোগী হইবে কিনা সন্দেহ।

তুলার গাছ সাধারণতঃ তিন প্রকার। এক প্রকার ওষধি জাতীয়, সাহা ৭৭সর ৭৭সর বুনা হয় এবং তুলা হঠলে গাছ মরিয়া যায়। গারো পাহাড়ে ও ময়মনসিংহ নধুপুরের জঙ্গলে ইহার চাষ আছে। দ্বিতীয় প্রকার গুরুজাতীয়, এক বার গাছ হইলে ৯৫ ৭৭সর থাকে। ত্রাসণী তুলার গাছ ইহার অন্তর্গত। নাজলায় ইহা গ্রামে গ্রামে অনেক দেখা যায়। এই জাতীয় গাছেরও চুইটী শ্রেণী আছে। একজাতীয় গাছের বীজ তুলার মত জড়াইয়া থাকে; বীজ ছাড়ান কষ্ট। অপর জাতীয় গাছের বীজ সহজে ভিন্ন হইয়া যায় এবং উৎপন্ন তুলা কোমল ও অপেক্ষাকৃত লম্বা আঁশযুক্ত। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলার আবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আরও এক প্রকার বৃক্ষজাতীয় তুলার গাছ আছে। ইহা ১২ ফুট হইতে ২০ ফুট উচ্চ হয়। ইহাতে তুলার কলার তায় কোষ জন্মে। এক একটা কোষে অনেক তুলা হয়। কোনও কোনও গাছের বীজগুলি একত্র ৮।১০টী থাকে। ইহার একটা গাছ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পিংনায় আছে। কোনও কোনও গাছের বীজ একত্র থাকে না কিন্তু সহজে ছাড়ান যায়। ইহার একটা গাছ টাঙ্গাইলের নিকট চাকলন গ্রামে আছে। এই গাছ তুলা কোমল ও লম্বা আঁশযুক্ত। ইহা ইজিপসিয়ান অথবা সি-আইলেণ্ড হইতে নিকট নহে। ইহা বাঙ্গলার স্বভাবজাত। বিগত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কনফারেন্সে ইহাকে ভারতবর্ষীয় তুলার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। তুলার গাছ জলে মরিয়া যায়; যেখানে জল যায় না, এমন স্থানে বুনিতে হইবে। এই গাছ একাদিক্রমে ১২ ৭৭সর পর্য্যন্তও জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

তুলার আঁশের কোমলতা, দৃঢ়তা ও দৈর্ঘ্যের উপর তাহার মূল্য নির্ভর করে।

ইজিপসিয়ান	১'২৫	হইতে	১'৬৫	উষ্ণ লম্বা
সি-আইলেণ্ড	১'২	"	১'৬৫	
আফলেণ্ডজর্জিয়া	১	"	১'৩	
নিউঅর্লিন্স	১	"	১'২	
বেরার তুলা	১'৮৫	"	১'১	

আমেরিকার বার্বেডোজ প্রভৃতি দ্বীপে এক লক্ষ একর জমি আছে, তাহার ৫ অংশে তুলার চাষ হইতে পারে। ইজিপ্তও একটা বৃহদায়তন দেশ নহে। ভারতবর্ষে তুলার চাষের উপযোগী জমি সর্বত্র আছে। তুলা নানাপ্রকার, তাহার উপযোগী জমিও নানাপ্রকার। পাহাড় হইতে সমতল ভূমির সর্বত্র তুলা জন্মিতে পারে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানের তুলা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়।

সকল প্রকার তুলারই প্রয়োজন আছে । এক এক কাজে এক এক প্রকার তুলা ব্যবহৃত হয় । স্বল্প স্তার জন্ত উৎকৃষ্ট তুলা চাই । কিন্তু মোটা স্তার নিকট তুলা হঠতেও প্রস্তুত করা যায় । বোম্বাই প্রদেশে, মধ্যভারতে, গজাবনে, যুক্তপ্রদেশে, মাদ্রাজ ও বাঙ্গলার সর্বত্র তুলা জন্মে । ভারতের তুলার চাষের উন্নতিতে আমেরিকার ভীত হটবার কথা । এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে এই ভীতির পরিষ্কার আভাস দেওয়া হইয়াছে । ভারতের শিল্পের চতুর ; ভারতে শ্রমের মূল্য কম । ভারতে তুলা প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে বলিয়া এনসাইক্লোপিডিয়াকার আশঙ্কার কথা তুলিয়াছেন ; ভারতে কল প্রতিষ্ঠিত হইলে অল্প সকল স্থানের অনিষ্ট হইবে তাহাও দেখাইয়াছেন । বোম্বাইর কলের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার সূচনা দেখাইয়াছেন ।

বর্তমান সময়ে ভারতে বহু পরিমাণে কলের তাঁত বসান সম্বন্ধে মতভেদ আছে । কিন্তু চরকার কল সম্বন্ধে মতভেদ নাই । ফ্লাইমাইলই করা হউক আর জাপানী তাঁওঁট বসান হউক, দেশের স্ত্রী না হইলে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে । স্ত্রীর কল না হইলে তুলার চাষোও উন্নতির সম্ভাবনা নাই । মেঃ হেভেল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কন্ফারেন্স চরকার কলের কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন ।

মেক্ষেপারে স্ত্রীর কল ভাগ চলিতেছে ; কেন না, ইংলণ্ডের অত্যাশ্রয় স্থান অপেক্ষা তথাকার বায়ু আর্দ্র । বাঙ্গালার জল-বায়ু বিশেষ রকমে আর্দ্র । এখানকার স্ত্রীর কলে ভাগ স্ত্রী হইলে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ।

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে ৩০ কোটি টাকার তুলা জন্মে । তুলার চাষ বৃদ্ধি করা চাই । সার ইত্যাদি দ্বারা প্রতি বিঘায় তুলার উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক । দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইবে । কাটে তুলা নষ্ট করে ; তাহার প্রতিকারের জন্ত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা অধ্যয়ন করা কর্তব্য । এদিকে গবর্ণমেন্টের শুভ দৃষ্টি পড়িয়াছে । দেশের স্বজনের কথা ।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তুর প্রতিযোগিতা চলিতেছে । কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়াতে নীলের চাষ আর হইতেছে না । গাছের আঁশকে কৃত্রিম তুলায় পরিণত করার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহাকে গাছের আঁশ “কটনাইজ” করা বলে । কৃত্রিম তুলা হইতেও ভারতের লোকের ভয়ের কোনই কারণ নাই । ভারতে তুলা ছাড়া দুই প্রকার গাছের আঁশ আছে, বাহা হইতে স্ত্রী করা যাইতে পারে । আনারসের চাদর, কলার স্ত্রীর কমালা ময়মনসিংহ গারস্বত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল । পাট, শণ,

উগটকঘল, স্বল্পপদ্ম, কনকুড়া, মুকুটবার, আনারস, বেগুনিচক্র, বেগুনি, পিপলনট, কদম প্রভৃতি গাছের ছাল ভারতের সর্বত্র জন্মিত। ভারতের প্রকৃতি সর্বপ্রকারে মানবজাতির অঙ্গকূল। জানি না কার অভিধানে এই মহাদেশবাসী জন সমূহ সভ্যজগতের নিম্নত্বের পড়িয়া আছে। সভ্যতার মূল—শক্তি, শক্তির মূল—অর্থ; অর্থের মূল—কৃষি ও শিল্প। বাধিজোর কথা বলিলাম না। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইলে, বাধিজা আপনা হইতে আইসে। মানুষের প্রথম অভাব খাওয়া, দ্বিতীয় অভাব পরা। পরিবেশ বান্ধা জল পরমুখপেফী না হইতে হইলে ভারতে তুমার চাষ বুদ্ধি করিতে হইবে ও কল-কারখানা করিয়া এই তুলা পরিবেশ-বন্ধে পরিণত করিতে হইবে।

শ্রী অক্ষয়কুমার মঙ্গলদায়।

সারস্বত-সমিতি।

পরমকারুণিক মঙ্গলদায় পরমেশ্বরের শুভ আশীর্বাদে নয়মমসিংহ সারস্বত-সমিতি ঊনত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিল। ঊনত্রিংশ বৎসর পূর্বে কতিপয় সারস্বত মিলিত হইয়া নিভৃত এই নগরে যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, আজ সেই ক্ষুদ্র বীজ প্রকাণ্ড মহীকূলে পরিণত হইয়া সকল সম্প্রদায়কে আশ্রয় প্রদান করিতেছে। সারস্বত-সমিতি কেমন জাতি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নহে। নয়মমসিংহবাসী মাজেই সারস্বত-সমিতির দেহ; ব্যবহারাজীব, শিক্ষক, চিকিৎসক ইহার মস্তিষ্ক; জমিদারগণ ইহার ক্রধির; রাজকম্পচারিগণ ইহার অস্থিগজ্জা; স্বাধীন ব্যবসায়িগণ ইহার হৃদয়; শিক্ষিত মাজেই ইহার শ্বাসযন্ত্র; কৃষি-শিল্পী বাহুবল এবং চাক্রবৃন্দ ইহার অঙ্গরাগ। জাতিবর্ণনির্দেশে অর্থ-সম্মিলন ইহার বীজমন্ত্র, জননী জম্মভূমির জল চেতনার সঞ্চার ইহার উদ্বোধন, জাতির উন্নতি ইহার উপাসনা, জাতীয়জীবন সংগঠন ইহার ধ্যান, জাতীয়গৌরব প্রতিষ্ঠা ইহার প্রার্থনার বিষয়। এ ভাবকাল সারস্বতগণ এই ভাবই মনে পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

ঊনত্রিংশ বৎসরের একটী সভা যে কোন স্থানের গোঁবাবের পরিচায়ক। সারস্বত-সমিতি নয়মমসিংহের প্রভূত গোঁবাবের নিদর্শন। আজ সংক্ষেপে এই ঊনত্রিংশ বর্ষের প্রাচীন ইতিহাস এখানে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

আজ ঊনত্রিংশ বৎসর নয়মমসিংহ সারস্বত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১২৮৪ সনের ২৬শে মাঘ বাসন্ত্যপঞ্চমী দিবসে মুড়াপাড়ার জমিদার ভূতপূর্ব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নসিরাবাদস্থ ভবনে এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। স্বর্গীয় কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র স্ব-রচিত “বাণী-বন্দনা” পাঠ করিয়া সারস্বতের প্রথম উদ্বোধন করেন।

প্রথম বৎসর উৎসব অতি সাধারণ ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ষে অপেক্ষাকৃত অধিকতর আয়োজনের সহিত উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার উদ্যোগ হয়। স্বর্গীয় কবি দীনেশচন্দ্র সেন স্ব-রচিত “মহামায়ার চিত্রপট” নামক কবিতা পাঠ করেন, অগ্ন্যাত্ম সম্মিলিত সারস্বতগণ রচনা ও বক্তৃতাাদি পাঠ করেন।

তৃতীয় বর্ষে সমিতি পূর্ব হইতেই উৎসবের আয়োজন করেন। উৎসব দিনে কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস সারস্বত কবিতায় বীণাপাণির আরাধনা করেন। সে বার উৎসবে ঘোড়দোড়, ব্যায়াম, কুস্তি, লাঠিখেলা, পাখীর লড়াই প্রভৃতির জ্ঞান পুরস্কার বিতরিত হয়। উৎসবে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা ও “নব নাটক” হইতে বহুবিবাহের বিষয় ফল প্রকৃতি নীতিপ্রদ কতিপয় অঙ্ক সুন্দররূপে অভিনীত হয়।

চতুর্থ বর্ষ হইতে সমিতি উদ্ভিজ্জ ও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীর সহিত ব্যায়াম, প্রবন্ধ পাঠ, কুস্তি, লাঠিখেলা, ঘোড়দোড়, খাতীদোড়, জীবন্তরাগ প্রদর্শন এবং অভিনয় ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস “সারস্বত কবিতা” পাঠ করেন ও চারুমিহিরের বর্ননান সম্পাদক (তৎকালে ছাত্র) শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ গোন “জাতীয় সম্মিলন” নামক প্রবন্ধ লিখিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। উপস্থিত সারস্বতগণ বক্তৃতাাদি প্রদান করেন। সমিতির কার্য্য তিন দিন স্থায়ী হয়। এবার খরচ ও পুরস্কারাদিতে প্রায় সাড়ে বোল শত টাকা খরচ হয়। হোসেনপুর হইতে একটা মহিলা সুপারীর নানাবিধ জিনিস দিয়াছিলেন। মিসেস্ চার্লস এই সুপারীর কাজ ইংলণ্ডে পাঠাইবার জ্ঞান লইয়া যান।

৫ম পঞ্চম বর্ষে সমিতি মেড়ার লড়াই ও মোরগের লড়াই উঠাইয়া দিয়া, দেশে সংস্কৃত চর্চার উৎসাহের জ্ঞান ত্রায় শাস্ত্রের বিচার করিতে পণ্ডিতগণকে আহ্বান করেন। হুংথের বিষয় কোন পণ্ডিত উপস্থিত হন নাই। এবার জীবন্তরাস প্রদর্শন ও সরোজিনী নাটকাদির অভিনয় হয়। কৃষি বিভাগের বিশেষ উন্নতির জ্ঞান সমিতি ব্যবহারিক এবং বৈজ্ঞানিক কৃষি বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকাশ জ্ঞান অর্থদান করিলেন বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। বাবু শশীভূষণ গুহের লিখিত “আদর্শ কৃষি” নামক হস্তলিখিত গ্রন্থ পুরস্কার বোণা হয়

ও সমিতির ব্যয়ে তাহা মুদ্রিত হয়। এটনার সারস্বত-সভা অতি বিরাট আকারে হইয়াছিল। তখনকার স্থানীয় পত্রিকা “ভারত মিহির” লিখিয়াছিলেন, এত বড় সভা কেবল ময়মনসিংহ কেন ভারতবর্ষের রাজধানীতেও অল্প হইয়া থাকে।

১২৮৯ সনে সমিতি ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করেন। সমিতি এ বর্ষে গত বৎসরের কার্যপ্রণালী কিঞ্চৎ পরিবর্তিত এবং কোন কোন অংশ পরিবর্তিত করিয়া কার্য আরম্ভ করেন। উদ্ভিজ্জ, দেশীয় কারুকার্য, দেশীয় মহিলা নিষ্পিত শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শন, ঘোড়দোড় এবং অভিনয় ইত্যাদি ভিন্ন ও পণ্ড পক্ষী প্রদর্শন এবং পণ্ডিত মণ্ডলীর শাস্ত্রালোচনাও এ বৎসরের কার্যপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়াও যিনি ময়মনসিংহের একথানা ইতিহাস লিখিতে পারিবেন, সমিতি তাঁহাকে একশত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। সমিতির কার্য পূর্বানুরূপ তিন দিন স্থায়ী ছিল।

১২৯০ সনে আশ্ব-কলহে সারস্বতের কার্যে একটু বিশৃঙ্খলা ঘটিল। ষাণ্মাসে কোনরূপে তিন দিবসের কার্য শেষ হয়।

১২৯১ সনে অষ্টম বর্ষে সমিতি পুনরায় স্থায়ী শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। এবার সারস্বতগণ কলিকাতা হইতে দেশীয় সার্কাস আনাইয়া উৎসবের অঙ্গ সৌষ্ঠব করিতে চেষ্টা করেন; নানা কারণে চেষ্টা সফল হয় নাই। সারস্বতগণ “আনন্দমঠ” অভিনয় করেন। অভিনয়ের শেষাংশে “ভারতের ভবিষ্যৎ ছায়া” বলিয়া যে দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল, তাহাতে অপূর্ব ভাবের আবেশ হইয়াছিল। “মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ তাঁর চারি পাশে” এ দৃশ্য অতি অপূর্ব হইয়াছিল। পরঃপরঃ-ভাবে বিস্মৃতি-বিরহিত আনন্দ মঠের আনন্দময়ী ময়মনসিংহের মৃতপ্রাণে এক নবভাব প্রদান করিয়াছিলেন।

একাল সারস্বতের নিজের কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। হার্ডিঞ্জ-স্কুলের সম্মুখে বর্তমান ব্রজ কোর্টের স্থানে সাময়িক গৃহনিৰ্মাণ করিয়া তিন দিনের কার্য সমাপন করা হইত। সারস্বতের স্থানের অভাব দেখিয়া, ১২৯৫ সনে শ্রীযুক্ত মহারাজা সুর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর এক দানপত্র দ্বারা সমিতিকে নসিরাবাদ নগরে একখণ্ড ভূমি দান করেন। এইরূপ ভূমিদান পাটয়াও সারস্বত অর্থাভাবে বহুদিন পর্যন্ত তাহার সম্ভাবনার করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতে থাকে। এবং অষ্টাবিংশ বর্ষে প্রায় নির্বাকের পথে অগ্রসর হয়।

১৩১১ সনের বাসন্তীপঞ্চমীতে সারস্বত অষ্টাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করে।

কিন্তু অর্থাভাবে সারস্বতগণ সে সময়ে প্রদর্শনী ও আগোদ-প্রমোদের কোন বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন সময়ে সারস্বত প্রদর্শনী হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া কার্য্য নিরীহকগণ সারস্বতের বার্ষিক কার্য্য শেষ করেন।

এ বৎসর নির্বাণোগ্রুপ সমিতিতে সজীব করিবার চেষ্টা হয়। সারস্বতগণের সে বিপুল চেষ্টায় সারস্বত-সমিতি অষ্টাবিংশ বর্ষে নবজীবন লাভ করেন। ২৮ বৎসরের বিপুল অধাবসায় ২৮ বৎসর সমিতি অভিনব শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিপুল বশের অধিকারী হন। অষ্টাদশ বর্ষে সারস্বত কৃষ-শিল্প-সাহিত্য সহিত এ জেলায় সাহিত্যেরও এক প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। অষ্টাবিংশ কৃষ-শিল্প-সাহিত্য-প্রদর্শনী ময়মনসিংহের বিপুল বন-গোত্র ও পণ্য সম্ভারের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনী হওয়ার, বাজার প্রভেদ জেলার লোকেই তাহা দেখিতে পাওয়াছিলেন। অষ্টাবিংশ সারস্বত-উৎসব এই কারণেও স্বায় বন উপার্জনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এ বৎসর পাঁচ দিন প্রদর্শনী রাখতে হইয়াছিল। প্রদর্শনীর স্থায়ী গৃহ নিম্মাণ জগদর্শকগণ হইতে টিকিট বিক্রয়ে অর্গ সংগ্রহের বন্দোবস্ত ছিল।

বর্তমান বর্ষে সারস্বত উনত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ১৪ই মাঘ সারস্বতক্ষেত্রে সুসজ্জের মহারাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে সমিতির উনত্রিংশ বর্ষের অধিবেশন হয়। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম্-এ, বি-এল “ভারতে কার্ণাট” সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৫ই মাঘ সিটিকলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম্-এ, বি-এল “রামায়ণের-সভা” সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৬ই মাঘ ৮ ঘটিকার সময় সুসজ্জের মহারাজা বাহাদুর কতৃক মহারাজ সুর্য্যকান্ত প্রদত্ত সারস্বতক্ষেত্রে সারস্বত-গৃহের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হয়। একখানা “চাক্রসিহর” একখানা “আরাতি” ও একখানা “স্বদেশ-সম্পদ” ও প্রচলিত মুদ্রা, একটি পাতে পুরিয়া ভিত্তির নিম্নে প্রোথিত করা হয়। মহারাজা বাহাদুর মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক বিহিত অনুষ্ঠানে ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করেন। তখন নহবৎ বাজিতে ছিল এবং তৎসঙ্গে ঘন ঘন “বন্দে মাতরম্” ধ্বনি উচ্চ হইতেছিল।

সোমবার প্রদর্শনী গৃহ উন্মুক্ত হয়। এবারের প্রদর্শনী গত বারের ত্রায় বহু মূল্যবান দ্রব্য সম্বারে পরিপূর্ণ ছিল না। কিন্তু এবারের প্রদর্শনীতে দেখে এতটা আশ্চর্য্য শক্তি অভ্যাস লক্ষ্য হইয়াছিল। প্রদর্শিত

প্রত্যেক পদার্থে জাতীয়জীবনেরও কার্যকরী শক্তির পূর্ণমুষ্টি বিকশিত হইয়াছিল। নানা জাতীয় কার্পাসের বীজ, কার্পাসের বৃক্ষ, বীজ ছাড়াইবার কেরকী, স্বাভাবিক চরকা, টাকুয়া, নানাজাতীয় কার্পাসের তুলা, টাকুয়া ও চরকার প্রস্তুতমিহি ও মোটা সূতা, ঐ সকল সূতার বস্ত্র। দেশী বস্ত্র—২০ নম্বরের মোটা হটেতে ২৫০ নম্বরের সূক্ষ্ম সূতার কাপড়। ঠক্করিত তাঁত, সোজার কল, সূতার কল, কলার সূতা, কলার সূতার কল। এঁও পোকা, সূতা এঁওবস্ত্র। গুটীপোকা-রেশম ও রেশমী সূতা, কনকুড়া সূতা, চুকাই গাছে সূতা, বৈদ্যরাজের তৈল, জমাট ছদ্ম, দেশী নিব, পেম্বিগ, ছুরী, বোতাস হেঙুল, দোপকলশাকা ইত্যাদি। এতগুলি এবারকার প্রদর্শনীর বিশেষত্ব—দেশের স্বকীয় শক্তির পরিচায়ক।

১৭ই মাঘ মঙ্গলবার মহিলাদিগের জন্ত প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল। সারস্বত মহিলা-সম্মেলনের ইহা দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব বলিলেও বলা যাইতে পারে। সারস্বত-সমিতি গত বর্ষ হটেতে ভদ্রমহিলাদিগের জন্ত এই সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। গত বর্ষে টিকেট ছিল, এবার টিকেটের বন্দোবস্ত ছিল না। এবারকা মহিলা-প্রদর্শনাতে আরও একটি বিশেষত্ব ছিল। মহিলাসভাতে আপন পছন্দ মত সূতা মূল্যে জিনিস ক্রয় করিতে পারেন, তজ্জন্ত সমিতি ভদ্রমহিলাগণ দ্বারা জিনিস বিক্রয় করাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অসুখ্যম্পত্তা হিন্দু মহিলাসভা, হিন্দী, মোদ স্বচ্ছন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। সমিতি বাজার হটেতে কাপড়, বস্ত্র, গন্ধতৈল, সাবান, কাগজ, আলতা প্রভৃতি ও কমলা, কুল প্রভৃতি ফলও করিয়া আনিয়া বাজারদর হটেতে কম মূল্যে ব্রাহ্মমহিলাদিগের দ্বারা বিক্রয় করাইয়াছিলেন। সমিতির এ কার্য নিম্নেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে বালক বালিকা সহ উপস্থিত সংখ্যা প্রায় সহস্র হইয়াছিল। ১০ বৎসরে ও তন্নিম্ন বয়স্ক বালকগণ ভলান্টিয়ারের কাৰ্য্য করিয়াছিল।

বুখার পুনরায় পুরুষদিগের জন্ত প্রদর্শনী খোলা হয়। বৃহস্পতিবার প্রদর্শনী বন্ধ হয়।

এবারও গিটিকুল ও কলেজগৃহে প্রদর্শনী হইয়াছিল।

শ্রীকেশবনাথ মজুমদার

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—শ্রীমরোজকুমারী দেবী প্রণীত । মূল্য ১ এক টাকা । আজকাল ক্ষুদ্র গল্পের অভাব নাই । কয়েক বৎসর যাবৎ বঙ্গ-সাহিত্যে ক্ষুদ্র গল্পের খরশোত আসিয়াছে । দুর্ভাগ্যবশতঃ সুখপাঠ্য ক্ষুদ্র গল্প আমরা অতি অল্পই পাঠ করিয়াছি । ক্ষুদ্র গল্প লিখা বড় সহজ কার্য্য নহে । অতি সামান্য ক্রটিতেই ক্ষুদ্র গল্পের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায় । ক্ষুদ্র গল্পের স্বল্প পরিসরের মধ্যে দোষটা অতি স্পষ্টভাবে ভাসিয়া উঠে । ফটো তুলিতে যেমন একটু আলো অধিক হইলে অথবা একটু আলো কম হইলে চিত্র খারাপ হইয়া যায় ; লেন্সটা ঠিক না হইলে প্রতিরূতি নিতান্ত বিকৃত ও বিস্তীর্ণ হয় ; তেমনি ক্ষুদ্র গল্প সামান্য অসামঞ্জস্য সমস্ত মাধুর্য্য বিনষ্ট হয় এবং গল্প অতিশয় নীরস এবং কদর্য্য হইয়া পড়ে । ক্ষুদ্র গল্প লিখিতে গিয়া অনেকে আবার উপছাসের মত বহু ঘটনাবলীর সমাবেশ করিয়া থাকেন । ক্ষুদ্র গল্প একটা চিত্র মাত্র । একটা ঘটনাকে শব্দবিজ্ঞাস-নৈপুণ্যে পরিষ্কৃত করিয়া ফুটাইয়া তোলাই ক্ষুদ্র গল্পের উদ্দেশ্য । ক্ষুদ্র গল্প লিখিতে এই কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য ।

আমরা মরোজকুমারী দেবীর ক্ষুদ্র গল্পগুলি গড়িয়া তৃপ্তিলাভ বোধিয়াছি । তাঁহার অধিকাংশ গল্পই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে এবং পুঁতিগন্ধময় প্রেমবর্ধনীর চর্চিত-চর্ষণ দোষ হুই নহে । দুই তিনটা গল্পে লেখিকা, স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্য দ্বারা নারীজীবনের নয়নাভিরাম চিত্র আঙ্কিত করিয়াছেন । সে চিত্র নারীজীবনের-দুঃস্বপ্নতা এবং মাধুর্য্য বড়ই রমণীয় হইয়াছে । মরোজকুমারীর ভাষা বড়ই মধুর এবং ভাষার চাতুর্য্য গল্পের সৌন্দর্য্য আরও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে ।

প্রাপ্তি স্বাকার ।

এম বর্ষের 'আরতি'র বিনিময়ে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদপত্রগুলি উপহার পাঠিয়াছি ।

চাক্ষুঃচিত্র, স্বদেশ-সম্পদ, ভিতবাদী, বহুমতী, বঙ্গবাসী, সন্ধ্যা, বান্ধব, Amrita Bazar Patrika, Weekly Chronicle, বঙ্গদর্শন, নব্যভারত, পদীপ, সাহিত্য-সংহিতা, সাহিত্য-পরিষৎ, বীরভূমি, অর্জুনা, নবনূর, ধুমকেতু, প্রতিজ্ঞা, প্রহসন, ব্রহ্মবাদী, স্বদেশ-হিতৈষী, সুলতান, বঙ্গলক্ষ্মী, পদ্মপ্রচারক, সবসর, শিল্প-সাহিত্য, কলাগী, স্বদেশ, স্বদেশী, ঐতিহাসিক-চিত্র, ইন্দ্রা, বাণী, গোয়ালন্দ-সুন্দর, প্রচার, নববিকাশ, খুদীর-বান্ধব, বহুধা, বীরভূম-বার্তা,

আব্রতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ।

ষষ্ঠ বর্ষ । { ময়মনসিংহ, কাবুল ১৩১২ । { দ্বিতীয় সংখ্যা ।

সাহিত্য-মেবার প্রয়োজন ।

বিংশ শতাব্দীর প্রাধান্যঃ বিজ্ঞান-যুগ । জড়-মতাবলম্বীর উন্নতির দিনে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইয়াছে । পাশ্চাত্য জগতের বহিঃস্রাবের এক নোহকর শভা দেখা যায় । ইহা আজকাল সমগ্র জগতের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে । এমন একদিন গিয়াছে যখন সাহিত্য গৌরবের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল । বিজ্ঞান, দীন-কাঙ্গালের মত ঘারে ঘারে ভিক্ষাটন করিয়া বেড়াইত । কিন্তু এখন বিজ্ঞান, সাহিত্যের অদ্বজা ও উপেক্ষার প্রতাপে লুপ্ত হইতেছে । এখন সাহিত্য নিম্নত কোণগত । আর বিজ্ঞানের তুটুট সাম্রাজ্য বিপুল বৈভব ।

কিন্তু প্রশ্ন দৃষ্টিতে সাহিত্যের যেমন অনাদর দেখা যায় বস্তুতঃ তাহাই ? হ্যাঁ/নাহে, বিজ্ঞানের অধুনাতন বিপুল প্রভাব । কিন্তু সাহিত্যও যে নিম্নত কোণে আণোত করিয়া আছে, তাহা চির জ্যোতির্ময়, উৎসাহের ও সুখপ্রদ ।

সাহিত্য কি এবং কাহাকে বলে ? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধ নহে । তবে বস্তুতঃ এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, বাহ্যতে চিত্তের উদ্ভূতি-কল্পে বিদ্যা ভাবগুলি পূর্ণবিকাশ লাভ করে ও নৈতিক জীবন সমৃদ্ধ হয় উঠে । কিন্তু সাহিত্য । এতোক চিত্তবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ শিক্ষার ফল মুক্তক-বাক্য বিদ্যাই জন্মের, করণ ও করণভাবগুলি প্রথমে বলে, জগৎ । উহা, অভিজ্ঞতা, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি সাহিত্যের প্রাধান্যসম কার্য । Frederick Harrison প্রাচীনক । ইহা শিশুতেও বর্তমান । আর সাহিত্য দেখা যায় যে প্রাচীন ঋষি ও পুরাতন গ্রীকদিগের মধ্যে উহা সাহিত্যেও কথিত আছে ।

৪ গ্রীকের যে সকল মনোহর পুরাণ-কাহিনী (Mythology) অগৎ মুক্ত করিতেছে, তাহারা মূলে বিস্ময়-মিশ্রিত এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান ।

সাহিত্যিকের কর্তব্য এই যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিদ্বারা হৃদয়কে উন্নত করা । মনে করুন, নীতিশাস্ত্রের উপদেশ আছে “অহঙ্কার করিও না” । উহা হ্রস্বত্মক রহিল, খুব সম্ভব আমরা ঐ নীরস কথাটা ভুলিয়াই যাইব । কিন্তু কনি বখন দেখাইলেন ইতরুণ্য রূপও অহঙ্কারে অধঃপতিত হইল, মহাতেজস্বী শরতান অহঙ্কারের কুফল স্বরূপ স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইল, তখন আমরা “নাহঙ্কারং পরো রিপুঃ” এই সত্যটির যেমন স্মৃতি উপলব্ধি করিতে পারিব একরূপ আর কিছুতেই হইবে না ।

সুতরাং সাহিত্যিকের কর্তব্য অতি গুরুতর । নৈতিকচরিত্র গঠন, আমোদ উপদেশ একই সূত্র প্রদান করা এবং সর্বোপরি মানবচরিত্রের মানাক্রম চিত্রাঙ্কন সাহিত্যিকের কর্তব্য কার্য্য । যিনি যে পরিমাণে সমুদায়কে দেবোপযোগী করিতে লম্বা হইয়াছেন, সেই পরিমাণে অগৎ তাঁহার নিকট ঋণী । বাস্কোভি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য কবিগণ যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও শোকশিলা দান করিয়া গিয়াছেন সেজন্য তাঁহারা আজ অমর পদবীতে আরূঢ় ।

নি মানব-জীবনের দুই একটি ভটিয়া প্রাণও মীমাংসা করিয়া দিয়া, কল্যাণভোগের সহায়তা করিতে পারিয়াছেন তিনিই শ্রুত ও মাহুঃসর কুহুমপ্রা-বিন্দন । দৈন্য-প্রেমিক “হাফেজ”, চির-সৌন্দর্য্য-মগ্ন, আনন্দ-কবি “গান্ধী”, ঐতিহাসিক-কবি “উনয় খাইরম্” পারস্য-জগতের নক্ষত্র এবং পৃথিবীতে অমর । বিন্দু বল, গ্রীক বল, মুসলমান বল, ইংরেজ বল, যিনিই সমুদায়জীবনের অপূর্ণ ভাবগুলি স্মৃতি ভাষায় অগতের সন্নিবেশ উপস্থাপন করিয়াছেন তিনিই মানবজাতির পূজার যোগ্য সম্ভেদ নাই ।

মানবচরিত্র অগৌরব, হৃদয়ের বৃহত্তম অনন্ত, সেইজন্য কাব্য এবং মে বক্তব্য ইন্দ্রিয় আদ্যাদী । তাই ক্ষুদ্র গীতিকাব্য-প্রাণের হইতে উপহার পাঠ্য হইতে মাহুঃসর উপকারী ; সকলেই সমাজের শিক্ষক ।

চাক্ষুঃশ্রিত, স্বপ্ন অসৎ প্রেমের কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না । Amrita Bazar P... মিত্রাচার্য্য পাণ্ডুরূপে যেমন আমরা বিশ্বাস করি না প্রতীক্ষা, প্রাণন, ব্রহ্মা লজ্জিত হই, সেইরূপ সুপ-মধুর, অলৌকিক প্রেম, শিল্প-সাহিত্য, ক আদর্শকবির কথা লিখিতে বাইরা একজন আদর্শকবি ... গোরাগঙ্গা-সুহৃদ.

"Blessings be with them and eternal praise,
Who gave us nobler loves and nobler cares,
The Poets, who on earth have made us heirs
Of truth and pure delight by heavenly lays."

তাই অসংসর্গের ছায় অসংগ্রহ পরিহার করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।
জীবনে সার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে সময় অতিবাহিত করা যায় তাহাই স্মৃষ্টি ব্যয়িত
হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে।

"অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিষয়ঃ।

বৎসার-ভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাসুশিশ্রম্ ॥"

এই সম্পর্কে উপত্ভাস পড়া উচিত কি না এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে।
অনেকে উপত্ভাস-বিরোধী। ইহা যেমন অত্যাশ পক্ষপাত, তেমনই অনিষ্টকর।
উপত্ভাস গদ্যকাব্য। অশ্রুই আমরা শ্রেষ্ঠশ্রেণীর উপত্ভাসের কথাই বলিতেছি।
আজকাল বাজারে 'প্রনোদিনী', বিনোদিনী, প্রভৃতি অসম্ভব গোয়েন্দা-
কাহিনী বাহির হইতেছে—তাহা আমাদের পরম শত্রুকেও পড়িতে বলি না।
উহাতে যেমন চরিত্রহানি হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ উহা পড়িলে মন এত
অবনত হইয়া পড়ে যে, বক্তৃকের "আনন্দমঠ" পড়িতেও প্রবৃত্তি হয় না।
রাবি বাবুর "রাজর্ষি"ও অসার বলিয়া দোষ হয়। মধুসূদনের প্রহ্লাদলী পড়াত
হুয়ের কথা। বাঙ্গালাসাহিত্যে কি কি পড়া উচিত তাহা বলিতে হইলে প্রায়
অতি দীর্ঘ হইবে এবং পাঠকের শৈথিল্য তিষ্টিবার সম্ভাবনা। ঐ সকল বিষয়
বাস্তবত্রে লিপিতে ইচ্ছা রহিল।

যতদূর এই বলিলেই যথেষ্ট হইলে যে, সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন একদিকে
শীতল চন্দন-ছায়া বিদ্যমান, তেমন অপরদিকে তৃণচ্ছন্ন কুপ বা সুবটক
প্রান্তরেরও অভাব নাই। বুদ্ধমান ব্যক্তিগণের এই শেখোক্ত স্থানগুলি পরিহার
করিয়া চলাই কণাণকর। আবার অনেকের বিশ্বাস, পুস্তক পড়িলেই বিদ্যা
হইল। বত শেখী বই পড়া যায় ততই নাকি বিদ্যার মাত্রা বাড়িয়া উঠে। কিন্তু
ঐসরা বিনীতভাবে এইটুকু স্বীকার করাইয়া দিতেছি যে, পুস্তক-লব্ধ বিদ্যাই
একমাত্র জ্ঞান নহে। প্রকৃতজ্ঞান কেবল পাঠ-সাধনক নহে। উহা, অভিজ্ঞতা,
আলোচনা ও বিচারের উপর নির্ভর করে। তাই Frederick Harrison
বলিয়াছেন, "যেই পড়িলেই বেশী জ্ঞান হয় না; এমনও দেখা যায় কে প্রচুর
পুস্তকপারী ব্যক্তি একটা সুখ বিশেষ।" হিন্দু আচার্যেরাও কথিত আচার্য্যঃ—

“যথা ধ্যানচন্দন ভারবাহী ভারস্ত বেতা ন তু চন্দনস্ত ।

তথাহি শাস্ত্রাণি বহুতপীত্য গারং ন জানানু খরবৎ বহেৎ সত্ ॥”

অন্য আমরা উপসংহার করিলাম । বারাস্তরে পাঠকগণকে গ্রন্থনিব্বাচন লক্ষ্যে দুই চারিটা প্রস্তাব উপহার দিতে চেষ্টা করিব ।

শ্রীকামিনীকুমার সেন ।

একখানি পুরাতন কাগজ ।

শুক্লি ষাটটিতে ষাটটিতে কদাচিত মুক্তা মিলে; ছাই উড়াইতে উড়াইতে কখনও রজ্জ পাওয়া যায়; একপা মিনা নহে । যাহারা প্রভুত্বের আশায় কিছুদিন গলিত জীর্ণ কাগজ বা দুর্গম অরণ্যের ইষ্টক স্তুপাদি গোৎসাহিত হইয়া পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহারা ইহা ভাব জানেন । অল্পদিন হইল আমরা প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধান করিতে করিতে একখানি গলিত জীর্ণ কাগজ পাইয়াছি । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া গৌর লীলার গোবিন্দী ও মহাস্তবণো সংক্ষিপ্ত জীবনী অর্থাৎ আবির্ভাব, বিয়োভাব, গৃহবাস, সন্ন্যাস প্রভৃতির বর্ষ পরমাণ ও শক ইহাতে লিখিত হইয়াছে । স্মরণ্য ঐতিহাসিক হিগানে ইহা মূল্য অত্যন্ত অধিক । কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় কাগজ খানির সম্পূর্ণ অবয়ব আমরা পাই নাই, এবং যাহা পাইয়াছি তাহারও সমুদয় অংশ পঠন যোগ্য নাই । যতদূর পড়িতে পারা যায়, অন্য আমরা বঙ্গীয় ঐতিহাসিক বৈষ্ণবগণের নিকট তাহাই উপস্থিত করিলাম । হয়ত, এই আলোচনার কালে কোনও ভাগ্যবান এই সংক্ষিপ্ত জীবনীর পূর্ণাবলীর অনুসন্ধানের কৃতকার্য হইতে পারেন ।

জীর্ণ পত্রের ভাষা অসিকল লিখিত হইল ।

১ । স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রচলিত বৈষ্ণব মতান্তরে আটাইশ চতুর্দশ শতাব্দীর পরে, ষাণ্মাসের শেষ বাসুদেব যোগেন্দ্রজ্ঞ—কলি প্রথমে মথুরা ধারকাণ্ডে স্বরূপ আবেশে । নরলীলা বাসুদেব রূপে একট

ষাণ্মাসের শেষ ১১

কলির প্রথমে ১১৪০০

১২৫১

জন্ম যাত্রা—ভাত্র কৃষ্ণাষ্টমী—মবমী যোগে।

২। শ্রীমতী রাধিকার জন্ম যাত্রা—ভাত্র শুক্লাষ্টমী।

৩। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু

জন্ম শকাব্দা— ১৪০৭

অগোচর শকাব্দা— ১৪৫৫

স্থিতি— ৪৮

বিতং—

গৃহে— ২৪

ভীর্ণদর্শন ৬

নীলাচলে— ১৮

৪৮

আদিভাব—ফাল্গুনী পূর্ণিমা।

অগ্রকট—আষাঢ়ী হোরা পঞ্চমী।

৪। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

আদিভাব— ১৩৮২

অগোচর— ১৪৮৭

স্থিতি— ১০৫

বিতং

বীরভজপুরে—১৮

ভীর্ণে— ২১

নীলাচলে ৬

পুনঃ গৃহে— ৫০

১০৫

৫। শ্রীমদৈত প্রভুর জন্ম— ৭৩৭

অগোচর— ১৪৮৭

স্থিতি— ৭৫০

ইহা অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। আদিভাবের মিয়ন গাতি।

ভিরোভাব কাঙ্ক্ষা অসামান্য দীর্ঘায়িত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদৈত প্রভু—

কাহিনী ।

পাহাড়ের উচ্চ ভূমি উপর দর্শার আদালত গৃহটি স্থান পাইবে। সেই উচ্চ ভূমির দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্ব প্রকালিত করিয়া ক্ষুদ্রতরার ভারই তরতরবেগে প্রাণহিত হইতেছে। অদূরে শস্ত-শ্রামণী প্রান্তর ভূমি—নীল, লীল, হরিত বসনে ভূষিত হইয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ও বিপুল ঐশ্বর্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কাছারীগৃহের বামে—অনিন্দ্রের “দীঘলদীঘি”। “দীঘলদীঘির” তীরে বহুমূল্য চন্দ্রাতপ খাতান। চন্দ্রাতপ তলে বহুমূল্য কিংখাপ খচিত করাস, কিংখাপের তকিয়া, সূর্যচন্দ্র। চতুর্দিকে সশস্ত্র সিপাহী ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে। সেই সূর্যচন্দ্র তলে বহুমূল্য সূর্য পরিচ্ছা সূর্যশক্তি এক সমুদ্র মুক্তি বিরাজিত। সে মুক্তি রাজ্যচিত্ত কিন্তু চিন্তাক্রান্ত এবং অস্থিরচিত্ত।

কাছারীগৃহের দক্ষিণে আর একখানা অধিকতর কার্যকারী খচিত বস্ত্রগৃহ। ইহা চতুর্দিক আশ্রয়। অতঃপরে বিরাট মজলিস, যেন আমির উমরাওগণের বিরাট মজলিস। পানীর ও খাদ্যভরণের বহুল আয়োজনে সুসজ্জিত, আতর ও কস্তুরী-গন্ধ ছুটিতেছে, মাঝে মাঝে চরসের ধূম কুণ্ডলিকারে উখিত হইয়া চাঁটুকারণের ব্যাদিত বসনে প্রবেশ করিতেছে, তাহারও তাহা অধিকতর আগ্রহের সহিত বসন ব্যাদন করিয়া গ্রহণ করিতেছে। ধূমপানকারী নিম্নলিখিত মেয়ে খোশ-মেজাজে পারিষদগণের কথার মাঝে মাঝে মাথা নারিতেছেন। সে মুক্তি দিব্যকান্তি—বিবাদবর্জিত।

আজ দর্শার আদালত-গৃহ নোকসবুজে পরিপূর্ণ। সকলেই একইভাবে মন, কি জানি হয়। দর্শকগণের উৎসুকচিত্ত ক্রমে অধীর হইয়া উঠিল। বিচারক কাজিসাহেব বিচারালয়ে বিচারকাণ্ডে মনোযোগী।

অপরূপে বিচারক কাজিসাহেব বাদী ও প্রতিবাদীকে ডাকিয়া রায় ভণাইলেন।

রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :—

মহিম ইয়ার

বাদী।

রণ সিংহ

প্রতিবাদী।

দানী—মূলকে সুসজ্জ ময় পাছাড় ও গড় আগর ।

সেহেতুক মূলকে সুসজ্জের রাজভক্তের হক্‌মালীক রাজা রামসিংহ স্ব-ইচ্ছায় বহাল তরিতে পবিত্র ইছলামধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান সরাযতে বিবাহস্বত্বে আবদ্ধ হইলে সেই ধর্মপন্থীর গর্ভে রহিম ইয়ার জন্মগ্রহণ করিয়াছে । সুতরাং রহিম ইয়ার মূলকে সুসজ্জের রাজভক্তের হক্‌ মালিক বটে ।

সেহেতুক রাজা রামসিংহ স্ব-ইচ্ছায় বহাল তরিতে পবিত্র ইছলামধর্ম গ্রহণ করিয়া বিহিত বিধানমত আবছুর রহিম নাম গ্রহণ পূর্বক স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার হিন্দু স্ত্রী (প্রতিবাদীর গর্ভধারিণী) তাহাকে অপমানিত করিয়া রাজধানীর বাহির করিয়া দেন । সুতরাং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এইরূপ অশ্রদ্ধা ব্যবহার জন্ম হিন্দুশাস্ত্র অনুসারেও রাজামজকুরের সেই স্ত্রী পরিত্যজ্য ।

পরিত্যজ্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পিতার স্বত্বে হক্‌কার হইতে পারেন না ।

অতএব আদেশ হইল যে—

জাল মোজ হইতে মুক্ সুসজ্জের দিল্লত রাজস্ব ময় পাছাড় কড়িনাড়ী ও বহাল ময় গড় আগরের মালিকো সাহা রাজা রামসিংহ ওাকে আবছুর রহিমের হক্‌কারে ছিল তাহা তাহার ধর্মপন্থীর গর্ভজাত পুত্র রহিম ইয়ার প্রাপ্ত হইলেক । ইতি

কাজিলাহেবের রায় শুনিয়া দর্শকগণ একবারে বিবাদের ময়মান হইয়া পড়িলেন ।

২

সুসজ্জের শূর সিংহাসন লইয়া ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত । রাজা রামসিংহ লবান মূর্শিদকুলী খাঁর অত্যাচারে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইলে তাঁহার হিন্দু স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র রণসিংহ সুসজ্জের গৈরুক সিংহাসন অধিকার করিতে প্রয়াস পান । এদিকে রামসিংহের মুসলমান পন্থীর গুণগজাত পুত্র কুমার রহিম ইয়ারও সিংহাসনের দাবী করিতেছেন । যথাসময়ে মূর্শিদাবাদ হুকুম সেরেস্তার উত্তর-পক্ষই সিংহাসনের দাবী উপস্থিত করিলে, লবান নাজিম বিচারভার দর্শার কাজির হস্তে প্রাপ্ত করেন । অব্য দর্শার কাজিলাহেবের নিকট তাহারই শুনানীর দিনধারণ ছিল । কাজির বিচারে কুমার রহিম ইয়ার সুসজ্জ-রাজস্ব বোল আনার মালীক লাভ্য হইলেন ও কুমার রণসিংহ গৈরুকরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন ।

৩

দিল্লীর সেই বিশাল দেওয়ানীখান। ভারতের সেই অধিষ্ঠিত সিংহাসনে
 স্তম্ভিত প্রদীপ সাহে জ্বলন্ত উপস্থিত। পাকিস্তানগণের অস্তাবনা থাকিলেও
 সে প্রবিশাল দেওয়ানীখান যেন জনহীন নিস্ত্রিত। দিল্লীখানের এখন
 ইংরেজ-বণিকদিগের আদার রক্ষা করাই একমাত্র কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।
 প্রাদেশিক আবেদন নিবেদন এখন প্রাদেশিক শাসনকর্তারাই গ্রহণ করিয়া
 থাকেন। দিল্লীখান এখন নামে জগদীশ্বর মান।

রাজা যশোবন্ত রাও একটা পরিণত বয়স্ক যুবককে লইয়া কুর্নস করিতে
 করিতে সিংহাসনের সম্মুখীন হইলেন এবং মস্তাউসমীপে নিবেদন করিলেন।
 “কুর্নসে রাজার উত্তর পূর্ব গৌমাহ মুক্ জুসদের পক্ষজ্ঞানি গারোতাবি জমিদার
 দিল্লীখানের অজুগতত্ব রাজা রামজীবনের বংশধর এই যুবক দিল্লীখানকে সম্মান
 সজ্জিরাগ্ন করিতেছে।” যুবক নতজানু হইয়া ভূপৃষ্ঠ লুপ্ত হইল।

রাজা যশোবন্ত রাও বলিতে লাগিলেন—“বাদশাহের সনন্দ প্রাপ্ত ও অজুগত
 মুক্ জুসদের জমিদারগণ ২৫৭ জাত ও ১২৫ মোজারের মুক্ জুসদের
 আবেদনকারী। আবেদনকারীর পিতা রাজা রামজীব ও এই মুক্ জুসদের
 সনন্দ প্রাপ্তি সহিত ভোগ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি কালগ্রস্ত হওয়ায়
 আবেদনকারী তৎসমস্ত বিষয়ে পিতৃস্থানীয় হইয়া বাদশাহের কৃপা ও
 সনন্দ প্রাপ্তি হইয়াছে।” যুবক পুনরায় নতজানু হইয়া ভূপৃষ্ঠ লুপ্ত হইলেন।

রাজা যশোবন্ত বলিতে লাগিলেন—“বাদশাহভোগ্য আগর মুক্ জুসদের এই
 অজুগত জমিদারগণই সরবরাহ করিয়া থাকে। বাদশাহের আদেশ হইলে
 কুর্নসে বীরসিংহও বাদশাহের সনন্দ প্রাপ্তি পিতৃস্থান ও সম্মান বক্ষণে চাখিয়া
 সনন্দ প্রাপ্তি বাদশাহী কর প্রদান করিতে পারে।”

বীরসিংহ পুনরায় নতজানু হইয়া ভূপৃষ্ঠ লুপ্ত হইলেন।

যশোবন্তের সরবরাহ ভঙ্গ হইল।

কুর্নসে বীরসিংহ, রাজা যশোবন্ত রাওয়ের অজুগত মুক্ জুসদ হইয়া দিল্লী
 প্রাসাদ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেন্দ্রনাথ বসু রচিত।

সহমরণ ।

আমরা কে সাহেবের গ্রন্থাবলীতে একটা মতী-কাহিনী “আরতি”র পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি। এই সহমরণ কাশিমবাজারের ইংরেজকুঠি পার্শ্বেই ঘটয়াছিল। কুঠির কতিপয় সাতের ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

১৭৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের ৩রা তারিখে মহারাষ্ট্র কুলোত্তম রামচাঁদ পণ্ডিত কালগ্রাসে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ২৮ বৎসর ছিল। তৎকালে রামচাঁদের পত্নী জীবনের মাত্র ১৭ কি ১৮ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পরক্ষণেই তাঁহার সহগামিনী হইয়া জীবন বিসর্জন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার যুক্তি-তর্কোত্তরতা করেন। কিন্তু মতী তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। রামচাঁদ একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। কুঠির অধ্যক্ষ রামেলের পত্নী রামচাঁদের সহধর্মিণী সঙ্কল্পে বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে বহু যত্ন করিলেন, তাঁহার অভাবে শিশু সন্তানগুলির (তাঁহার দুইটা কন্যা ও একটা পুত্র ছিল; তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানের বয়স ৪ বৎসরের অধিক ছিল না) অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে এবং জলস্তপাবকে জীবন বিসর্জন কিরূপ গম্ভীরদায়ক, তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইল। কিন্তু তাহাতেও কিছু ফলোদয় হইল না। তিনি আপন সঙ্কল্পে পক্ষপাতের ভ্রাতা অটল রহিলেন। তখন আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে বলা প্রয়োগে নিবৃত্ত করা হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। ইহাতে মতী অত্যন্ত গম্ভীরীভূতা হইলেন, কিয়ৎকাল পরে বাস্তবিককণ্ঠে বলিলেন, “মৃত্যু আমার ইচ্ছান্বিত। তোমরা আমাকে আশ্বাসে পুড়িয়া মরিতে দিবে না, কিন্তু আমি অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিব।” আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে তাদৃশ দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া অনায়াসেই হইয়া অমুদ্রিত প্রদান করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রামচাঁদের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে আনাও হইল। বেলা দশ ঘটিকার সময় তাঁহার সহধর্মিণী তিন জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, পুত্র কন্যা, পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন এবং বহুসংখ্যক দর্শক পরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হন। কিন্তু অপরাহ্ন এক ঘটিকার সময় রাজাদেশ-বাহক-কন্সচারী সেখানে আগমন করেন। এই মধ্যাহ্ন সময় মতী, পুত্র-অর্চনার এবং গঙ্গাস্নানে বাপন করেন। রাজকন্সচারী গঙ্গাতীরে আগমন করিয়া মতী স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জন করিতেছেন

কি না, তাহাই প্রথমতঃ নবাবের অভিপ্রায়ানুসারে অনুসন্ধান করেন। রাজ্যদেশ প্রাপ্তি যাত্রা তিনি পূজা অর্চনা পরিভ্যাগ করিয়া আশ্রয়দেব নিকট গমন করেন। তাঁহাদের সহিত কথা-বার্তায় অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তারপর সতী অঙ্গভরণ খুলিয়া লইয়া তৎসমুদায় একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা সম্মুখভাগে পেটির মত বান্ধিলেন। তিনি নিরাভরণ হইলে, আশ্রয়গণ তাঁহাকে সজ্জিত-চিতার এক পাশে লইয়া গেলেন। শুককার্ঠ, শাখা ও পত্রদ্বারা চিতা সজ্জিত হইয়াছিল। চিতার এক পাশে সতীর প্রবেশের জন্ত উন্মুক্ত ছিল। চিতামধ্যে শায়িত মৃত দেহের মস্তক উন্মুক্ত-পাশের বিপরীত দিকে স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মণগণ চিতার একপাশে একটা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিলেন। প্রজ্জ্বলিত কুণ্ডের চতুঃপাশে তিনজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করিতেছিলেন। সতী তাঁহাদের নিকট কিয়ৎকালের জন্য উপবিষ্টা রহিলেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্তে উপাচার সহ একটা বিষপত্র প্রদান করিলেন। তিনি তাহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন; তারপর আর একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্তে আর একটা বিষপত্র অর্পণ করিলেন। তিনি এ বিষপত্র অগ্নি-শিখার উপর ধারণ করিয়া রহিলেন, ব্রাহ্মণ তত্পরি তিনবার ঘৃত নিক্ষেপ করিলেন; অগ্নির উত্তাপে ঘৃত তরল হইয়া কুণ্ডে পতিত হইতে লাগিল। এই সকল ক্রিয়া সম্পাদিত হইবার সময় তৃতীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ ও সতীকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সতী সমুদায় প্রশ্নের উত্তরই ধীরভাবে ও প্রশান্ত চিত্তে প্রদান করেন। ইউরোপীয় দর্শকগণ এই সময় তাঁহার অতি নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু তখন চতুর্দিকে এত গড়গোল হইতেছিল যে, তাঁহারা সতীর উত্তরের একটা বর্ণও বুঝিতে পারেন নাই। এই সকল ক্রিয়ার পর সতী তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন; এই সময় ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করেন। তৃতীয়বার অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপনীত হইয়া তিনি দণ্ডায়মান হইলেন, হস্তের অঙ্গুরী ও পদের পাক্সলী খুলিয়া লইয়া অস্ত্রাস্ত্র অলঙ্কারের সঙ্গে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি গম্ভীরভাবে পুত্র কন্যা, পিতা মাতা ও আশ্রয় স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক স্থলিপুত্র সলিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া চিতার উন্মুক্ত পাশে গমন করিলেন। এই সময় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। সতী তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন; তাঁহারা অশ্রুমোচন করিতে করিতে সে স্থান পরিভ্যাগ করিলেন। ইহার পর সতী চিতায় আরোহণ করিলেন। তিনি চিতায় আরোহণ করিয়া প্রকাস্ত ভক্তিতে মৃত-পতির পদতলে প্রণত হইলেন, তারপর অগ্নিসহ হইয়া

তাহার মন্তকের নিকট উপবেশন করিলেন । সতী স্বামীপাথে উপবিষ্টা হইয়া ক্ষণকালের জন্য তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, পরমুহূর্ত্তেই চিতার তিন স্থানে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন । অগ্নি ধু ধু করিয়া জলিয়া উঠিয়া পুণ্ডিতা আবরণ করিল ।

“তদ্বসাত্ নরদেহ ;—চি তানির্করূপণ

ধূলায় মিশিল ধূলা ; জীবনে জীবন ।”

শ্রীরামপ্রাণ শব্দ ।

হুমায়ূনের বঙ্গ-বিজয় ।

(৩)

পরদিবস সজাট হুমায়ূন সমগ্র বাহিনী সমভিন্যাস্তারে নগর পরিভাগ করিয়া অভয়পুরের সমতলক্ষেত্রে শিবির সন্নিবেশ করেন । তথায় সজাট গৈরুগণের অবস্থা পরিদর্শন করতঃ যাহারা উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত না হইয়াছিল, অস্ত্রাগার হইতে তাহাদিগকে যথোগ্যুত্ব অস্ত্রাদি প্রদান করেন ; * পরে তাহাদের সংখ্যা গণনা করিয়া দেখিলেন যে, সর্বশুদ্ধ ১০,০০০ হাজার অশ্বরোহী তথায় সমবেত হইয়াছে । সজাট প্রধান কাম্বাচারীবৃন্দকে নানাবিধ খেলাৎ প্রদানে সম্মানিত করতঃ আসন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের নিমিত্ত সমস্ত সেনানীর উৎসাহ উদ্দীপ্ত ও তেজস্বিতা প্রজ্জ্বলিত করেন । দুই এক দিন পথ অতিক্রম করিয়া মোগলবাহিনী গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ কনোজনগরে উপনীত হয় ; তথায় সংবাদ পাওয়া যায় যে, শের শাহ নদীর অপর তীরে শিবির সন্নিবিষ্ট করতঃ অবস্থান করিতেছেন । এই সময় আরোলের নরপতি রাজা গান্ধারহান সংবাদ দেন যে, যদি সজাট পুট্ নামক স্থানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তবে তিনি তাহার সমস্ত বাহিনীসহ মোগলসৈন্যের সহিত মিলিত হইবেন । হুমায়ূন রাজার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া কনোজের নিকট নদী উত্তীর্ণ হইতে সকলকে আদেশ করিলেন ।

মহরম মাহার ১০ই তারিখ মোগলসৈন্য তুর্ঘ ও তেরী নিনাশ করিতে করিতে গঙ্গা অতিক্রম করে । মোগলবাহিনীর দক্ষিণভাগ যুবরাজ হিন্দল, বামপার্শ্ব

* ঐতিহাসিক ইংরাট বলেন,—“The Soldiers found their own horses and arms, but this was a gratuitous act of his Majesty.”

যুবরাজ আসকারী এবং মধ্যভাগ স্বয়ং সম্রাট আফগানদিগের প্রধান বৃহৎ লক্ষ্য করিয়া চালনা করিলে শের খাঁর পুত্র জেনারল যুবরাজ হিন্দলের, খোয়াজ বঁ। যুবরাজ আসকারীর এবং আফগানগণের প্রধান বৃহৎ সম্রাটের গতিরোধার্থ অগ্রসর হয়। এই প্রথম দুই বাহিনীতে তথায় যে লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতে এ দুর্লভ লেখকের ক্ষম লেখনী অশক্ত ।

(গ্রন্থকার জোহর এখানে কতিপয় পারস্ত-কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন ।)

কিয়ৎকাল তুমুল সংগ্রাম চলিলার পর, হুমায়ুন সংবাদ পাইলেন যে, যুবরাজ হিন্দল আফগানগণ কর্তৃক অতিশয় দ্বিত্ত এবং আসকারী বামপার্শ্ব হইতে হঠাৎ বাইতে বাধ্য হইয়াছেন । মীর্জা হারদার সম্রাটকে বলিলেন যে, স্বপক্ষের অসমর্থ পলাতকগণকে নির্দ্বিগ্ন প্রস্থান করিবার সুবিধার জন্য, বৃহৎ সদাশূলে যে শিকশদ্বারা পথরোধ করা হইয়াছে তাহা পৃথক করিয়া দেওয়া উচিত । দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্রাট এই মন্তব্যমুসারে কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন । এই অবসরে একজন আফগানসৈন্য কৃষ্ণার্ণ পরিচ্ছদ ভূষিত হইয়া সম্রাটেরদিকে অগ্রসর হইয়া, হস্ত হস্ত বর্ষা দ্বারা সম্রাটের অশ্বের কপালে বিষম আঘাত করিল । এই আকস্মিক আঘাতে অশ্বটী পশ্চাৎ ফিরিয়া এমনি অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল যে, কিছুতেই তাহাকে বাগে আনা গেল না ।

হুমায়ুন বলিয়া গিয়াছেন যে, যখন তিনি তাঁহার অশ্বকে শাস্ত করিলেন, তখন আফগানগণ তাঁহার গাড়ীর জিনিসপত্র লুণ্ঠনে ব্যাপৃত । তিনি একবার তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু স্বপক্ষের কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার অশ্বের লাগাম ধরিয়া তাঁহাকে নদীর তীরে লইয়া যায় । অতঃপর ক্রি ভাবে কার্য্য করা যায়, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে সম্রাট, পিতার আমলের একটি বৃদ্ধ হস্তী দর্শন করিয়া, নিকটে আনিতে মাছতকে আদেশ করেন । হস্তী নিকটবর্তী হইলে সম্রাট তাহাতে আরোহণ করতঃ হাওনাস্থিত এক খোজাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন । খোজা জানাইল যে, তাঁহার নাম—কাছুর । অবশেষে সম্রাট মাছতকে নদী উত্তীর্ণ হইতে আদেশ করিলে, মাছত আপত্তি করিয়া বলে যে, এ হস্তী নদী উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না ; জলে নামাইলেই ডুবিয়া যাইবে । মাছতের কথা শুনিয়া খোজা গোপনে সম্রাটকে বলে যে তাহার সন্দেহ হইয়াছে—মাছত তাঁহাকে আততায়ীর হস্ত সমর্পণ করিবে । অতএব তাহার গিরিচ্ছদ করাই যুক্তিসঙ্গত । সম্রাট বলিলেন—

“তাহা হইলে আমরা হস্তীকে নদী পার করিব কেমন করিয়া?” খোজা উত্তর করিলে,—“আমি হাতী চালাইতে একটু একটু জানি।” * খোজার বাক্য শ্রবণ করতঃ সম্রাট অসি নিক্ষেপিত করিয়া হতভাগ্য মাহতকে এগনি সাংঘাতিক প্রহার করিলেন যে, সে হাতীর উপর হইতে গড়িয়া জলে পড়িয়া গেল এবং খোজা হাওদা হইতে বাহগত হইয়া হাতীর স্বক্কে উপবেশন করতঃ নদীতে হাতী নামাইয়া দিল। সম্রাট হুমায়ন নিজের বলিয়াছিলেন যে, নদীর অপর তীরে উপনীত হইয়া দেখেন যে, নদীর পাহাড় অমনি উচ্চ নীচ যে কোন স্থান দিয়াই উপরে উঠা যায় না। অবশেষে কতিপয় শিবিররক্ষক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের উষ্ণবের একপ্রান্ত উপর হইতে নামাইয়া দেয়। সম্রাট তাহারই সাহায্যে বহুকষ্টে করিয়া উপরে উঠেন। অতঃপর সম্রাট অশ্বারোহণে স্রাগ্রা অভিযুখে অগ্রসর হন।

পূর্বোক্ত শিবির প্রহরী বাহার প্রত্যক্ষ আজাদীনে কার্য্য করিত, তাহার। উভয়ে সহোদর ভ্রাতা। তাহাদের মধ্যে এগনি সম্ভাব ও সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল যে, তাহাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি অবলোকন করিয়া সম্রাটের হৃদয় ভ্রাতৃ-বিরহে আকুল হইয়া উঠিল। এ সম্বন্ধে হুমায়ন নিজমুখে বাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাহার উন্নত ভ্রাতৃ-প্রেমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়;—“The colourmen were two brothers who seemed so affectionate to each other, that it aroused a sympathy in my breast, and I became very anxious for the safety of my brother Hindal and my other connections. In about an hour, the arrow of my prayer hit the butt of consent, for my dear brother came and paid his respects on which I returned thanks to the Almighty God by whose single command of *Be!* the whole universe was instantly produced.” †

* বীরমান রাজগণ স্বহস্তেই হস্তী চালনা করিতেন। লক্ষ্যের এক সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, অযোধ্যা-রাজ্যে স্বয়ং হস্তী চালাইয়া থাকেন। পূর্বের স্বহস্তে হস্তী চালনা করা সম্ভাব্যজ্ঞির পক্ষে অসম্ভবজনক বিবেচিত হইত।

† ইয়াট লিখিয়াছেন,—“The kuran states that when the Almighty created the universe, he merely said *Kun, Be* and it was.”

বাহা হউক সম্রাট যুবরাজ হিন্দল ও আসকারী এবং মীর্জা বোদগার প্রভৃতির সহিত প্রকুর অন্তরে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভীন্‌গাঁয়ে উপনীত হইলে, বিধ্বস্ত সেনাদলের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন-প্রিয় একদল কৃষক আসিয়া তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় এবং তাহাদের একজন তীর নিক্ষেপে মীর্জা বোদগারকে * আহত করে। আঘাতপ্রাপ্তে মীর্জা যুবরাজ আসকারীকে বলেন,—“আপনি এই গ্রামবাসিগণকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হন, আমি ক্ষত স্থানটা জড়াইয়া লই।” যুবরাজ মীর্জার এই কথায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভৎসনা করেন কিন্তু মীর্জা ও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনিও প্রত্যুত্তরে রুঢ় ভাষায় যুবরাজকে আপ্যায়িত করেন। যুবরাজ মীর্জার পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া হস্তস্থিত অশ্ব-চাবুকদ্বারা মীর্জাকে ছুই তিন ঘা বসাইয়া দেন কিন্তু মীর্জা অবাধে এই চাবুক হজম করিতে না পারিয়া মায়মুদ যুবরাজকে প্রত্যর্পণ করেন।

সম্রাটের কর্ণে এই অন্তত সংবাদ পৌঁছাইলে তিনি বলিলেন,—“দম্ভাগণের প্রতি আক্রোশ এইভাবে পরম্পরের প্রতি তাহারা নিয়োজিত করিল। বাহা হইয়াছে তাহা আর ফিরিবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে আমাকে যেন এইরূপ ঘটনা আর না শুনিতে হয়।

বাহা হউক, সম্রাট নিরাপদে আগ্রায় উপনীত হইয়া সৈয়দ রফি উদ্দীন নামক এক ধর্মাত্মা ব্যক্তির ভবনে অবতরণ করিলেন। রফি তৎক্ষণাৎ রুটি, ফুটি প্রভৃতি আহারীয় সম্রাটের নিমিত্ত আনয়ন করিলেন কিন্তু সম্রাট যুবরাজ হিন্দল ও অপরাপর ভৃত্যবর্গকে, দুর্গ হইতে তাঁহার জননী ও অত্যাচারিত পরিজনবর্গকে এবং ধনরত্নাদি আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

এই স্থানে যুবরাজ কামরানের বিষয় কিঞ্চিৎ বিবৃত করার প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্বেপ্রস্তাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, সম্রাট আগ্রা পরিত্যাগকালে কামরানের প্রতি নগর রক্ষা ও দেশ শাসনের ভার অর্পণ করিয়া যান। সসৈন্ত সম্রাটের প্রস্থানের কিয়দিবস পর, যুবরাজ পীড়িত হন। আগ্রার জলবায়ু

* এই সময় তাইমুরের বহুতর বংশধর এবং চেঙ্গিজ খাঁরও কতিপয় বংশীয় চিন্দুস্থানে আগমন করতঃ মীর্জা উপাধি গ্রহণ করে। এবং নামের পশ্চাতে উপাধি থাকার রীতি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সকলেই এই রীতি অনুসরণ করে নাই। এই গ্রন্থে বোদগার প্রভৃতি নামের পূর্বে সর্বদাই মীর্জা ব্যবহৃত হইয়াছে। মীর্জা বোদগার সম্রাটের এক আত্মীয় সহিত পরিণীতা হন।

তাহার স্বাস্থ্যের প্রতিকূল এইরূপ স্থির করিয়া যুবরাজ অনেকগুলি রাজ-কণ্ঠচারী লইয়া বায়ু পরিবর্তনের জন্তু লাহোরে গমন করেন। তথায় বসিয়া তিনি যে সকল কুটিল ষড়যন্ত্রের সূচনা করেন, তাহা যথাক্রমে বর্ণিত হইবে।

সম্রাট পানাহার করতঃ শ্রান্তিদূর করিলে পূর্বোক্ত সৈয়দ তাহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন—“এই পৃথিবীর কার্য্যকলাপ কখনো প্রবহমান জলশ্রোতের ত্রায় আবার কখনো স্থির সরোবর সলিলের ত্রায় প্রতীয়মান হয়! সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে আপনার এ স্থান পরিত্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত।” তিনি তৎপর সম্রাটকে একটী সুন্দর ঘোটক প্রদান করিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

সম্রাট অশ্বে আরোহণ করতঃ ফতেপুর শিক্ৰী অভিমুখে যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে যুবরাজ হিন্দল তাহার সহিত মিলিত হইয়া অভিনন্দন করতঃ একখানি মূল্যবান ছোরা এবং একখানি ভিতরে মোড়া তরবারি উপঢৌকন প্রদান করিলেন। যুবরাজ উক্ত অস্ত্রনিচয় আগ্রার মেলাখানা হইতে সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। প্রথমদিন সম্রাট পরলোকগত সম্রাট বাবরের উদ্যানে অবস্থান করেন। এই উদ্যানে বসিয়া থাকিতে থাকিতে শিক্ৰী পর্ব্বত হইতে একটা তাঁর আসিয়া তাহার সম্মুখে পতিত হয়। কোন্ ব্যক্তি এই তাঁর নিক্ষেপ করিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত সম্রাট, ছইজন অনুচর তদাভিমুখে পেরণ করেন কিন্তু শীঘ্রই তাহারা উভয়ে আহত হইয়া প্রগাবর্ত্তন করে অথচ কাহাকেও দেখিতে পায় না।

সম্রাট রাজদ্রোহীতার সন্দেহ করতঃ সত্বর ইহান পরিত্যাগ করিয়া চুনি-পল্লী উদ্দেশে যাত্রা করেন। এই সময় সম্রাটের সমভিব্যাহারে নিজ পত্নিজনবর্গ ব্যতীত ছই একজন কন্ঠচারী ছিল। এই কন্ঠচারিগণের মধ্যে একজনের নাম ফকীর আলি, সে নির্বুদ্ধিতাবশতঃ সম্রাটের আগে আগে যাইতেছিল। সম্রাট ফকীর আলীকে অগ্রবর্ত্তী হইতে দেখিয়া ফুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—“আমি তোমারই পরামর্শে (বিগত যুদ্ধের পূর্বে) গঙ্গা উত্তরণ হই। তথায় তোমার মৃত্যু হইলে আমি সুখী হইতাম! তুমি এখন কি সাহসে আমার আগে আগে যাইতেছ? এতৎপ্রবণে ফকীর আলি নিজের অশ্ব বুড়াইয়া সম্রাটকে অভিবাদন করতঃ সৈন্ত শ্রেণীর পশ্চাত্তানে গমন করিল।

সম্রাট নির্বিন্দু চুনিয়াতে উপনীত হইয়া কেন্দ্রীর নদীতীরে অপেক্ষা করিতেছেন, ইত্যবসরে যুবরাজ আসকারী আসিয়া জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি

জানিতে পারিয়াছেন শের খাঁ তাহাদের অনুসরণে ফেরিদ গোরকে সৈন্ত প্রেরণ করিয়াছেন ; বিপক্ষায়েরা অগ্রসর হইতেছে । সুতরাং অবিলম্বে সম্রাটের এখান হইতে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য এবং যুবরাজ অবশিষ্ট অত্যাচার সংখ্যক সৈন্ত লইয়া তাহার প্রস্থানের সহায়তা করিবেন । সম্রাট তদনুসারে অশ্ব আরোহণ করিয়া রওনা হইলেন ; কিন্তু অল্পচারণ ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িল । তাহাদের কেহই জানে না কি করিতে হইবে, অপরকে সাহায্য করিতে কেহই অগ্রসর হয় না, পুত্র পিতারদিকে ফিরিয়া চায় না, প্রত্যেকেই স্ব স্ব মূল্যবান জিনিসপত্র সুকাইতে ও পলায়ন করিতে যত্নবান । তাহাদের বিপদের মাত্রা বাড়াইতে আবার মুঘলদ্বারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল । কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে পুনরায় প্রভাতের কনক কিরণ দেখিতে পাওয়াগেল ।

সম্রাট যখন জানিলেন যে, তাহার সৈন্তগণ নিকরসাহ ও ভীতিবিহ্বল হইয়াছে তখন তিনি অশ্ব খামাইয়া যুবরাজ ও শগারনাবশিষ্ট গমরাগগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—“পূর্বে পৃথবীর সকল অংশের লোক আমার সৈন্ত-শ্রেণীভুক্ত ছিল, তাহাদের কতক চোসারের যুদ্ধে, কতক কনোজের যুদ্ধে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে । বাহারা এখনও জীবিত আছে তাহাদের শোচনীয় অবস্থা । এমনাবস্থায় তাহাদের দুঃখ বজ্রগা বৃদ্ধি করার অপেক্ষা আমি নিজকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করি । আমি এখন আত্ম সাবধানে প্রস্থান করিব এবং আশা করি তুমি আমার বিশ্বস্ত অনুচরগণের জীবন রক্ষা পাইবে ।” অতঃপর তিনি সকলকে অবতারণ করিতে আদেশ করিয়া তিন অংশে সৈন্তশ্রেণী বিভাগ করিলেন । দক্ষিণ বিভাগ যুবরাজ হিন্দলের অধীনে, বামভাগ মোগদার মৌজ্জার হস্তে এবং মধ্যভাগ নিজের কর্তৃত্বাধীনে নির্দেশ করিয়া এবং অপর কতিপয় সেনানী পশ্চাছাণ্ডে রাখিয়া, সম্রাট সমগ্রবাহিনী ধীরে ও উপযুক্ত পর্যায়ক্রমে চালিত করিলেন । সম্রাট সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, কেহ যদি এই বিভাগের অগ্রবর্তী কি কোথাও লুপ্ত হইয়া ব্যাপৃত হয়, তবে তাহাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে ।

এইভাবে কিয়দূর অগ্রসর হইবার পর একজন মোগল আদমী সম্রাট-সদনে অভিযোগ করিল যে, চানপুটি বাহাদুর নামক এক কন্মচারী তাহার অশ্ব লইয়াছে । সম্রাট তৎক্ষণাৎ অভিযোগকারীর সহিত একজন অনুচর দিয়া চানপুটিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, অভিযোগকারীর অশ্ব এই দণ্ডেই যেন তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হয় । কিন্তু অবাধ্য কন্মচারী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া

অভ্যুত্থানক কতকগুলি কথা বলে। তত্ক্ষণে সম্রাট তাহার শিরোক্রম করিতে অমুজ্ঞা প্রচার করেন। আদেশ প্রতিপালিত হইলে, অপরায়ণ সৈন্তগণকে ভয় দেখাইয়া বাধ্য ও অচ্যুত রাখিবার অভিপ্রেয়ে এবং পল্লীলুপ্ত হইতে তাহাদিগকে নিরস্ত রাখিবার নিমিত্ত এই ছিন্নস্তব্ধটী বর্মার বিদ্ধ করিয়া সমগ্রবাহিনীকে প্রদর্শিত করান হয়।

এই স্থান হইতে প্রত্যহ ২০২৫ মাইল হিসাবে পথ অতিক্রম করিয়া মোগল-বাহিনী মির্জিন নগরে উপনীত হইল। এইস্থানে যুবরাজ হিন্দুগণকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া সম্রাট স্বয়ং মাতুলেজ নদীতীরে অবস্থিত নাচওয়ারা অভিযুখে অগ্রসর হইলেন। নদী তখন পূর্ণাবান পর্যায়ে এবং নৌকারও অপ্রতুল ছিল, কাজেই সৈন্তসহ নদী উত্তীর্ণ হইতে সম্রাটকে সমুদ্র অস্ত্রবিধা ভোগ করিতে হয়। ইতোমধ্যে সংবাদ আসে যে, শের খাঁ নিজে দিল্লীতে অপেক্ষা করিতেছেন কিন্তু তাহার সৈন্তশ্রেণী ৮০ কি ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত।

যুবরাজ হিন্দুগের সৈন্তশ্রেণী আসিয়া মিলিত হইলে, সম্রাট একত্রে জালিকার অভিযুখে ব্যস্তা করিলেন। এখানে পুনরায় যুবরাজকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া সম্রাট লাহোরে গমন করতঃ রোসন আইনীর আলয়ে আশ্রয় লইলেন। পরদিবস সম্রাট জালিকার রক্ষার্থে যুবরাজ হিন্দুগের সাহায্যকল্পে তুর্কী মোজাক্ফর বেগকে প্রেরণ করেন। তদনুসারে মোজাক্ফর গাণ্ডোরাণ বা বিয়ানদীর পশ্চিমতীরে শিবির সন্নিবেশ করেন; আচরণেই আকগানদৈত্য নদীর অপর তীরে আসিয়া দেখা দিল।

সম্রাট অতঃপর লাহোরের বাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও যুবরাজগণকে আহ্বান করিয়া এই শঙ্কটাবস্থায় কি করা কর্তব্য তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইতোমধ্যে সংবাদ পাওয়া যায় যে, সন্ধির প্রস্তাব করিতে শের খাঁর নিকট হইতে এক দূত উপনীত হইয়াছে। কোথায় এবং কি ভাবে দূতের সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত, বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সম্রাট বলিলেন যে, যুবরাজ কামরানের উদ্যান-বাটিকায় তিনি দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং প্রচার করিলেন যে, “সাত হইতে সত্তর” বৎসর বঙ্গ নগরের প্রত্যেক ব্যক্তি এই সময় উপস্থিত থাকিবে।

নিরূপিত সময়ে শের খাঁর দূত অগ্রসর হইয়া যুবরাজ কামরানের হস্তে তলীর অস্ত্রের পূজা অর্পণ করিল। সম্রাটের আগমনের পূর্বেই যুবরাজ কামরান ও শের

খাঁর মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল কিন্তু উক্ত পত্রে শের খাঁ ব্যক্ত করেন যে, তিনি তাঁহার সহিত কোনরূপ সন্ধি সত্ত্বে আবদ্ধ হইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, কাজেই দূতকে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া প্রস্থান করিতে হইল । এই ঘটনার পর কি করিতে হইবে বা কোথায় যাওয়া উচিত তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সম্রাট অকম্পা হইয়া লাহোর আসাদে অবস্থান করিতে থাকেন । এই সময় সম্রাটবর্গ তাঁহাকে পরামর্শ দেন যে, প্রথমে যুবরাজ কামরানকে শাস্তি প্রদান করা কর্তব্য ; কারণ তাঁহাদের সন্দেহ হয় যে, যুবরাজ সৈন্যসমূহকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছেন । কিন্তু সম্রাট বলেন,—‘না, তা’ হইবে না ! এই বিনশ্বর জগতের ক্ষণিক মোহের বশবর্তী হইয়া ভ্রাতৃত্বকে কি হস্তগত করিব ? না, আমাদের পূজনীয় পিতৃদেব বাবরের মুখ্যকালের বাক্য আজীবন স্মরণ করিব । পিতৃদেব মৃত্যুকালে আমায় বলিয়া যান,—‘হুয়ায়ন ! সাবধান, সাবধান, তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত কলহ কিম্বা তাহাদের বিরুদ্ধে কখনও কোনও কু-অসিতসন্ধি হৃদয়ে স্থান দিও না ।’ পিতার এই বাক্য চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে ।

শ্রীব্রজসুন্দর সাম্রাজ্য ।

—o—

বসুবন্ধু ।

প্রাচীনকালে বসুবন্ধু নামে একজন প্রসিদ্ধ শ্রমণ বর্তমান ছিলেন । বৌদ্ধ-ইতিবৃত্ত-লেখক তারানাথ, বসুবন্ধুর বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন । চীন-পরিব্রাজক হিয়ান্‌সাঙ্ এবং ইৎসিং উভয়ে বসুবন্ধুর উল্লেখ করিয়াছেন ।

বসুবন্ধু মগধদেশে ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার অগ্রজের নাম অসজ । বসুবন্ধু জন্মগ্রহণ করার এক বৎসর পূর্বে অসজ শ্রমণ হইয়াছিলেন । এদেশে সকলেই অবগত আছেন যে সম্রাট অবলম্বন করিলে, গুরু নবীন সম্রাটের নামকরণ করেন । নবীন সম্রাটী তাঁহার গার্হস্থ্যশ্রমের নাম পরিত্যাগ করেন এবং সম্রাটশ্রমের নামে পরিচিত হন । বৌদ্ধশ্রমণ এবং জৈন-বতিগণ পক্ষেও ঐ নিয়ম প্রচলিত । অসজ এবং বসুবন্ধু তাঁহাদের শ্রমণশ্রমের নাম ।

বসুবন্ধু মনোরথ নামক শ্রমণের নিকট সম্রাটশ্রম গ্রহণ করেন । তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ কাম্বোজদেশে গমন করেন । তথায় সজ্জতজ্ঞ নামক জনৈক শ্রমণের নিকট নানা প্রকার বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । সজ্জতজ্ঞ হীনায়ন বৌদ্ধ ছিলেন ।

পরিশেষে বসুবন্ধু মগধদেশে প্রত্যাগমন করেন। তদীয় অগ্রজ অসন্ধ যোগাচার্য্য ভূমিশাস্ত্র রচনা করেন। অসন্ধ মহাযন বৌদ্ধ। বসুবন্ধু প্রথমতঃ অগ্রজের গ্রন্থের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন। অসন্ধ একান্ত বসুবন্ধুকে উপদেশ প্রদান করার জন্য তাঁহার দুই শিষ্যকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা বসুবন্ধুকে অক্ষয় বতিহর এবং দশভূমিকা-সূত্র শিক্ষা দেন। অনন্তর বসুবন্ধু অগ্রজের মতাবলম্বন করেন এবং অগ্রজের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

বসুবন্ধু মহাযানসূত্র, গুহ্যপত্রবিদ্যা, রত্নকূট, অবতংসক, সময়রত্ন, শত সাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা ইত্যাদি নানাগ্রন্থ সংগ্রহ করেন এবং গ্রন্থের সাহায্য ব্যতীত অনায়াসে আবৃত্তি করিতে সক্ষম হন।

বসুবন্ধু সুবিখ্যাত নলন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অভিদর্শকোষ নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহার কাম্বীরপ্রদেশীয় অধ্যাপকের নিকট এই গ্রন্থ প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শতশাস্ত্র এবং বোধিচিত্তোৎপাদন শাস্ত্র রচনা করেন।

হিয়ান্ সাঙ্ নলন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি বসুবন্ধুর বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। ৬২৯-৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দ হিয়ানের ভারত-ভ্রমণের কাল। বসুবন্ধু বোধি হর ইহার অস্থান পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন।

রত্নদর্শরাজ নামক একজন ভ্রমণ লিখিয়াছেন যে বিনোক্ষসেন, গুণপ্রভ, আর্য্যদেব, গুণমতি এবং যশোনিজ প্রভৃতি বসুবন্ধুর শিষ্য ছিলেন। তিনি বলেন যে চীনদেশীয় একজন ত্রিপিটকাচার্য্য বসুবন্ধুর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। হিয়ান্ ভারতবর্ষে অবস্থান সময়ে মোক্ষদেব বলিয়া পরিচিত ছিলেন; তিনি বসুবন্ধুর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করা অস্থান হয় না। বসুবন্ধু তাঁহার পূর্বসূরী ছিলেন, হিয়ান্ তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

বসুবন্ধু ভায়দর্শনে পারদর্শীতা লাভ করেন; তিনি কাম্বীরপ্রদেশে সজ্জহস্রের নিকট ভায়দর্শন শিক্ষা করেন। বৌদ্ধভ্রমণগণ মধ্যে অনেকে ভায়দর্শনে পারদর্শী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মকীর্ত্তির নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে ধর্ম্মকীর্ত্তির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি অসন্ধের শিষ্য ছিলেন। তারানাথ বলেন—ধর্ম্মকীর্ত্তি ভায়দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। হিয়ান্ ভারতবর্ষে একজন ব্রাহ্মণের নিকট ভায়দর্শন শিক্ষা করেন। অসন্ধের শিষ্য দিগ্‌নাগ দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। ভায়বাস্তিককার উদ্যোতকর এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। সুবন্ধুর বাসবদত্তা পাঠে ভ্রমণগণ ভায়দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ

রচনা করা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয় ।

বসুবন্ধুর শিষ্য গুণপ্রভ, গুণপ্রভের শিষ্য মিত্রসেন । হিয়ান্ নলন্দায় মিত্রসেন নিকট তত্ত্বগতশাস্ত্র এবং অভিব্যক্ত্যানুগ্রহান শাস্ত্র শিক্ষা করেন ।

অসঙ্গের আরও বহু শিষ্য ছিল ; তন্মধ্যে শীলভদ্র এবং স্থিতমতি প্রসিদ্ধ । শীলভদ্র কখন কখন ধর্ম্মকোষ নামে পরিচিত । হিয়ান্‌সাঁও বখন নলন্দায় আগমন করেন তখন শীলভদ্র তথাকার অধ্যাপক ছিলেন । শীলভদ্র তৎকালে অতি প্রাচীন ছিলেন । হিয়ান্ শীলভদ্রের ছাত্র জয়সেন নিকট নানাপ্রকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । ধর্ম্মপাল শীলভদ্রের অধ্যাপক ছিলেন । ইংসিং বলেন—
ধর্ম্মপাল ভট্টহরির সমসাময়িক ।

হিয়ান্ এবং ইংসিং উভয়ে নলন্দায় অধ্যয়ন করেন । ইহাদের প্রমাদে নলন্দায় বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । ইংসিং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে নলন্দায় অবস্থান করেন ।

হিয়ান্ বৌদ্ধগায়্য গমন করার সময়ে রাজগৃহের ভগ্নাবশেষ দর্শন করেন । বৌদ্ধগায়্য অবস্থান করার সময়ে নলন্দার শ্রমণগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন । হিয়ান্‌কে অভ্যর্থনা করার জন্ত নলন্দার দুই শত শ্রমণ কিয়দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সাদরে প্রত্যাগমন করেন । পরিশেষে পথে অসংখ্য শ্রমণগণ হিয়ানের সমাদরের জন্ত উপস্থিত হন । তন্মধ্যে কেহ কেহ বৈজয়ন্তী উত্তোলন করেন, কেহ বা বিগুন্ধভাষায় হিয়ানের গুণপ্রকাশক গান করেন, কেহ বা পশ্চিমমধ্যে সচন্দন-কুসুম নিষ্ফেপ করিতে করিতে হিয়ানের অহুগমন করেন । হিয়ান্ ভারতবর্ষের অল্প দে স্থানে গমন করিয়াছেন কুহাপি তিনি এক্ষণ সমাদর পান নাই । বাস্তবিক “গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নিগুণঃ ।” হিয়ান্ সমাদরের বোধ্যব্যক্তি ।

কথিত আছে, একদা একজন ব্রাহ্মণ নলন্দায় উপস্থিত হইয়া শীলভদ্রের সহিত বিচারপ্রার্থী হন । হিয়ান্ প্রথনতঃ উক্ত ব্রাহ্মণের সহিত বিচার আরম্ভ করেন । বিচারে হিয়ানের নিকট ব্রাহ্মণ পরাজিত হন ।

নলন্দায় অধ্যাপক এবং ছাত্রদের ব্যবহারের জন্ত চয়টি সুদীর্ঘ চৌতাল দালান ছিল । এই স্থানে অধ্যাপক এবং ছাত্র মোট দশসহস্র লোক অবস্থান করিতেন । ইহাদের সমস্ত বায় রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত । কান্তকুজেশ্বর হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য একজু ভূমি নিদিষ্ট করিয়া দেন । বিদ্যালয়ের নিকটে এক বৃহৎ আত্র-বাগান ছিল ।

হিয়ান্-এখানে পাণিনি ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ, দর্শনশাস্ত্র, শিল্পবিদ্যা, বেদ এবং নানাপ্রকার বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হিয়ান্-প্রণীত নীলপীঠে পাণিনির তিওস্ত এবং সুবস্ত পদের উল্লেখ আছে।

নলন্দা বিদ্যালয়ের অট্টালিকার অস্তিত্ব নিলুপ্ত হইয়াছে। অল্পদিন হইল ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের বক্তিমারপুর স্টেশন হইতে বেহার পর্য্যন্ত এক রেলপথ হইয়াছে। বেহার গয়া জিলার সম্ভিতিসন। বেহার হইতে মাদ্রি তিন ক্রোশ অন্তরে বড়গাঁ নামে এক গ্রাম আছে। এই স্থানে প্রাচীনকালে ভুবনবিখ্যাত নলন্দা-বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ইদানীং ভারতবাসীগণ নলন্দার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।

পাঠকগণ মধো যাহারা সুসভ্য ইউরোপের ঐতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি ইউরোপে কি এতাদৃশ বিদ্যালয় বর্তমান আছে? কি কখন ছিল?

শ্রীবেণীমোহন শুহ।

কৃষি।

পর্যায় রোপণ।

এখানে আর একটি আবশ্যকীয় কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করিতেছি। এক জমিতে একই ফসল প্রতিনব্বসর উৎপন্ন করিলে ভাল ফল পাওয়া যায় না। উদ্ভিদের শ্রেণীভেদে খাদ্য ভেদ হইয়া থাকে। এক এক জাতীয় উদ্ভিদ এক এক প্রকার পদার্থ ক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং এক শ্রেণীর ফসল ক্রমিক চাষ করিলে, সেই ফসলের প্রয়োজনীয় পদার্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়। তখনও অল্প প্রকার শস্যের উপযোগী সার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে থাকে। সেই জন্তই পর্যায়ক্রমে এক রকমের ফসলের পর অল্প রকমের ফসল দেওয়া উচিত; তাহাতে সার ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশের কৃষকেরাও পর্যায় রোপণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই পর্যায় রোপণের মূলে যে কি বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহারা তাহা অবগত নহে। আমাদের দেশে দুই জাতীয় ফসলেরই বিস্তৃত চাষ হইয়া থাকে। ধান,

গম, যব, ভুট্টা, আঁক প্রভৃতি ফসল একশ্রেণী ভুক্ত এবং গটর, মসুর, ছোলা, মুগ, কলাই, অরহর প্রভৃতি অন্য শ্রেণীভুক্ত। প্রথমোক্তগুলিকে “লক্ষ্মীবীজ” ও শেষোক্ত ফসলগুলিকে “দালজাতীয়” ফসল বলে। এই উভয় জাতীয় ফসলের পুষ্টি সাধনের জন্য প্রচুর পরিমাণ “নাইট্রোজেন” আবশ্যক। দালজাতীয় শস্ত বায়ু হইতে “নাইট্রোজেন” সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে কিন্তু “লক্ষ্মীবীজ” জাতীয় ফসল তাহা পারে না। সেইজন্য ধান, গম প্রভৃতি ফসলের পূর্বে মুগ, খেসারী প্রভৃতি দালজাতীয় ফসল রোপণ করা কর্তব্য। দালজাতীয় ফসল বায়ু হইতে প্রচুর পরিমাণ ‘নাইট্রোজেন’ প্রাপ্ত হয় সুতরাং তাহার যে সকল মূল ভূমিতে রহিয়া যায় তাহাতেও যথেষ্ট ‘নাইট্রোজেন’ থাকে, এই নাইট্রোজেন পরবর্তী “লক্ষ্মীবীজ” জাতীয় ফসলের পুষ্টি সাধন করে। দালজাতীয় উদ্ভিদ সকল হইতে শস্ত সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া না ফেলিয়া ক্ষেত্রেই চাষ করিয়া গিশাইয়া ফেলিলে আরও ফল পাওয়া যায়।

পর্যায় রোপণের স্থার একটা উপকারিতা এই, ক্ষেত্রে কীটের উপদ্রব অপেক্ষাকৃত কম হয়। এক এক জাতীয় ফসল প্রতি বৎসর করিণে সেই ফসলের কাঁট সকল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে অন্য ফসল দিলে পূর্বের ফসলের কীট সকল মরিয়া যায়।

জমি মাঝে মাঝে পতিত রাখা ভাল। তাহাতে রোদ্দ ও বৃষ্টিতে মাটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

জলসেচন ।

সমগ্র ভারতেই জলের অভাব। যে দেশে ভূমিত কণ্ঠ শীতল করিবার জন্য উর্দ্ধনদ্রে আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিতে হয় সে দেশে কৃষিকার্যের জন্য জলাভাব হইবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ফসলের সময় উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। কোন দেশের লোকই আমাদের মত কেবল প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করে না। প্রাচীনকালে এ দেশের রাজা মহারাজেরা জলাভাব নিবারণের জন্য পুকুর, দীর্ঘিকা এবং খাল খনন করিয়া দিতেন। ইংরেজ-রাজার আমলে সে সুনিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। ইংরেজ রেল প্রসার করিয়া যাতায়াত এবং শাসনকার্য্যের সুবিধা সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু খাল খনন করিবার জন্য যত্ন নাই। রেল ইংরেজ-গবর্ণমেন্টের আয় হয়, স্বজাতি বণিকদিগেরও যথেষ্ট লাভ আছে; খাল খননে কেবল প্রকৃতিপুঞ্জের উপকার, তাই সরকার বাহাদুর সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। গরীব

প্রজারা খাইয়া বাঁচিতে পারে না, তাহারা নিজ অর্থব্যয়ে খাল খনন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

যে স্থানের মাঠে নদী, বিল কিম্বা খাল থাকে কৃষকেরা উক্ত জলাশয় হইতে অপ্রশস্ত খাল কাটিয়া “কুঁদ” দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচন করে। অনেকস্থানে ডাল বা চাউগাছের গোড়াধারা “ডোঙ্গা” প্রস্তুত করিয়া লয়। দূর হইতে জল আনিতে হইলে চন্দ্র নিশ্চিত “ভিস্তি” ব্যবহার করাই সুবিধা।

অনেক ইংরেজ এদেশে “এবিসিনিয়ান টিউব ওয়েল” নামক যন্ত্র কৃষিকার্য্যে জলসেচনের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধারণ কৃষকেরা উহা ক্রয় করিতে অসমর্থ। প্রতি যন্ত্রের মূল্য ৬০০, ৭০০ টাকা। মাদ্রাজে “সুলতান ওয়াটার লিফট” নামক আর একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রদ্বারা ছুটী বলদের সাহায্যে কূপ হইতে ছুটী পাত্রে পরে পরে জলপূর্ণ হইয়া উঠে। এই যন্ত্রের দাম ৮০ টাকা। মাদ্রাজ-গবর্ণমেণ্ট উহা কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই তো গেল জলাভাবের কথা। শস্ত্রো পক্ষে অনাবৃষ্টি সেমন “ঈতি” অতিবৃষ্টিও তেমন ঈতি; অতিবৃষ্টির সময় এই সকল যন্ত্রদ্বারা কোন ফল হইবে না। খাল খনন করিলে অতিবৃষ্টির সময়ও বিশেষ উপকার হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী করিয়া দিলে মাঠের সমস্ত ক্ষেত্রের জল গড়াইয়া খালে পড়িতে পারিবে; জমিতে জল দাঁড়াইতে পারিবে না। সুতরাং অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি এই বিবিধ ঈতির হস্ত হইতে মুক্তলাভ করিবার পক্ষেই খাল খনন নিরাপদ।

সকল জমিতে সমপরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় না। “বেলেমাটি” স্বাভাবিক অবস্থায়ই খুব নীরস; সেই জন্য বেলেমাটিতে জলের বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ‘আঁটাল মাটিতে’ সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না এবং একবার জল প্রবেশ করিলে বাহির হইতে পারে না। সুতরাং আঁটাল মাটিতে অধিক কি অল্প জল দুই-ই শস্ত্রো হানিকর। “বৌদ মাটি”তে অল্পারক অধিক। তজ্জন্ত অধিক জল সেচন করিলে অল্পারক পরিবর্তিত হইয়া ফসলের অনিষ্ট করিয়া থাকে। “দো-আঁস মাটি” কৃষির পক্ষে খুব সুবিধাজনক। দো-আঁস মাটিই এদেশে অধিক। এই মাটিতে অধিক জলসেচনের আবশ্যক হয় না।

শস্ত্রের কীট।

ক্ষেত্রে প্রচুর শস্ত হইলেও কৃষকের চিন্তার অবসান হয় না। শস্ত নিরাপদে বাড়ীতে আনিয়া না পৌছাইতে পারিলে আর শাস্তি নাই। জমিতে আশাহুৰূপ

শস্ত্র হইয়াছে, কৃষকের আনন্দের সীমা নাই ; কিন্তু হয়-তো ফসল কাটিবার পূর্বে একদিন কৃষক ক্ষেতে গিয়া দেখিল তাহার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে । সারা বৎসর রোজে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া যে শস্ত রোপণ এবং সংরক্ষণ করিয়াছিল তাহা কীটে একবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে । সুতরাং শস্ত গৃহে না আনা পর্য্যন্ত কৃষকের আর শান্তি থাকে না ।

কীট কৃষকের পরম শত্রু । কীটের আক্রমণ হইতে শস্ত রক্ষা করিবার উপায় কৃষক মাত্রেই জানিয়া রাখা একান্ত কর্তব্য ।

কীট নানা প্রকার । এক এক রকম শস্তে এক এক রকম কীট দেখিতে পাওয়া যায় । নিম্নে প্রধান প্রধান শস্তের কীট নিবারণের সহজ উপায় লিপিবদ্ধ করা গেল ।

ধান ।

১। এক জাতীয় কীট, ধান্ত বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া মাত্র তাহার পাতা খাইয়া ফেলে । এই কীট নিবারণের জন্য ‘পেরিসগ্রীন’ (Paris green) নামক বিষাক্ত পদার্থের জল গাছে ছিটাইয়া দিতে হয় । তাহা হইলেই পাতা খাইয়া সব কীট মরিয়া যায় ।

২। আট ভাগ ছফের সহিত একভাগ কেরোসিন মিশাইয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলে কীটের উপদ্রব দূর হয় ।

৩। তামাকের পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিলে ধান গাছের কীট মরিয়া যায় ।

৪। বর্ষাকালে বৃষ্টির পর ক্ষেত্রে জল দাঁড়াইলে এক প্রকার কীট (*Leptocoris Acuta Thumb*) হয় । নৈশাথ মাসে বৃষ্টির পর এই কীট দেখিতে পাওয়া যায় । এই কীট অতিশয় সাংঘাতিক ; একবার ক্ষেতে প্রবেশ করিতে পারিলে সকল ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে । ক্ষেতের যে দিক দিয়া বাতাস বয় সেই দিকে খুব ভাগ করিয়া আবর্জনা দ্বারা ধূয়া করা উচিত । অধিকক্ষণ ধূয়া লাগিলে এই কীট মরিয়া যায় । আর সেই সঙ্গে ক্ষেত্র হইতে জল বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা উচিত ।

ইক্ষু ।

ইক্ষু প্রায়ই উই কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে । উই নিবারণের জন্য কেরোসিন জলের মিশ্রিত করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য । কেরোসিনের তীব্র গন্ধ উই সহ্য করিতে পারে না । ইক্ষুতে এক প্রকার পোকা হইয়া থাকে

তাহাকে 'ধমা বা মাজেরা' (*Dacatracca Bacharates fabur*) বলিয়া থাকে। এই পোকা দেখা দিলে ইক্ষু রক্ষা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। যে ইক্ষুতে পোকা ধরিলে তাহা তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। ইক্ষু পোকা নিবারণের বিশেষ কোন উপায় এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই।

আলু।

আলুর গাছ বাহির হইলে অনেক সময় পাতাগুলি কৌকড়াইয়া গাছ শুকাইয়া যায়। যখন অনেক গাছ এই ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হইবে তখন ৪৫ সের জলে এক ছটাক হীরারকস মিশ্রিত করিয়া পিচকারীদ্বারা ক্ষেতে ছড়াইয়া দিবে।

একভাগ ভাল কার্বলিক এসিডে একশত ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া ছড়াইয়া দিলে সকল প্রকার কীট এবং কীটের ডিম্ব মরিয়া যায়।

উপসংহার।

কৃষি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইল, এখন কৃষকের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। আমাদের দেশের কৃষকেরা নিতান্ত নিঃস্ব। অতি অল্প লোকেরই দুই বেলা আহারের সংস্থান আছে। মহাজনের নিকট হইতে উচ্চ মূল্যে টাকা কৰ্জ করিয়া ব্যবসায় করে। প্রচুর পরিমাণ ফসল হইলেও তাহাদের হাতে এক কপর্দক থাকে না। সুতরাং তাহারা কিরূপে কৃষির উন্নতি করিবে এবং কেনই বা করিবে? যদি কষ্টোপার্জিত ধনের অধিকারী হইতেই না পারিল, তবে তাহারা কেন যত্ন এবং পরিশ্রম করিবে। বেনারস Industrial Conference এ পঠিত প্রবন্ধে Mr. D. M. Hamilton যথার্থই বলিয়াছেন—
"If the great body of cultivators have to work not so much for themselves as for their creditors, why should they take the trouble to assimilate new methods of agriculture."

কৃষি কার্যের উন্নতি করিতে হইলে কৃষকের অবস্থা সচ্ছন্ন করা সর্বপ্রায়ে প্রয়োজন। জমিদারেরা যদি অল্প মূল্যে কৃষককে টাকা ধার দেন তাহা হইলে তাহাদের হাতে কিছু অর্থ থাকিবে এবং তাহাদের উৎসাহও বাড়িবে। Hamilton বলিয়াছেন এতি জেলার জমিদারেরা সম্মিলিত হইয়া যদি Cash Banks অথবা Grain Banks স্থাপন করেন এবং প্রজাদিগকে টাকা অথবা বীজ ধার দেন তাহা হইলে কৃষকের অবস্থা অনেকটা ভাল হইতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ নন্দমদার।

প্রাণেশচন্দ্র ।

(৪)

বাসন্তী । দাদা ম'শায়, আজ এত ভোরে যে, মাঘের শীত ।

বিনয় । দাদা ম'শায়ের শীত গ্রীষ্ম সমান । আজ যে আকের লাঠির শুধু আগা খানা দেখতে পাচ্ছি । তবে বুঝি এর আগে আরও কোন বাসায় গিয়াছিলেন ।

দাদা ম'শায় । মায় বাসায় গিয়াছিলাম ; ছোট মা, বড় মা, ছোট খোকা, বড় খোকা, গোড়ার দিক সব কেটে নিল ।

মুক্তি । আগে কেন আমাদের বাসায় এলেন না ? আমাদেরকে তবে আকের আগার মত ভাল বাসেন ।

দাদা ম'শায় । দিদিমণি, আকের গোড়ার পথের গোড়া, একটা বই ছোটো হয় না । তোরা গোড়া কেটে নিলে তারাও তবে তাই বলতো ? কাল গোড়া তোদের ।

দাদা ম'শায় বেড়াইবার কালে হাতে একখানি আকের লাঠি লইয়া বাতির হইতেন, যে বাসায় বাইতেন বালক বালিকাগণ উহার অংশ কাটিয়া লইত । আগা ছিল ; দাদামণি, দিদিমণি সকল, ঐ আগাটাই টুকরা টুকরা করিয়া লইল । বাসন্তী দাদা মহাশয়ের অন্তঃস্পর্শ পকেটের মধ্যে তাহার সুন্দর হাতখানি ডুবাইয়া দিল ।

বাসন্তী । কুল পেয়েছি গো, কুল পেয়েছি—ও গো জলপাই, ও গো কমলা ।

বালক বালিকাগণ নিমেষে, দাদা ম'শায়ের পকেটে হাত ডুবাইয়া কুল-মুজা, জলপাই-মণি, কমলা-প্রবাল সকল তুলিতে লাগিল ।

মুক্তি । দাদা ম'শায়, কুল, জলপাই—এ যে বড় প্রলোভন, আপনি প্রলোভন দিবেন !

দাদা ম'শায় “আচ্ছা দিব না, দেখি, প্রলোভন সব এই ফেলে দিলুম” বলিয়া পকেটে আরও হাত হুল, কমলা, জলপাই ছিল মেজতে ছড়াইয়া দিলেন ।

এক পকেটে কুল কত, কমলা কত, জলপাই কত । দাদা ম'শায়ের পকেট শোভাফিসের গার্শেলের ব্যাগ ; তাই কি একটা, এপাশে ওপাশে, বুকের উপরে ও নীচে ।

স্বরময় সব ছড়াইয়া পড়িল । বালক বালিকাগণ কে কা'র আগে সব

হরির লুঠের জায় লুঠিয়া লইল। দিদিমণি মুক্তি, হু'গালে ছ'টা কুল দিয়া মচ্ মচ্ শব্দ খাইতে লাগিলেন। এতক্ষণ যে সকল প্রলোভন দাদা মহাশয়ের পকেটে ছিল তা ছেলে মেয়েদের পেটে বাইরা নিমেষে নিরূপণ প্রাপ্ত হইল।

ছোট খোকা তখন সবে ঘুম হইতে উঠিয়াছে। উঠিয়া দেখিল—দাদা ম'শায়ের এক পকেট শূন্য হইয়া গিয়াছে; সে তাঁহার হাতুতে উঠিয়া অপর পকেটে হাত ডুবাইতে চেষ্টা করিল। ছোট হাত তল পাইবে কেন? দাদা ম'শায় "দিচ্ছি" বলিয়া হাত ডুবাইয়া দিলেন।

দিদিমণি। বান্, আবার ওকি? আপনি প্রতিদিন ও কত কি নিয়ে আসেন? আপনার পরস লাগে না? এ-ত গেল, আপনি পথে বেতে আর সকল বাসার ছেলে-মেয়েদের জন্য কত কি কিনুন।

এই কথা বলিতে বলিতে দিদিমণি পকেট তাঁহার মণিব্যাগটা হস্তগত করিল।

দাদা ম'শায়ের এক হাত খোকায় হাতের সঙ্গে এক পকেটে, অপর হাত তাঁহার মণিব্যাগ উদ্ধারে ব্যস্ত। তারপর তিনি দিদিমণির পশ্চাতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। একটা খরগোশের পশ্চাতে দৌড় সহজ কিন্তু একটা চটুল বালিকার পশ্চাতে তত সহজ নয়। বালিকাকে ধরা বাইতেছেন না। খোকা তখন অধীর হইয়া উঠিয়াছে। দাদা ম'শায় পকেটের সম্পত্তি তাড়াগাড়ি ধরিয়া তাড়াগাড়ি একটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিদিমণির পশ্চাতে ছুটিলেন।

পকেটের তুলার মত নরম সম্পত্তি গরনের আরাম হইতে বাহির হইয়া মিউ মিউ করিতে লাগিল।

বিড়াল-ছানা দেখিয়া সকলে হো, হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, অবাক হইল। দিদিমণি বিড়াল-ছানার শব্দ শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল, মণিব্যাগ রাখিয়া বিড়াল-ছানা কোলে তুলিয়া লইল।

দিদিমণি। দাদা ম'শায়, ফল ফুল ছেড়ে এখন জ্যেস্ত ধর্ম্মলেন যে। আপনার যে পকেট—কোন দিন বা আমাদের জন্য হাতী নিয়ে আসেন।

দাদা ম'শায়। এ কি ক'রে এল। নিশ্চয়ই সতুর কাজ, সতু হয়ত কোন সময়ে আমার পকেটে রেখে দিয়াছে—সতু আজ বড্ড ভোরে উঠে ছিল। বাচ্ছাটাও গরমের আরাম পেয়ে চুপ করে ছিল। খোকাবাবু এইটা নেও—দেখো খেও না।

দাদা ম'শায় বিরাট পুরুষ; উচ্চতার অল্পপাতে পড়িয়া স্থলতা হুটিয়া উঠিতে পারে নাই। বর্ণ তপ্তকাকনের জায়। চক্ষু দেখিলে দয়ার অবতার বলিয়া মনে

হয়। কিন্তু জ্ঞ মধ্য লম্বভাবে যে দুইটা সমান্তরাল বলিরেখা আছে, ঐটাই ভয়ের কথা। অত্যাঁ দেখিলে ঐ রেখাটির হইতে যেন অগ্নিস্ফুল্গ বাহির হয়। এই আনন্দ কোলাহলময়, ঐ নির্বাক গম্ভীর। দাদা ম'শায় হঠাৎ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “দিদিমণি, তোমার বাবা উঠেছেন।”

দিদিমণি। হরিরলুঠ হয়ে গেল, বেড়াল-ছানা, মণিব্যাগ্ নিয়ে ভূমিকম্প হয়ে গেল, আর বাবা উঠেন নি? তাঁকে কি কাজ?

দাদা ম'শায়। কথা আছে।

দিদিমণি। কেবল কথা আছে; মা, বাবা, আর আপনি কি যে কথা বলেন চুপি চুপি। আজ আমি থাক্‌বো।

দাদা ম'শায়। আচ্ছা, কিন্তু আমার একটী অমুরোধ রাখতে হবে।

দিদিমণি। রাখ্‌বো।

দাদা ম'শায়। কাণে তুলো দিয়ে থাকতে হবে।

দিদিমণি। আচ্ছা তাই।

এই সময়ে বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—“আপনার ফল দান হ'য়ে গেছে-তো।”

দিদিমণি তার বাবাকে সব বলিল, ষোঁকাকে ডাকিয়া বাচ্চা আনিয়া বাবাকে দেখাইল। তখন আবার হাসির নূতন হোরু উঠিল।

দাদা ম'শায় গম্ভীর—তিনি ব্রজেন্দ্রবাবুকে গম্ভীরভাবে ডাকিয়া গম্ভীরভাবে একটা কামরায় প্রবেশ করিলেন। দিদিমণিও থাকিল।

দাদা ম'শায়। কাণে তুলো দিয়েছিদ্?

দিদিমণি। দিয়েছি বই কি? দেখুন না।

দিদিমণি সত্যি কাণে তুলো দিয়াছে, কিন্তু কলসের স্থানে।

দাদা ম'শায়। এই বুঝি চালাকি, আচ্ছা শোনু। (ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রতি) দেখুন প্রাণেশচন্দ্র পালিয়েছে; কেন, কিছুই বুঝলুম না। তার দীক্ষা গ্রিক তার মধ্যে—আপনি জানেন, কেন?

ব্রজেন্দ্র। কিছু-ত জানি না। আপনি কোন সন্ধান নিয়েছিলেন?

দাদা ম'শায়। তাদের বাগায় সন্ধান নিয়েছিলাম। অনন্ত কিছুই কলতে পারলো না, কি বলে না, সে রেল উঠিয়ে দিয়েছিল—এই পর্য্যন্ত।

দিদিমণি চিত্র পুস্তকের মত দাঁড়াইয়া তনিতেছিল। তার চোকে বেধে উড়িয়াছে বই হয় আর কি? দাদা ম'শায় এবং ব্রজেন্দ্র বাবুতে কথা শেষ

হইবার পূর্বেই দিদিমণি অল্প এক কামরায় বাটরা দরজা বন্ধ করিয়া দিল ।

ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁর দ্বীকে ডাকিলেন ; তিন জনে কথা হইল । দাদা ম'শায় চলিয়া গেলেন—পথে চলিতে চলিতে আবার পকেট কুল-কমলায় বোঝাই করিলেন, হাতে আবার একখানি লম্বা আক—দেখিলে বোধ হয় বেন একখানি বড় গোবাই নৌকা, রাজপথের জনশ্রোতে লগি মারিয়া চলিয়াছে ।

দিদিমণির মা স্মৃশীলা দেবী, দিদিমণিকে ডাকিলেন, সারা পাইলেন না, দিদি মণির কামরার দ্বারে আঘাত করিলেন—কেহ দ্বার খুলিল না । আবার আঘাত করিলেন—রুদ্ধকণ্ঠ হইতে অমুচ্চ কান্নার অমুচ্চধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল ।

(৫)

পাঁচদিন চলিয়া গেল, অনন্ত প্রাণেশচন্দ্রের কোন পত্র পাইল না । যে তারিখে তাহার বাড়ী পৌঁড়িবার কথা তাহার পরের তারিখে তাহার মা তাহাকে পত্র লিখিয়াছেন । অনন্তের চিন্তা হইল—প্রাণেশচন্দ্র তবে কোথায় গেল ?

অনন্ত ভোরে দরজা খুলিয়াই শি'ড়িতে শব্দ শুনিতে পাইল । সে শব্দ অতি পরিচিত—দাদা ম'শায়ের পায়ের শব্দ । এক্রপ পা অতি অল্প লোকের হয়, আপনার সমস্ত ওজন পৃথিবীর বুকে চাপাইয়া অতি অল্প লোকেই এক্রপ সজোড়ে চলে । দাদা ম'শায় দারজিলিং-হিমাগয় রেলের এঞ্জিনের মত উপরে উঠিয়া আসিলেন ।

অনন্ত । নমস্কার, এত ভোরে যে !

দাদা ম'শায় । আমার ভোর-তো ছ'পর রাতে, কোনদিন সন্ধ্যায়ও ভোর ।

অনন্ত । তা নিদ্রা না গেলে সমস্ত সময়ই ভোর । আপনি এত জেগে করেন কি ?

দাদা ম'শায় । কি আর করুনো ? জেগে ঘুমাই ; তাই তোমাকে বলতে এসেছি ; প্রাণেশ চলে গেল—এমন ক'রে । তা আগে কিছু জানতে পারলুম না । তুমি কোন পত্র পেয়েছ ?

অনন্ত । কোন সংবাদ নাই, তার মার একখানি কার্ড এসেছে, পরখও বাড়ী পৌঁছে নাই ।

দাদা ম'শায় । কেন এমন ক'রে গেল বলতে পার ?

অনন্ত । তা কিছুই বুঝতে পারছি না, ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে খবর নিয়েছেন ?

দাদা ম'শায় । সেখানেও বলে বার দাই, কোন পত্র কেমনে নাই ।

দি-দিন যুক্তি তো কৈদে কেটে অস্থির, অথবা দিন কিছু খেগ না, হুঁদিন কুলে যায় নাই।

অনন্ত ! ঐ ত রোগের ঘর। আপনাত দিদিনবি যদি না জানেন তবে আর কেউ জান না। ঐসে দেখছেন বিছানা, ও খাটে প্রাণেশ্বর শরীরটা থাক্তো—চাই কি, নিমন্তলায় নিগেও ক্ষতি হতো না—তার আত্মাটা থাক্তো ব্রজঙ্গাবা বাড়ী। আচ্ছ জিজ্ঞাসা করি, আপনাত দিদিনবিও কি প্রাণেশ্বকে খুঁদ ভালবাসেন ?

দাদা ম'শায়। তা তোমরা যেমন ভাব তেমন নহ। পূর্বরাগ টাপ কিছু নয়, এ একরূপ অম্মরাগ। বয়সই-বা কি ?

অনন্ত। পড়াইতে পড়াইতে, নীতি-বিদ্যা শিক্ষা দিতে দিতে, একটা প্রীতি জন্মে—তা বুঝি। ব্রজঙ্গাবু সে কই মাছের মত প্রাণেশ্বকে জিয়ায়ে রেখেছেন, তা-তো মেয়েটিকে বুঝতে দেওয়া হয় নাই ?

দাদা ম'শায়। কিছু না, তোমরা কিন্তু একটু ভাব বুঝিয়া থাক। যে রূপ শ্রোমের কথা তুমি ভাবছ সে রূপ শ্রোম এদের মধ্যে এত শব্দে জন্মায় না।

অনন্ত। জন্মাইতে দেহিও-ত হয় না। সে অন্ধদেহী কখন এসে বুক চাপেন পঞ্জিকায়-ত তার তারিখ, তিথি, নক্ষত্র লেখে না।

দাদা ম'শায়। তুমি কথায় কথা পের কর্ণায় চেট্টা করছ, প্রাণেশ্ব কেন একরূপ করে চ'লে গেল—তাই বল।

দাদা ম'শায় প্রাণেশ্বের খাটের উপর বসিয়াছিলেন। ভোষক বালিশ, ঠিক তেমনি রহিয়াছে। দাদা ম'শায় একটু সরিয়া বসিতে বালিশের নীচে একখানা গজ দেখা গেল। খামে আঁটা, উপরে লেখা Mukti Dewi। ঠিকানা লেখা হইয়াছে কিন্তু কাটা। দাদা ম'শায় পত্রখানি লাইলেন। অনন্ত “দেখি দেখি” বলিয়া পত্রখানি হস্তগত করিতে চাইল, বলিল “খুলে পড়ুন না।”

দাদা ম'শায়। অস্ত্রের পত্র খুলতে নাই, তা হলে তো/অস্ত্রের ঘরে সিঁদে দেওয়া যেতে পারে। জান, পত্র একটা মন্ত সম্পত্তি।

অনন্ত। পত্রটা ডাকেই দেওয়া হউক। টিকেট এটো বাস্তব ফেলে দিবে আসি।

দাদা ম'শায়। না গো ঠাকুর না, পত্র ছাড়ছি না। দিলেও তুমি না দেখে বাস্তব ফেলবে না—বড় প্রলোভন, তার পর প্রাণেশ্বের পত্র দিদিবনিকে।

অনন্ত। তবে বান, আপনিই পিয়নের কাজ করুন। পত্র বিবরণটা কি জেনে আসিকে জানাবেন। নৈলে বড় চিন্তিত থাকুনো।

দাদা ম'শায় পত্র খানি লইয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ী চাছিলেন! পথে ভাবিতে লাগিলেন—পত্র ব্রজেন্দ্র বাবু হাতেই দিবে, কি দিদিমণি হাতেই দিবে? পত্রের পেটে আছে কি—জানিবার জন্ত তাঁহারিও খুঁ কোঁতুল হইল। কোঁতুল বুদ্ধি অল্পপাতে পদক্ষেপের পরিসরও বুদ্ধি পাঠতে লাগিল। তিনি পৌছিয়া মুক্তির হাতেই পত্র দিগেন। মুক্ত উহা লইয়া তাহার কামরায় প্রবেশ করিল, দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

মুক্তি যদি বিষয়টা না বলে—দাদা ম'শায় “হাইত” “হাইত” বলিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। ছুট এক বার জানালায় মুখ রাখিয়া ডাকিলেন “দিদি মণি।”

দিদি মণি তখন পত্র খানির গুপ্তা। ভাজা, চড়চড়ি, অঙ্গুর মাংস কত সন্ধি খাইতে ছিল—স্থানে স্থানে হয়ত বড় বাল, হয়ত চোকের জগ পাড়িতেছিল।

দিদি মণি দরজা খুলিল না।

লুকাইয়া ভালবাসার জনের পত্র পড়ায় কি হয়, তা তুমি কি বুঝবে চির কুনার দাদা ম'শায়?

পলায়িত।

(১)

পিঞ্জরখানি শুল্ল করিয়া

পলায়ে গেলি রে পাখি!

এতদিন কার এত মোহ মায়া

চিরদিন তরে কেটে চলে যাওয়া,

একটুকু প্রাণে বাজিল না কিরে

দিলি ববে মোরে ফাঁকি!

পিঞ্জরখানি শুল্ল করিয়া

পলায়ে গেলি রে পাখি!

(২)

দেখিলি রে শুধু লোহার পিঞ্জার,

দেখিলি না প্রেম-প্রীতি?

এ যে সুখময় মধু কারাগার,

সেহ মমতায় ঘেরা চারিধার,

দেবতা হলেও পলাতে নারিত

তোদের একিরে রীতি?

দেখিলি রে শুধু লোহার পিঞ্জার

দেখিলি না প্রেম-প্রীতি?

(৩)

আপন করিয়া রেখেছিহু তোরে
রাখি নি বন্দী ক'রে।
তোরে যে দেখিতে ভালবাসি ভাই
নয়নে নয়নে রেখেছিহু তাই,
আমরা মানুষ বাঞ্ছিতে চাই
রাখিতে হৃদয়ে ধ'রে,
তাই আপন করিয়া রেখেছিহু তোরে
রাখি নি বন্দী করে।

(৩)

ওয়ে তাক পিঁজার আমারে দেবে না
ভুলিতে-ত তোর বাখা,
তুই কত গান গাবি বসে নীড়ে
আসিনে ঘাইনে বসন্ত ফিরে
সে গীতের মাঝে থাকিবে না আনি
আমাদের কোন কথা,
তবু তাক পিঁজার আমারে দেবে না
ভুলিতে-ত তোর বাখা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

প্রকৃতি।

অধিক প্রকৃতি!

ভুবন মোহন ওই
হেরিতে তোমার রূপ
কিবা শাস্ত্র কি ফুটন্ত
তুষার কিরীটি শিরো
বহিছে বিশাল সিঁদু
বহিছে মলয়ানিল
শোভিছে হৃদয়ে তব
তোমারি কাননে কবি
তব প্রেম ভাগবাণী
কিবা স্নেহাঙ্কুশখান
তোমার স্নেহের কোলে
তোমারি সৌন্দর্য মাঝে
মরি কি প্রশান্ত মুক্তি
নিরাখি, বদন তব
ভুবন মোহন তব
উদার ছবির মরি!
ধন্য ধন্য পুণ্যময়ী!
শাস্ত্র অনন্ত উৎস
তোমার স্নেহের নীড়ে
স্নেহময়ী তুমি মাতঃ।

হোনার মধুর হাসি,
কেন এত ভালবাসি।
তোমার মোহন ছবি,
ভালে শোভে রাঙা রবি
চুমিয়া চরণতল,
গুঞ্জরিছে অলিদল।
অনন্ত রতন হার,
ঝঙ্কারিছে অনিবার।
অতুল ভবমণ্ডলে,
পাতিয়াছ ধরাভলে।
তোমার শীতল ছায়,
ক্রমে দিন কেটে যায়।
কি ভাব হৃদয়ে আনে,
পবিত্রতা আগে প্রাণে।
অতুলন রূপ শোভা,
বিশ্বজন মনোলোভা।
শ্রী ত-স্নেহ-পারাবার,
বিগলিত স্নেহা মার।
পাল জীব অমূল্য,
অমৃতের প্রসবণ।

শ্রীউষা প্রমোদিনী বসু।

শোক সংবাদ ।

আমরা সংবাদ পাইলাম, সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী সরস্বতী গত ১২ই বৈশাখ বুধবার রাত্রি ১১৬ টার সময় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন । ‘আরতি’র পাঠকপাঠিকামাত্রই এই শোক সংবাদ শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইবেন । বহুদিনস চতুর্ভুজ ‘আরতি’র সচিত্র নগেন্দ্রবালার সম্বন্ধ ছিল । আমরা তাহার সুললিত কবিতাবলী প্রকাশ করিয়া বহুবার পাঠকপাঠিকাগণের চিত্তবিনোদন করিয়াছি । কিন্তু হায় আজ সেই কবিতার উৎস অকালে চিররুদ্ধ হইল । বঙ্গসাহিত্যে নগেন্দ্রবালার স্থান কোথায় তাহা আমরা শোকসমুদ্রে চিত্তে নির্ধারণ করিতে বসি নাই । তবে এই কথা নৈরাশ্রের সচিত্র বলিতেছি যে নগেন্দ্রবালার অভাব বঙ্গসাহিত্যে সকলেই অনুভব করিবেন তিনি “নারীধর্ম্য” “গার্হস্থ্যধর্ম্য” “অমিরগাঁথা” “ব্রজগাঁথা” “কুসুমগাঁথা” প্রভৃতি সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন । আজ আমরা কি বলিয়া তাঁহার বিরহবিধুর পতিকে সাহসনা করিব ? ভগবান পরলোকগত কবির আত্মার সঙ্গতি করুন এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে শান্তি দান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা ।

আব্রতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ।

ষষ্ঠ বর্ষ

{ ময়মনসিংহ, চৈত্র ১৩১২ । { তৃতীয় সংখ্যা ।

বঙ্গিমচন্দ্র ।

হে কবীন্দ্র দেখ আজি ত্রিদিব হইতে
হইয়াছে বঙ্গে গাতৃ-পূজা-আয়োজন,
জন্মভূমি-জননী কল্যাণ সাধিতে
মহাসাধনায় সবে হ'য়েছে গগন ।
সপ্তকোটি-কণ্ঠ হ'তে কাঁপায়ে গগন
“বন্দে মাতরম্” ধ্বনি হ'তেছে উঠিত ;
লভিয়াছে মৃতজাতি নবীন জীবন
তব সঞ্জীবনী মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত ।
সর্ব স্বার্থত্যাগী কত সন্ন্যাসী-সন্তান
করিয়াছে মহাব্রত আনন্দে গ্রহণ ;
এক আশা এক চিন্তা এক মন্ত্র-ধ্যান,
সবারি হৃদয়ে এক প্রতিজ্ঞা ভীষণ ।
হে দেব হইবে তব বাসনা পূরণ
অপ্ত বঙ্গে আসিয়াছে মহা জাগরণ ।

শ্রীযশোনাথ মজুমদার ।

বুদ্ধঘোষ ।

বুদ্ধঘোষ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের নিকট সুপরিচিত । তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ক নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হওয়ার পরে বুদ্ধঘোষ ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত হইয়াছেন । মহামঙ্গল নামক একজন ব্রহ্মদেশীয় শ্রমণ বুদ্ধঘোষের জীবনী সংগ্রহ করিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন । তাহা গালিভাষায় রচিত, গ্রন্থের নাম বুদ্ধঘোষোপপত্তি (বুদ্ধঘোষোৎপত্তি) । ইয়োরোপীয় পণ্ডিত জেমস্ গ্রে উক্ত গ্রন্থ ও তাহার অন্তর একখানা ইংরেজী অনূবাদ প্রকাশ করিয়াছেন । লণ্ডনস্থ লুজেক কোম্পানি এই গ্রন্থের প্রকাশক ।

প্রাচীন সময়ে যে সমস্ত ধর্ম্মাশ্রম এবং বীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের অনেকের জন্মবৃত্তান্ত অলৌকিক বিবরণে পরিপূর্ণ । ক্রীতকৃৎ, বুদ্ধদেব, রোমনগর-সংস্থাপক রমলাস, যুনানীবীর সেকেন্দর, বীণখুট প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্ত ইহার দৃষ্টান্তস্থল । বুদ্ধঘোষের জন্ম সম্বন্ধেও নানা প্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে ।

যে স্থানে ভগবান্ সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা এক্ষণ বৌদ্ধগয়া নামে পরিচিত । সেই স্থানে এক্ষণ বৌদ্ধগয়ার মন্দির সংস্থাপিত ; এই মন্দিরের নিকটে বোধিফ্রম দণ্ডায়মান ছিল । বোধিফ্রমের নিকটে এক সময়ে এক জনপদ ছিল । আভীরগণের বাসস্থান হেতু, এই জনপদ ঘোষ নামে কথিত হইত । এই জনপদে একজন নরপতি বাস করিতেন । কেশিনী নামে জনৈক ব্রাহ্মণ তাহার গুরু ছিলেন । কেশীর পত্নীর নাম কেশিনী ।

কেশী চ নাম ব্রাহ্মণো রয়ো চ বরতো পিতো
বেদতয়ং শিক্ষা পেতি রাজানঞ্চ দিনে দিনে
তস্বেব কেশিনী নাম ব্রাহ্মণী চ বিশারদী
ব্রাহ্মণস্য পীয়া হোতি গুরুংথব অনালসতি ।

কেশিনীর গর্ভে এক বালক জন্মগ্রহণ করেন । ঘোষ তাহার নামকরণ হইল । চতুর্দশ বৎসর বয়সে ঘোষ বেদশাস্ত্রে পারদর্শীতা লাভ করেন । একদি তাহার পিতা বেদ অধ্যাপনার জন্য রাজার নিকট গমন করেন । ঘোষ একখণ্ড অজচর্ম্মসহ পিতার অনুগমন করেন । বেদ অধ্যাপনাকালে কেশী, বেদে এক দ্রুত স্থানের ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম হইয়া বাটীতে প্রত্যগমন করেন । ঘোষ একখণ্ড তালপত্র তাহার ব্যাখ্যা লিখিয়া রাখেন । কেশী তাহা দেখিয়া

বাটীর একজনকে জিজ্ঞাসা করেন, “কে ইহা লিখিয়াছে ?” সে ব্যক্তি উত্তর করিল, “আপনার পুত্র।”

রাজা এই বৃত্তান্ত অবগত হন। পরিশেষে তিনি ঘোষকে পুত্রের স্থায়ী ভালবাসিতে আরম্ভ করেন।

কালক্রমে ঘোষ একজন বৌদ্ধশ্রমণের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; এবং সম্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রমণ-দলভুক্ত হন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার পিতা কেহীকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। এই সময় হইতে ঘোষ বুদ্ধঘোষ নামে পরিচিত হন।

এই সময়ে সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে বৌদ্ধদিগের তৃতীয় মহাসভা হইয়াছিল; এই মহাসভায় শ্রমণগণ বৌদ্ধধর্মের যে মত প্রচার করেন, সিংহলদ্বীপে সেই মত প্রচলিত আছে। বৌদ্ধশাস্ত্র সিংহলবাসিগণের ভাষার অনূদিত হইয়াছিল, কিন্তু মাগধীভাষায় বৌদ্ধ-মূল গ্রন্থ বিলুপ্ত প্রায় হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বুদ্ধঘোষ সিংহলী ভাষা হইতে পুনঃ তাহা মাগধীভাষায় অমূল্য করায় জন্ম জলপথে সিংহলান্তিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সিংহলদ্বীপে উপনীত হইয়া বিজয়নগর নামক স্থানে পদার্পণ করেন।

অনন্তর একদিন বুদ্ধঘোষ লঙ্কাদ্বীপবাসী সম্রাট মহাথের সম্মতি সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। বুদ্ধঘোষ মহাথের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মহাথের অত্যন্ত শ্রমণদিগকে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেছেন। বুদ্ধঘোষ সেখানে অপেক্ষা করিলেন। মহাথের শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছেন, গ্রন্থের এক প্রকরণ স্থানে মহাথের ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম হইলেন এবং সেই দিবস সমাভ্যস্ত করিলেন। বুদ্ধঘোষ একখণ্ড ফলকে তাহার ব্যাখ্যা লিখিয়া স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরিশেষে মহাথের, বুদ্ধঘোষের লিখিত ফলক দেখিতে পাঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহা কে লিখিয়াছে ?” অমূল্য উত্তর করিল, “বিদেশী শ্রমণ।” অনন্তর মহাথের বুদ্ধঘোষের বাসস্থানে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আহ্বান করেন। বুদ্ধঘোষ মহাথের নিকট পুনরাগমন করেন।

মহাথের জিজ্ঞাসা করিলেন :—“তদং কিং অকুখং নাম তয়া লিখিতং ?”

ইহা কি সত্য যে এই লেখা আপনার ?

বুদ্ধঘোষ কহিলেন :—“হঁ। সম্রাট।”

অনন্তর সম্রাট অত্যন্ত শ্রমণদিগকে ত্রিপিটক শিক্ষা দেওয়ার জন্য বুদ্ধঘোষকে অমূল্য করেন।

বুদ্ধঘোষ কহিলেন :—

“আমি এজন্ত এখানে আগমন করি নাই; সিংহলদেশী বৌদ্ধশাস্ত্র মাগধী ভাষায় অনুবাদ করিয়াও জন্ত আমি অনুষ্ঠান হইতে সিংহলে আসিয়াছি।”

বুদ্ধঘোষ কতিপয় বৎসর সিংহলে বাস করেন এবং কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ উদ্ধার করেন। পরিশেষে তিনি ভারতবর্ষে পুনরাগমন করেন।

বুদ্ধঘোষ বৌদ্ধধর্ম প্রচার জন্ত সুবর্ণভূমি গমন করেন। বর্তমান আরাবাক প্রদেশ এই সময়ে সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল। এই সময়ে ধর্মপাল সুবর্ণভূমির নগরপতি ছিলেন।

বুদ্ধঘোষ নানাগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে ‘সুমঙ্গল বিলাসিনী’ সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ ‘দিশুদ্ধি মাগ’ নামে পরিচিত।

কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, বুদ্ধঘোষ সুবর্ণভূমি হইতে সিংহলদ্বীপে গমন করেন। বুদ্ধঘোষের সময়ে মহানাম অনুবাদপুস্তকের অধীশ্বর ছিলেন। অনুবাদপুস্তক সিংহলের প্রাচীন রাজধানী। মহানাম ভগবান বুদ্ধদেবের নির্মাণ আশ্রিত ৯৪৬ বৎসর পরে সিংহলে রাজত্ব করেন। অতএব বুদ্ধঘোষ শকাব্দার চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন।

শ্রীবেবতীমোহন গুহ।

কাহিনী।

মুর্শিদাবাদ নবাব নাজিমের পাগ-মহলের বহির্দেশে প্রবেশ-দ্বারের অভ্যন্তরে একটি সুবক দণ্ডায়মান। সুবকের মুখর ও চক্ষের ভাব তাঁহার অভ্যন্তরীণ ভাব ব্যক্ত করিতেছে—যেন কাহারও প্রতীক্ষায় তিনি এখানে অপেক্ষা করিতেছেন। এই সময় একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি আসিয়া অল্পে অল্পে তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া দাঁড়াইল। এই ব্যক্তির পরিধানে পাগজানা, পরীয়ে আছকান, মাখায় পাগরি, পাগ নাগরাই জুত, কাণে একটি মোটা রক্তবর্ণের গুলাবি কলম, হাতে একটি কাগজপত্রের গটুনি।

আগন্তক সগম্ভসে জিজ্ঞাসা করিল—“আপনি কাহাকে অনুসন্ধান করিতেছেন?”

যুবক সাগ্রহে বলিলেন—মুন্সী রত্নম খাঁকে—আপনি চিনেন কি ?

আগন্তুক। মীরমুন্সী রত্নম খাঁ ?

যুবক। আজ্ঞে।

আগন্তুক। আমি এই দরবারের তাবেদার—না চিনিব কেন ? মীরমুন্সী রত্নম খাঁকে চিনি, হরপ্রসাদ মুন্সী কারকুনকে চিনি, বন্ধে আলি বক্সীকে চিনি—

যুবক বাধা দিয়া বলিলেন—আমি কেবল মীরমুন্সী রত্নম খাঁর কথাই বলিতেছি।

আগন্তুক বিচলিত হইলেন না। বলিলেন—আর কাহারও কথা বলিলে তাহাও জানি। আজ ৩০ বৎসর এই তাবেদারিতে—

কথা শেষ হইতে না হইতে যুবক তাক্কলোর সহিত সরিয়া দাঁড়াইলেন।

আগন্তুকও ছাড়িবার পাত্র নহেন। যুবকের অমুসরণ করিলেন। বাজে কথা ছাড়িয়া প্রকৃত কথাই আসিলেন। চুপি চুপি বলিলেন—“আপনার প্রয়োজন শুনিতে পারি কি ?”

যুবক। “আপনার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে শুনিতে পারেন বৈ কি ?”

আগন্তুক নিজ উদরে হস্তার্পণ করিয়া অধিকতর বিনীতভাবে বলিলেন—এই ৩০ বৎসর আপনাদের দশ জনের কার্য উদ্ধার করিয়াই বন্দা চলিয়া আসিয়াছি। আপনি অনায়াসে আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন।

যুবক। মীরমুন্সীকে আমার সেলাম জানাইতে পারেন কি ?

আগন্তুক। তা পারিব না কেন ? এ-ত অতি সামান্য বিষয়। কিন্তু আপনি কে—কি অস্ত্র সাক্ষ্যপ্রার্থী—এ সকল বিষয়—

“তাহা আমি লিখিয়া দিতেছি” বলিয়া যুবক কালী-কলসের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিলেন—আগন্তুক তৎক্ষণাৎ কাপ হইতে ওয়াস্তির কলম, হস্তস্থিত পুটল হইতে কাগজ ও কমনে সুগান দোয়াতটী বাহির করিয়া বলিলেন।

যুবক পারশুভাষার লিখিলেন—

“মুন্সে মুগজ ও করিবাড়ী গড় আগরের মুন্সেফ-রাজা বীরসিংহ, বিশেষ কারণে সাক্ষ্যপ্রার্থী।”

এই করটা কথা লিখিয়া বীরসিংহ সেই ক্ষুদ্র কাগজখানা আগন্তুকের হস্তে অর্পণ করিলেন।

আগন্তুক কাগজখানা হস্তে লইয়া মস্তকস্পর্শ করাইয়া চলিয়া গেল।

৫

সুখে অসুখের সিংহাসন লইয়া যখন রাজা রামসিংহের হিন্দু ও মুসলমান ঔরঙ্গাবাদ দর্শার কাজির আদালতে বিচারপ্রার্থী, সেই সময় রাজা রামসিংহের লগ্নোদর কনিষ্ঠভ্রাতা স্বকর্ষ সাধনোদ্দেশ্যে একেবারে দিল্লীতে গমন করেন ও বাদসাহের প্রিয়পাত্র রাজা বশোবন্ত রাও-এর অতুল্য হে দিল্লীখরের নিকট স্বীয় আবেদন নিবেদন করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া স্বকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হন ; পাঠক তাহা বখাসময়ে অগত হইয়াছেন।

দিল্লীর বাদসাহের আম হুকুমও বর্তমান সময় অনেকস্থলে সুবাদারগণ ইচ্ছা করিয়া অগ্রাহ্য করিয়া ফেলেন। বাদসাহ প্রদত্ত সনন্দ লইয়া নবাব-দরবারের জাযা উপঢৌকন ও কাম্বচারিদিগের পেসকমুপ্রদান না করিলে সে সনন্দ আমলে আসে না। বীরসিংহ চারিদিগের এই সকল প্রতিকূল বাধা বিয় দূরীকরণ মানসে দিল্লী দরবারের পরওয়ানা পাইয়া একবারে মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিয়াছেন। মুর্শিদাবাদে আসিয়া নবাব-দরবারে হাজির হইবার অবসর পুঞ্জিতে লাগিলেন। ২৪ দিন বাতায়ত করিয়াছেন ; বিশেষ সুযোগ ঘটয়া উঠে নাই। অদ্য সেই সুযোগ উপস্থিত।

৬

বীরসিংহ আগন্তুকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আগন্তুক আসিয়া অবনত মস্তকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—মীরনুজীর ফরসুৎ কম ; সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না বলিয়া তিনি বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আগন্তুকের কথার বিচ্ছেদ নাই তিনি অবিরল বলিতে লাগিলেন—বাই হউক আমিই তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ করাইয়া আপনার কার্য হাসিল করিয়া দিব। আপাততঃ কি প্রয়োজন তাহা জানিতে পারিলে উপায় অন্তর চেষ্টা করিতে পারিতাম। বীরসিংহ চিন্তিত হইলেন। কোন উত্তর করিলেন না।

আগন্তুক বলিলেন—মহারাজ নিরাশ হইবার কারণ কি ? মীর নুজীর একায়েই কি আপনার কাজ ?

বীরসিংহ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন—“আপনার পরিচয় এক্ষণে জানিতে পারি নাই। আপনি— ?

আগন্তুক গমগম ৭৩ বলিলেন—মহারাজ এ তাবোদারের নিকট উপস্থিত।

উকীল । নবাব দরবারে ৩০ বৎসর যাবত এই কার্যে গতর খাটাইতেছি । রাজসরকারের বহু কাজ এ গরিবের হাতে হইয়াছে । ভরসা আছে, মহারাজের সময়ও এ দৌনের প্রতি অনুগ্রহ বর্জাল থাকিবে । মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় নাই । বেরাদবি ক্ষমা করিবেন । মহারাজের অনুমতি হউক ।

বীরসিংহ । সম্প্রতি আমার কার্য অতি গুরুতর ।

কৃপারাম । কার্য যাঁহা হয় আমি করিব । মহারাজ, অর্থের নিকট কিছুই গুরুতর না ।

বীরসিংহ । কার্যসিদ্ধি হইলে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিব ।

কৃপারাম । কি করিতে হইবে মহারাজ, আদেশ করুন । আপমার কার্যে দেওয়ানখানার রেজা খাঁর নিকট পর্যন্ত যাইতে হইলে তাহাও যাইব ।

বীরসিংহ । তবে চলুন যথাস্থানে বসিয়া প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিব ।

বীরসিংহ কৃপারাম উকীলকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশবার উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া অনতিদূরে একখানা ক্ষুদ্রগৃহে প্রবেশ করিলেন । তখন বেলা অল্পমান আড়াই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে ।

অল্পমান অর্দ্ধদণ্ড পর কৃপারাম একখণ্ড কাগজসহ দ্রুত গদে দেওয়ানখানার দিকে চলিয়া গেলেন । বীরসিংহ ও পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন ।

৭

সরলপ্রকৃতি বৃদ্ধ গোপীকান্ত মহাশয় ক্রোধের সহিত বলিলেন—শেষে কি যবনের গুরু হইতে হইবে ? না, তাহা কদাপি হইবে না । ত্রিসফা-গারজী কখনই বুঝা যাইবে না । এই আমি শুভগমে কুমার রণসিংহের মন্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি । কুলগুরু প্রদত্ত আশীর্বাদ অক্ষর হউক । অক্ষর হউক, অক্ষর—

রণসিংহ অবনত মস্তকে আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন ।

এই সময় বহির্দেশ হইতে “মহারাজ কি জয়” শব্দ শ্রুত হইল ।

রাজসরকারের পত্রবাহক রামকান্ত তেওয়ারি মুকুন্দবাজ হইতে চিঠি লইয়া আসিয়াছে । সংবাদ শুভ । গোপীকান্ত মুন্সী দেওয়ানজী চিঠি খুলিয়া পাঠ করিলেন—

শ্রীশ্রীচরণাধিপতি—

কৌশলে কাণী স্থানিকাহ করা গিয়াছে । শ্রীবৃদ্ধ বীরসিংহ বাহাদুর ইচ্ছা মধ্যে দিল্লী দরবার হইতে যে পরওয়ানা লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা কৌশলে

হস্তগত করিয়া কেদান গিয়াছে। তিনিই লাক্ষ্য উদ্যম বিকল হইলেন।
অদ্য তারিখে আবল্যাসিকো কেবল পরওয়ানা সহিমোহরী পাঠান গেলহ।
বিত্তারিত পর পর নিবেদন হইবে ইতি। মোতালকে মক্কাবাজ কাছির
দেউর :

সেবকাধম সেবক—

শ্রীকুপারাম দেও উকীল ।

গোপীনাথ মহাশয় সহর্ষে বলিলেন—ভগবান অরুণ আছেন। দেখলে
দেওয়ানজী ! এই মাত্র কুণদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের গৃহে জাগ্রত মন্ত্র উচ্চারণ
করিয়া আশীর্বাদটী লইয়া বহির্গত হইয়াছি। গুরুর আদেশে অদ্যই শুভলগ্নে
রাজ্যমধ্যে পরওয়ানা জারি হউক।

গুরুর আদেশ কার্যে পরিণত হইল। পরওয়ানা এইরূপ—

১৪নং পরওয়ানা ।

মোহর

মুৎসুদ্দয়ান, কাননগোয়ান, চৌধুরান, কসোরিয়ান, জমিদারান,
(বর্তমান ও ভবিষ্যত) পং নসরৎসাহি ওরফে মুগল সরকার বাজুতার ও পং
হুসেনপ্রতাপ সরকার সিলেট জায়গীর নবাব সমসমউদ্দৌলা সুবেদার বাংলা
ভোমরা সকলে অবগত হও যে মুসল্লের জমিদার রামসিংহ ওরফে আবদুল
রহিম তাহার ৭০০ মনসবদারী ও ৩০ সওয়ার ইস্তাক্কা করিয়াছে তাহার পুত্র রণ
সিংহকে উক্ত পদে স্থলবর্তী করা হইয়াছে। উক্ত মুৎসুদ্দয়ান সত্যুতি সকলে
তাহার নিকট সরকারী সমস্ত কার্য সতর্কতার সহিত নির্বাহ করিবা এবং উক্ত
জমিদারের কার্যের সহায়তা করিবা এবং সরকারী সমস্ত কার্য ভালরকম
নির্বাহ করিবা। ১১৪৩ হিজরী ৬ মহের রমজান।

শ্রীকেশরনাথ মক্কাবাজ ।

সতীদাহ ।

বৈদেশিক লেখকগণ ভারতীয় আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ, ধর্মবিধিমাণ প্রভৃতি সামাজিক-ব্যবহার পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ না হইয়াও দেশীয় প্রত্যেক সামাজিক অঙ্গুষ্ঠান বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়াছেন এবং দেশীয় সমাজ-নীতি ও ধর্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তৎসমুদয়ের ভীত ভ্রান্ত-সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন । ইংরেজগণ তৎসমুদয় পাঠ করিয়াই ভারতবাসী সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা দ্বারা পোষণ করিয়া থাকেন । বর্তমান প্রবন্ধে সতীদাহ সম্বন্ধে বৈদেশিকগণের ভ্রান্ত মত লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব ।

সতীদাহ সম্বন্ধে বেদে একটা মাত্র শ্রুতি আছে,—

ইমাঃ নারীর বিধবাঃ সুপত্নীরাঙ্গনেন সর্পিষা সংভূষন্তাঃ

অনশ্রুকে অনমোরা আরোহন্তুজনয়ো যোনি অগ্নে ॥ ১০।১৮।৭

“এই সকল নারী বৈধবা হুঃখ অহুভব না করিয়া, মনোমত্ত পতিলাভ করিয়া

• • গৃহে প্রবেশ করুন । এই সকল বধু অশ্রুপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া • • • সর্বাগ্রে গৃহ আগমন করুন অথবা অগ্নিতে আরোহণ করুন ।” উক্ত শ্রুতির শেষ শব্দ কেহ “অগ্নে”, কেহ “অগ্রে” পাঠ করিয়া লন । প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে ‘থ’ ও ‘গ্র’ প্রায় একই আকারেই লিখিত হইত ; প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির পৃষ্ঠা উদঘাটন করিলেই পাঠকগণ এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন । বেদের কোনও শ্রুতিতেই বধন সম্বন্ধে হইবার কথা নাই, তখন আমাদের মতে উহা “অগ্রে” ধরাই সমস্ত বলিয়া বোধ হয় । বেদের সুবিখ্যাত ভাষ্যকার শ্রীমদ্ মাধনাচার্য্যও “অগ্রে” পাঠ গ্রহণ করিয়া কুম্বীরগের চিত্রানলে স্বাক্ষর হইবার প্রথা প্রদর্শন করিয়াছেন । বৈদেশিক পণ্ডিতগণ এই পাঠ-বৈধম্য উপলক্ষ করিয়া এদেশীয়গণকে যে, জঘন্য কট্টকটিক্য করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই বিধেব-প্রসূত ।

“European research has clearly proved that the text in the Vedas adduced to authorize the immolation of widows was a wilful mistranslation.” Ency. Britannica Vol. 12-

বৈদেশিকগণের এই উক্তি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, দেশীয় পণ্ডিতগণ যে বেদের wilful mistranslation করিয়া সতীদাহ প্রথার বৈদিক প্রমাণ সৃষ্টি করেন নাই, তাহা সন্দেহে প্রদর্শন করিয়াছেন ।

বাহা হউক এ সম্বন্ধে আমরা অধিক বাস্তবিত্তা করিতে ইচ্ছা করি না । সতীদাহ প্রথা বৈদিককালে প্রচলিত না থাকিলেও পৌরাণিককাল হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজ রাজত্বের কতক সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল ; তৎবিষয়ে অমুমান সন্দেহ নাই । পতিব্রতগণের মৃত পতির অলঙ্কার চিতার আত্মাহুতি যে অতি পুণ্যকর ও গৌরবজনক তাহার উদাহরণ অশ্বেষণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র ।

অনেকে অমুমান করেন যে, বৈদিককালে সতীদাহ-প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও তৎপূর্ববর্তী কোনও সময়ে তাহা প্রচলিত ছিল ; বৈদিক সময়ে উহার বিলোপ সাধন হইয়াছিল, কেবল স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট ছিল । পরে পৌরাণিক কালে উহা পুনর্জীবিত হয় । এইরূপ অমুমানের প্রধান কারণ, বেদে আছে,—

“হে নারি (মৃতের বিধবা) ! সংসারের লিকে ফিরিয়া চল ; গাজোত্থান কর ; তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে মৃত হইয়াছে, চলিয়া এস । যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভধারণ করাইয়াছিলেন, সেই মৃতের পত্নী হইয়া বাহা কিছু কর্তব্য ছিল, সকলই তোমার করা হইয়াছে ।” ১০।১৮।৮

“মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে যক্ষুণ্ণ করিলাম । * * * হে মৃত ! তুমি এই স্থানে থাক । আমরা অনেক বীরপুরুষ সহিত একত্র হইয়া যাবুদীর আত্মদ্বিকারী শত্রুকে যেন হত করিতে পারি ।” * ১০।১৮।৯

এতদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, বিধবানারীকে অশ্রুশানভূমি হইতে গ্রহ প্রত্যাবর্তন করিতে বলা হইতেছে । যদি ইহার পূর্ব হইতে সতীদাহ প্রচলিত না থাকিলে তবে, বিধবা মৃতস্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিতে যাইবে কেন ? এবং তখনই তাহাকে উঠিয়া আসিতে বলা হইতেছে কেন ? এই সকল কারণে অমুমান হয় যে, পারগীকগণের কুকুরাচার শব্দ দেখানোর জ্বার ইহা কেবল মাত্র প্রাচীনপ্রথা রক্ষা ।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে তৎকালীন প্রধান রাজ-প্রতিনিধি সার উইলিয়াম বেণ্টিং মহোদয়কর্তৃক ভারতে সতীদাহ প্রথা নিবারিত হয় । বৈদেশিক-গণের গ্রহণার্থে অবগত হওয়া যায় যে, নোগল-কেশরী সম্রাট আকবর একবার আইনদ্বারা এই প্রথা রহিত করেন । তাহার পরলোক গমনের পর পুনরায় তাহা উজ্জীবিত হয় । ইংরেজশাসনকর্তৃগণ প্রথম প্রথম ভারতবাসীর সামাজিক আচার

* গ্রীষ্মক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে অমুবাদগুলি উদ্ধৃত হইল ।

ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই, তাই ব্রিটিশরাজ্য ভারতে স্থাপতি হইলে উক্ত প্রথা অপসারিত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কেবল বঙ্গদেশে সাত শতেরও অধিক বিধবা পতির অগস্ত চিতায় মহানিদ্রাভিভূত হন। *

হালিডে সাহেব বঙ্গদেশের একটি সতীদাহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই ঘটনাটি সি, ই, বক্সাও সাহেব তাঁহার প্রণীত *Bengal under the Lieutenant Governors* নামক পুস্তকের প্রথমভাগের ১৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'আরতি'র পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত উক্ত ঘটনাটি বখাষথ অম্ববাদ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

"১৮২২ খৃষ্টাব্দে আইনদ্বারা সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়। এই সময় এং তৎপূর্বেও আমি হুগলী জেলার মাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য্য করিতেছিলাম। এই নূতন আইন আমলে আসিবার পূর্বে একদা আমি সংবাদ পাইলাম যে, আমার কুঠির অনতিদূরে একটা সতী পতির চিতায় আরোহণ করিতেছে। হুগলী জেলার এইরূপ ঘটনা প্রায়ই সংঘটিত হইত, কারণ গঙ্গাতীর এই কার্য্য্য প্রশস্ত ও পুণ্যকর স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সতীদাহের সংবাদ বখন আমি পাইলাম, তখন সিভিলসার্জন ডাঃ ওয়াইজ্ এং গবর্ণর জেনারেলের চাপ্লেন এক পাদরী (নামটা আমার মনে নাই) আমার সহিত যাত্রা করিয়া ঘটনাটী অবলোকন করায় ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে আমরা ঘটনাস্থানে উপনীত হইয়া দেখি যে, বহুসংখ্যক দেশীয় ব্যক্তি তথায় সম্মিলিত হইয়াছে, চিতা সজ্জিত হইতেছে এং উহার সম্মুখে ভূমিতে সতী বসিয়া আছেন। আমাদের উপবেশনের নিমিত্ত চেয়ার আনীত হইলে আমরা রমণীর নিকট বসিলাম। আমার সঙ্গীষয় দেশীয়ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন না; তাহার সতীকে চিতাসজ্জা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে যুক্তি-তর্কযারা যে সকল কথা বলিতে লাগিলেন, আমি তাহার অম্ববাদ করিয়া রমণীকে শুনাইতে লাগিলাম। রমণী গম্ভীরভাবে একাগ্র চিত্তে কথাগুলি শ্রবণ করিলেন কিন্তু একটুকুও

* The Emperor Akbar is said to have prohibited it by law, but the early English rulers did not dare so far to violate the traditions of religious toleration. In the year 1817 no less than 700 widows are said to have burned alive in the Bengal Province alone. To this day the most holy spots of Hindu pilgrimage are thickly dotted with little white pillars, each commemorating a Suttie."

বিতলিত হইলেন না ; পুরোহিত এবং অস্ত্রান্ত দর্শকগণও তাহা শ্রবণ করিল।

“অবশেষে তিনি কিছু অস্থিরতা প্রকাশ করিয়া চিতারোহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাইবে না ভাবিয়া আমি অনুমতি প্রদান করিলাম কিন্তু তিনি উঠিবার পূর্বেই পুরোহিত আসিয়া তাঁহাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আমার অলুপ্রাধ করিল ;—“কি বস্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে তাহা কি তিনি বুঝিয়াছেন ?” আমার পায়ের নিকট ভূমিতে রমণী বসিয়াছিলেন, এই কথা শ্রবণ করতঃ স্থণাবাক্তক ভাবে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—“একটা বাতি অধায়ন করুন।” কুবকদিগের ব্যবহৃত ঝিঙ্কের স্থায় একটা প্রদীপ, একটু স্বত এবং তুলার একটা শলিতা আনীত হইলে, রমণী নিজেরই প্রদীপটী সাজাইয়া আশীত বলিলেন। অবিলম্বেই প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল তাহার সম্মুখে মাজিতে রাখা হইল। রমণী গভীর অবজ্ঞা ভরে আমার প্রতি একবার তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া দক্ষিণ হস্তের কনুই মাজিতে স্থাপন করতঃ প্রদীপের অসমস্ত শিখায় অঙ্গুলি ধরিলেন। অঙ্গুলিটি পুড়িয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যা হইল এবং অবশেষে প্রজ্জ্বলিত বাত্মি শিখায় পেনের কলম ধরিলে সেরূপ হয় সেইরূপ বাকাইয়া গেল। অনেকক্ষণে এইরূপ হইল, কিন্তু ইহার মধ্যে তিনি হস্ত একটু নড়ান নাই, একটু শব্দ করেন নাই কিম্বা তাঁহার চেহারার কোন পরিবর্তন হইয়াছিল না। তৎপর তিনি বলিলেন,—“আপনি সম্ভটে হইয়াছেন ?” আমি ভাড়াভাড়ি বলিগাম—“খুব সম্ভটে হইয়াছি।” এই কথা শ্রবণ করতঃ তিনি ধীরভাবে অস্থি শণা হইতে অঙ্গুলী সড়াইয়া বলিল,—“তবে এখন আমি যাইতে পারি ?” ইহাতে আমি সম্মতি জ্ঞাপন করিলে রমণী চিঠার ঢালুদিকে অগ্রসর হইলেন। চিঠাটি জলের ধারে সজ্জিত হইয়াছিল, উহা দৈর্ঘ্যে ও উচ্চে সাড়ে চারি ফিট এবং প্রস্থ প্রায় তিন ফিট, তাহাতে শুকবান ও কাষ্ঠাদি থাকে সজ্জিত ছিল। তারপর কোলাহলের মধ্যে তিনি দুই কি তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। চিঠার আরোহণ করিয়া নিম্না যাইবার অলুক্রমে পাশ ফিরিয়া শয়ান হইয়া হাতের উপর নিজের মুখ রাখিলেন। তাহার উপর কতক ইচ্ছা পূরু করিয়া শুক তৃণ কাষ্ঠাদি এই ভাবে সজ্জিত হইল যে, তিনি ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে উঠিয়া বহিতে পারেন। দাহকারিগণ তৎপর তাহাকে বংশদণ্ড দ্বারা বাধিতে বাহিতে ছিল কিন্তু আমি তাহাতে আপত্তি করিলে তাহারা অনিচ্ছা স্বরূপে কোনরূপ রাগের ভাব না দেখাইয়া নিরস্ত হইল। তৎপর সতীর প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক পুত্র চিতা প্রজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্ত আহূত হইল।

“স্বামীর মৃত্যু সময়ে পত্নী নিকটে থাকিলে এই ভাবে কাৰ্য্য হয়। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুদেশে পরলোক গমন করিলে এবং তথা হইতে শব আনয়নের সুবিধা না হইলে তাহার পরিষেয় বস্ত্রের ক্রয়বংশ আগা হইত। এবং বিধবা সেই বস্ত্র খণ্ডের পার্শ্বে চিত্রায় শয়ন করিত। চিত্রা কাঠে প্রাথমতঃ অনেক পরিমাণে চূর্ণাধূপধূনা এবং আগার মনে হয় খানিকটা ঘি নিক্ষিপ্ত হইত। ইহাতে প্রথম খুব ধূনা হইয়া পরে দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিত। ধূন রাশি কর্তৃক বিতাড়িত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি চিত্রার অতি সন্নিকট দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমি তাহা হইতে কোন শব্দ শ্রবণ করি নাই বা অঙ্গ সঞ্চালন করিতে দেখি মাই। কেবল শুষ্কতৃণাদি একবার ধীরে ধীরে দেহের উপর উড়িয়া পড়িয়া সব নিতরু হইল। পূজাটি যে চিত্রা জালাইয়া দিয়াছিল, চিত্রা জনা পর্য্যন্ত উহার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার পর তীরে উঠিয়া শোকোন্মত্ত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। এমনতে হুগলী জেলার সম্ভ্রাতঃ সনপ্র বঙ্গদেশের জায় সম্ভ্রতরূপে অমুষ্ঠিত সর্ব্ব শেখ সতীকাহ্ন প্রথা নির্ব্বাহিত হইল।” *

বিগত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অনেকগুলি পাশ্চাত্য পর্য্যটক ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে টাভার্নিয়ার, বাণিয়ার, থিভেনট, কার্ডন এবং কারে—এই পাঁচজন ফরাসী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে টাভার্নিয়ে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে উপনীত হন, তখন দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট শাজাহান সমাসীন। টাভার্নিয়ে ব্যাসায় বাণিজ্য করিতেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই স্বদেশ এবং অত্যন্ত স্থান হইতে পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বিক্রয়ার্থ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ছয়বার প্রাচ্য ভূমিপথে পদার্পণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ডচ্ কোম্পানীর অধীন সৈনিকের কাৰ্য্য গ্রহণ করতঃ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

* এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া স্থানিভে সাহেব লিখিয়াছেন,—“The prohibition of this horrible custom which had been a subject of grave apprehension to which the government, until the time of Lord William Bentick, had always feared to apply itself was effected without the smallest opposition or difficulty. At first applications for leave to perform it were not unfrequent but being in every case sternly forbidden were at once abandoned, the Brahmins merely remarking that if the widow was not permitted to burn she would infallibly be struck dead. This never occurred in my district or any where else so far as I know.”

বাটাভিরাতে টাভারর্ণির সহোদর মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহাকে সমাধিস্থ করিতে ১২২৩ লাইভরি মুদ্রা (ফ্রান্সীশেণ এচলিত মুদ্রা বিশেষ) ব্যয়িত হয় ।

টাভারর্ণির বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইয়াও দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি বিশেষভাবে প্রকাশ করেন নাই, তবে তৎসম্বন্ধীয় তাঁহার অধিকাংশ বিবরণই অসম্ভব । তৎসমুদয়ের আলোচনার স্থান ইহা নহে । আমরা কেবল সতীরাহ সম্বন্ধেই তাঁহার অভিমত লিপিবদ্ধ করিব ।

টাভারর্ণির বলেন ;—ভারতবাসিগণের একটি চির-পুণ্যতন পদ্ধতি এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না । সুতরাং স্বামীর মৃত্যু হইলে, পত্নী অত্যন্ত কান্নাকাটি করে ; কয়েকদিন পর তাহার কেশ মুণ্ডিত হয়, গাজ হইতে অলঙ্কারাদি খুলিয়া ফেলে ; বিবাহের সময় স্বামী চিরকালের নিমিত্ত শ্মশনিত ও বশস্তু করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহার হস্তে ও পদে যে সকল অলঙ্কার পরাইয়া দিয়াছিল তাহাও সে উন্মোচন করে ! এবং পরে যে গৃহে একদা সে সর্বসম কৰ্ত্তা ছিল, সে গৃহেই ক্রীতদাসী অপেক্ষাও হীন আহার্য আশ্রয় অশিষ্টাংশকাল অতিবাহিত করে । এক্ষণে অসহায় অসহায় দক্ষণ তাহাদের জীবনের প্রতি ঘৃণা জন্মায় এবং অগতের ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র হইয়া থাকায় চেয়ে মৃত পতির সহিত ভস্মীভূত হইবার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করিত । এতদ্ভাতিত ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে বুঝাইত যে, এইভাবে মৃত্যু আলিঙ্গন করিলে পায়গতে তাহারা উভয়ে পুনরায় মিলিত হইবে এবং অধিকতর সুখ সৌভাগ্যের সহিত জীবনান্তিবাচিত করিতে পারিবে । এই আশাতেই রমণীগণ পতির সহিত সমুগ্ধ হইত । ভক্তির পুরোহিতগণ চাই-বাক্যে তাহাদিগকে মোহিত করিত এবং বুঝাইত যে, যখন চিত্তার ধূনরাশি মন্থে তাহারা থাকিলে অর্থাৎ চিত্তার দাব-দাহে মৃত্যু সংঘটিত হইবার পূর্বে ভগবান স্বামিতন্ত্র তাহাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া এক অলৌকিক স্বপ্নাক্ষেপের উদ্ঘাটিত করেন ; পরে তাহাদের আত্মা নানা দেহে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে স্বর্গরাজ্যে মহা গৌরবান্বিত উপাধি প্রাপ্ত হয় ।

যাহা হউক কোনও রমণীই স্থানীয় শাসনকর্তার অহুমতি ব্যতীত সহমৃত্যু হইতে পারিত না এবং শাসনকর্তাগণ মূল্যমান শত্রু, উক্ত আত্মবাতীশ্রম প্রতি অবজ্ঞার চক্ষে অবলোকন করিতেন, কাজেই অহুমতি প্রদান করিবার সময় তাহারা অতিশয় ইতস্ততঃ করিতেন । অপতাহীনা বিধবারা সহমৃত্যু হইবার ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, জোর করিয়া তাহাদিগকে এই কার্যে প্রবৃত্ত করান

হইত। কিন্তু পূজাবতী হইলে ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিত, ছোট পূজকতাদিগের শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত সতী জীবনায়না করিতে আদিষ্ট হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা যে সকল রমণীকে সহমৃগা হইবার অনুমতি না দিতেন, তাহারা গাজীবন প্রারম্ভিত ও দান-ধ্যান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যে ব্যস্ত করিত। কেহ কেহ পৰিপার্শ্বে বসিয়া খাদ্য শস্তাদি জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই উত্তেজক পানীয় পথিককে পানার্থ প্রদান করিত, কেহ কেহ তাহাক গাজিবার নিমিত্ত অগ্নি সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিত। অপর কেহ বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত যে, গোময়ের মধ্যে গোটা যে শস্ত পাওয়া যাইবে তাহা ছাড়া আর কিছু আহার করিবে না।

নানা প্রলোভনেও রমণীকে সংকল্পহীন করিতে না পারিলে এবং অৰ্ধ-প্রাপ্তর (যুব!) কথা সহকারী নিকট অবগত হইলে, শাসনকর্তা ঘৃণার ভাব দেখাইয়া অনুমতি প্রদান করিতেন। এই সময় রমণীর আত্মীয় ও জ্ঞাতিবর্গ বাধ্যভাও বাজাইতে আরম্ভ করে এবং মৃতব্যক্তির ভবনে বাইরা মৃতের সম্মুখে নানা প্রকার বাদ্য ও বাঁশী বাজাইয়া অতি সমারোহের সহিত মৃতব্যক্তিকে বহুইয়া সংস্কার করিতে ব্যস্ত করে। যে রমণী সহমৃগা হইবে তাহার বন্ধুগণ ও জ্ঞাতিবর্গ আসিয়া, পরজগতে যে যে সুখ ভোগ করিবে তজ্জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। তাহার এই মহৎ সংকল্পের জন্ত তাহার সমগ্র জাতি সম্মানিত হয় এবং বিবাহ করিতে যাইবার সময় যেরূপভাবে বেশ-ভূষার সজ্জিত হইয়া থাকে, তদনুরূপভাবে সজ্জিত হইয়া আড়ম্বরের সহিত বধ-ভূমিতে নীত হয়। এই মিছিলের বাদ্যভাণ্ডের উচ্চ রোলের সহিত হতভাগ্যা রমণীর সম্মানের নিমিত্ত অপরাপর রমণীবৃন্দ সংগীত গাহিতে গাহিতে তাহার অনুসরণ করে। যে সকল ব্রাহ্মণ মৃত পতির অনুসরণকারিণী রমণীর সঙ্গে থাকে, তাহারা তাহার নিকট হইতে তাহার সংকল্পের দৃঢ়তার ও তেজস্বিতার প্রকাশ প্রমাণ আদায় করেন। অনেকানেক পাশ্চাত্য মহোদয়ের অভিমত এই যে, মৃতের ভয়ঙ্করী বিভীষিকা বন্ধারা মানব-হৃদয় ভয়ে আড়ষ্ট হয়, তাহা হইতে নিম্নুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে পুরোহিতগণ সহগামিনীকে মানকদ্রব্য খাওয়াইয়া তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত করে, কাজেই মৃত্যুর নামে যে একটা বিভীষিকা আছে তাহাতে তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। কেবল এই ব্রাহ্মণগণের স্বার্থে নিমিত্তই অসহায় রমণীগণ মৃত্যু-প্রাণে পতিত হয়; কারণ বালা, অমৃত, ইত্যাদি প্রভৃতি যে সমস্ত অসংসার সহগামিনীর সঙ্গে থাকে তাহা ব্রাহ্মণগণই পাইয়া থাকে। চিতানল নিকাশিত হইলে ভস্মভূণের বধ্য হইতে ব্রাহ্মণগণ তাহা উঠাইয়া লয়।

টাতারগিরে বলেন,—দেশীয় রীতুমুতাবে আমি তিন রকমে রমণীগণকে দহ হইতে দেখিয়াছি। গুজ্জারামো, আগ্রার এবং দিল্লীতে নদী বা গুফরিণীর তীরে আর ১২ বর্গকুট ব্যাপী একখানি কুটার নির্মিত হয়। উহা ছোট ছোট আগাছা ও কাঠবারা নির্মিত, উহার সহিত তৈল এবং অপর কতিপয় ঔষধীয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দিলে অগ্নি প্রবলবেগে প্রজ্জ্বলিত হয়। উক্ত কুটার অভ্যন্তরে সতী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকে, বাগিশের দ্বার একরকম কাঠে তাহার মস্তক রক্ষিত হয়। পাছে অগ্নির তাপে শিকার পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণগণ একটা স্তম্ভ সহিত তাহার পৃষ্ঠদেশ বন্ধন করে। এই অবস্থায় তাহা চর্কন করিতে করিতে সে তাহার মৃত স্বামীর দেহ কোড়ে করিয়া রাখে। এইভাবে অর্দ্ধবটী অতিবাহিত হইলে ব্রাহ্মণগণ কুটার হইতে বাহির হয় এবং সতী কুটারে অগ্নিসংযোগ করিতে অহুমতি করে। ব্রাহ্মণ এবং সতীর আত্মীয়স্বজন অবিলম্বে তদনুসারে কার্য করে এবং শীঘ্র শীঘ্র তাহার সমস্ত যন্ত্রণা উপশম করিবার অভিপ্রায়ে তৈলপূর্ণ পাত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে থাকে। সতীদাহ হইলে ব্রাহ্মণগণ ভস্ম হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন প্রভৃতি যে কোনও ধাতু থাকে সংগ্রহ করে; এই সকল দ্রব্য তাহা হোমই একমাত্র দাবী পাওয়া।

বঙ্গদেশে আর এক ভাবে সতী দাহ হয়। এই প্রদেশে দরিদ্রা রমণীগণ দাহের পূর্বে মৃত স্বামীর দেহ গঙ্গার ধৌত করিবার জন্য আনিতে পারে না এবং নিজেও গঙ্গাস্নান করিতে পারে না। টাতারনিরে বলেন যে, কুড়ি দিনের দুর্বলতা প্রদেশ হইতেও আবারে করিয়া শব গঙ্গাতীরে আনিতে দেখিয়াছেন; শবের দুর্গন্ধ বিনাশের নিমিত্ত নানা প্রক্রিয়া করিলেও তাহা হইতে অসহনীয় দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। একবার ভুটানের প্রাক্ত স্ত্রী গিরিপুত্র হইতে এক রমণী গাড়ীতে করিয়া স্বামীর মৃত দেহ গঙ্গাতীরে আনিয়াছিল। সে কুড়ি দিন টাটয়া পথ অভিক্রম করে এবং ১৫। ১৬ দিন পানাহার কিছুই করে নাই। পরে গঙ্গায় স্বামীর গলিত দেহ দৌত করতঃ নিজেও স্নানগ্ৰহণ করিয়া বহুস্ত্রী হয়। সতীর সম্মুখ ঢাক, ঢোল, বাঁশী প্রভৃতি নানা রকম বায়্যযন্ত্র ধ্বনি হইতে থাকে এবং তিনি নানাক্রমে উৎকট বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মৃত্যু করিতে করিতে চিত্রায় উঠিয়া শয়ন করে, পরে তাহার উপর স্বামীর শব রক্ষিত হয়। ইহার পর তাহার আত্মীয়গণের কেহ-বা একখানি পুত্র, কেহ-বা একখানি কালিকট বস্ত্র, কেহ-বা একখানি রৌপ্য বা তাম্রখণ্ড সতী হস্তে দিয়া, তাহা তাহাদের মাতা, ভ্রাতা বা অপর কোনও আত্মীয়কে দিবার দ্রব্য আদেশ

আদেশ করিতে অতাকে অস্বপ্নে দেখে । এইভাবে আদেশ করিয়া উপস্থিত
জনা সমূহ দাতাকে প্রার্থিত হইলে, সতী উপস্থিত জনসংখ্যাকে আর
কিছু করিতে হইবে কি না, তিনবার জিজ্ঞাসা করেন । কেহ কোন উত্তর
না করিলে তাকাতা বজ্র দ্বারা স্বামীর দেহ জড়াইয়া ধরিয়া অগ্নি সংযোগ
করিতে সতী আদেশ করেন । ভ্রাক্ষণ ও রমণীর আত্মীয়গণ তৎক্ষণেই সে আদেশ
প্রতিপালন করেন । টাটানিয়ে বলেন, বজ্রদেশে কাঠের অভাব প্রযুক্ত এই সকল
কর্তব্য দম্পতীর দেহ অর্দ্ধদগ্ন হইতেই টানিয়া গজার শীতল মলিলে নিঃশেষ
হয়, তথায় হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুর উদরে ভাঙ্গ স্থান প্রাপ্ত হয় ।

শ্রীব্রজসুন্দর সামান ।

ছবি-মঙ্গল-চণ্ডী ।

অদ্য ‘অরতির’ পাঠকবর্গের নিকট দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রণীত শীর্ষোক্ত নাগেশ্বর
একখানি প্রাচীন পুঁথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি পুঁথিখানি আকারে
নিতান্ত ক্ষুদ্র । কেবলমাত্র ২৩ পৃষ্ঠা ; অর্থাৎ মোট পদসংখ্যা ৩০২ ।
প্রাচীন ভুলোট কাগজের ছুইপৃষ্ঠে লেখা । লেখাশক্তি অতি সুন্দর ;—গোট
গোট অক্ষর । লেখকের নাম নাই ; কিন্তু তিনি একজন প্রকৃত মুন্সী ছিলেন ।

গ্রন্থকর্তা নিজের কোন সবিস্তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন নাই । স্থানে
স্থানে ‘দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র কয়’, ‘দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র ভণে’ ইত্যাদি রচকের ভণিতা দ্বি-
ভদ্রীর পরিচয়-জ্ঞাপক অথচ কোন কথা গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না ; অতরাং তিনি সম্পূর্ণ
অপরিচিতই থাকিয়া বাইতেছেন । পুঁথিখানি আমরা ত্রিপুরাঞ্চল হইতে সংগ্রহ
করিয়াছি । এই আমরা অঙ্গমান করি, গ্রন্থকর্তাও উক্ত অঞ্চলবাসী ছিলেন ।

পুঁথির রচনা কবে হইয়াছিল, নিশ্চিত বলার উপায় নাই । প্রতিশ্লিষ্ট
খানি সন ১২৩৩ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রস্তুত হইয়াছিল ; অতরাং
উহার বয়স এখন ৭৯ বৎসর হইয়াছে । কাগজের অবস্থা কিন্তু এরূপ হইয়াছে
যে, ইহাকে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় । ভাষাশোধনা করিলে
পুঁথিখানি অনেক প্রাচীন বলিয়াই মনে হয় ।

ইহা একখানি চণ্ডী-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক গ্রন্থ । কনিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
প্রভৃতি বৃহৎ কাব্যকারগণ যীশ্বরীয় গ্রন্থে বাহা অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া
গিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহাই অতি সংক্ষেপে ও সূক্ষ্মশৈলীতে পরিবর্তিত হইয়াছে ।

চণ্ডী-উপাখ্যানের সহিত বঙ্গীয় পাঠক মাজেই সুপরিচিত বলিয়া আমরা ভৎসন্যে এখানে আর বেশী কিছু বলিতে আবৃত্তি হইলাম না ।

কাব্যের মত হইলেও ইহা ঠিক কাব্য নহে,—একরূপ ত্রুতকথা বিশেষ। সংক্ষেপতঃ ইহাকে চণ্ডী উপাখ্যানের একখানি Rough Sketch মাত্র বলা যাইতে পারে। চণ্ডীকাব্যের প্রাক্-চেষ্টা-ক্ষুরণকালেই যে ইহা বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই জন্তই আমরা ইহাকে অতি প্রাচীন বলিয়া অনুমান করি। এই উপাখ্যান সর্বদো কাহার করিত, তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই ; সুতরাং এই পুথির অবলম্বন কি তাহা বলা সহজ নহে। এতৎসাধনকল্পে আগে চণ্ডী-উপাখ্যানের সমস্ত পুথির সংগ্রহ ও প্রকাশ আবশ্যক। হয়ত কথক ইত্যাদির মুখেও এরূপ আখ্যায়িকা যুগ-যুগান্তরে চলিয়া আসিতেছিল এবং তাহার অবলম্বনেই আঞ্চলিক বঙ্গীয় কবিগণ নিজ নিজ কাব্যে গাঁথিয়া গিয়াছেন। একই উপাখ্যান সকল কবির অবলম্বন হওয়ার উপাখ্যানগুলি নৃনন্দ-বর্জিত ও অস্থিচর্মসার হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে এরূপ উপাখ্যানে কোন আকর্ষণীয় শক্তি ছিল বলিয়াই অধুনা ধারণা হয় না।

কবিকল্পের চণ্ডী-উপাখ্যানের সঙ্গে মূলতঃ মিল থাকিলেও রচনা সম্বন্ধে তাহার সহিত ইহার কোনও ঐক্য নাই। ইহার ভাষা সর্বত্রই সহজ, অনাড়ম্বর ও সংক্ষিপ্ত। ইহাতে চৌত্রিশটিরে ত্রুবানীর একটি দীর্ঘ স্তব আছে। তাহা এরূপ ক্ষুদ্রাঙ্গতন গ্রন্থের পক্ষে একটু অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়াছে, বলিতে হইবে। বাহা হউক, এরূপ ক্ষুদ্র পুথি সম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া নিয়ে আমরা পুথি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহা হইতেই পাঠকগণ ইহার কবিত্বাদি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে পারিবেন।

গ্রন্থকর্তা সর্বপ্রথমে যথারীতি গণপতি প্রভৃতি দেবগণও মূনি-ঋষিবর্গের চরণে প্রণাম জানাইয়া এইরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন :—

“পঠমঙ্কুরি রাগ ।

তুম সর্বজন, কহি বিবরণ,
পৃথিবীতে স্থানধানি ।

উজানি নগর, জানে সর্বনর,
ইন্দের অমরা জিনি ॥

বিক্রমকেশরী, তাথে দণ্ডশারী,
প্রজা গবে পূজা করে ।

সেইত নগর, মহা ধনেশ্বর,
 ধনপতি বাগ করে ॥
 ভাহার অঙ্গনা, লহনা খুলনা,
 গুণে শীলে আছে ভাল।
 কামদেব রতি, দৌহার মুরতি,
 রূপেতে করিছে আল ॥
 উখে ধনপতি, রাজ অমুরতি,
 পালিতে গোড়োতে গেল ॥
 গাড়াইতে পুঞ্জর, গেল সদাগর,
 বৎসরেক তথা হৈল।
 ছুই নারী এখা, শোন তার কথা,
 লহনা কপট করে ॥
 মাধু নামে মাত্র, লিখি এক পত্র,
 দিলেক খুলনা ভরে।
 পত্র পাইয়া ধনৌ, পড়িল অমনি,
 লিখিয়াছে ধনপতি ॥
 ক্রোধ হৈয়া অতি, লিখিয়াছে পত্রি,
 শোনলো খুলনা সতি।
 তোর ব্যবহার, হইল আচার,
 বনে চল স্বীয়গতি ॥
 বত অঙ্গণ, করিতে রক্ষণ,
 নিযুক্ত করিল পতি ॥

ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঐপতি সদাগর রাজাজ্ঞার, মশানে নীত হইয়া ভবানীকে স্তব করিতেছেন :-

ধর ধর কাঁপে প্রাণ দেখিয়া শবন।
 ছির হৈতে নাহি পারি কি হবে এখন ॥
 স্বাবর অঙ্গম আদি তোমার সৃজন।
 খাবা দিরা প্রাণে রাখ দাগীর নন্দন ॥
 জগতিনাশিনী জুগী ভৈরবী বগল।
 বদভুজা শকাবরী চণ্ডিকা দিগল ॥

দয়া করি দরাসরী হওত সদয় ।
 দূর কর মহানীলা শমনের ভয় ॥
 ধরণী ধরিতা তুমি কৃষ্ণরূপ হৈয়া ।
 ধারা করিব কর আকাশেতে বৈয়া ॥
 ধান কর মুন হোমা না পাত্র দেখিতে ॥
 ধরিত্র চরণ তব রাপ নশানেতে ॥
 নমো নারায়ণ ভীমা অম্বিকা অভয়া ।
 নরশির মালাগলে, বিশ্বরূপ কায়া ॥
 নগেন্দ্র-নন্দিনী কালী সাবিত্রী মর্দানী ।
 নিদানে রাগহ যোরে পতিতপাবনী ॥
 পুরাণে প্রদান করে সীমা দিতে নারে ।
 পদনঃখ বিরাজিত রবি শশধরে ॥
 পরমা প্রকৃতি তুমি জিহ্মধারিণী ।
 পার কর কারাগার বিশ্ব-বিনাশিনী ॥
 কাঁকর হৈলু মাতা দেখিয়া শমন ।
 ফিরিয়া না চাও বুঝি কোধ করি মন ॥
 ফেলিছ সাগরে তুমি কে করিকে পার ।
 ফুৎকারে মারিয়া সৈন্ত করহ উদ্ধার ॥
 বলরে ছলিলা তুমি বামন হৈয়া
 ব্রহ্মাঙ্গনা ভুলাইলা কীশী বাজাইয়া ॥
 বাণীবধ কৈলা তুমি রাগরূপ ধরি ।
 বাণক তরাতে কেন করহ চাতুরী ॥
 ভাৱাক্রান্ত পৃথিবীতে হইল যখন ।
 ভীমারূপে কৈলা তুমি অস্তুর নিধন ॥
 ভুবনমোহিনী হৈয়া অমৃত হরিলা ।
 ভবাবধ মাঝে কেন তরী ডুবাইলা ॥ ইত্যাদি ।

নানারূপ রেশভোগের পরে ধনপতি সদাগর প্রভূতি সকলে চণ্ডীকার প্রাঙ্গণাব-
 লিপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় রচয়িতা গ্রন্থের নাম “হরিব-সঙ্গল-চণ্ডী”
 দিয়াছেন । “নববিকাশে” সমগ্র পুথিখানি প্রকাশিত হইতেছে ।

শ্রীআবদুল করিম ও শ্রীমোগেন্দ্রনাথ ঙগ ।

বহু-বিবাহ ।

আমার প্রবন্ধের নাম পড়িয়াই অনেকে ভয়ভীতি পাতা উল্টাইবেন । এতদিন পর আমার বহু-বিবাহ সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি কেন ? বহু বিবাহরূপ বিষয়ক সমস্যা এবং শিক্ষার প্রভাবে সমাজ হইতে প্রায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে ; কালে একবারে উঠিয়া দাঁড়াইবে, সে বিষয় আর বাক্যবাগে প্রয়োজন কি ? বহু বিবাহ যে একটি গুরুতর কুপ্রথা এমন সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই ; সুতরাং নূতন করিয়া কিছু বলিবার আবশ্যকতাও নাই ।

বহু-বিবাহ কুপ্রথা হইলেও সমাজে স্থান পাইয়াছিল । সুতরাং মানব-সমাজের ইতিহাস হইতে বহু বিবাহরূপ পরিচ্ছেদটি পরিত্যাগ করা যায় না । কুপ্রথা হইক আর সুপ্রথা হইক যাঁহা সমাজে একদিন স্থান পাইয়াছিল তাঁহা সমাজতত্ত্বের হিসাবে উপেক্ষণীয় নহে ।

বহু বিবাহ কিরূপে মানবসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছিল ; কোন্ কোন্ জাতির ভিতর বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং কখন হইতে মানবসমাজে উহার আস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এই সকল তথ্য বিবাহের ইতিহাসে মিতান্ত্র অকিঞ্চিৎকর বিষয় নহে ।

ডিওডোরাস্ সিকিউলাস্ (Diodorus Siculus) বলেন, প্রাচীন ইজিপ্টের ধর্মধাজকগণ ব্যতীত আর সকলেই বহু সংখ্যক ইচ্ছা পত্নী গ্রহণ করিত । ইহা ভিন্ন যুদ্ধে ধৃত শত্রু-রমণীগণও উপপত্নীরূপে রক্ষিত হইত । অধ্যাপক রলিন্সন্ (Rawlinson) বলেন, এসিয়ার নৃপতিগণও উপপত্নী রাখিতেন । মিডিয়া এবং পারস্তদেশে বহু বিবাহ প্রথা বর্তমান ছিল । খৃষ্টাব্দের সময় বহু বিবাহ ছিল এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় । মজুও অবস্থা বিশেষে বহু-বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন ।

হোমারের (Homer) সময় গ্রীসের লোকেরা উপপত্নী রাখিত । উহাদের এক পরিবার ভুক্ত হইয়া বাস করিবার অধিকার ছিল ; এবং প্রায় বিবাহিত পত্নীর জ্ঞান সম্মান পাইত । কিন্তু প্রায়াম (Priam) ছাড়া প্রকৃত বহু-বিবাহ কেহই করে নাই । (Grote's History of Greece) কিন্তু পরবর্তী সময়ে গ্রীসে বহু বিবাহ স্থান পাইয়াছিল । প্রাচীন রোমে এক পত্নীক বিবাহেরই অধিক প্রচলন ছিল । তৎকালিক লোকেরা পত্নী অপেক্ষা উপপত্নীকে মূণ্ডার চক্ষে দেখিত । ক্রিয়া এবং ক্রোডিনেভিয়াতে বহু-বিবাহের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে ।

আধুনিক অনেক খৃষ্টান জাতির মধ্যেও বহু বিবাহ স্থান পাইয়াছিল। ত্রিশ বৎসরের সংগ্রাম (Thirty years war) অবসানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার নামে জার্মানদেশে বহু-বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। সেন্ট অগষ্টাইন স্পষ্টই বলিয়াছেন, তিনি বহু-বিবাহকে দোষাবহ মনে করেন না। মার্টিন লুথার Philip the Magnanimous-কে বিশেষ রাজনৈতিক কারণে দুই বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে অনেক অসভ্যজাতি আছে জাহাদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত নাই। এমন কি কোন কালেই ছিল না। বহু-বিবাহকে ঐ সকল অশিক্ষিত জাতি নিত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইক্ষিপ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং অনেক দ্বীপপুঞ্জের অসভ্য অধিবাসীরা বহু বিবাহ করে না। কেনারীদ্বীপ এবং এঞ্জলার অধিকাংশ জাতিই একনিষ্ট বিবাহ করিয়া থাকে। পশ্চিম সাহারার 'মুর' জাতিদিগের মধ্যে কেহই একসময়ে দুই পত্নী গ্রহণ করে না। কালিকর্ণিয়ার কিংকলা ও জুরক জাতি একাধিক পত্নী গ্রহণ করাকে নিন্দনীয় মনে করিয়া থাকে। 'কারোক' নামক অসভ্য জাতিরা তাহাদের দলপতিদিগকে পর্য্যন্ত বহু-বিবাহ করিতে দেয় না। প্রত্যেকেই দাসীরাপে যতসংখ্যক ইচ্ছা রমণী রাখিতে পারে কিন্তু তাহাদিগের সহিত সহবাস করিলে ঘোরতর নিন্দা হইয়া থাকে। সিংহলের 'বেদা' জাতি কখনও বহু-বিবাহ করে না। এক দ্বীপ জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় দার গ্রহণ করিতে কেহই আগ্রহ প্রকাশ করে না। আন্ডামানের অধিবাসীদিগের মধ্যে দ্বী. পুরুষ কেহই বহু বিবাহ করে না। তাহাদের সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথাও (Divorce) স্থান পায় নাই। নিকোবর দ্বীপের উত্তরাংশে যে সকল অসভ্যজাতি বাস করে তাহারা সকলেই এক-পত্নীক-বিবাহের পক্ষপাতী এবং উহাদের সমাজে অসতী দ্বীলোকের বড়ই ছর্ণাম। কুচ এবং আদিম কুকুদিগের মধ্যে কেহই বহু বিবাহ করে না এবং উপপত্নীও রাখে না। 'কোল' জাতির মধ্যে বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে তথাপি কেহ বহু-পত্নী গ্রহণ করে না।

নৌলগিরির বেদাগা এবং আসামের নাগাজাতিদের মধ্যে একপত্নীক বিবাহ প্রচলিত। সাওতাল এবং ব্রহ্মদেশ, মালয় এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ অসভ্যজাতিরা একাধিক পত্নীর পাণি পীড়ন করে না। আবার যাহারা ভ্রষ্টাচারী এবং পরজীর সহিত শারীরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি বিধার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ব্যাভিচারিণী সমাজের ভিতর স্থান পায় না।

ডেলেগার (Dalager) বলেন—আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা বহু-বিবাহ করিত না । তাহাদের ভিতর শতকরা ৫ জন লোক একাধিক পত্নী গ্রহণ করিত কি না সন্দেহ ।

গ্রীণলণ্ডে এবং উত্তর আমেরিকার স্থানে স্থানে বহু-বিবাহ প্রচলিত আছে । কিন্তু ঐ সকল দেশে প্রথমা পত্নীই গৃহস্থামিনীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সম্মান লাভ করিয়া থাকেন । দ্বিতীয়া পত্নী স্বামীর ইন্দ্ৰিয়স্বপ্নেচ্ছার পরিতৃপ্ত সাধন করিয়া সমধিক আদরের অপিকারিণী হন ।

নিকারাগুইতে (Nicaragua) যে ব্যক্তি এক সময়ে একাধিক পত্নীর পাণি-লীড়ন করে সে তথাকার আইনানুসারে নির্দাসিত হয় এবং তাহার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে গৃহীত হইয়া থাকে । বহু-বিবাহের জন্য কিরূপ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা !

মেক্সিকো দেশে যে ব্যক্তি বহুপত্নী গ্রহণ করে তাহার সম্পত্তি প্রথমা পত্নী এবং তদীয়া পুত্রকন্ডাগণ প্রাপ্ত হয় । উক্ত সম্পত্তিতে তৎপরবর্ত্তী স্ত্রী কিম্বা সন্তানগণের কোন অধিকার থাকে না । পশ্চিম ভিক্টোরিয়া, সেমেও, টিহিটী প্রদেশের অধিবাসিগণ বহুপত্নীক ; কিন্তু তাহাঙ্গিগের মধ্যেও প্রথম বিবাহিতা পত্নীর সম্মান অধিক এবং সর্ববিধ সাংসারিক কার্যে তাহার অধিকার । পরবর্ত্তী পত্নীগণ উপপত্নী স্বরূপ গৃহে বিরাজ করিয়া স্বামীর চিন্তাবিনোদন করিয়া থাকে ।

ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মার এবং মাওতাল পরগণায় প্রথম পরিণীতা পত্নীই পতিবুলে সর্ববিধ ক্ষমতার অপিকারিণী হইয়া থাকে । চীন দেশীয় লোকেরা এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে পারে না ; কিন্তু উপপত্নী গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই । উপপত্নী সর্বদাই বিবাহিত পত্নীকে সম্মান করিয়া থাকে ; তাহার অহুমতি ব্যতীত কোন কার্য করিবার অধিকার নাই । চীনদেশে—A wife cannot be degraded to the position of concubine, nor a concubine be raised to the position of a wife etc.—(Westermarck)

নিগ্রোজাতিরাও প্রথমা পত্নীর হাতে গৃহস্থালীর সকল ভার অর্পণ করিয়া থাকে । দামারা, বসেটো এবং জুলু জাতিদিগের মধ্যে কেহ বহু-বিবাহ করিলে প্রথমা পত্নীকে গৃহকর্ত্তা করিয়া রাখে ।

বহু পত্নীক বিবাহ অপেক্ষা বহু পত্ন্যাত্মক বিবাহপ্রথা বিরল । লেংসফোর্ড (Langsford) বলিয়াছেন, পূর্বে ‘এলিউসিয়ান’ দ্বীপে এক স্ত্রী দুই স্বামী

গ্রহণ করিত। এক্ষুটমগ জাতিদের মধ্যে ছুইজন পুরুষ একটা রমণীকে বিবাহ করিতে দেখা যায়। লুকাহিনাতে বন্য পরিবারের মহিলারা ছুইজন করিয়া পতি রাখিয়া থাকে। একজনের অভাবে কি কিছা অল্পপস্থিতে অল্পপাতি পক্ষীর মনোরঞ্জন করিয়া স্বীয় কর্তব্য পালন করে।

কেনারি দ্বীপের রমণীরা তদোদিক সংখ্যক স্বামী গোষণ করিয়া থাকে। ভাষায় প্রভেদে বিবাহিতা স্ত্রীর তিনটি করিয়া স্বামী। হোটেন্টট্‌স্‌ রমণীরাও একাবিক পতিকে বিবাহ করে বলিয়া শুনা যায়। মাডাকান্‌কার দ্বীপে হোভান্‌ (Hovans) নামক এক জাতি আছে। তাহাদের পুরুষেরা বছরদিনের জন্ত জুরদেশে গমন করিলে স্বীয় পত্নীকে পরপুরুষের সহিত সহবাস করিতে অজ্ঞমতি দিয়া যায়। বিরহ-বিধুরা পত্নীর জন্ত ঈর্ষা ধারণা অতিশয় বিচিত্র।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সিংহলের গবর্নর Sir Henry Ward জীলোকের বহুস্বামী গ্রহণপ্রথা উচ্চাঁইয়া দেন। এই নিষেধ আজ্ঞা প্রচারের পূর্বে সিংহলী রমণীরা ছুইটা ছুইতে সাতটা পুরুষকে পরিণয়ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিতে দেখা গিয়াছে। বোদা জাতি ছাড়া এখনও মধ্যে মধ্যে অল্প অশিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে এইরূপ বহু পত্নীস্বক বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই প্রেণীর বিবাহের স্বামী প্রায়ই এক পরিবারের লোক, অধিকাংশ স্থলেই সহোদর।

টোডা জাতির সাকগ সহোদর মিলিয়া এক পত্নী গ্রহণ করে। এই বিবাহিতা স্ত্রীর যদি ছোট বোন থাকে, সেও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্বামীকে পতিত্ব বরণ করে। Dr. Shortt বলেন—Owing, however, to the great scarcity of women in this tribe, it more frequently happens that a single woman is wife to several husbands sometimes as many as six.

টোডা জাতিদিগের মধ্যে জীলোকের সংখ্যা খুব কম বলিয়াই বহুসংখ্যক পুরুষ একটা রমণীকে বিবাহ করিয়া সংসারবাত্মা নির্বাহ করিয়া থাকে।

মহীশূরের 'কুগ' জাতি, মালবারের 'নেয়ার', ভুটিয়া, শাসিয়া এবং মাওরাব-দিগের মধ্যে বহুপুরুষ মিলিয়া একটা যুবতীকে বিবাহ করিতে দেখা যায়। তিব্বতেও জীলোকের বহু নষ্ট-উদ্বাহ প্রচলিত। ডাক্তার শর্ট (Dr. Shortt) আর এক অদ্ভুত রকমের বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রেডিলিগেবু (Reddies) পূর্ণবয়স সম্পন্ন রমণী সাত আট বৎসরের বাৎসর্যের সহিত পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ঐ বিবাহিতা যুবতী স্ত্রী স্বীয় স্বামীর পিতৃব্য কিম্বা পিতার সহিত সহবাস করিয়া থাকে। এই সহবাসজাত সন্তান উক্ত স্ত্রীর স্বামীর ঔরস

আত্মবলিগা গণ্য হয়। যখন স্বামী যৌবনে পদার্পণ করে তখন পত্নীর বার্ষিক্যকাল সমুপস্থিত হয় সুতরাং তাহাকেও অগরের জীর অভিভাবকের পদাধিবেশ ভিন্ন গণ্য করা থাকে না।

আত্ম প্রাচীন কালে পৃথিবীর অনেক অসুভাষিতার ভিতরই বহুপত্যাক নিবাহ প্রচলিত ছিল। স্বদেশে উহার উল্লেখ আছে। মহাত্মারতকার দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিল লিখিয়াছেন। স্ট্রাবো (Strabo) বলিয়াছেন, প্রাচীন মেডিয়া (Media) এবং আরবদেশে রমণীর বহুনিষ্ট নিবাহ অসুচিৎ হইত। পিক্স (Picks) রমণীরা বহুস্বামীকে নিবাহ করিত। আদিম ব্রিটনদিগের কথা সিজার (Caesar) বলিয়াছেন—১০। ১২ জন সহোদর তাই-এ স্ত্রীদিগকে এক রমণীকে নিবাহ করিত। অনেক সময় পিতা পুত্র এক নারীর পাণি পীড়ন করিতেও ক্রটি করিত না।*

কেন্দিমিভিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যেও রমণীরা বহুস্বামী গ্রহণ করিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ অনেক দেবদেবীর আখ্যায়িকার এই শ্রেণীর নিবাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও বহু পত্যাক নিবাহ অনেক জাতির মধ্যে স্থান পাইয়াছিল এবং এখনও কোন কোন স্থানে বর্তমান আছে তথাপি এই শ্রেণীর নিবাহ অধিক পিস্তৃত হইতে পারে নাই।

ঐতিহাসিকনাথ মজুমদার।

সুভাষিতাবলী ।

১। মেপোলিয়ন বলিতে, স্থির-প্রতিজ্ঞাট প্রকৃত জ্ঞান। শিক্ষা কর—কার্য্যকর—বদ্ধ কর—ইত্যাদি বাক্য মন্দাদি বীজার মূগ হইতে নিঃসৃত হইত।

২। বিদ্যা, যৌবনের অসংকর, বুদ্ধবাল্যের আশ্রয় এবং দরিদ্রের সাহায্য ; বিদ্যা সন্তোষের প্রদায়ক।

৩। যদি তোমার অসামারণ বুদ্ধি থাকে, তবে পরিশ্রম উহাকে সর্বদা-সুসংরক্ষণ করিবে ; আর যদি তোমার বুদ্ধি অল্পত থাকে, তবে পরিশ্রম, তা অল্পত হই করিবে।

* "By tens and twelves husbands possessed their wives in common and especially brother with brothers and parents with children."

- ৪। অলস ব্যক্তির জীবন—আকাশের ধূম ও সমুদ্রের ফেন-মালায় ভ্রায় ।
 ৫। প্রকৃত-সাধু, শারীরিক-বল-প্রসূত নহে; উহা ধর্ম-প্রসূত ।
 ৬। সেফিয়ার বসিয়াছেন—নিম্নলি অস্ত্র-করণ অপেক্ষা দৃঢ়কবচ আর নাই ।

৭। চোর ব্যক্তি, সকল স্থানেই পুলিশ কর্মচারী দিদানান আছে এইরূপ আশঙ্কা করে । দোষী-ব্যক্তি নিজের পাণের ভারে চূর্ণ হইয়া যায় । দোষী-ব্যক্তি অল্প কর্তৃক অধুষ্ট না তত্লেও ভয়ে পলায়ন করে ।

৮। বাক্সের মধ্যে জিনিস রাখা দ্বারা সুশৃঙ্খলা-জ্ঞান প্রকাশ পায় ।
 নির্দোষ ব্যক্তি একটা বাক্সের মধ্যে যত দ্রব্য রাখিতে পারে, নিপুণ ব্যক্তি তাহার দ্বিগুণ দ্রব্য রাখিতে পারে ।

৯। চঞ্চলতা কার্য-বিনাশক ও ছন্দ-চিত্ততার পরিচায়ক । চঞ্চলচিত্ত-ব্যক্তি গিজরাবন্ধ কাষ্ঠ-বিড়ালের ভায় অনবরত ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিফল পরিশ্রম করে ; সে সতত গমন করে, কিন্তু বিন্দুমান অগ্রসর হইতে পারে না ।
 চঞ্চল-ব্যক্তি অনেক পদার্থই দেখে, কিন্তু কিছুই পর্যবেক্ষণ করে না । সে বাক্সটু হয় বটে, কিন্তু তাহার বাক্যে সারাংশ থাকে না ।

১০। কর্তব্য কর্ম সম্পাদন না করিলে গভীর বিশ্রামস্থল অসুভব করিতে পারা যায় না ।

১১। যে ব্যক্তি আপন চিন্তা সকল শৃঙ্খলবদ্ধ করিতে পারে না, তাহাকে অনেক বুথ কথ্য বলিতে হয় । পজাবলীবারা আচ্ছাদিত ফলের ভায় তাহার উদ্দেশ্য বাগাড়ম্বরে আবৃত থাকে ।

১২। কুসংসর্গ সংক্রামক রোগের ভায় । কুসংসর্গ, পাণের প্রতি যুগা-ক্রাস করে, মনকে নীচপথে লটয়া যায় ।

১৩। মন সহস্র-সম্পন্ন না হইলে মন-সম্পত্তি এক প্রকার অপরিভ্রম্য বস্তুত্ব লাভ করে ।

১৪। যিনি আপনাকে জয় করিতে পারেন তিনি দিগ্বিজয়ী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ।

১৫। ধর্ম অতিক্রম করিয়া মন-ভ্রম প্রবলা হইয়া উঠিলে, সমুদায় উৎকৃষ্ট বস্তুই প্রতাহীনা হয়, নীচাশ্রয়তা ও নিষ্করণতা অমুদেই উপস্থিত হয়, দয়া নাকিয়া, বদাশ্রয়তা ও উপচিকীর্ষা প্রায় প্ররোচিত হয় ।

১৬। যদি তোমরা অবশ্যবাদিনী বিপত্তি পরাম্পরায় অব্যাহত থাকিতে

এবং ভবিষ্যতে স্বামী হইতে চাও, তবে ধীরতা ও দৃঢ়তা দ্বারা স্বীয় স্বীয় আত্মাকে সুসংযুক্ত কর।

১৭। শিশুর হৃদয়, বীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র ; ইহাতে যে প্রকার বীজ বপন করিবে, আজীবন তাহারই ফলভোগ চাইবে।

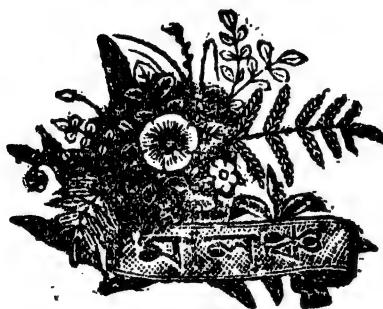
১৮। মিথ্যচার, অপ্রমাদ ও ইন্দ্রিয়-দমন, জীবন-যাত্রা নির্বাহের প্রধান উপাদান-সামগ্রী।

১৯। সত্যনিষ্ঠ পুরুষের যাবতীয় কার্যে সন্দেহ সঙ্গতি থাকে। তাঁহার আচার ব্যবহার পূর্ণাঙ্গর সুসংবাদী হয়, সুতরাং তিনি সর্বদা সমাদৃত হইয়া থাকেন। তাদৃশ পুরুষ দৈবাৎ অশরাদ্ধ হইলেও লোকে যেচ্ছা-পূর্বক তাহাকে ফমা করে।

২০। অস্ত্রে গোমাদিগের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিলে সন্তুষ্ট হও, অপরের সহিত গোমাদিগের সেই প্রকার ব্যবহার করা কর্তব্য—এই সর্বজনীন পবিত্র উপদেশ চিত্ত-ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখ।

২১। বাগাড়ম্বর করিতে গেলে বিস্তর মিছা কথা বাহির হইয়া পড়ে। কবিবর তারতচন্দ্র বলিয়াছেন—“যে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।”

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী।



মানবের প্রেম।

যে বাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে,
বিধাতার প্রেম-রাজ্যে এইত বিধান !

নদী ধার সিদ্ধ-পাশে, সিদ্ধবাণে ভূঙ্গপাশে
প্রেমভরে-হৃদি স্নেহে প্রিয়তার বয়ান।

শত উর্ক দিবাকর, তবুও ত নিরন্তর
সদা গুজে সরোজিনী তাজি লাজ ভর ।
কেহ ত বারেক তার, মিথ্যে না করে হার,
কুণ-বালা-মুখচুমে সন্তত মলয় ।
থেনডোরে বাঁধা বিশ্ব, জগৎ প্রেমের শিষ্য,
মানব-হৃদয় মুখ্য প্রেম-নিকেতন,
কিন্তু সেই নানবের এক আত্ম-টর ফের,
তার পৃষ্ঠ প্রেম থাকে সঙ্কট গোপন ।
হৃদিনাকে প্রেম ফুটে, জ্বলয়েই পড়ে লুটে,
নাহি নানবের হেথা প্রেমের মিলন ।
উধু নানবের তরে আছে হেথা থরে থরে,
দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুধারা, সমাজ দলন
প্রেমে হেন অপমান, সহ্যে কি প্রেমিক প্রাণ
আছে কি পাষণ চাপা তাদের ভিন্নায় ।
নানবের তরে কেন, কঠোর নিয়ম হেন,
কেন তাহাদের প্রেম পূর্বত বাধ্যয় ।
শ্রীমতী নগেন্দ্রাবালা সরস্বতী !

লিলি ।

হার্জিলিঙ্গে তেরিলাম কি স্নানর লিলি
একসঙ্গে শোভে বেন সুরবালা গুলি,
ছোট ছোট দলগুলি ভুবঃর মত
সমীরণ সঞ্চালনে ছলিছে নিয়ত,
নিরখিয়া, পরশিয়া প্রিয় লিলিফুল,
আনন্দ আবেগে মন হইল আকুল,
পুনঃ পুনঃ লইলাম ফুলের সুবাস
মনের সাগিজ সন হইল বিনাশ ।

শ্রীঅম্বজানন্দনী দাস গুপ্তা ।

ছোট ভ্রাতার প্রতি আশীর্বাদ ।

মনে রেখো ভাই ! তুমি ভারত-সন্তান ;
রক্ত-প্রসবিনী মাতা, স্নেহলা স্নেহলা মাতা
গাও আঁত গাও 'বন্দে মাতরম্' গান ।

মনে রেখো ভাই ! তুমি ভারত-সন্তান ;
জননীর বাহা আছে, তা কেলে পরের কাছে,
কখনো সেও না তার থাকিতে পরাণ ।

মনে রেখো ভাই ! তুমি মায়ের সন্তান ;
পূজিবে চরণ মার, নিবারিবে সাধ্য কার
জননীর কাজে কর সবস্ব দান ।

মনে রেখো ভাই ! তুমি ভারত-সন্তান ;
বড়ই দুঃখিনী মাতা, বুকভরা কত ব্যথা
পর পদাঘাতে তার চূর্ণ মনপ্রাণ ।

প্রাণাধিক ভাই ! তুমি মায়ের সন্তান ;
জগনীর দুঃখ হরি', মুচাও নয়ন-বারি,
কার সাধ্য মার ভব করে অপমান ।

কর মৃত বঙ্গে মাতৃ-পূজা-আয়োজন ;
দুট্ট ঐক্য-ছত্র দিয়া, বেঁধে লও কোটি হিরা
উঠক আনন্দধ্বনি বিদারি গগন ।

এতদিন করিয়াছ মার অপমান,
পড়ি মার পদতলে, অহুতাপ-অশ্রুজলে
পাপমুক্ত হও আজি মায়ের সন্তান ।

অশীর্বাদ করি হও স্বদেশ-প্রেমিক
 তুচ্ছ এই দেহ-প্রাণ, মার তরে করো দান
 গাও 'বন্দে মাতরম্' ওরে প্রাণাধিক ।
 শ্রীমতী স্মৃতিবালা গেন ।

অতিথিসংকার ।

স্রামল ধরিজী ক্রোড়ে পুত জগোবন,
 ফল ফুলে সুশোভিত কুসুম কানন ;
 ফুলে ফুলে অলি সেথা ছুটিয়া বেড়ায়,
 সহকার পাখী ঈশগীতি গায় ;
 পুষ্পে গাত্রে স্বর্গশোভা রয়েছে ফুটিয়া,
 লতিকা ঘুমায়ে আছে বৃক্ষ আলিঙ্গিয়া ।
 কুরঙ্গ কুরঙ্গী সেথা আপনার মনে,
 রঙ্গ ভঞ্জে ক্রীড়া করে তপালা মনে ।
 সোণার সাঁঝেতে স্নিগ্ধ মারুত-কম্পনে,
 ব'য়ে যায় স্রোতস্বিনী কুলু কুলু স্বনে,
 কুটীর পেষ্টিয়া শোভে শ্রাম তরুকুল—
 মলয়ে আকুলি উঠে মঞ্জরি মুকুল ।
 ব্রতশীলা অচঞ্চলা ঋষিবালাগণ,
 আলবালে সিন্ধে নীর করিয়া যতন ;
 কক্ষেতে কলসী বহি সুন্দর শোভন,
 সলিলে তিতিয়া বক্ষ বঞ্চল ভূষণ ।
 বিস্তৃত নীবারে সেথা ভরিয়া প্রাঙ্গণ,
 পরি প্রান্ত মৃগকুল করে রোমন্থন ;
 প্রভাতে প্রদোষে শুভ গানবেদ-গান,
 আলোড়িত করে নিত্য সুপ্ত সমীরণ ;
 মালিনীর পূতনীয়ে মরাল মরালী
 মনসাথে প্রেম-মদে করে সেথা কেলি ।

আহরে সমিধ পুষ্প পবিত্র তাপস
 অবগাহি মালিনীতে ভাবেতে বিবশ !
 কল্পপ পালিতা মেধা মেনকা-কুমারী—
 পিতা-মাতা, জন্মকথা অবাধে পাশরি,
 প্রিয়ম্বদা অননুয়া সহচরী মনে,
 শুচিস্নিতা ক্রীড়ারতা পুণ্য তপোবনে !
 নিষ্কান্ত মহর্ষি বনে তীর্থ পর্যাটনে,
 স্নানীতল স্নানাল রমা তপোবনে,
 অমিল নবীন এক অতিথি স্নানর,
 কন্দর্প বিজিত রূপ অতি মনোহর !
 রমা ভালে রাজটীকা শোভিছে কেমন,
 পৌরব-প্রকৃতি-নাথ সৌন্দর্য-দর্শন !
 চাহিয়া অতিথিপানে মুগ্ধা শকুন্তলা,
 শিহরি উঠিল বালা—আবেশ বিহবলা !
 অমুরাগ প্রকাশিল বিমুগ্ধ নয়ন,
 ভূবিল অতিথে বালা, সমর্পি' জীবন ।

শ্রীকিশোরীমোহন সুখোপাধ্যায় ।

সমালোচনা ।

চণ্ডীদাস চরিত—

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল বিরচিত ; মূল্য ১ টাকা ।

বহু দিবস যাবত ব্রজসুন্দর বাবু বঙ্গসাহিত্যের লুপ্তরত্নোদ্ধার কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন । ইহার ভিতর তিনি কয়েকজন প্রাচীন কবির অপ্রকাশিত পদাবলী মুদ্রিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন । ব্রজসুন্দর বাবুর প্রয়াস সর্বথা প্রশংসনীয় ।

চণ্ডীদাস চরিত ব্রজসুন্দর বাবুর আরক কার্যের রূপ । চণ্ডীদাসের স্থললিত ভাবপূর্ণ পদাবলী পাঠ করিয়া মুগ্ধ না হইয়াছেন এমন লোক বঙ্গদেশে বিরল । চণ্ডীদাসের জীবনী কবিতা, প্রেম এবং ভক্তির পবিত্র ত্রিভাণী । এক্ষণে কৌতুক

পূর্ণ চন্দ্র-কথা পাঠ করা সকলেরই কর্তব্য। ব্রজমন্দের বাবু ভক্ত-কবি চণ্ডীদাসের পুণ্যকাহিনী লিখিয়া ধন্ত হইরাছেন।

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যিক মনে করিতেছি। ব্রজমন্দের বাবু তাঁহার গ্রন্থের আরম্ভেই বৌদ্ধধর্মের লোপ এবং হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“যে ভারতবর্ষে বুদ্ধের জন্ম, সেই ধর্মক্ষেত্রে ভারতভূমিতে আজ আমরা করুণ বৌদ্ধধর্মাবগম্যকে দেখিতে পাই? পূর্ণচন্দ্র উক্তাসিত গগনপটে কি খদ্যোতের জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়?” আমরা, হিন্দু ব্রজমন্দের বাবুর মুখে এইরূপ অহুদার অতিমত শুনিরা হুঃখিত হইরাছি। কোন্ ধর্ম বড় কোন্ ধর্ম ছোট এই বিষয় লইয়া অত্যন্ত প্রকাশ করা মিতান্ত্রই গর্হিত কাজ। একবার মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন্ ধর্ম বড়। রামকৃষ্ণ তাঁহার স্বাভাবিক সরল কণায় উত্তর দিয়াছিলেন—জলকে পাণি বল, ওয়াটার বল, আর আবুই বল, স্বাদ একট। উদার ভক্ত-কবি চণ্ডীদাসের জীবনচরিতে এরূপ সংকীর্ণ ভাব স্থান পাইয়াছে দেখিয়া বড়ই হুঃখিত হইরাছি।

নব্য জাপান—

ঐউনাকাত্ত গাকুরী শ্রেণীত। কলিকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

এই পুস্তিকাখনিতে জাপানের ভৌগোলিক বিবরণ ভট্টে আরম্ভ করিয়া, রাজ্যশাসন, শিক্ষা ও ক্রমবৃদ্ধ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইরাছে। তথা প্রাক্কলভাবার আধুনিক জাপানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পাঠ্য। বিষয়—সরস্বত ও ভাষা বিভাগে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব আছে। জাপানের সহিত হিন্দু নাম ও তাবের সামঞ্জস্য বিচার কোতুল্লপ্রদ মনেহ নাই।

সারস্বত ময়মনসিংহ পঞ্জিকা—

১৩১৩ সন। ঐ.গোবিন্দগাই সাতা শঙ্করনিধি কর্তৃক ঢাকা হইতে প্রকাশিত। আমরা বঙ্গদ্রোণে দেখাছি তাহাতে তথা প্রায়দ্ধ গুপ্তপ্রোগ পঞ্জিকা হইতে কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। প্রতিদিন মাহেন্দ্রযোগ এবং মাসের শেষে চন্দ্রের স্থিতি নক্ষত্রে সংক্রমণের বিবরণ এই পঞ্জিকার বিশেষত্ব দেখিলাম। বঙ্গদেশের প্রচলিত বচনগুলির মধ্যে—“মহাতেজা মহানন্দী সর্বদা দহতে সদা।”

ইচ্ছাণাং গণনাঞ্চ নিশ্চয়ং সর্বং জন্মু।” ইত্যাদি অল্প সংস্কৃত যৌলিকতার চিহ্ন কি না বাল্যে পারি না।

আব্রতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ।

ষষ্ঠ বর্ষ । { ময়মনসিংহ, বৈশাখ ১৩১৩ । { চতুর্থ সংখ্যা ।

নবজীবন । *

বাপ্প এবং তাড়িতশক্তির সমবায়ে ইউরোপের আজ যে অবস্থা, তাহার সহিত এসিয়ার অনাবিল জীবনের তুলনা করিতে যাইয়া লজ্জিত হইবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। সেই প্রাচীন ব্যবসায়-বাণিজ্য, সেই শ্রমনিপুণ শিল্পী এবং খুচরা ফেরিওয়ালার চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর ; সেই গ্রাম্যবাজার এবং উৎসব-তিথির মেলা, স্বদেশীয় পণ্যদ্রব্য পূর্ণ ক্ষুদ্র নোকোশ্রেণীর সেই উজান-ভাটি ইত্যন্তঃ সঞ্চালন, প্রমোদ-প্রাঙ্গণে যবনিকাস্তরালবস্তিনী সুন্দর ললনাগণের দর্শন এবং ক্রয়-করণাভিপ্রায়ে ভ্রমণশীল বণিকের পণ্যসামগ্রীর এবং মণি-মুক্তা-প্রবাল প্রভৃতির সে প্রদর্শনী—এ সমস্ত ব্যাপার এখনও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। যে ভাবে যতই কেন পরিবর্তন হোক না, এসিয়া যদি তাহার আপন প্রকৃতিকে বিনষ্ট হইবার অবসর দেয়, তবে তাহার ঘোর অমঙ্গল অবশ্যস্বাবী ; কারণ সেই এসিয়া-প্রকৃতিই বহুযুগ ধরিয়া শিল্প এবং ললিত কলাদি পালন করিয়া আসিতেছে। তাহার সেই প্রকৃতির বিনাশে কেবল যে শিল্প-সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইবে তাহা নহে, পরন্তু শিল্পীর আনন্দময় কলাহাস্ত, তাহার কল্পনার স্বপ্নরাজ্য এবং সমগ্র মানবজাতির যুগযুগান্তব্যাপী শ্রমজাত জ্ঞানগরিমা সমস্তই তৎসঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। নিজের ঘরের ঊর্ধ্বে বুনান বস্ত্রধারণ শরীর আবৃত করার অর্থ—নিজের ঘরে বাস করা,—নিজের প্রকৃতির অক্ষুণ্ণ অবস্থা গড়িয়া তোলা।

সময়সংক্ষেপকারী দ্রুত বাষ্পীয় শকটারোহণে কি উৎকট আনন্দ তাহা এসিয়া জানে না সত্য, কিন্তু তীর্থযাত্রী ও ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পর্যটন-দক্ষতা

* The Vista,—The Ideals of the East. By Kakasu Okakura.

এখনও তাহার অস্থিমজ্জাগত । ভারতীয় যে সম্রাটগণী সম্প্রদায় পল্লী-গৃহলক্ষ্মী-গণের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া বেড়ায় অথবা সন্ধ্যাকালে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া গঞ্জিকা সেবন করিতে করিতে গ্রাম্য কৃষককুলের সহিত নানাক্রম কথোপকথনে ব্যাপ্ত হয় তাহারাই প্রকৃত ভ্রমণকারী ; তাহার নিকট গ্রাম্য-প্রান্তরস্থিত প্রাকৃতিক দৃশ্যই একমাত্র দর্শনীয় পদার্থ নহে । এখানে নানাপ্রকার অভ্যাস ও সংস্কার, মানব-প্রকৃতির বিবিধ উপকরণ ও জনপ্রতি একত্র প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ; এই পর্য্যটকগণ তৎসমুদয় এবং স্থানীয় জীবন-নাট্যের দৃশ্য-বিষয়ে সম্পূর্ণ সমবেদনা প্রকাশ করতঃ সেই সমস্ত ভাব ও দৃশ্যকে অধিকতর মনোরম করিয়া তোলে । আবার জাপানী কৃষকগণটক ভ্রমণব্যাপদেশে কোন মনোজ্ঞ স্থানে উপনীত হইলে, তথায় একটা সরল সহজ “হোকু” (ক্ষুদ্র কবিতা) রচনা না করিয়া স্থান পরিত্যাগ করে না ।

এইরূপ ভ্রমোদশন দ্বারা স্থিতি ও ধর্ম্মের সম্মিলনে এবং কঠোরতা ও মৃদুতার সমবায় প্রাচ্য-মানব স্বভাব পরিপক্ব হয় এবং জীবন্তজ্ঞানের ক্ষুরণ হয় । এই প্রকারে প্রাচ্যদেশে মানবজাতি পরস্পরের সহিত পরস্পরের চিন্তা বিনিময় করিয়া থাকে, সেখানে প্রেমের মুদ্রিত স্থচীপত্রই শিক্ষার চরমোৎকর্ষ বলিয়া বিবেচিত হয় না ।

প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বৈষম্য লিপিয়া শেষ করা যায় না । প্রাচ্যের গৌরব-রবি এখানেই অস্তমিত নহে—তাহা আরও বাস্তব । বাহার প্রভাবে প্রত্যেক হৃদয় শান্তির দোলানিতে (vibration) কম্পিত হয়, যে ঐক্যতানে সম্রাট ও কৃষককে একত্র সম্মিলিত করে, যে স্বাভাবিক গভীর ঐক্যতাব সমস্ত সহানুভূতি ও অমায়িকতা প্রসব করে,—বাহা শীতলজনীতে শব্দ-পরিচ্ছদ দূরে নিষ্ক্ষেপ করিয়া জাপ-সম্রাট টাকাকুরাকে দরিদ্র প্রজার তুমারাবৃত গৃহে উপনীত করতঃ অগ্নির অভাব স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং ছতিফের সময় প্রজার হঃসহ অন্নকষ্টে অবলোকন করিয়া টাঙের টাইশেকে অন্নজন পরিত্যাগ করায়—তাহাই প্রাচ্যের মহিমাসী মহিমা । ভ্রমণের শেষ ধূলিকণাও নির্ঝাণানন্দ লাভ না করা পর্য্যন্ত বোধিসত্ত্ব স্বয়ং নির্ঝাণ প্রাপ্ত হইতে বিরত হইয়া যে আগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই এশিয়ার মহত্ব । যে স্বাধীনতা পূজার দরিদ্রকে মহত্বের আলোকে মণ্ডিত করে, ভারতীয় নরপতিকে সামান্য সাজে সজ্জিত করে এবং পৃথিবীর সমস্ত শক্তিশালী শাসন কর্তাদের মধ্যে কেবলমাত্র চীনসম্রাট যে প্রভাবে কখনও ভরবারি স্পর্শ না করিয়াও সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন, তাহাই প্রাচ্যের মহিমা ।

ইহাই এগিয়ার বিজ্ঞান, কিংবা এংগলিশ শাস্ত্রশক্তি । এই সময়
সংস্কার বিস্তৃত হইলে,—ভারতবর্ষের সেই ধর্মজীবন, যাঁহা তাঁহার জাতীয় জীবনের
মূলশক্তি, তাঁহা শুষ্ক হইয়া বাইবে এবং যে দিন দিন নীচতা, অসত্য এবং
নুতনত্বের সেবক হইয়া দাঁড়াইবে ; চীন নৈতিক-মভাতার পরিবর্তে পার্শ্ব-
মভাগ-সমস্তায় নিমগ্ন হইয়া মৃত্যুসম্মুখা ভাগ করিবে ; যে নৈতিক বল প্রভাবে
চীন-বণিকের মুখের কথা পাশ্চাত্য দাঁল অপেক্ষাও সমাদিক সম্মানিত ছিল
এংগ চীন-কৃষক অগৌরব গোতরা ভোগ করিত, তাঁহা তাঁহাকে হারাইতে হইবে ।
এংগ অমা-প্রাণের পত্নী—জাপান । জাপান নৈমিত্তিক আনন্দ-দর্শন কলুষিত
করতঃ তৎপাত ওরবারিকে সৌম্যকে পরিত্যক্ত করিবে । এমন প্রবৃত্তায় এগিয়ার
বর্তমান মঙ্গল প্রধান কতব্য—এগিয়ার প্রাচীন নীতিমৌলিক সংরক্ষণ ও পুনঃ
সংস্থাপন । কিন্তু এই সকল নীতিক, যাহা মঙ্গল প্রধান কতাকে জানিয়া বাইতে
হইবে ; অতীতের ছায়াই ভবিষ্যতের আশা । বীজমধ্যে যে শক্তি নিহিত
পাকে, বৃক্ষ তদপেক্ষা বৃহৎ হইতে পারে না । জীবনের অর্থ—আপনাতেই
প্রণবিত্তন । এই মত বহুতর শাস্ত্রিকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে,
ডেগফিক দৈববাণীর প্রদান শ্রুতি উপদেশ—“আপনাকে জানিতে শিখ ।”
কনফিউসিয়াসের গম্ভীর স্বর—“তোমাতেই মন আছে ।” ভারতীয় গল্পে এই
তাই আরও গম্ভীর স্বরে তদীয় শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে । বোধগম্য
বগেন যে, একদা প্রভুর আদেশে শিবদ্বার তাঁহার সম্মুখে সম্মিলিত হইয়াছে,
এমন সময় সহসা এক বিরাটমূর্তি—সেই মহানুদ্বীকর মঙ্গল হইল শিবমূর্তি গভ্রাজ্ঞ
আলোকরশ্মিতে উদ্ভাসিত হইলেন ; এক বজ্রবাণি বাণীত সে আলোক ‘আর
কাহারও চক্ষে সহ হইল না ।’ অশ্রুধারা বজ্রবাণি শিবদ্বারকে অক্ষয় দেখিয়া
বুদ্ধদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—গজাইমকর্তার বাণীব্যবহার অসংখ্য
নক্ষত্র এবং দেবতা দেখিয়াছি কিন্তু কুলাপ এমন মোহনীর মূর্তি দেখি নাই ।
বলুন, তিনি কে ? বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন,—“তিনি আপনাদের আত্মা ।” কথিত
আছে, এই কথা শুনিয়াই বজ্রবাণি উৎকৃষ্টতম জ্ঞান (নিস্তাণ) লাভ করেন ।

যে প্রবণ ব্যতিকার প্রাচীনা কৃত্তিক বিক্ষম করিয়াছে, জাপান সেই
বেগশালী প্রভঞ্জনময়া হইতেই আত্মতত্ত্বের কণিকানার অবগত হইয়া, আপনাকে
পুনর্গঠিত করিয়াছে এবং সেই আত্মতত্ত্ব পুনর্জীবিত হইলেই শাস্ত্রের এগিয়ার
পূর্বতন শক্তি ও স্থিতিশীলতা গঠিত হইবে ।

কিন্তু বর্তমানে বহুতর পাশ্চাত্য চিন্তাশ্রোতে আগাদিগকে আন্দোলিত

করিতেছে। যামাটোর দর্পণ মেন মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। এই বিপ্লব সময়ে, জাপান সত্য সত্যই অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে এবং নবজীবন লাভের প্রয়োজনীয় উপাদান সেইখানেই অন্বেষণ করিতেছে। অকৃত্রিম পুনরুদ্ভাসের সহিত প্রাচীন অভ্যাসের কিছু পার্থক্য থাকিয়া যায়, জাপানেরও তাহাই হইয়াছে। আশিকারা রাজগণের চেষ্ঠায় জাপানী শিল্প প্রকৃতি-আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, এখন তাহা সমস্ত জগতের সেবায়—মানবের সেবায় আপনাকে ধ্যস্ত করিতেছে। আমরা বুদ্ধি, আমাদের ভবিষ্য-রহস্ত-বীজ আমাদের জাতীয় ইতিহাসেই নিহিত আছে, তাই অন্ধ আবেগের সহিত তাহার স্ত্রোতসস্ফান করিতেছি। যদি এ চিন্তা সত্য হয়, সত্যই যদি অতীত ইতিহাসে নবজীবনের উপাদান প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে আমরা অবশ্য স্বীকার করিব যে, তাহাতে সমধিক শক্তি সংযোগ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কারণ বর্তমান নীচতার অনলবৃষ্টি—জীবন ও শিল্পকলার কঠোর বৃদ্ধি করিতেছে।

যে ক্ষণপ্রভার সমুজ্জ্বল আলোকরশ্মিতে এই গাঢ় তমোমণ্ডল অপসারিত হইবে, আমরা তাহারই আশায় বসিয়া আছি। কারণ বর্তমানের এই ভীষণ নীরবতা ভঙ্গ করিতেই হইবে কিন্তু নগোৎসাহের শাস্ত্রশীতল ব্যাখ্যার বর্ষণে ধরণীবক্ষ সরস না হইলে তাহাতে কুসুমস্তবক প্রস্ফুটিত হইতে পারিবে না। এবং বর্ষণের পূর্বের সেই মেঘগর্জ্জন এমিয়া হইতেই, মানবজাতির সেই প্রাচীন রাজবস্ত্র দিয়াই শ্রাণ করিতে হইবে। তাহাতে হয় আত্মশক্তির জয়, না হয় বহিঃশত্রুর হস্তেক্ষয়;—

“Victory from within, or a mighty death without.”

শ্রীব্রজমুন্দের সান্নাধ্য ।

পলাতক ।

(১)

কলিকাতা সহরে ভয়ানক গোলমাল। ইংরাজি দৈনিক পত্রে—বড় বড় অক্ষরে কখনও লিখিত হইতেছে “ব্যাঙ্কে ভয়ানক চুরি”—কখনও লিখিত হইতেছে “বৃহৎ তহবিল ভস্করূপ,”—আর একখানা কাগজে খুলিয়া দেখ তাহাতে “নারায়ণ চাটুসো ধূত হইয়াছে”—আর একখানা কাগজে “পুলিশ এখনও তাহাকে

ধরিতে পারে নাই”—আবার কোন কাগজওয়ালা লিখিয়াছেন—“ধরা পড়িয়াছিল আবার পলাইয়াছে ।” এইরূপ ও নানারূপ কথা কলিকাতাবাসিগণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছে ।—একথানা খবরের কাগজ একজন উচ্চৈশ্বরে পড়িতেছে, দশজন তাহাকে বিরিয়া কোতুক ও কোতুহলে আপাদ মস্তক পূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছে ।

ট্রামে,—গাড়ীতে,—রেল—আফিসে, রাস্তার মোড়ে সর্বত্রই নারায়ণ চাটুয্যের কীর্ত্তি—দশজনে সমবেত হইয়া আলোচনা করিতেছে ।

নারায়ণ চাটুয্য—“ভারতব্যাঙ্কে” কাগজ পড়িত,—রালি হিসাব বিভাগে সে এক-শ টাকা মাত্র মাতিয়ানা পাইত,—তাহার বয়স তিরিশ বৎসরের উর্দ্ধ নহে,—তাহার চেহারাতেও কোন বিশেষত্ব ছিল না । প্রত্যহ সে দশটার সময় শেরালদহে ট্রামে চড়িয়া ব্যাঙ্কে গাইত,—এই পর্য্যন্ত, কলিকাতার কেহই তাহাকে চিনিত না । এক-শ টাকা মাতিয়ানার কেরাণী এ সহরে হাজার হাজার আছে সুতরাং নারায়ণ চাটুয্যকে তাহার আত্মীয় স্বজন বাতীত আর কে চিনিবে ?

কিন্তু আজ সে যেন একবারে বিশ্ববিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে ; আজ প্রকাশ পাইয়াছে সে এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্ক হইতে দশ লক্ষ টাকা ভাঙ্গিয়াছে ! এক শত টাকার কেরাণী দশ লক্ষ টাকা ভাঙ্গিল, এ কথাটা বারহাত কাঁকুড়ের তেরহাত বোচির মত নিতান্তই অদ্ভুত । এত টাকা সে কিরূপে সরাইল,—কেহ তাহা পূর্বে ঘূণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই !—লোকে ইহাতেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছে—অনেকেই ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিয়া বলিতেছে, যাই । . . . আর যাই কও—লোকটার বাহাছরি আছে ।

কেবল যে এত টাকা ভাঙ্গিয়াছে বলিয়াই তাহার বাহাছরি তাহা নহে ! সে ফেরার হইয়াছে—শেরালদহের বাটীতে পুলিশ তাহাকে ধৃত করিতে আসিয়া শুনিল যে কেবল অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্বে সে বাটী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে ।

এই অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় পাইয়া সে এমনই অন্তর্ধান হইয়াছে যে পুলিশ এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধানই পায় নাই । এইরূপ বারংবার ।

এবার তাহার পলায়নের পর প্রায় দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে—পুলিশ ভারতের সর্ব প্রদেশে টেলিগ্রাফ করিয়াছে—তাহার চেহারার বর্ণনা সর্বত্র পাঠান হইয়াছে,—ডিটেক্টিভগণ দেশে-বিদেশে তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছে—তাহার সন্ধান দিতে পারিলে সেই ব্যাঙ্ক হইতে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছে । কিন্তু দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহার আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই

নানা শুভব প্রভৃৎ উঠিতেছে। এই বরা পড়িয়াছে—আবার প্রচার হইল, না—ধরা পড়ে নাই। কেহ রটাইল সে ত্রুষ্ণে গলাইয়াছে,—কেহ রলিল চন্দন নগরে লুকাইয়া আছে। একদিন রটিল সে আপানে পৌছিয়াছে—কেহ কেহ বলিল সে বিলাত যাঁহিতেছিল,—জাহাজে ধরা পড়িয়াছে।

যাহা হউক একমাগ কাটিয়া গেল, নারায়ণ চাটুয্যের আজ্ঞাও কোন সন্ধান হইল না।

(২)

একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পর খুব বোজের সময় আহিরীটোলার এক গলির ভিতর একখানা গাড়ী আসিয়া লাগিল। গাড়ী হইতে একটা যুবক ও একটা রমণী নামিয়া একটা ক্ষুদ্র গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গাড়ীর ঘোড়া দুইটা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এই গাড়ী বহুদূর হইতে আসিয়াছে। ঘোড়া দুটির মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইতেছে,—সর্কাস্ত বশ্যাক্ত।

তখন প্রায় বেলা একটা বাজে। পথে লোক চলাচল একরূপ বন্ধ হইয়াছে। চৈত্রমাসের প্রথর রোদ্রে যেন বিশ্ব পৃথিবী ঝলসিয়া বাইতেছে; নিঃশব্দ দায়ে না-পড়িলে এময়রে সহজে কেহ বাটীর বাহির হইতে চায় না।

যুবকের মুখ ও মস্তক চাহরে একপভাবে আচ্ছাদিত ছিল যে সহজে তাহার মুখ দেখিবার উপায় ছিল না। সম্ভবতঃ দারুণ রোদ্র হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য তিনি মাথায় একপ ভাবে চাদর জড়াইয়া ছিলেন।

রমণীর গায় একখানি মোটা চাদর ছিল, তাহাতেই তিনি সর্কাস্ত ঢাকিয়া এমন এক সুদীর্ঘ অবগুষ্ঠন টানিয়া ছিলেন যে তাহার মুখ দেখিবার কোন উপায় ছিল না।

উভয়ে কিছুদূর এত ক্ষুদ্র গলির ভিতর দিয়া আসিয়া আর একটা গলির সম্মুখে আসিলেন, সে গালাটা আরও সংকীর্ণ। এত সংকীর্ণ যে দুইজনের পাশাপাশি বাইবার উপায় নাই।

কিছুদূর গিয়া যুবক মৃদুস্বরে রমণীকে কি বলিয়া অন্তরিক্তে ক্রতপদে কী কবিতা-সুরিয়া গেল। রমণী শঙ্কিতভাবে ক্রতপদে এই ক্ষুদ্র গলির ভিতর আরও অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

এই গলির প্রান্তভাগে একটা জিতল বাটী, এই বাটীর দরজায় আসিয়া গলি শেষ হইয়াছে। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ—রমণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কড়া লাড়িলেন।

কিয়ৎকাল পরে একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিল,—জীলোক দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিতে লাগিল।

রমণী মূহুর্তে বলিলেন, “আমি—রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, তিনি কি বাটী আছেন?”

“হাঁ—আছেন—গবর দেব?”

“না—তিনি আমার চিনেন।”

এই বলিয়া রমণী গৃহ প্রবেশে উদ্যত হইলেন,—ভৃত্য পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

রমণী বাটীর মধ্যে আসিলে ভৃত্য দরজা বন্ধ করিয়া বলিল, “তিনি তেহানার ঘরে থাকেন—এই দিকে গি’ড়ি।”

রমণী কোন কথা না কহিয়া নিঃশব্দ উপরে উঠিয়া গেলেন।

ত্রিতলে একটা মাত্র ঘর। তিনি দেখিলেন ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ, তিনি আস্তে আস্তে দরজায় ঘা দিলেন। তখন ভিতর হইতে কে বলিল, “কে?”

রমণী অতি মূহুর্তে বলিলেন “আমি।” তখনই দ্বার খুলিয়া গেল—রমণী ঝড়ের বেগে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

গৃহস্থযাক্তি বিস্মিত ও সম্ভ্রান্তভাবে বলিয়া উঠিলেন “তুমি!—তুমি যে আজ সহসা এখানে!”

রমণী প্রায় অস্পষ্টস্বরে বলিলেন “চুপ—দরজা ঘাও!”

রমেশচন্দ্র দ্বারবন্ধ করিয়া আবার মোহরূপভাবে বলিলেন, “তুমি—তুমি এখানে—তোমাকে এখানে কে আসিতে বলিল?”

রমণী ব্যাকুলভাবে বলিলেন, “আগে বল তুমি ভাল আছ—তারপর তোমার অন্তকথা শুনিব।”

রমেশচন্দ্র আরও বিস্মিতভাবে বলিলেন, “ভাল আছি—আমার কি হইয়াছে—তুমি এখানে আসিলে কেন?”

রমণী বলিলেন, “তুমি পত্র লিখিয়াছিলে?”

রমেশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, “আমি পত্র লিখিয়াছিলাম—যে কি?”

রমণী বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন।

তাহাতে কেবলমাত্র লেখা আছে :—

‘মৃত্যুশয্যা—যদি শেষ দেখা দেখিতে চাও শীঘ্র আসিও।’

রমেশচন্দ্র এক নিমিষে নিবর্ণ হইয়া গেলেন। তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া

আসিল,—তিনি ব্যাকুলভাবে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “দাঁর কি! সর্বনাশ হইয়াছে।”

রমণী রমেশচন্দ্রের স্ত্রী—তাহার সর্বনাশ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল,— তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিলেন তাহা হইলে এ খানা তোমার চিঠি নয়।”

“না—এ চিঠি আমি লিখি নাই।”

“এ যে তোমারই হাতের লেখা।”

“জাল করিয়াছে।”

রমণী হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন। রমেশচন্দ্র বলিলেন “বাহা হইয়াছে, তাহার আর উপায় নাই—পুলিশেরই এ কাজ,—ভাবিয়াছিল তুমি নিশ্চয়ই আমার ঠিকানা জান,—এ রকম পত্র পাইলে নিশ্চয়ই তুমি আমার নিকট ছুটিবে—তাহারাও তোমাকে নজরবন্দি রাখিবে—তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিকট আসিবে।”

রমণী অত্যন্ত কুণ্ঠিতা হইয়া বলিলেন, “আমিই শেষে সর্বনাশ করিলাম।”

রমেশচন্দ্র বলিলেন “তোমার অপরাধ নাই, হয়তো তাহারা তোমার ঠিক অনুসরণ করিতে পারে নাই এখন বল দেখি শুনি, তুমি এখানে কি রকমে আসিয়াছ।”

“এই চিঠি খানা পড়েই আমি দাদাকে দেখাইলাম। আমরা কেহই কোন সন্দেহ করি নাই; আর বুঝিতেই পারিতেছ, এগন ভয়ানক চিঠি পাইয়া কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায়।

“তোমার বিশেষ কোন দোষ দেখি না।”

“তাহার পর শোন, আমি দাদার সঙ্গে তখনই বাহির হইলাম। দাদা বলিলেন পুলিশ আমাদের বাড়ীর উপর নজর রাখিয়াছে—তাহারা আমাদের অনুসরণ করিতে পারে স্বতরাং একেবারে সেখানে যাওয়া হইবে না, কোচম্যানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া আগে কালাঘাট যাইব,—তাহার পর নানানান ঘুড়িয়া বেলা একটার সময় এখানে আসিব। আমরা সেই রকমই আসিয়াছি।”

“তোমার দাদা কোথায় গেলেন।”

“তিনি আমাকে এই গলির মুখে রাখিয়া কাছেই লুকাইয়া আছেন।”

“তোমাদের বাহা করা উচিত করিয়াছ—এখন ভগবানের হাত। কিন্তু শোন বিরাজ, আমাকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের কণ্ঠ নয় যদিও দৈব চক্রিপাকে একান্ত থর পড়ি জীবিতাবস্থায় আমাকে কেহ পাইবে না, শেষে পুলিশকে

আমার মৃত দেহ বহন করাইয়া ছাড়িব ।” এই দেখ বলিয়া একটা গুলিভরা পিস্তল পকেট হইতে বাহির করিয়া বিছানার উপরে রাখিলেন ।

বিরাজসোহিনীর আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল ; সে স্বামীর কণ্ঠলগ্না হইয়া কাতরভাবে বলিল, “কি ভয়ানক ! তবে কি তুমি আত্মহত্যা করিতে চাও ?”

রমেশচন্দ্র বলিলেন, “সহজে নয়—একান্ত নিরুপায় হইয়া পাড়লে কি করিব এমন ঠিক নাই ।”

“এই সময়ে বাহির হইতে ঘারে কে ধাক্কা দিল । উভয়েই চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।

তখন বাহির হইতে ভৃত্য বলিল, “একটী ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন ।”

রমেশচন্দ্র বলিলেন “নিয়ের ঘরে তাহাকে বসাতো ; বল পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখা হইবে ।”

তখন রমেশচন্দ্র স্ত্রীকে বসে চাপিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন, “বিরাজ সোহ হই এই আমার শেষ ।” বিরাজের চক্ষু ছুটী অশ্রুজলে ভুবিয়া গেল মুখের উপর কাপড় দিয়া অব্যক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল । বলা বাহুল্য এই রমেশচন্দ্রই সেই পলাতক নারায়ণ চাটুয্যে ।

(৩)

আমরা যে ত্রিতল বাটার কথা বলিলাম, তাহাতে যে আর কেহ ছিলেন না এমন নহে । দ্বিতলের ঘরে দুইটী ভদ্রলোক বসিয়া কথা কহিতে ছিলেন । উভয়েই সমন্বয়ক,—বয়স ছত্রিশের মধ্যে,—একজনের সম্মুখে একটা বাস্ক রহিয়াছে,—বাস্কের উপর কতকগুলি কাগজ পত্রের ছড়াছড়ি । সে গুলি দেখিলেই স্পষ্ট জানিতে পারা যায় ইনি দালালি করেন । অপর ব্যক্তি ইহার পরিচিত লোক,—বন্ধু বাস্করের মধ্যে কেহ ।

বন্ধু বলিলেন, “অবিনাশ বাবু—বাস্কের চুরি সম্বন্ধে অন্য কোন নূতন খবর শুনিলেন ?”

অবিনাশচন্দ্র বাস্ক বন্ধু করিয়া বলিলেন, “না—নূতন আর কই—তবে শুজবের অশ্রুভূল নাই ।”

“আমাদের দেশের পুলিশ যে নিতান্ত অপদার্থ তাহা এই ব্যাপারেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে । গুলিলাম নাকি পুলিশ এবার তাহার বাটা ধাইবার জরুরি বস্তু পূর্বে সে বাটা হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল—আমি বস্তু আগে সরিল,—

দশ লাক টাকা লইয়া সরিল,—আর তাহাকে শ্রিতে পারিল না, ইহাতে কি বলিতে টেক্ষা করে ?”

“তাহারও জী-পরিবার আছে—ধরা পড়িলে আমাদের লাভ কি !”

“আমাদের লাভ বেশী কিছু না থাকিতে পারে, কিন্তু একরাশি টাকা !”

“তাতে আমাদের কি, “যদি যথার্থই ব্যাঙ্কের দশলাক টাকা চুরি গিয়া থাকে, তবে সে দোষ নারায়ণ চাটুসোর নয়,—ব্যাঙ্কওয়ালারিগের,—তাহারা অন্ধ হইয়াছিল কেন ? নারায়ণ চাটুসোকে এত টাকা চুরি করিবার সুবিধা দিল কেন ?”

“সে কথা ঠিক ।”

“এখনও আমরা নারায়ণ চাটুসোর কি বলিবার আছে, তাহার কিছুই শুনি নাই—একপক্ষের কথা শুনিয়াই তাহাকে চোর জুরাচোর বলিয়া গালি দিতেছি হয়-ত লোকটা নির্দোষ হইতে পারে ; অবস্থাগত প্রমাণের উপরে লোকটা এখন ভয়ানক জুরাচোর বনিয়া গিয়াছে ; এমন কি সে অল্প কোন জুরাচোরের যড়নস্ত্রেও এইরূপ বিপন্ন হইতে পারে । এমন অনেক দেখা গিয়াছে, রাসের অপরাধে স্থানের মাথার লাশি পড়িয়াছে ।

তবে যথার্থই যদি এত—“তা বটে কিন্তু এত টাকা লইয়া সে করিল কি—ছ চার-শ নয়, দশ লাক টাকা—কুনেরের ভাণ্ডার, অথচ শুনিতে পাই তাহার কোন বড় সাহসি ছিল না ।”

“এই জন্ম তাকে আগম্বর নির্দোষ বোধ হয়, যাগাই হউক আমি তাহার বিষয় বিশেষ কিছুই জানিনা,—কেমন করিয়া বলিব ?”

এই সময়ে বাহিরের দরজায় কে সজোরে কড়া নারিল ।

বেহারী ছুটিয়া দরজা খুলিতে গেল ।

ভূত দরজা খুলিয়া দেখিল একজন কুলোদর শরীরকার লোক দ্বারে দাঁড়াইয়া,—তাহার এক চক্ষু টেরা,—মুখে বসন্তের দাগ,—গৌক জোড়া অস্বাভাবিক বড়,—দেখিলে লোকটার উপর ঘৃণার উদ্বেগ হয়,—ভয়ও হয় । তবে ইহার বেশভূষা ভদ্রলোকের স্থায়,—পরণে ভাল কালাগাড় ধূতি, গরদের কোট, রেশমী উড়ানী, পায়ে বার্পিস করা বিলাতী জুতা ।”

সেই ভদ্রলোক বলিলেন, “আমার একটা আশ্রিয়া জীলোক এই মাল এ বাটা আসিয়াছেন ?”

ভূত কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া, তিনি

ভাটার পাশ কাটাইয়া সজ্জা বাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “বিশেষ দরকার—তাই ছুটিয়া আসিয়াছি—বিশেষ দরকার—তাহাকে একবার এখনই খবর দাও।”

ভৃত্য নড়ে না, তাহার পিটে একটা ছোটখাট খাকু দিয়া বলিলেন, “বাও—
বাও—শীঘ্র যাও—ভারি দরকার।”

ভৃত্য বলিল, “দাঁড়ান—খবর দি।”

ভক্তলোক বলিলেন, “চল—আমি তোমার সঙ্গে যাই।”

ভৃত্য একটু ভাবিয়া বলিল, “আম্বন।”

সে সেই আগন্তুক ভক্তলোকটিকে—যে গৃহে অবিনাশবাবু তাহার বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেই গৃহে আনিয়া বলিল, “ইনি সেই মেয়ে মানুষটির সঙ্গে দেখা করিতে চান।”

অবিনাশচন্দ্র বিস্মিত তইয়া বলিলেন, “কোন্ মেয়ে মানুষ?”

তখন সেই ব্যক্তি গম্ভীরভাবে বলিলেন, “মহাশয়,—বৃথা গোপন করিবার চেষ্টা করিবেন না—আমার সহিত চালাকিও চলিবে না।”

এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, “আমি ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর রামলাল মুখার্জী।”

অবিনাশবাবু বলিলেন, “আমার বাড়ী কি জন্ত অতুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন।”

“এই বাড়ীতে পলাতক নারায়ণ চাটুয্যো লুকাইয়া আছে।”

“আপনার ভুল হইয়াছে—এখানে নারায়ণ চাটুয্যো বলিয়া কেহ নাই।”

রামলাল সহাস্তে বলিলেন, “রামলাল ভায়ার ভুল হয় না। আমরা নারায়ণ চাটুয্যোর হাতের লেখা জাল করিয়া তাহার জীকে এক পত্র লিখিয়া-
ছিলাম,—সেই পত্র পাঠিয়া সে এখানে আসিবার জন্ত সকালে বাটা হইতে বাহির হইয়াছিল—পাছে আমরা তা’র অনুসরণ করি বলিয়া কালীঘাট গিয়াছিলাম,
তাহার পর কত ঘুরিয়া এই বাড়ীতে চুকিয়াছে—এবার ভায়া জালে পড়িয়াছেন।

অবিনাশবাবু বলিলেন, “বন্ধন—তামাক খান—আপনার ভুল হইয়াছে।
এ বাড়ীতে কেবল আমিই থাকি—আমার জী-পরিবার কেহ এখানে এখন নাই।
জিতলের ঘরে রমেশবাবু নামে আমার একটা বন্ধু পীড়িত আছেন,—তাহার জী
তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন—ইহাতেই আপনি হয়তো ভ্রমে পড়িয়াছেন।”

“না—রামলালের ভ্রম হয় না।”

“এখান হইতে উপরে ঘাইবার এবং নীচে ঘাইবার সিঁড়ী আপনার সম্মুখেই দেখা যাইতেছে—আপনিও সিঁড়ীর উপর নজর রাখিয়াছেন দেখিতেছি, সুতরাং আপনার অজ্ঞাতে কেহই উপর হইতে নীচে নামিয়া যাইতে পারিবে না,—তবে আপনি এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন ? তামাক খান । আসি বেহারাকে দিয়া রমেশবাবুকে সংবাদ দিতেছি,—তিনি এখানেই আসিবেন,—তখন আপনি আপনার ভুল বুঝিতে পারিবেন । ভদ্রলোকের স্ত্রী রহিয়াছে সেখানে যাওয়া কি আপনার উচিত ?”

রামলাল বসিলেন না,—দাঁড়াইয়া রহিলেন,—সিঁড়ীর দিকেই তাহার অবিচল দৃষ্টি—তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন, তবে খবর দিন, শীঘ্র তাহাকে এখানে আসিতে বলুন ।”

(ক্রমশঃ)

ত্রীপাচকড়ি দে ।

নববর্ষ ।

এস নববর্ষ করি শুভ সম্ভাষণ ;

ফুল প্রাণে হাসিমুখে নব আশা লয়ে বুক

করিতেছি বঙ্গগৃহে সাদরে গ্রহণ ;

ভুলেছি অতীত কথা হৃদয়ের তীব্র ব্যথা

মুছিয়াছ চিরতরে সজ্জন নয়ন ;

যে যাতনা দুর্কিসহ সহিয়াছি অহরহ

দিয়েছি বিশ্ব্তিজলে চির বিসর্জন,

ঢাকিয়া প্রাণের ক্ষত চিরসুহৃদের সত

নিতেছি তোমার আজ করিয়া বরণ ।

এস বর্ষ করিতেছি শুভ সম্ভাষণ ।

২.

এস বর্ষ করিতেছি শুভ সম্ভাষণ ;

নীরবে শাসন ভব সদা শিরপাতি ল'ব

হইবে না শোকে হৃৎখে বিচলিত মন ;

চাহি না জানিতে আর ভবিষ্যৎ বাঙ্গালার

কি হ'বে শুনিয়া বল অদৃষ্ট লিখন ?

নবীন প্রভাতে আজ জ্ঞান প্রকৃতির গাজ,
হু হু করি বহিতেছে প্রবল পবন
শক্তিও বিহীন নীড়ে বসে আছে চূপ করে
নীরব নিস্তরু এবে বন উপবন,
আসিতেছে যেন এক প্রলয় ভীষণ !

৩

এস বর্ষ করিতেছি শুভ সম্ভাষণ ;
বল বাঙ্গালীর তরে, এনেছ বতন করে
কত তীব্র অত্যাচার কত নিষ্ঠাতন,
অবুখ পতিত বার। হয় কি জাগ্রত তারা
না করিলে নিরমস গুরু উৎপীড়ন,
দারুণ আঘাত বিনে আসে কি শক্তি প্রাণে
হয় কি ভীষণ বৃকে সাহস ভীষণ ?
চাহি না মমতা-দরা হোক উত্তেজিত হিয়া
প্রতিপদে লভি দুর্ব্বিসহ বিড়ম্বন ;
অমুগ্রই নাহি মাগি শ্রাঘ্য স্বপ্নের লাগি
যাইব না পরদ্বারে থাকিতে জীবন,
আপন শক্তির পরে সবাই নির্ভর করে
দাঁড়াব নির্ভয়ে এবে করিয়াছি পণ ।
এস বর্ষ করিতেছি শুভ সম্ভাষণ ।

৪

এস বর্ষ করিতেছি শুভ সম্ভাষণ ;
এবার দেখিবে বঙ্গে মহোন্নায়ে মহারঙ্গে
নব দৃশ্য, বাহা কেহ দেখেনি কখন ।
অতৃপ্তি অনলশিখা সর্বত্র দিয়েছে দেখা
আসিয়াছে অশুভঙ্গে মহা আগরণ ;
খুলে গেছে মোহপাশ নাহি আর ভয়ভ্রাস
সবারি হৃদয়ে এক অস্তিত্ব ভীষণ ;
আত্মশক্তি প্রকাশিতে সবাই অদৃষ্ট চিন্তে
করিতেছে প্রাণপণে সতত বতন ;

কঠোর সাধনা বলে

এবার মস্তক তুলে

উঠিবে বাঙালী জাতি কাঁপারে/গগন !

এল বর্ষ করিতেছি শুভ সঙ্কারণ ।

শ্রীমদ্ভীষ্মনাথ মজুমদার ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী ।

পুরাণ শাস্ত্র হিন্দুজাতির প্রকৃত ইতিহাস না হইলেও ইহা যে আর্ষাদিগের অতি গৌরবের সম্পত্তি, তাহার আর সন্দেহ নাই । অতি প্রাচীনকাল হইতে যদ্বৈদ্যোদ্যে পুরাণ-পাঠ পুরাণ-শ্রবণ, উৎসুক পণ্ডিতদ্বারা তাতার ব্যাখ্যা, এবং “কথক” দ্বারা দেশীয় ভাষায় তাতার তাৎপর্য সর্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া ও তত্পলক্ষে সামর্থ্যানুসারে ব্রাহ্মণভোজন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদ্যায়, দীন-দরিদ্রগণকে অনবদ্য ও অর্থাদি দান চলিয়া আসিতেছে । এক্ষণ যদিও কালমাহাত্ম্যে হিন্দুধর্মের অধোগতি হেতু পুরাণপাঠাদি কার্য দিন দিন লোপ পাইতেছে, কিন্তু অদ্যাপি তাহা একদা বিলুপ্ত হয় নাই ।

যদিও এক্ষণ পাশ্চাত্য-শিক্ষা-বিকৃত-মস্তক ব্যক্তিগণ পৌরুষিক বিষয়গুলিকে “আবাড়ে গল্প” বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, কিন্তু নিবিষ্ট হস্তে পুরাণ পাঠ করিয়া তাহার গুঢ় অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে অজ্ঞানাত্মক ও জ্ঞানোদয় হয় ।

পুরাণোক্ত বিষয় মধ্যে বর্তমান সময়ে মহাতারতান্তর্গত “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা” হিন্দুজাতির প্রধান ধর্মগ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ । ভিন্নদেশীয় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ মধ্যেও অনেকে গভীর জ্ঞানপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ সমূহ মধ্যে গীতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া থাকেন ।

কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রেষ্ঠতা সর্ববাদী সম্মত হইলেও হিন্দুসমাজে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী-সাহস্রাণ্ড (শ্রীশ্রীচণ্ডী) কম আদরের গ্রন্থ নহে ।

হিন্দুর ব্রাহ্মদি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে যেমন গীতা পঠিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শারদীয়া মহাপূজাদিতে এবং নানাবিধ, উৎপাতিক ঘটনা—প্রবলবল্লভ ও রোগোপশমনার্থ শান্তি-বক্তব্যাদি কার্যে চণ্ডীচরণ পঠিত হইয়া থাকে ।

কার্য বিশেষে কেহ একাবৃত্তি হইতে শতাবৃত্তি—সহস্রাবৃত্তি পর্য্যন্ত পাঠ করাইয়া থাকেন। জগতে বোধ হয় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি চণ্ডীর মাহাত্ম্য এবং চণ্ডী পাঠের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাত নহেন।

ক্ষুদ্র-বৃত্তং বহু সংখ্যক ধন্যগ্রন্থ মধ্যে “গীতা” ও “চণ্ডী” হিন্দুর নিকট এত আদরের সামগ্রী হইল কেন, এক্ষণে তাহাই দেখাটিতে প্রয়াস পাইব।

“কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয় সৈন্যদল মধ্যে পিতামহ, মাতুল, ভ্রাতা, স্বপুত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্মোহন করিয়া অর্জুন कहিলেন,—

“কিং নো রাজোহন গোবিন্দ ! কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।

যেবামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ স্থখানিচ ॥

তে তমেহংস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাং ত্যক্ত্বা ধনানিচ ।

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈবচ পিতামহাঃ ॥

মাতুলাঃ স্বপুত্রাঃ পৌত্রাঃ শ্রাণাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।

এতান্ন হস্তমিচ্ছামি, যতোহপি মধুসূদন ॥

হে গোবিন্দ ! আমাদের রাজ্যই বা কি ফল ? স্থখভোগ ও জীবন-ধারণেই বা কি ফল ? কেন না বাহাদিগের জন্ম রাজ্যভোগ স্থখাদির কামনা করা যায়, উহারাই প্রাণ ও ধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। হে মধুসূদন ! আচার্য্য পিতামহ মাতুলাদি আত্মীয়গণ যদি আমাদের গণ্ড করেন, তথাপি আমি ইহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না।

এবমুক্তাৰ্জুনঃ সজ্যো রথোপস্থ উপাविशत् ॥

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোক সংবিলম্ব মানসঃ ॥

অর্জুন এই কথা বলিয়া যুদ্ধস্থলে ধনুর্ধারী পরিত্যাগ পূর্বক শোকাকুলিত-চিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন। এবং—

“ন যোৎস্রে ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তৃষ্ণীং বভূবহ ॥”

“আমি যুদ্ধ করিব না” শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কৃপাপরবশ ও রণবিমুখ দেখিয়া—

“ক্লেব্যামান্ধ গমঃ পার্থ ! নৈতৎ ত্ৰয়্যুপপদ্যতে ।

ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্দল্যং ত্যক্তে, তিষ্ঠি পরন্তপ ॥”

হে পার্থ ! তুমি ক্লীববৎ প্রাপ্ত হইও না, এরূপ ক্ষুদ্র অনোচিত হৃদয়দৌর্দল্য তোমাতে শোভা পায় না, হে পরন্তপ ! তুমি দৌর্দল্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ

গাত্ৰোত্থান কর। উভ্যাং উদ্বেজনা পূর্ণ বাক্যে এবং—

“অচ্ছদোহ্মগদাহোহ্মগক্লেদ্যোহ্মশোষা এনচ ।

নিভাঃ সৰ্বগতঃ স্বাহ্মরচলোহ্মং সনাঃনঃ ।

আত্মা অচ্ছদ্য অদাহ অক্লেদ্য অশোষা, নিত্য সৰ্বগত স্থান অচল এবং অনাদি ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিয়া এবং ফলা-কাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক স্বশ্রদ্ধাবিহিত কন্মের অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্তব্য ইত্যাদি উপদেশ দ্বারা অৰ্জুনকে পুনর্বার যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করাইয়াছিলেন।

“ইহাই স্নীতার বর্ণনীয় বিষয়” ।

আর,—

চিত্রবংশোদ্ভূত সুরথ নামক জনৈক প্রজাপংগল নরপতি দুর্জয় শত্রুচর্চক যুদ্ধে পরাজিত, এবং বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গের বড়নজে হৃতসর্বস্ব হইয়া একাকী অস্বারোহণে বনগমন করেন। এবং কিম্বৎকাল উৎস্রুতঃ ভ্রমণের পর মেঘস্বর্ষির আশ্রমে যাইয়া স্বর্ষিবরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। অনন্তর এ আশ্রমে পুত্র দারাদিকর্তৃক প্রবঞ্চিত ও নিতাড়িত সমাদি নামক বৈদ্যের সহিত তাঁহার সংস্রব হয়, এবং একে অন্তর পরিচয় পাইলে সমগ্রুপে প্রযুক্ত উভয়ে প্রণয়গস্ত হইয়া মেঘস্বর্ষির নিকট গমন করেন।

অনন্তর রাজা সুরথ, মেঘস্বর্ষিকে প্রণাম করিয়া বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যে দুই অমাত্যগণকর্তৃক আমি হৃতসর্বস্ব হইয়া বনে আগমন করিয়াছি, তাহারা কে কি ভাবে আছে, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে কেন? এবং এই বৈদ্যই বা কেন পুত্রকলজাদি কর্তৃক প্রবঞ্চিত ও নির্যাসিত হইয়া পুনর্বার তাহাদিগের কুশলাকুশলান্নক তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যাকুলিত হইতেছে? আমরা জ্ঞানবান্ হইয়াও কেন মুখের কার্য্য করিতেছি?

মেঘস্বর্ষি কহিলেন,—রাজন্! এ সমস্তই মোহের কার্য্য। মোহ বশতঃই প্রাণিগণ মায়ার অধীন হইয়া সংসারে আবদ্ধ থাকে। “মহামায়ার প্রভাবেই প্রাণিগণ মমতারূপ মোহগন্তে নিপতিত হয়।”

তখন সুরথ বলিলেন,—“ভগবন্! কা হি সা দেবী মহামায়েতি বাৎস্তবান্। ত্রয়ীতি কথমুৎপন্ন সা কস্মীন্মাস্তি কিং দ্বিজা ॥ যৎ স্বভাষাচ সা দেবী যৎ স্বরূপা যদ্বত্ত্বা, তৎসর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্ব ব্রহ্মবিদাশ্চর ॥”

হে ভগবন্! আপনি যে মহামায়ার কথা বলিলেন, তিনি কে? তাঁহার স্বরূপ কি? কিরূপে তাঁহার উৎপত্তি হইল? তাঁহার কথ্যই-বা কি? তত্কার

আমি প্রণয় করিতে ইচ্ছা করি, পরাপূর্ণক তাহা বিস্তারিতরূপে আমার নিকট বর্ণন করুন।

অনন্তর মেমস্‌ পিসি, সুপ্রিয় রাজা ও সমাদি নামক বৈজ্ঞানিক নিকট মহা-মায়ার উৎপত্তি, তাহার স্বরূপ এবং তাহার (মধু কৈটভ ম. ইত্যাদির গুণ্ড নিমন্ত আদি বিনাশরূপ) কাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিলেন। ইহাই চণ্ডীর মূল বিষয়।

কেন কেন পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি বলেন,—সুপুত্রতা, ব্রহ্মহত্যা, শিকারমহাদি জাতিকবল্লভকারিণ মহাপাপক তইতে বিরত হওয়া অর্জুন বধন বুদ্ধবলে অজ্ঞান্য করিলেন, তখন কটনীরিচ্ছ ক্রম নানারূপ উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাক্যে অভীষ্ট সিদ্ধি জন্ম পক্ষের আদরণে স্বার্থ লুক্কায়িত রাখিয়া বাক্যভাল বিস্তার পূর্বক অর্জুনকে বুদ্ধ প্রবর্ত করিয়াছিলেন—ইহাই গীতার মূল তাৎপর্য। যে লোকফরকর ভীষণ যুদ্ধে ভারত বীরতীন এবং আত্মজাতির গৌরববর্ধিত অস্তমিত হয়; সেই যুদ্ধপ্রবর্তক কণ্টপশ্চময়পাক্যাবলীকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বসিয়া তিস্তপ কেন যে এত আদর করেন তাহার কারণ বুঝা যায় না।

আবার চণ্ডী সম্বন্ধেও অনেক বলেন যে, “অসভ্যগণে মধুকৈটভের সহিত নিম্নর বর্ধরোচিত বাহ্যক, স্ত্রীজাতির সহিত পুরুষের মল্লযুদ্ধ, উলগিনীবেশে রণস্থলে বগনী, তাণ্ডন নৃত্য, শোণিত পান, চন্দ্র-অশ্ব-নরের আম-মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি পৈশাচিক ব্যাপার ঘটয়া মার্কণ্ডেয় ঠাকুর যে আঘাতে গল্পের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, সেই গল্পমূগক চণ্ডী কেন যে হিন্দুগণের নানারূপ ধর্মকার্যে ও শাস্তি স্বস্তায়নাদিতে পতিত হয়, ইহারও কারণ বুঝা যায় না।

সাহিত্য-জগতের অভ্যাসগরত্ব বাক্যমজ্ঞ লিখিয়া গিয়াছেন,—“সংস্কৃত ভাষার হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ‘বুনা নারিকেল’; যে ইহার ছোবড়ার উপর কামড় দেয় তাহার মুখ দ্রুত বিকৃত হইয়া থাকে, আর যে ব্যক্তি জ্ঞানরূপ অজ্ঞান্যার ছোবড়া ভাড়াইয়া খুলি ভয় করিতে পারে, সে তাহার সুশীতল জয়পানে স্নিগ্ধ ও সুমিষ্ট শত ভয়গণে পরিতৃপ্ত হয়।”

বাক্যমজ্ঞের এই সারবান উপমাটি অতীব সুমঙ্গল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর মহাহংস্রা যাহারা মণীষর্বে কলঙ্কিত করিয়া গৌরব অক্ষত করেন, তাহার হস্ত তদ্বাহুগন্ধান না করিয়া যে কেবল ছোবড়াই কাষড়াইয়াছেন, তাহাতে আর সম্বন্ধ নাই। নচেৎ সমস্ত আত্মসমাজ যে ইত্যাকে ধর্মশাস্ত্রের সার মনে করেন, কতিপয় পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি

যে তাঁহাকে অসার প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান হয়, ইহা কি তাঁহাদের অদূরদর্শিতার পরিচয় নহে ?

“সর্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপীল নন্দন।

পার্থ বৎস স্মরীভোক্তা হৃদ্যঃ গীতামৃতং মহৎ ॥”

বেদের সারস্বরূপ উপনিষদ সমূহ গাভী, অর্জুন বৎস, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দোহন-কর্তা, অমৃতোপমগীতা হৃদ্য এবং স্মরণীয় তাহার ভোক্তা।

“সারথ্যমর্জুনশ্চ। দৌ কুর্ষ্বন গীতামৃতং দদৌ।

লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃকাত্মসো নমঃ ॥”

অর্জুনের সারথ্য কার্যব্যাপদেশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকের হিতের জন্ত অর্জুনকে গীতারূপ অমৃত প্রদান করিয়াছিলেন, কৃষাৎমক সেই গীতাকে নমস্কার। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কেবল অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করাই গীতার উদ্দেশ্য নহে। ত্রিলোকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্তই ভগবান বাসুদেব ধর্মশাস্ত্রাণি মহন করিয়া গীতারূপ অমৃত অর্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার বহু টীকা-টিপ্পনী ও ভাষ্য রচিত হইয়াছে এবং বাঙ্গলা ইংরাজী হিন্দী প্রভৃতি নানা ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। গীতার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনার্থ এ পর্য্যন্ত নানারূপ আন্দোলন আলোচনারও ক্রটি হয় নাই। এমন কি গীতা যে ধর্মজগতের সর্বোচ্চ উজ্জ্বল রত্ন, অনেকে ইহাও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং গীতা সম্বন্ধে আসার বক্তব্য সংক্ষেপেই শেষ করিব।

গীতার মূলশিক্ষণীয় বিষয় “নিকাম কর্মযোগ” এবং “অদ্বৈতবাদ”। যথা—
“অদ্বৈতামৃতবর্ষীণীং ভগবতামষ্টাদশাধ্যায়িনীং ॥” কিন্তু গীতা অদ্বৈতবাদী হইলেও সাকার উপাসনার বিরোধী নহে। তাই বলিয়া গীতাকে কেহ যেমন পুতুল-পুজকের স্তম্ভিত গ্রহ মনে না করেন। গীতা যেমন সাকারবাদের আদরের বস্তু, তজ্জন সাকার উপাসকেরও পরম ধন। গীতা নিকাম সন্ন্যাসধর্মের উপদেষ্টা, আবার কর্মযোগীরও গুরু।

গীতার সর্বোপেক্ষা বিশেষ মত এই যে, “সাধক সংসারের সর্বপ্রকার কর্তব্য কর্ম বখারীতি সম্পাদন করিয়াও নির্লিপ্ত সংসার-বিরাগী বা জীবমুক্তভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন।” এই জন্তই গীতার এত গৌরব।

গীতা যদিও হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ, তথাপি প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায়—গীতা কোন জাতি বিশেষ, ধর্মবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নহে। গীতা জগতের “সার্বভৌমিক ধর্মোপদেষ্টা ;” গীতা প্রকৃতই পরমপুণ্য

উপদেশের উপদেশ বাক্য। মহুবা কখনও এরূপ সর্বস্বাদী সম্বত, সর্বজন পূজনীয় অত্রান্ত-তত্ত্বের উপদেশক হইতে পারে না।

পরম্পর বিরোধী শাস্ত্রসমূহের সামঞ্জস্য বিধান অর্থাৎ বেদান্তের অষ্টব্রহ্মবাদ, সাংখ্যের জ্ঞানযোগ, নিকাম কর্মযোগ, ভক্তিবোগ প্রভৃতি বিভিন্নমতে অপরূপ সম্মিলন এবং পরম্পর বিরুদ্ধতাবের সুসীমাংসা একমাত্র গীতাত্তেই দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মসম্বন্ধে যে বাহা পাইতে বা যে সে পথে যাইতে ইচ্ছা করেন, সে-সমস্তেরই অত্রান্ত উপদেশ গীতাতে আছে।

কিন্তু সদৃশ্যের উপদেশ ভিন্ন গীতার প্রকৃত অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া যায় না। বর্তমান সময়ে মুক্ত ধর্মগ্রন্থের সহায়তায় গুরুপদেশ ভিন্নও অনেকে ধর্মতত্ত্ব পণ্ডিত হইয়া থাকেন। যে সমস্ত বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও বৃত্তিতে অসমর্থ, ছুঃখের বিষয় কোন কোন সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাশ্চাত্য শিক্ষাভিগানী ব্যক্তি সেই সমস্ত গুরুপদ বিষয়ের অমূল্যদের ক্রিয়দংশ পাঠ করিয়া বেদকে “চাষার গান” গীতাকে “কুটনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ চাতুর্যময় বাক্য,” চণ্ডীকে মার্কণ্ডেয় ঠাকুরের আবাড়ে গল্প” এবং বাহা তাঁহাদের মত বিরুদ্ধ তাহা “প্রাক্ষিপ্ত” বলিয়া উল্লেখ করিয়া নির্লজ্জভাবে এই সমস্ত গভীর তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থের অসারতা প্রতিপাদনে অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীমত্তগবদগীতার নাহাওয়া বর্ণন প্রসঙ্গে মহর্ষি হৃত বলিয়াছেন,—“ককো-জানতি বৈসয়া কৃষ্ণং কুন্তি সূতঃ কং বাগো বা বাগ পুত্রো বা বাজবক্যোথ মৈনিলঃ।”

গীতার প্রকৃত তত্ত্ব ত্রীকুমার সমাক্রম জ্ঞাত আছেন, কুন্তিপুত্র অর্জুন কিঞ্চৎ-জানেন, মহর্ষি বাগ, জীবন্ত সূকদেব, ব্রহ্মজ্ঞ বাজবক্য এবং রাজর্ষি জনকও কিঞ্চৎ অবগত আছেন।

যে গীতা-সম্বন্ধে মহর্ষি হৃত এইরূপ উচ্চ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন সেই গীতা কুটনীতিজ্ঞ কৃষ্ণের স্বার্থমূলক কৌশলপূর্ণ বাক্যজাল বলিয়া সমালোচিত হওয়া সামান্ত আশ্চর্যের বিষয় নহে।

বাহা হউক এ সকল বিষয় লইয়া অধিক আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। শ্রীমত্তগবদগীতার সহিত মার্কণ্ডেয় পুর্বাশাস্ত্রগত ত্রীশ্রীচণ্ডীর কতদূর সম্বন্ধ, এবং কি প্রকৃতি হিন্দুসমাজে গীতা ও চণ্ডীর এত আদর তাহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য। আরও গীতা ও চণ্ডীর তাৎপর্যার্থের আংশিক আলোচনা করিয়া উভয় গ্রন্থের ভাবমূল্য সম্বন্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সাধারণভাবে দেখিলে দেখা যায় যে, “গীতা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধাশ্রিত কৃষ্ণার্জুন সংবাদে-নিকাস কৰ্ম্মলোগের উপদেশ” । আর-চণ্ডী, মেঘস্ সন্ধির সহিত সুরথ । সমাদি সংবাদমূলক দেবাসুর যুদ্ধ প্রসঙ্গে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণন । গীতা ও চণ্ডীর বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক্ হঠলেও উভয়ের ভাবগত সাদৃশ্য অল্প নহে এবং উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্য প্রায় একরূপ । গীতাতে যে যে বিষয়ের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ; চণ্ডীতে সেই সেই বিষয় অতিদীর্ঘ হইয়াছে ।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হঠতে গীতার উৎপত্তি, সুরথঃ কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের মূল তাৎপৰ্য্য কি, অগ্রে তাহার বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

উচ্চাশ্রীর হিন্দু নাক্রোহ জাত আছেন, প্রাক্কালে পট্টাং হর,—

“যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমক্ষন্দোহঙ্কুনো ভীমসেনোহস্তশাখা, মাদ্রিস্থতো পুষ্পকলে সমুদ্ভূত মূলং কৃষ্ণ ব্রক্ষচ ব্রাক্ষণশ্চ ।”

“দ্রু্যোপনো মনুময়ো মহাদ্রুমক্ষন্দঃ কর্ণঃ শকুনো স্তম্ভ শাখা হ্রঃশাসনঃ পুষ্প-কলে সমুদ্ভূত মূলং রাজা ধুংরাষ্ট্রোমনীবা ।”

রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাদ্রুমক্ষরূপ, অঙ্কুন তাহার স্বক, মহাবীর ভীমসেন তাহার শাখা, নকুল ও মহদেব তাহার পুষ্প ও ফল, এবং সেই ধর্ম্মময় মহাদ্রুমের সমুদ্ভূত মূল কৃষ্ণ, ব্রক্ষা ও ব্রাক্ষণগণ ।

আর দ্রু্যোপন অহঙ্কারময় মহাদ্রুমক্ষরূপ, কর্ণ তাহার স্বক, শকুনো তাহার শাখা, হ্রঃশাসন তাহার পুষ্প ও ফল ; এবং সেই অহঙ্কারময় মহাদ্রুমের সমুদ্ভূত মূল ব্রাক্ষচক্ষু রাজা ধুংরাষ্ট্র ।

তাৎপৰ্য্য এই,—এক পক্ষে ধর্ম্ম, অপর পক্ষে অহঙ্কার বা অধর্ম্ম ; এক পক্ষে দৈববল বা অদৃষ্টবল, অপর পক্ষে পুরুষকার বা বাহুবল ; সুরথঃ ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের যুদ্ধ, বা দৈবশক্তির সহিত পুরুষকারের যুদ্ধ ।

দৈব শক্তির সহিত পুরুষকারের যুদ্ধে প্রথমঃ পুরুষকারের জয় । তৎপর অহঙ্কারাতিশয়ে অধর্ম্মের উৎপত্তি । অনন্তর ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের যুদ্ধ, সুরথঃ অধর্ম্মের নাশ, ধর্ম্মের সংস্থাপন, ছুষ্টের দমন এবং সাধুর পরিব্রাজ্য ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, বা মানবদেহ ধারণ । ইহাই গীতার একটা প্রধান কথা । যথা—“যদা যদাহি ধম্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত ! অভ্যুত্থানমধম্মস্ত তদাত্মনঃ”

সুজ্ঞানাহং ॥

পরিব্রাজ্য সাধুনাং বিনাশায়াচ হৃদতাং, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় গচ্ছামি

যুগে যুগে

হে ভারত! যে যে সময় মর্মের গীতুন ও অশ্রুর আর্দ্রান হয়, সেই সেই সময়েই আমি দেহধারণ করিয়া থাকি। সাধুগণের রক্ষা ও ছোটদিগের বিনাশ এবং মর্মসংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

অতঃপর গীতার সহিত চণ্ডীর কণ্ঠস্থ মন্ত্রক তাহাট আলোচনা করি। (ক্রমশঃ)
শ্রীচূর্ণাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন।

নূতন।

চৈত্র-দৈশাখী নিশি পোহায় পোহায়

জাগো ওগো জাগো বজবাসি,

ভারতের পুণ্যময় রমা উপকূলে

স্বর্ণতরী আসিয়াছে ভাসি।

সুদূরের হোম-গন্ধ প্রভাতী পবনে

রহি রহি আসিতেছে আজ,

ঋতুকের বেদমন্ত্র জেগেছে আবার

শ্রামস্বন্ধ তপোবন মাঝ।

হে নূতন হে বাঞ্ছিত, এসো আজ এসো

সার্থক হউক আবাহন;

পুরাতন অবসাদ দৈন্ত-হিংসা-দ্বेष

হোমানগে করেছি ইক্ষন!

স্বার্থ অশ্রুর রক্তে পূর্ণাছতি দিয়া

হে স্নানর ওহে অভিনব,

পবিত্র শাস্তির ফেঁটা পরায়ে লগাটে

তোমাতে বরণ করি লব।

এসো এসো চির-প্রিয়, মঙ্গল উষায়

সার্থক হউক আবাহন;

মঞ্জীবনী স্পর্শে তব ভারত-সন্তান

লঙ্কক নবীন জাগরণ।

শ্রীকৃষ্ণদেবদাস মণিক।

পুজার ফুল ।

(বাউল শুর)

ভোমার বনভূমি, স্বর্গ ভূমি, ভোমার সমান আর কে আছে ?

কে স্বর্গার আমায় স্বর্গার কালে, অধা কুলে মৃথের কাছে ।

ভোমার জলে অধা, স্থলে অধা, কলে অধা গাছে গাছে ॥

এমন বড় ঋতু অধের হেতু ফিরে কাহার পাছে পাছে ।

(ওগো) নিতি নূতন, মনের মতন, কত রতন লঞ্চেবাচে ॥

আকাশ কার সুনীল কেশে হেসে হেসে তারা-হীরার সিঁথি রচে ।

এমন ইন্দ্রধনুর মুকুট মাগো কবে কেবা পরিয়াছে ॥

ভোমার সরোবরে হংস চরে ভরুপরে মধুর নাচে ।

(ওগো) আকুল করে কোকিল শ্রামা, কুলের লহর বহে গাছে ॥

ভূমি অতুপমা বিশ্বরমা গড়বিধির মনের ছাঁচে ।

মা ভোম মরণহরা চরণ-ছায়ার শরণ নিলে পরাণ বাচে ॥

(মাগো) আঁখি থাকতে দেখে না কেউ মণি ফেলে-মজে কাঁচে ।

আপন পরমায়ে নাইকো কচি, পরের কাছে গরল বাচে ॥

ফেপা বাউল ৮

প্রাণেশচন্দ্র ।

(৬)

তিনটা বাজিয়া গেল, নৌকা আসিল না ; শশীধর বন্দোপাধ্যায় অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন । মাঘের দিন ; সন্ধ্যার আর বিলম্ব কত ? নৌকা না আসিলে রাজে এই দোকানগৃহে অপেক্ষা করিতে হইবে । সঙ্গে তাঁহার কত, কত মালী ও সদঃ পরিচিত প্রাণেশচন্দ্র ।

দোকানগৃহে অনেক লোক আসিতেছে, বাটতেছে, অনেক লোক রাজি বাপমের ব্যবস্থা করিতেছে । দিনে প্রদীপ জালিলে পুস্তক আসে কি না দেখি নাই, কিন্তু অনেক যুবক-পুস্তক এই দোকানগৃহে আসিয়া বসিতেছে । বালিকা এই মুহূর্ত্ত বসিয়াছিল, এখন সর্বদা ঢাকিয়া মালীর আড়ালে শুইয়া আছে । যে গার কাটা-মুটিয়াছিল, সে পা-খানি অনাস্বাদিত ।

হেটি পা, সুন্দর পা, আলতা বাতীক আরক্তিম পা, বেদনার আরও আরক্তিম হইয়াছে। প্রাণেশচন্দ্র অনিমেবে ঐ চরণ নিরীক্ষণ করিতেছে।

প্রাণেশচন্দ্র বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করে। কিন্তু শব্দজ্ঞের নিপত্তি সে সহ করিয়া উঠিতে পারে নাট। পুনরায় আসিয়া এম-এ পরীক্ষায় মন দিয়াছে। কাটিতে ছিঁড়িতে তাহার ভয় ছিল না, কাটা ছেঁড়ার প্রাণেশের বরং উৎসাহই ছিল। কিন্তু হৃগ্ন তাহাকে মেডিকেল কলেজ হইতে তাড়াইয়াছে। প্রাণেশ দেখিল, বালিকার পা ফুলিয়াছে, বুঝিল—উহাতে পূজ হইয়াছে, কাটা ভিতরে থাকিলে যদি এখন তাহা বাহির করা না যায় তবে ভীষণ ব্যতনা হইতে পারে, কত সাত্বাতিক হওয়াও বিচিত্র নহে।

প্রাণেশ চন্দ্র কি ভাবিয়া ট্রাকটা খুলিল, একবার এ কোণে একবার সে কোণে তন্নাশ করিল, উঠিয়া আসিয়া বন্দোপাধায় মহাশয়কে বলিল, “আর বেলা নাই, নৌকা আসিলে আপনারা রাজি সম্মুখে করিয়া বাইবেন কি ?” আসি চলিয়া বাইব তাবিতোছি। একটি কথা এই, বলিয়া যাইতেছি—আপনার মেয়ের পা বেরূপ ফুলিয়াছে, উহাতে যেরূপ পূজ হইয়াছে, উহা এখনই কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। সম্ভবতঃ এই কারণেই খুব অর হইয়াছে।

শশীধর। চলিয়া যাইবেন—ইহাও কি হয়, আমাদের বাড়ীতে আপনাকে বাইতেই হইবে।

পিতা মেয়ের কপালে তাত দিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, খুব অর-ত হইয়াছে ; এখন কি করা যায় ?

প্রাণেশ। আপনি যদি অনুমতি করেন তবে পূজ বাহির করে দেওয়া বাইতে পারে ; যুগ—এই সুযোগ—আমার সঙ্গে অত্র আছে।

শশীধর অনুমতি দিলেন। বন্দোপাধায় এবং মেয়ের মাকীকে নেকড়া লইয়া প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া প্রাণেশ ট্রাক হইতে অত্র খুলিল, অতি সাবধানে অঙ্গসর হইয়া অতি সাবধানে ঐ সুন্দর পা খানি ধরিয়া স্রুতীক অত্র পলকে ক্ষীত স্থানে বসাইয়া দিল। মেয়েটা আগিয়া দেখিল—বাবা ও মাকী শুক্রবা করিতেছেন—সম্মুখে প্রাণেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া। বালিকা উঠিয়া বসিয়াছিল, লজ্জিত হইয়া আবার শুইল।

নৌকা আসিল না—সন্ধ্যা হইয়া গেল ; নৌকা তখনও আসিল না। তাহারি দোকান ঘূঁহে থাকিতে বাধ্য হইলেন ; ভাগ্যকুল বড় বন্দর হইলেও নিরাপদ নহে—হৃগ্নের দোরাত্তের ভয় বখেই। প্রাণেশচন্দ্র সাহস দিল—সে আগিয়া থাকিবে।

বালিকার অর অনেক কমিয়া গেল। মামী আহার করিলেন না, বন্দোপাধ্যায় ও প্রাণেশ অন্ন আহার করিয়া আসিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন।

শ্রীমতের রাজ ফুরার না। বন্দোপাধ্যায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। প্রাণেশচন্দ্র জাগিয়া রহিল। অন্ধকারের পর চল উঠিয়াছে। বিশাল পদ্মার বিস্তৃত বক্ষে ক্ষণলোক নৃত্য করিতেছে—দোকান গৃহ তত্বে এই সুন্দর দৃশ্য দেখা যাউতেছিল। প্রাণেশচন্দ্র, বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে জাগাইয়া, তাঁহাকে জাগিয়া থাকিতে বলিয়া, পদ্মাতীরে আসিয়া বসিল। জল-বাতাস—কিন্তু তাহার শীত-রোধ নাই। বামে একখানি ভয় অট্টালিকার ভয় অংশ অন্ধময় হইয়া রহিয়াছে, দক্ষিণে একটা উন্মূলিত খজুরক ফলশ্রোতে তেলিয়া পড়িয়াছে। প্রাণেশচন্দ্র এই জোয়ারালোকে এই পদ্মাতীরে ভয়-বিনাশের লীলাস্থলে বসিয়া উচ্চ গলায় গাইতে লাগিল—

এস গো ভক্তি গঙ্গা

ভগবৎ পদ কমল ত'তে

হৃদয় মরু মাঝারে,

রজত-শুভ্র-পূণা-তিলোপ বাতিনি।

এই ভক্তি-সঙ্গীতটী মুক্তি তাহার নিকট শুনিতে বড় ভালবাসিত—কতদিন মুক্তি ছাতে বসিয়া এমন চক্ষুলােকে মুগ্ধনেবে প্রাণেশের দিকে চাহিয়া এই গঙ্গীত শুনিয়াছে। গান গাতিতে গাতিতে প্রাণেশের সেই মুক্তির কথা মনে পড়িল, সে দেখিতে লাগিল—চন্দ্রকরোজ্জ্বল পদ্মার প্রতি তরঙ্গে মুক্তির সেই সুখখানি নৃত্য করিতেছে। এই নৃত্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের সুমিষ্ট তান উচ্চ হইতে উচ্চতরে উঠিল। প্রাণেশের অর অতি নম্বর বোধ হইতে লাগিল, যেন পদ্মার সফেন তরঙ্গ, কুর্ণল করিতে করিতে এই অর শুনিবার জন্ম তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রাণেশ সঙ্গীতে তন্ময় হইয়া আরও দেখিল মুক্তির পার্শ্বে আর একখানি মুগ—সদাঃ পরিচিত, সগজ্জ—অতি সুন্দর, অতি নম্বর।

প্রাণেশের সঙ্গীত সহসা ধামিয়া গেল—সে অতি দ্রুত দোকান ঘরে ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—বন্দোপাধ্যায় নাট, তাঁহার ঘেয়ে নাট, ঘেয়ের মামী নাই—তাহার ট্রাকটী পর্যন্ত অক্ষত হইয়াছে। প্রাণেশচন্দ্র ভয়ে ও বিষয়ে বিস্মল হইয়া পড়িল।

(৭)

প্রাণেশচন্দ্রের পলায়নের সংবাদ শুনিয়া এতৎ তাহার পত্র পড়িয়া মুক্তি অস্ত্রিশয় বিষয় হইয়া পড়িল । পড়িতে যায় পড়া হয় না ; সেলাই করিতে হুঁট আঙ্গুলে ফোটে ; স্কুলে পড়া বলিতে ভুল হয় । একটা পোষা পাণী উড়িয়া গেলো মেনন হয় তেমন হইয়াছে । কেন গেল, কোথায় গেল—মা, বাপ, দাদা ম'শায়কে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন কোন সন্তুষ্টর পাইল না তখন সে একখানি পত্র লিখিল, কিন্তু ঠিকানা কি ?

বেলা প্রাতে নয়টা ; মুক্তি তাহার পোষা বিড়াল-ছানাটী কোলে ধরিয়া বুক চাপিয়া তাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—“বল্, প্রাণেশ দাদা চ'লে গেল কেন” । চাপ যখন অসহ তখন ছানাটী হাত হিচড়িয়া দিল, মুক্তি রাগ করিয়া ছানাটীকে দূরে নিক্ষেপ করিল । নিঃশব্দ বিড়াল-শিশু যখন মিউ মিউ করিতেছিল তখন মস্ত দাদা ম'শায়, তাঁর মস্ত কোট লইয়া, মস্ত পকেট লইয়া, মস্ত জুতা পায়, মস্ত লাঠি হাতে, আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন—
“ওর উপর এ উপদ্রব কেন ?

মুক্তি । ও বলতে পারলে না কেন, প্রাণেশ দাদা কোথায় গেল ।

দাদা ম'শায় । বেড়াল কি সোঁগী সে বলে দিতে পারবে ?

মুক্তি । আচ্ছা বেড়াল গেন সোঁগী নয় । আপনি-ত একজন সব খবর জ্ঞানেন, বলুন না, প্রাণেশ দাদা কোথায় গেল ।

দাদা ম'শায় । তা দিয়ে কি হবে ?

মুক্তি । একখানা পত্র লিখেছি, ঠিকানা পাচ্ছি না ।

দাদা ম'শায় । প্রাণেশ কি লিখে গেছে, দেখাবে ?

মুক্তি । আপনি ঠিকানা ব'লে দিবেন ?

দাদা ম'শায় । ঠিকানা ক'রে দিব ।

মুক্তি ঠিকানা পাইবার ভরসায় পত্রখানি আনিয়া দিল ।

স্নেহের মুক্তি,

হঠাৎ চলে যেতেছি, কিছু ব'লে যেতে পারলাম না । কষ্ট পাবে, কষ্ট ভুলে যেও । আর কখনও দেখা-হবে কি না জানি না । যে ব্যক্তি সফল রাখিতে পারে না, সে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবার অযোগ্য । তোমার অল্প অনেক স্বর্গিব, অনেক খাটব ভাবিয়াছিলাম, তা হলো না । তোমাদের নিকট বা

পেয়েছি তার মস্ত চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকুব । তোমার মা-বাপকে আমার শ্রণাম
জানাইবে । যদি কখনও তোমাকে পত্র লিখিতে লিখি খুব বড় পত্র লিখিও ।
তবে এখন যাই । ইতি—

শ্রীপ্রাণেশ—

দাদা ম'শায় ছ'বার পত্রখানি পড়িলেন । কোমল-হৃদয় দাদা ম'শায়ের
চোকে জল দেখা দিল ।

মুক্তি । এখন বলুন ঠিকানা ।

দাদা ম'শায় । আমি-ত বল'নো বলি নি, ঠিকানা ক'রে দিব বলেছি ।

মুক্তি । আচ্ছা ক'রেই দিবেন, দিবেন-তো ?

দাদা ম'শায় । তুমি কি লিখেছ, দেখানে ?

মুক্তি । পত্র দেখাই আর আপনি তখন বলবেন—“আমি তো বলেছি,
ঠিক না-করে দিব, বলেছি ।”

দাদা ম'শায় । খুব-ত জল্প করেছিমু । বল'ছি ঠিকানা ক'রে দিব ।

মুক্তি । ঠিকানা ব'লে দিন আর না দিন, পত্র দেখাচ্ছি, দেখুন ।

মুক্তি পত্র আনিয়া দিল ।

শ্রীচরণ কমলেশু—

দাদা ! চলে গেলেন, এমন ক'রে চলে গেলেন, আমাকে একটু ব'লেও
গেলেন না । আমি কত কষ্ট পাব তা আপনি একটুও ভাবেন নি । ভাবিলে
আপনার ছোট বোনটির প্রতি এরূপ ব্যবহার করতেন না । আমি কার কাছে
এখন পড়বো ? Pilgrim's Progress আর পড়া হবে না । আমি কার সঙ্গে
তেমন আবদার করবো ? আমার কিছুই ভাল লাগছে না । “অযোগ্য”
কথাটা লিখলেন কেন ? একবার পারেন নি, আবার পারবেন । আমি
আপনাকে কি বলতে পারি ? আমার লক্ষ অনুরোধ, আপনার পায় পড়ি,
আপনি আমার সব আবদার রাখেন, শীঘ্র আসিবেন ।

আপনার মেহের ছোট বোন

মুক্তি ।

দাদা ম'শায় পত্রখানি একবারের অধিক পড়িলেন না, পড়িতে পারিলেন
না, তাঁহার চোকের জল এবার গড়াইয়া গড়িল । বালিকার চিত্ত তিনি
ঝুঙ্কিলেন, বলিলেন—“আমি ঠিকানা ক'রে দিব, পত্র আমার কাছে থাক'ক ।”

এই বলিয়া দাদা ম'শায় তার মস্ত পকেট হইতে কমলা, কুল, তেঁতুল
টেবিলের উপর সাজাইলেন । অপর্যাপ্ত । দাদা ম'শায় চির কুমার—এই

অপর্যাপ্ত দানে হিংসা করিবার জন্ত তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেহ নাহি। বালক বালিকাই তাঁর সব। তিনি নিত্য সব দিয়া নিত্য সম্মানী, তিনি নিত্য সব সংগ্রহ করিয়া নিত্য সংসারী।

মুক্তি। দাদা ম'শায় আমার এখন কিছুই ভাল লাগছে না; এমন আর কাউকে দেবেন।

দাদা ম'শায়। এ শুধি তুমি না লইলে আমার যে ভাল লাগবে না। আমার ভাল লাগছে না,—তাই কি তুমি ভাল বাসবে।

মুক্তি। নী, কখনো না। সব নিচ্ছি। তেঁতুল আগে, মূণ এনেছেন-তো?

দাদা ম'শায় পকেট হইতে এক শিশি মূণ বাহির করিয়া মুক্তির হাতে দিলেন, বলিলেন, "এখন জিব-তালুতে টক্ শব্দ হোল। এই টক্ শব্দ থেকেই "টক্" কথাটা হ'য়ে থাকবে। বসন্ত, সাহানা সব রাগ-রাগিণী মোগ্ করলেও তোদের মুখে একটা টক্ শব্দের তুল্য মিষ্ট হয় না।"

মুক্তি। আপনার যে কথা!

মুক্তি তেঁতুল খাইতে খাইতে, টক্ টক্ শব্দ করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে মাটিতে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

দাদা ম'শায়। এখন ভাল লাগছে তো?

মুক্তি আমার বর্ষণ-বিনুখ ঘন মেঘের জায় গভীর হইয়া উঠিল।

দাদা ম'শায়। অমন গভীর হ'য়ে থাকলে আমার কান্না পায়। ঠিকানা ক'রে দিলেই তো হলো।

মুক্তি। কবে দেবেন?

দাদা ম'শায়। দিন—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—

মুক্তি। ঐ তো আপনার দৌল; তবে আমি চলেম।

দাদা ম'শায়। দাঁড়া, এই নে ঠিকানার অঙ্কিক।

তিনি একখানি কার্ড বাহির করিয়া দিলেন। দেখা—“প্রাণেশব্দ বা ভাগ্যকুল নামিয়াছেন, সঙ্গে একটা ব্রাহ্মণ, একটা জীলোক বিদ্যা, ও একটা কন্যা পরমাসুন্দরী।”

মুক্তি। এ কি?

মুক্তি দাঁড়াইল না—চলিয়া গেল। দাদা ম'শায়ের পুনঃ পুনঃ ডাকিলে আর কিরিল না। দাদা ম'শায় ব্রহ্মেশ্বরকে কার্ডখানি দেখাইয়া, কি পরামর্শ করিয়া, চলিয়া গেলেন।

নেতৃগণের কর্তব্য ।

কর্জনের কর্জনে নিদ্রিত বাঙ্গালী জাগিয়া বসিয়াছিল ; ফুলারের ‘কুগারের’ জালাময় স্পর্শ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এক্ষণে নেতৃগণের প্রদর্শিত পথে, তাহারা দলবান্ধিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে । দেশে সুবাতাস বহিতেছে সন্দেহ নাই । বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়া নৌকার কর্ণ ধরিয়া বসিয়া থাকিলেই নাবিকের কর্তব্য পরিসমাপ্ত হয় না ; নদীর বাঁকে বাঁকে ঘুরিয়া গাছ-পাথর অতিক্রম করিয়া, উত্তাল তরঙ্গমালার ভিতর দিয়া তাহাকে গন্তব্যস্থানে নৌকা লইয়া যাইতে হয়, সুতরাং তাহাকে চারিদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে হয়—নৌকার পুরাতন ছিদ্রপথে জল প্রবিষ্ট হইলে কোশলে সে পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিতে হয় । সুবাতাসে বাঙ্গালী দেশ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে নেতৃগণ পাল তুলিয়া হাল ধরিয়া বসিয়াছেন, তাহাদের সতর্ক চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতেছে কিন্তু পুরাতন ছিদ্রপথে যে, জল ঢুকিয়া পড়িল সেদিকে তাহাদের আদৌ দৃষ্টি নাই । আর কতকদিন এ ভাবে চলিলে “ডুববে তরী খান” আমাদের “ডুববে তরী খান” ।

বাহিরের শত্রু অপেক্ষা ভিতরের শত্রু হইতে ভয় বেশী । বনের সাপ ক্ষণে ঢুকিবে তারপর কামড় দিবে—সহজ কথা নয় ; কিন্তু শয্যাভুল হইতে সর্প উঠিয়া দংশন করিলে উপায় নাই । অনিত বশশালী ইংরাজ জায়ের সীমারেখা লঙ্ঘন করিয়া বাঙ্গালীর একতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত, ইহাতে আমরা ভীত নই কিন্তু বঙ্গ-জননীর কোলের ছেলে গোল বাঁধাইয়া তুলিয়াছেন দেখিয়া আমরা আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি । যে হিংসার যে আজীবন পুড়িয়া মরিলাম, আবার সেই বিষ—আবার সেই দলাদলি, মারামারি ! মা জগত্তারিণি ! বাঙ্গালী দেশকে রক্ষা কর ।

বাঙ্গালী চিরকালই দলাদলি-প্রিয় । জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীশিত্ত ক্রীড়াক্ষেত্রে দল গড়িতে আরম্ভ করে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত সংসারের শুল্কস্বাক্ষে সে কেবল গড়িতেই রহে । মুনি অষ্টাবক্র মাতৃগর্ভে থাকিয়া সমগ্রই ব্রহ্ম অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—অবস্থা দৃষ্টে বলিতে ইচ্ছা হয়, বাঙ্গালী-শিশুও দগদগ-উন্মত্তে সর্বাশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া জননী-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় । সায়ের আহ্বানে সায়ের ভবনে সম্মান ফিরিয়া আসিবে, সায়ের কাজে জীবন উৎসর্গ করিবে, মধ্যোক্ত হিংসা-দেষ, ইহার মধ্যেও দলাদলি ! হারের দুর্ভাগ্য জাতি !

মত-বিভিন্নতায় বাঙ্গালীর নেতৃগণ স্বদেশী আন্দোলনে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। উভয় দলের উদ্দেশ্য এক কিন্তু বিরোধ কার্যপ্রণালী নিয়া। বিধাতার সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়। এখানে একটীর মত আর একটী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই বৈষম্যপূর্ণ জগতে সাম্যের আশা একবারে নাই বলিলেও চলে। মতবিরোধ সর্বত্রই আছে ও থাকিবে। যদি ভ্রায় ও শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘিত না হয়, যদি সরলভাবে নির্দিষ্ট কালের ভ্রম লড়াই চলে তবে ক্ষতি নাই; বরং সত্য আবিষ্কারের ভ্রম এরূপ লড়াইর আবশ্যকতা আছে। মাঠে মল্লধর শাস্ত্রভানে পরস্পরের বল পরীক্ষা করুক—তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু এই সূত্রে যদি এক দলের লোক অল্প দলের আখড়া লক্ষ্য করিয়া কামান দাগিতে আরম্ভ করে তবে প্রাণঘাতী মহাসমর অবশ্যস্তাবী।

বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনের মুক্তমাঠে পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটা মত যখন বল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইল আমরা তখন সোৎসুকচিত্তে তাহা নিরীক্ষণ করিতে-ছিলাম। ভাবিসাচ্ছিলাম—অনতিবিলম্বেই জয় পরাজয় নির্ধারিত হইবে অথবা ইহার একটা সুখ-সমাप्তি ঘটিবে। কিন্তু যে দেশ দলাদলির চির লীলা-নিকেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, যে দেশের লোক হিংসা-বিদ্বেষের বিষ-চুরিকা পরস্পরের বক্ষে বিদ্ধ করিবার সুযোগ অনুসন্ধানে অক্লান্ত ব্যাপৃত, যে দেশের লোক অপরের উন্নতিক্কে শ্রীয়া উন্নতির প্রশান অন্তরায় বলিয়া মনে করে, সে দেশে মতবিরোধ সহজে মীমাংসিত হইতে পারে না। তাই আজ বঙ্গবাসী এক সর্বনাশকর মহা-সমরের আয়োজন দেখিতেছে।

আমরা নেতৃগণের কাহারও নিন্দা করিব না। তাঁহারা সকলেই অতিভক্ত, কষ্টার্থ এবং জ্ঞানবান পুরুষ। সকলেই স্বদেশ-উন্নতির মহামন্ত্রে দীক্ষিত এবং স্বদেশের কল্যাণব্রত্রে নিয়োজিত। আমরা জানি, দোষ সম্যাসীর নয়, দোষ চেণার; অত্যাচার সেনাপতির নয়, অত্যাচার যেনার। কোন কোন নেতার পৃষ্ঠচররূপে এমন দুই একটা লোক অবস্থান করিতেছেন যাহারা আজন্ম কেবল হিংসা-বিদ্বেষই অর্জনা করিয়া আসিয়াছেন এবং নিন্দাকে বৈরনির্যাতনের অমোঘাস্ত্র নিরূপণ করিয়া তদ্বারা তুণপূর্ণ করিয়া বসিয়া আছেন। ইহাদের কালাকাল প্রাজাপাত্ত জ্ঞান নাই, কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, সুযোগ পাইলেই শরদ্বান করিতেছেন। লর্ড কর্জফনের বঙ্গবিভাগ নিক্ষেপ হইয়াছে কিন্তু এই শ্রেণীর কালাপাত্ত হইতে বঙ্গজননীর অঙ্গচ্ছদের আশঙ্ক! আদানিদিকে প্রতিবৃদ্ধি আকুল করিয়া তুলিতেছে।

যুক্তি-তর্কের কষ্টিপাথর সাহায্যে আমরা অল্প পরস্পরবিরুদ্ধ মত দুইটির ভালমন্দ বিচার করিতে চাই না ; সে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে । তবে একথা বলা প্রয়োজন যে, উভয় মতের বিশেষ বিশেষ অংশের একীকরণে একটা সর্ব্ববাদী সম্মত অভিনব নত সৃষ্ট হওয়ার একান্ত আবশ্যিকতা আছে । এ দেশের বর্তমান অবস্থায় শুধু নরেন্দ্র কাজ হইবে না, শুধু সিংহেও কাজ হইবে না ; উভয়ের সংমিশ্রণে যে নরসিংহমূর্তি গঠিত হইতে পারে তাহারই প্রয়োজন ।

এখনও সময় আছে ; দেশের নেতৃগণ কালাপাহাড় দমনে আপন আপন ব্যক্তিগত শক্তি নিয়োগ করুন । পরস্পর মিলিত হইয়া বিভিন্নমতের সামঞ্জস্য বিধানে যত্নপরায়ণ হউন ; হিংসা-দেষ্ট বমন করিয়া ফেলুন, ওরূপ দূষিত জিনিস পেটে রাখিতে নাই ; মান-অভিমানের কীরীট-কুণ্ডল চূর্ণ করিয়া ফেলুন, দরিদ্রের এ রাজবেশ কেন ? সকলেই এক হুংখিনী জননীর গন্তান—সকলেই ভ্রমাত্মক জীব এই সাম্যামন্ত্র উচ্চারণ করুন । সকলে গারি খাওয়া মাতৃপূজার “গারি” গাছিতেই সম্মুখদিকে অগ্রসর হউন—পর্যন্ত টলিবে, পাষণ গলিবে ।

সুভাষিতাবলী ।

২২। পরের কটুক্তি যদি সহিতে না পার, তবে আগে আপনার মুখ মিষ্ট কর ।

২৩। ক্রোধ, অজ্ঞানতা হইতে আরম্ভ হইয়া জ্ঞানোদয়ে পর্য্যবসিত হয় ।

২৪। পুরোছার দিয়া ক্রোধ প্রবেশ করিলে, পশ্চাদ্ধার দিয়া সদ্গুণাবলী পলায়ন করে ।

২৫। কীৰ্ত্তি, ধর্ম্মের তুলা-মূল্য নয় । ধর্ম্মাপচয়ে প্রশংসালভ—দীরক-বিনিময়ে কাচ গ্রহণের তুলা ।

২৬। উৎকট যশোলিপু ব্যক্তি সতৃষ্ণনয়নে জনতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে ।

২৭। যে আপনার বন্ধু আপনি নয়, সে কাহারও বন্ধু হইতে পারে না ।

২৮। উৎকট বশোধর্ম্মাদিগের পারিপার্শ্বিকগণকে বিশ্বাস করা যায় না ।

২৯। চাপকা বলিয়াছেন—দিনি উৎসবে, বাসনে, ছুড়িফে, রাইবিন্নবে, রাজদ্বারেও অশানে সহায় থাকেন, তিনিই বন্ধু ।

৩০। এই জীবলোকে শারীরিক ও মানসিক এই দুই প্রকার পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে । শরীর অসুস্থ হইলে মন, এবং মন অসুস্থ হইলে শরীর

পীড়িত হয়। যে ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিক হুঃখ স্মরণ করিয়া অশ্রুতাপিত হয়, সে কেবল একটা হুঃখদ্বারা অপর একটা হুঃখ আকর্ষণ করিয়া হইতে অনর্থ প্রাপ্ত হয়।

৩১। যেমন পর্বতারূঢ় ব্যক্তি নিম্নস্থ ব্যক্তিদিগের সমুদয় কার্য্য দর্শন করিতে পারেন, সেইরূপ জ্ঞান-প্রাণাদারূঢ় ব্যক্তি অজ্ঞলোকদের সমস্ত কার্য্য অমুভব করিতে পারেন। তিনি মনঃমতি অজ্ঞলোকদিগকে শোকের অবিষয়ীভূতস্থলে শোক করিতে দেখিতে পান।

৩২। বাহ্যদ্বারা দৃষ্টোদৃষ্ট বিষয়ের বোধ হয়, তাহার নাম বুদ্ধি। সেই বোধ-চক্ষুদ্বারা যিনি অজ্ঞাত-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান—তিনিই চক্ষুমান।

৩৩। আলস্তে হুঃখ ও দক্ষতায় সুখোদয় হয়। ঐশ্বর্য্য, শ্রী, কীৰ্ত্তি প্রভৃতি সম্পত্তি, নিপুণ ব্যক্তি ভিন্ন অলস ব্যক্তিতে কদাচ অবস্থিতি করে না।

৩৪। অভ্যুদয়-সময়ে লোকে মনে করে, আমি একজন অসামান্য মনুষ্য, আমি মহাকুল-প্রসূত, আমি বাহ্য মনে করি, তাহা করিতে পারি। এই তিন প্রকার অভিমানে লোকে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হয়। এই পৃথিবীতে ধনী, নির্ধন, বলবান্, দুর্বল, সুবোধ ও বুদ্ধিহীন সকলেই জরা-মৃত্যুর অধীন। যিনি পরাক্রম-প্রভাবে সাগরাস্থার-ধরার অধীশ্বর হইতে পারেন, তিনিও জরা-মরণের প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে অভিমান করিবার অধিকার কাহারও নাই। ক্ষুদ্র বংশে জন্মিয়াও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়, মহাকুল-প্রসূত ব্যক্তিও পতঙ্গবৎ প্রাণষ্ট হয়।

৩৫। অদীন-ভাবে প্রিয়বাক্য বলিবে ; শুব হইয়াও শ্লাঘা-বিহীন হইবে ; দাতা হইয়াও অপাত্রে দান করিবে না। অন্তরু হইয়া মানবগণের সংকার করিবে

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

গোকার দপ্তর—শ্রীমনোমোহন সেন প্রণীত। মূল্য ১০ চারি আনা। কলিকাতা ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। গোকার দপ্তর শিশুগাথ্য গ্রন্থ। বঙ্গীয় শিশুসাহিত্যে এইরূপ

চিত্রসুন্দর রসমধুর পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই বলিলেও অতুষ্টি হইবে না । যিনি শিশুচরিত্র সমাকরূপে অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছেন এবং যিনি শিশুসুন্দরের স্বাভাবিক প্রতিকৃতি স্বীয় মানসপটে অঙ্কিত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন; শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে তাঁহারই মাত্র অধিকার । মনোমোহন বাবু সে অধিকার আছে । গ্রন্থকার শিশুদিগের রুচি অনুসারী নিবিশেষ বিষয়ানলম্বনে, এক একটা সরল ও সরস কবিতা রচনা করিয়াছেন, সুনিপুণ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত গোপাল মনোরম চিত্রসাহায্যে তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । মধুর কবিতা, মনোহর চিত্র ও পরিপাটি মুদ্রণ এই ত্রিবিধ সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে গ্রন্থখানা শিশুপাঠ্য পুস্তক শ্রেণীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে । 'খোকার-দপ্তর' বন্ধের খোকা-সম্প্রদায়কে সুস্বাদু মিঠাই-মণ্ডা অপেক্ষাও অধিক প্রলোভনে আকৃষ্ট করিবে ।

সুখপাঠ — শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্তী প্রকাশিত । মূল্য দুই আনা । গ্রন্থের রচয়িতার নাম নাই । না থাকুক, স্কুলপাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নে গ্রন্থকারের যে ক্ষমতা আছে, 'সুখপাঠ' পাঠ করিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছি । গ্রন্থখানা গদ্য-পদ্যময় । শিক্ষাপযোগী নিবিশেষ বিষয়ের সমাবেশে, ভাষার সরলতায় ও রচনা-লাগিতো বইখানা সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে । সংযুক্ত বর্ণ পরিচয়ের পর এই গ্রন্থখানা বালক-বালিকাগণের পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হইতে পারে । 'সুখপাঠ' বালকশিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী গ্রন্থ হইয়াছে । আমরা এরূপ গ্রন্থের অদূর দেখিলে সুখী হইব ।

বাল্যসখা — শ্রীকরণাকান্ত চক্রবর্তী প্রকাশিত । মূল্য এক-আনা । এই গ্রন্থখানা প্রথম শিক্ষার্থীগণের জন্য লিখিত । ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই । তবে একথা বলা যাইতে পারে, অধুনা যে শ্রেণীর পুস্তক শিশুপাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইতেছে, সমালোচ্য গ্রন্থখানাও সেই শ্রেণীতে স্থান পাইবার উপযুক্ত । আজকাল প্রথম শিক্ষার্থীগণের পাঠ্যপুস্তকের অভাব নাই তবে আর বৃথা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় কেন ?

আব্রতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ।

ষষ্ঠ বর্ষ । { নয়ননগিৎহ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ । { বঙ্গম সংখ্যা

বীরপূজা ।

। নয়ননগিৎহ স্বল্পদ্য মনিঃপ্রাণাদিত্য উৎসবে পত্রিকা ।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা । বাঙ্গালীর হৃদয়ে আজ এক অনিবার্জনীয় সুপনয়ী স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে । পতীর শমসাদ্দর অতীতের স্তব্ধ বেদ করিয়া বাঙ্গালীর শৌর্যের পুণ্যলোক আজ সর্বসমক্ষে প্রতিভা হইতেছে । তিন শত বৎসরের কথা ; এইরূপ জোৎস্না-বিসেত বৈশাখী-পূর্ণিমা-রজনীতে বাঙ্গালীর গৌরব-রবি প্রভাপাদিত্যের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল । ব্রাহ্মণ-কর্তৃ-নিঃসৃত সুললিত বেদমন্ত্র-ধ্বনিতে, উৎসবের কলকোলাহনে, গীত-বাদ্যের স্তম্ভুর আলাপনে, পুরদাসিনী মহিলাবৃন্দের উল্লাসে রাজগৃহ মুগ্ধিত হইয়াছিল । মঙ্গল দীপাবলীতে অট্টালিকাশ্রেণী অপূর্ণ আদরণ করিয়াছিল । চূর্ণপ্রাকার হইতে মুহুমূহঃ ভোগধনি উৎখিত হইয়া দিগ্‌মণ্ডল নিলাদিত করিয়াছিল । নানাদেশ হইতে কত লোক রাজমন্দিরে বহুমুখা উপচৌকন প্রদান করিতে আসিয়াছিল । বাঙ্গালী একদিন এই অপূর্ণ দৃশ্য দেখিয়া আহ্লাদে আত্মগার হইয়াছিল । স্বর্গীয় স্বাধীনতা-স্বা অন্বেষণ করিয়া গর্দিত হইয়াছিল । বাঙ্গালী আপন রাজার মস্তকে বিজয়-মুকুট পরাইয়া বহু হইয়াছিল । সে দিন তাহারা অন্বেষণ করিয়াছিল “দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গস্থ পায় ।” হায় ! সে দিন গিয়াছে । সেই বৈশাখী পূর্ণিমার সুবিলম্ব শশসর আজ নিবিড় জলদাবৃত । এখনও প্রতি-বৎসর বৈশাখী-পূর্ণিমা-রজনী আসে, সুনীল গগনে চাক-চক্সা বিকাশ পায় । কিন্তু ও স্ৰবাস্তুরে মৃৎ-সজীবনী-স্বা নাই ; থাকিলে এ মৃৎজাতি নবজীবন লাভ করিত, বাঙ্গালীর পূর্বগৌরব পুনঃ প্রকাশিত হইত, বিপুল শৌর্য ক্রিয়া আগিত, প্রগট শক্তি জাগরিত হইত । এখনও বাঙ্গালী জীবিত

রহিয়াছে ; কিন্তু সেই বৈশাখী পূর্ণিমার সুবিমল চন্দ্রকরোদ্ভাসিত বাঙ্গালীর বদনে একদিন যে গৌরবের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল সে হাসি এখন চিরস্নান হইয়াছে । বাঙ্গালীর মুখ আজ কলঙ্ক-কালিমা-রঞ্জিত ।

সে রাম নাট, সে অমোঘাণ্ড নাই । স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন, বীরকেশরী প্রতাপের জন্মভূমি আজ অরণ্যে পরিণত । পুণ্যতীর্থ প্রতাপের রাজধানী আজ স্থাপদগণের আবাসস্থান । চিত্তচমৎকারিণী প্রাসাদশ্রেণী এখন ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে । কাল ! তোমার কি মহতী শক্তি ! তোমার কি নিৰ্ম্মম হৃদয় ! তোমার বিধ্বংসী-স্রোতসুখে কত রত্নখচিত রাজসিংহাসন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; কত কোহিনূর-শোভিত রাজমুকুট তোমার পদতলে দলিত হইতেছে ; কত কনকসৌধকিরিটনী-নগরী তুমি ভয়াবহ শ্মশানে পরিণত করিয়াছ । কিন্তু কাল ! জড় জগতেই তোমার শক্তি সীমাবদ্ধ । অন্তর্জগতে তোমার প্রভাব অব্যাহত নহে । তুমি বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে বৈশাখী পূর্ণিমার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারিলে না । অনন্ত কাল প্রবাহে সেই স্মৃতি দিন দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে । বাঙ্গালী যতই হীনবীৰ্য্য হউক না কেন, যতই অধঃপতিত হইয়া থাকুক না কেন, বৈশাখী-পূর্ণিমার স্মৃতি তাহার হৃদয়ে চিরজাগরুক থাকিবে । সেই স্মৃতিই বাঙ্গালীর জীবন, বাঙ্গালীর আশা । সেই সুখময়ী, উৎসবময়ী, গৌরবময়ী বৈশাখী-বামিনীর স্মৃতিই বাঙ্গালীর হৃদয়ে নবীন আকাজ্জা, নবীন উৎসাহ পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে । বাঙ্গালীর শৌর্য্য, বাঙ্গালীর বীৰ্য্য, বাঙ্গালীর প্রতিভা এই বৈশাখী-পূর্ণিমার সহিত চির বিজড়িত । এই পুণ্য স্মৃতি যতদিন প্রাণে জাগরুক থাকিবে ততদিন বাঙ্গালীর ধ্বংস নাই । বৈশাখী-পূর্ণিমার স্মৃতি বৃকে ধরিয়াই বাঙ্গালী উঠিলে ; বাঙ্গালী আবার গৌরব-মণ্ডিত হইয়া জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে । যে বলিবে বাঙ্গালী ভীক, বাঙ্গালী কাপুরুষ, বাঙ্গালী দুর্বল, আমরা তাহকে বৈশাখী-পূর্ণিমার কথা বলিব ।

বিদেশী ঐতিহাসিকগণ এতদিন আগাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছে । তাহারা আমাদের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদিগকে দ্বিগত বর্ণে চিত্রিত করিয়া চিরদিনের জন্ত তাহাদিগকে নিম্নিত এবং অজ্ঞাত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল । এই দুঃখভিক্ষাপ্রণোদিত হইয়া তাহারা অনেক মিথ্যা কাহিনী প্রচার করিয়া গিয়াছে । যে জাতীর পূর্বপুরুষদিগের শৌর্য্যবীৰ্য্যের ইতিহাস আছে, সে জাতি প্রাচীন মহত্ব সংরক্ষণে যত্নবান হয়—একবার হারাইলে লুপ্তগৌরব উদ্ধারের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে । সেই জন্তই ফরাসি ঐতিহাসিকগণ আগাদিগকে

বুঝাইয়াছিল আমরা চিরদিনই ভীক, চিরদিনই কাপুরুষ । এতদিন বাঙ্গালীর ঐ সকল অমূলক কুংসা পাঠ করিয়া আমাদেরও সেই বিশ্বাস জন্মাছিল । ফিরিজীর বিদ্যালয়ে যে সকল ইতিহাস পাঠ্য তাহাতে ভারতবর্ষের কোন বীর-কেশরীর বীরত্বের কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায় না । ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হয়, এই আর্ঘ্যভূমে কেবল কাপুরুষই জন্মগ্রহণ করিয়াছে । ভারতজননী অরণ্যভীত কাল হঠতে বে বীর-মাতা বলিয়া আখ্যাত হইতেছেন ইহা কেবল মিথ্যা কল্পনা মাত্র । যাবদান জনক-জননী সেমন কীকর অঙ্গ স্বীয় সম্বানের করে প্রদান করিতে ভীত হন সেহরূপ ইংরেজ, ভারত-ইতিহাসের সমুচ্চল বীরগাঁথা আমাদের বিদ্যালয়ে বালকদিগকে শিক্ষা দিতে সাহস পায় না । পাছে তাহাদিগের হৃদয়ে অতীত-লুপ্ত-গৌরব-উদ্ধারের অদম্য বাসনা জাগরিত হয় । পাছে তাহারা মহিমাশক্তি পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে প্রয়াস পায়, পাছে কেছো তুলিতে বিষধর সর্প বাতির হঠয়া পড়ে । তাই ইংরাজের ইতিহাসে জালিয়াৎ ক্রাটন মহাপুরুষ ; কিন্তু শিবাজী অত্যাচারী, লুণ্ঠনকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । পরপীড়ক পরতাপহারী হেষ্টিংস দেবভূগ্য ব্যক্তি ; কিন্তু বাঙ্গালীর মুকুটমণি স্বদেশবৎসল প্রতাপাদিত্য, সীতারাম চর্কৃত দম্ভা যাত্র । ইংরেজের ইতিহাসে সকল বুদ্ধেই ইংরেজ জয়ী । একবার একটা সিংহ নগরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল । সে এক গৃহের বারেন্দার একটা প্রতিমূর্তি দেখিতে পাইল । সেই প্রতিমূর্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছে এক সিংহকে একজন মহুষ্য জুতা মারিতেছে । সিংহ সেই দৃশ্য দেখিয়া বলিয়াছিল যদি সিংহকর্তৃক এই প্রতিমূর্তি গঠিত হইত তাহা হইলে উহা অস্ত্র আকার ধারণ করিত । ইংরেজ এ দেশের বীরপুরুষদের সান্তান্যে রাজ্যপাত করিয়াছে কিন্তু এখন দেখাইতে চায় সে বাহুবলে বিশাল ভারতবর্ষটা জয় করিয়াছিল । এট একটা বিরাট মিথ্যা কথা প্রচার করিবার মানসেই ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা এদেশবাসীদিগকে নিতান্ত হীন কাপুরুষ বলিয়া পরিচিত করিতেছে । কিন্তু ইংরেজ আর আমাদের প্রাচীন মহত্বের ইতিহাস আমাদের চকুর অন্তর্গলে লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না । আমরা লুপ্ত গৌরবের সন্ধান পাইয়াছি । ভাষাচ্ছাদিত অগ্নির তায় অতীতের তসমাচ্ছন্ন স্বর ভেদ করিয়া প্রাচীন ভারতের শৌর্য্য-বীৰ্য্যের উজ্জল রশ্মি ফুটিয়া উঠিতেছে । আমাদের বীর্য্যবস্ত, প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষদিগকে আমরা চিনিয়াছি, তাহাদিগকে পূজা করিতে শিখিয়াছি । তাই এখানে আজ প্রতাপাদিত্য উৎসব । তাই বাঙ্গালীর হৃদয়ে লাজ ঠোকাণী-পূর্ণিমান ভ্রমণময়ী, গৌরবময়ী স্থিতি—

আজ বাঙ্গালার গৃহে গৃহে বীরপূজার আয়োজন—কণ্ঠে কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি।

বীরপূজার মহাফল। বীরের স্মৃতি চর্চায় বাহুতে শক্তি আসে, হৃদয়ে বল সঞ্চার হয়, এখানে নবীন আশার মুকুল ফুটিয়া উঠে। প্রত্যেকের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিকাহিনী পর্যালোচনা করিয়া আমরা নবজীবন লাভ করিব। আবার স্বাধীনতা-বৈশাখী-পূর্ণিমা-বাসন্তীর আগমন আশায় বিনিমিত্র নয়নে প্রতীক্ষা করিব। কে জানে, বাঙ্গালীর ভাগ্য কি আছে, হয়-তো কাল সমুদ্র মথিত করিয়া যুগ যুগান্তে স্নানিখল নীল-নভোমণ্ডলে বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র আবার সমুদিত হইবে। আবার বাঙ্গালায় নবীন উৎসবের স্রোত প্রবাহিত হইবে; বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে বাঙ্গালার আকাশ নিনাদিত হইবে, বাঙ্গালীর মলিন অধর প্রান্তে আবার গৌরবের হাসি ফুটিয়া উঠিবে। ভাই নিরাশ হইও না। দিন ফিরিবে, আমরা জাগিব, আমরা উঠিব। বিপাতার দৈববাণী হইয়াছে আমরা উঠিব। আমাদের উন্নতি অনিবার্য। সত্য সত্যই মরা গাঙ্গে আবার বাণ আসিয়াছে। ভাই চিরদিন কোন জাতি পরিত থাকে না। চিরদিন কাহারো ছুঁথে অতিবাহিত হয় না। আবার বৈশাখী পূর্ণিমার প্রতীক্ষায় কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হও। সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি নাহি; আত্মশক্তি ভিন্ন প্রতিষ্ঠা নাই। প্রত্যেকের জীবনী পাঠ কর, প্রত্যেকের গবিত্ত গদাঙ্ক অনুসরণ কর—বাঙ্গালীর দিন ফিরিবে। একা প্রতাপ কি অধৌনিক যমগার সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন মনে হইলেও বিশ্বাস হৃদয় পুঙ্খকিত হয়। ভাই তোমরা নিঃসন্দেহ, নিঃসঙ্কল ভাবিয়া নিরাশ হইও না। সাধু সাধার ইচ্ছা ঐশ্বর্য তাহার সহায়। তোমরা সর্বস্বার্থ বিসর্জন দিয়া, সকল ভয় ছাড় হইতে অপসারিত করিয়া প্রত্যেকের দৃঢ় সংকল্প বহিরা কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর, দেখিবে তোমাদের উন্নতির পথ চিরমুক্ত। প্রতাপ মুহুর্তের জন্ত ভাবেন নাই কে তাহার সহায় হইবে, একবার মুখ ফিরিয়া দেখেন নাই—কে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছে। যদি প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম তোমাদের হৃদয়ে জাগিয়া থাকে তাহা হইলে তোমার সেই প্রেম সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া ভুলিতে পারিবে। একটা প্রদীপ দ্বারা সহস্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেওয়া যায় এক কথা অগ্নিশকুলিঙ্গ দাবানলের সৃষ্টি করিয়া দেয়। একা বুদ্ধ সমগ্র এসিয়া বাগীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, একা চৈতন্য বাঙ্গালায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, একা প্রতাপ প্রবল প্রতাপাধিত দিল্লীধর আকবরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বিরাট বিদ্রোহ প্রাণ্ডিত করিয়াছিলেন। একা গীতাবান কাহাঙ্গীরকে বিধ্বস্ত করিয়া

বাজালীর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে স্বদেশ প্রেম চাই, স্থির সংকল্প চাই, সংগম চাই, অধ্যবসায় চাই নতুবা সফল মনোরথ হইবার আশা সূদূরপরাতত। সাধনার অনল প্রজ্জ্বলিত কর। ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র ভাব, ক্ষুদ্র আশা বিগর্জন দাও ব্যক্তিগত শোকহুঃখ তুলিয়া জাতীয় শোকহুঃখে আপনাব করিয়া লও। জাতির উদ্ধারত্বকে একমাত্র জীবনের লক্ষ্য কর।

আজ এখানে বীরপূজার আয়োজন হইয়াছে। ভাই কথায় বীরপূজা হয় না। নিকাম কর্মের দ্বারা বীরের পূজা করিতে হয়। পুণ্যশ্লোক প্রতাপাদিত্যের পরলোক গত আত্মার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া জোড় করে অবনত মস্তকে বল ভাই আজ হইতে তোমরা আমার সম্মান তইবে, আজ হইতে আমার সেবা-ব্রত এই নম্বর জীবন বিগর্জন দিবে। এই চির অরণীর বৈশাখী পূর্ণিমা রজনীতে বজ্রগজ্জীর স্বরে বস “মস্তকের সাধন কিধা শরীর পাশন”।

শ্রীমতীন্দ্রনাথ মজুমদার ।

পলাতক ।

অবিনাশচন্দ্র তাকে উপরে পাঠাইয়া দিলেন। সে আসিয়া বলিল, “বাবু, এখনই আসিতেছেন।”

অবিনাশচন্দ্র বলিলেন, “এখনই আসিবেন—বসুন, তামাক খান।”

রামলাল বলিলেন না—সেইখানে পড়াইয়াই হুঁকা লইবার জন্ত হাত বাড়াইলেন। হুঁকা লইয়া তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, “নারায়ণ চাটুয্যে বড়ই ভোগাইয়াছে—তাকে পরিতে পারিলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার আছে; সুতরাং সকল পরিশ্রম তখন এক রকম গোবাইয়া বাইবে। ভায়া আর আমার হাত এড়াইতে পারিতেছেন না—এইবার ঠিক জালে পড়িয়াছেন। হুঁকা বাবা, বারবার মুরগী তুমি খেয়ে যাও শান, এইবার মুরগী তোমার নদিব পরাগ।”

অবিনাশবাণু আরার ধীরে ধীরে বলিলেন, “এই যে মহাশয়ের কবিতাতেও বেশ দখল আছে, তা থাক্ বিস্ত আপনি বড় ভুল করিতেছেন।”

রামলাল হাসিয়া বলিলেন, “মহাশয় কতবার বলিব সে রামলাল ভুল করেন

না । এক্ষণ যাহু এক উপায়ে আমার হাত এড়াইতে পারেন—আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড করিতে পারেন, আমার পাঁচ হাজার টাকা পাওয়াতে ছাই দিতে পারেন” বলিয়া হুকুতে খুব জোরে একটা টান দিলেন ।

অবিনাশচন্দ্র বিস্মিতভাবে বলিলেন, “সেটা কি ?”

রামলাল গম্ভীরভাবে বলিলেন, “বিষ খাওয়া—গলায় দড়ি দেওয়া—পিস্তল দিয়া মাথার খুল উড়াইয়া দেওয়া—তা সে যে রকমের লোক শুনিয়াছি তাহাতে তিনটার একটাও সে করিতেছে না । এইবার তাহাকে আচ্ছা রকমে জব্দ করিয়া দিব ; সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কারের পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত হইবে ।”

এইরূপ কথায় প্রায় পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল—তখন রামলাল সহসা কথা বন্ধ করিয়া নিরন্তরভাবে বলিলেন, “মহাশয় আপনার বন্ধু—কি নাম বলিলেন,—এখনও আসিলেন না—জানি, কেন আসিতেছেন না,—আর আমি বিশ্বাস করিতে পারি না । বাধা হইয়া আগাকেই যাইতে হইল ।”

এই বলিয়া তিনি হুকুটা রাখিয়া দ্রুতপদে তেতালার সিঁড়ির দিকে চলিলেন,—অবিনাশচন্দ্র ও তাহার বন্ধুটা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ।

তেতালার সোপানশ্রেণী অতি অপরিসর, তাহাতে অন্ধকার । তাহার কয়েক সোপান উঠিয়া দেখিলেন যে একটা জীলোক নামিয়া আসিতেছে । তাহার সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকা,—অবশুতনে তাহার মুখ আবৃত । তাহাদের উঠিতে দেখিয়া, রমণী এককোণে প্রাচীরের দিকে দাঁড়াইল,—তাহারা দেখিলেন, সে অক্ষুটস্বরে কাদিতেছে, অতি কষ্টে ক্রন্দনধ্বনি চাণিয়া রাখিতেছে ।

রামলাল তাহার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এই সময়ে উপরে একটা বন্দুকের শব্দ হইল—শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল ।

“বা ভেবেছি—বদমাইশ শেষে তাই করিল—একদম সব মাটি” এই বলিয়া রামলাল তিন লাফে উপরে উঠিলেন,—অবিনাশচন্দ্র ও তাহার বন্ধু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন । ত্রিতলস্থ কক্ষের সম্মুখে আসিয়া রামলাল সবলে দ্বারে ধাক্কা মারিলেন । দেখিলেন দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ,—তিনি সবলে দ্বারে ধাক্কা উপরে ধাক্কা দিতে লাগিলেন, কিন্তু দ্বার কিছুতেই খুলিল না ।

ক্রোধ ও নৈরাশ্রে রামলালের মুখ লাল হইয়া উঠিল । তিনি গর্জিতে গর্জিতে বলিলেন, “শালা শেষে গুলি করিয়া মরিল,—এত পরিশ্রম সব মাটি করিল,—আমার প্রোমোগন মাটি হইল,—পাঁচ হাজার টাকা পাইয়া কত কি

করিল মনে করিয়াছিলাম, সব গেল।

সে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের স্থায় অবিনাশচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিল, “তা করিয়া চাহিয়া আর কি দেখিতেছেন ? ডাক্তার চাও—শীঘ্র একজন যাও—একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস—এখনও ভয়-শো মরে নাই—এখনও বেটাকে বাঁচাইতে পারিলে আমার পাঁচ হাজার টাকা মারা যায় না।”

কেহ নড়েন না দেখিয়া তিনি আরও গজ্জিয়া উঠিলেন, “আমি পুলিশের লোক জান না—আচ্ছা শিগ্গা দিয়া দিওঁছি।”

অবিনাশচন্দ্র বলিলেন, “কি হুকুম করেন পলুন।”

“আমি এখান থেকে যেতে পারি না, যাবার ঘো নাই—একজন ডাক্তার এখনই ডেকে আন।”

অবিনাশচন্দ্র বন্ধুকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন। নিকটেই একজন বৃদ্ধ ডাক্তার বাস করিতেন।

তখন রামলাল বলিলেন “শীঘ্র একটা সাবল বা সেইরকম একটা যা কিছু পান আনুন—দরজা ভাঙ্তে হবে।”

অবিনাশচন্দ্র সাবলের অমুগন্ধানে চলিলেন। এষ্টরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া,—অবিনাশচন্দ্র আসেন না দেখিয়া, রামলাল ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহাকে বারংবার চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পর অবিনাশচন্দ্র আসিলেন, ভূত সাবল লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

তখন রামলাল দ্বারে সবলে সাবল মারিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বৃদ্ধ ডাক্তার মহাশয়ও আসিলেন।

তখন দ্বার ভাঙ্গিবার জন্ত সকলে নিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে পাড়ার অনেক লোক আসিয়া সেইখানে সমবেত হইলেন। বাড়ীতে একটা খুন্ গোলামাল পড়িয়া গেল।

(৫)

পুনঃ পুনঃ সাবলের আঘাত করায় দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল।

রামলাল, ডাক্তার বাবুকে সংক্ষেপে বলিলেন, “পলাতক নারায়ণ চাটুয্যেকে অনেক পরিশ্রমে এই বাড়ীতে ধরিয়াছিলাম,—আমার খবর পাঠিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে—গুলি করিয়াছে—দেখুন যদি কোন উপায়ে তাহাকে বাঁচাতে পারেন, নতুবা আমার প্রোগোসন—পাঁচ হাজার টাকা একদম সব নাটি হয়—

ডাক্তার বোধ হয় রামলালের কোন কথাই শুনিলেন না,—তিনি বলিলেই

“সকলে ঘরের মধ্যে বাইবেন না,—আগে আমি পরীক্ষা করিয়া দেখি, ব্যাপার কি ?—গোলমাল আমি ভালবাসি না—বাড়িরে থাকুন ।”

অগত্যা সকলে বাহিরে থাকিলেন,—কেবল ডাক্তারবাবু গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।

গৃহের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ ছিল—তাই ঘরটা কতকটা অন্ধকার—ডাক্তারবাবু সেই অন্ধকারে দেখিলেন, গৃহের একপার্শ্বে একটা দেহ পতিত রহিয়াছে,—তিনি মৃত্যুর সেই দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ।

বাহির হইতে রামলাল পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “মরিয়াছে—একবারে মরিয়াছে—না একটু আশা আছে—সেমন করিয়া হোক টপকে বাঁচান,—ডাক্তার মহাশয় আপনাকে খুব খুশী করিব ।

ডাক্তার বাবু তাহার কথায় কোন উত্তর দিলেন না । বাহিরে রামলালের মাথা তখন অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে ।

কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার বাবু বাহির হইয়া আসিলেন । রামলাল ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “কেমন দেখিলেন—আছে তো—বাঁচিলে তো ?”

ডাক্তার বাবু বলিলেন “বাঁচিলে না কেন ? কোন আঘাত লাগে নাট ।”

রামলাল সোৎসাহে বলিলেন “মার দিয়া কেহ—তবে আর কি—কি হইয়াছে দেখিলেন ?”

“কেবল অজ্ঞান হইয়াছেন মাত্র ।”

“ওঃ—কেবল অজ্ঞান—এখনই ভাল হয়ে যাবে ।—হাতকড়ি সঙ্গেই আছে এখনই পরাব কি ?”

“ভয়ে বোধ হয় মুর্ছা গিয়াছেন—বালিকা বইত নয় ।”

রামলাল লাফাইয়া উঠিয়া মনিস্বয়ে বলিল, “বালিকা !—সে কি মহাশয় !”

ডাক্তার বাবু বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন “আপনি কি বলিতেছেন ?”

রামলাল বলিল “আমি পলাতক নারায়ণ চাটুয্যের কথা বলিতেছি—সে এই ঘরে অজ্ঞান হয়ে আছে ।”

ডাক্তার বাবু বিরক্তভাবে বলিলেন—“মহাশয় গরমে আপনার মাথাটা খারাপ হইয়াছে গৃহে গিয়া বিশ্রাম করুন,—নতুনা চিকিৎসার আবশ্যক হইবে ।”

রামলাল আরও চটিয়া উঠিল, বলিল “আমার মাথা খারাপ হইয়াছে ?”

নতুনা ডাক্তার বাবু অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন । “হাঁ—নিশ্চয়,—এই ঘরে

একটা অন্ন বসুন্ধা জ্বলোক অজ্ঞান অবস্থায় আছেন, —আর কেহ নাই।”

রামলাল চক্ষু বিস্তারিত করিয়া বলিলেন—“জ্বলোক!” তখনই তিনি লক্ষ্য দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই আবার লক্ষ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া উত্তর হন্তে উত্তর জামুতে উপবৃণাপরি সম্বোধন করেকটা চণেটাঘাত করিয়া বলিলেন, “শালা—আমার চক্ষে ধূলা দিয়ে পলাউল—জ্বীর চাদর মুরী দিয়ে আমার চক্ষের মাখন, মিড় দিয়া নাসিয়া গেল—আমি মুখের মত এখনও এখানে দাঁড়াইয়া আছি—ওঃ আমি কি গাথা?”

রামলাল লক্ষ্য দিতে দিতে উদ্ভয়ের ভ্রায় বাড়ী হটতে বাহির হইয়া গেল—

ডাক্তার বাবু বলিলেন—“এই ঔষধ আনিয়া খাওয়াইলেই জ্বলোকটা সুস্থ হইবে;—কোন ভয় নাই।”

ডাক্তার বাবু একটা ঔষধ বাবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভূতা তৎক্ষণাৎ ঔষধ আনিতে ছুটিল।

যখন বিরাজমোহিনীর জ্ঞান হইল, তখন তাহার পার্শ্বে একব্যক্তি বসিয়াছিলেন।

চক্ষু মেলিয়াই তাহাকে বলিলেন। “দাদা।”

‘দাদা বলিলেন ‘হাঁ, তবু নাই—তাহাকে পরিত্রাণে গারে নাই—মে পলাইয়াছে।’

বিরাজমোহিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন ‘ভগবান আমার সহায়।’

বিরাজমোহিনী একটু সুস্থ হইলে তাহার দাদা তাহাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

তখন অনিনাশচক্ৰ মন বুলিয়া উচ্চ হস্ত করিয়া উঠিলেন। তাহার সেই বন্ধুও খুব হাসিতে লাগিলেন—বলিলেন, “নারায়ণ বাবু যে একজন কপটজ্ঞানী লোক তাহাতে সন্দেহ নাই—আমি এক বিন্দুও সন্দেহ করি নাই—মিড়িতে আপনার সন্দেহ হইয়াছিল?”

“হাঁ—হইয়াছিল বই কি।”

“আমার কিছুমাল হয় নাই—রামলালেরও হয় নাই।”

“লোকটা চালাক খুব—ঠিক সময়ে বন্ধুকের আওয়াজ না হইলে সন্দেহ হইত।”

“নারায়ণ বাবু—তানিয়া চিন্তিয়া এসব করিয়াছিলেন—আপনি ইহার কিছুই জানিতেন না?”

“না—কিছুই নয়—তাহাকে একজন অপরিচিত লোক চাহে বলিয়াই সে
বুঝিয়াছিল পুলিশের লোক—অমনই পালাবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল—তাহার
বাহ্যস্থরী আছে—বলিতে হইবে ।”

“হুঁশ্যার—তিনি ফণজন্ম পুরুষ । আপনি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন ?”

“হাঁ, সে আমার বন্ধু—পরম বন্ধু, তাহার জন্ত প্রাণ দিতে পারি ।”

ত্রিপাঁচকড়ি দে ।

হুমায়ূনের আউচ্ যাত্রা ।

(১৫৪০ খৃঃ অঃ)

(৪)

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর যুবরাজ কাশগরান সম্রাটকে নিমন্ত্রণ করেন
কিন্তু যুবরাজের সহচরগণকে সমস্ত দেখিয়া সম্রাটের মন্ত্রিগণ তাঁহাকে সতর্কতা
অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন । সম্রাট ভ্রাতৃ-প্রেমে কুটিলতা নাই ভাবিয়া
সে প্রস্তাব অগ্রাহ করেন । উভয় ভ্রাতা মিলিত হইলে কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার
পর যুবরাজ সম্রাটকে বলেন,—

“জাঁহাপনা ! এ দাস হিন্দুস্থানে প্রবেশের পর হইতে বড়ই অসুখে কালাতি-
পাত করিতেছে । কতকগুলি ছুঁইটনার আমার অসুচরবৃন্দ নির্লজ্জের ছায়া
পলায়ন করিয়াছে । এখন আমাকে কাবুলে (১) যাইবার আদেশ প্রদান
করুন । তথায় বিষয় কার্যের সুব্যবস্থা এবং সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া হজুরে হাজির
হইব ।” সম্রাট তৎক্ষণাৎ ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন পূর্বক কনিষ্ঠকে আশীর্বাদ
করিলেন ।

অতঃপর সম্রাট যুলতান-যাজা স্থির করেন । তাঁহার সৈন্তশ্রেণী রাভিন্দী
অতিক্রম করিয়া হেজারা নামক পল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে এবং
আট মাইল অতিক্রম করিয়া শিবির সন্নিবেশ করে । এই স্থানে সম্রাট জানিতে
পারিলেন, যুবরাজ হিন্দগ এবং যোগদার কুপরানশীর চক্রান্তে সম্রাট-সৈন্তদল
পরিত্যাগ করতঃ কতিপয় অসুচর সহ গুজ্জর অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন ।
ইতিমধ্যে বেহার জেলার শাসনকর্ত্তা কেলানবেগের নিকট হইতে একখানি লিপি

(১) কাবুল, সম্রাট বাবরের প্রিয় আবাস স্থান ও রাজধানী ছিল । See
Edinburgh Gazetteer.

আগত হয়। তাহাতে বেগ সম্রাটকে সাদর আগমণ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং মাধ্যাহ্নসারে সম্রাটের কার্যসাধনে বন্ধনান হইবেন, প্রতিশ্রুত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐরূপ আর একখানি পত্র যুবরাজ কামরানের নিকটও প্রেরিত হয়। সম্রাট তৎবিষয় জ্ঞাত না থাকায়, তৎক্ষণাৎ বেগের আগমণ গ্রহণ করতঃ বেহার অভিযুখে অগ্রসর হন। বৈকালিক উপাসনার পর মোগল-সৈন্য চেনাবনদীর উপকূলে উপনীত হইলে, সম্রাট তর্ডি বেগকে প্রথম পথ প্রদর্শকরূপে নিজ অখারোহণে নদী সন্ধান করিতে আদেশ করেন। তর্ডির অশ্ব কিরদূর সন্ধান দিয়া অগ্রসর হইয়াই প্রত্যাবর্তন করে। তদদর্শনে সম্রাট একটা হস্তী নামাইতে আদেশ করেন। হস্তী সাঁতার দিতে আরম্ভ করিতেই, সম্রাট স্বয়ং নিজ অশ্ব লইয়া নদীতে অবতরণ করেন। তাঁহার অনুচরগণও তৎপথায়ুগরণ করে কিন্তু মাত্র ৪০ জন ব্যক্তি পরপারে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। তৎপর সমস্ত রাজি, পথ-অতিক্রমের পর প্রাতঃকালে সকলে বেহারে উপনীত হন।

বেহারে পৌঁছিয়া সম্রাট দেখিলেন, যুবরাজ কামরান কেবল যে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন তাহা নহে, তিনি কেলান বেগকে বন্দী ও তাহার গৃহ-সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। যুবরাজের এই অতৈধকার্য্যে কুণী কুর্চ্চ নামক জনৈক সম্রাটামুচর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু সম্রাট তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলেন,—“আমি লাহোরে এই প্রস্তাব একবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছি এবং নিশ্চয়ই এখনও তাহাতে সম্মত হইব না। বাণ্ড, আমার জ্ঞাত একটা নূতন অশ্ব আনয়ন কর, আমি খুসানে বাইরা তথাকার শায়নকর্ত্তা হোসেন সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিব।” অনতিবিলম্বে অশ্ব আনীত হইলে, সম্রাট খুসাব অভিযুখে রাজ্য করিলেন এবং পর দিবস মাধ্যাহ্ন সময়ে তথায় উপনীত হইলে হোসেন ও তৎপুত্রগণ কর্ত্তক সাদরে গৃহীত হন। কথাপ্রসঙ্গে সম্রাট হোসেনকে জিজ্ঞাসা করেন,—“কেলান বেগের সহিত কামরান যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তোমার সহিতও যদি সেইরূপ করিবার চেষ্টা করে, তবে তুমি কি করিবে?” হোসেন উত্তর করিলেন,—“আমি সম্রাটের অনুরক্ত ভৃত্য, আপনার হিতার্থেই আমি জীবন উৎসর্গ করিব।” অতঃপর সম্রাট তাঁহাকে মোগল-সৈন্যের সহিত যোগদান করিতে বলেন, হোসেন তাহাতে কোন আপত্তি করেন না।

পরদিবস সকলে খুসাব ভাগ করিয়া সুলতান রাজ্য করিলেন। বার মাইল অতিক্রমের পর তাঁহার এক সংকীর্ণ পথে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহার কিছু

পরেই দুইটা রাস্তার সঙ্গম স্থল, একটা কাবুগ অভিমুখে অপরটা মুলতান অভিমুখে গিয়াছে। হুর্ভাগ্যক্রমে গম্ভাট-গৈস্ত্র এবং কামরানের অমুচরণ একই সময়ে এই সঙ্গমস্থলে উপনীত হয়। গম্ভাট অগ্রে বাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু কামরান তাহাতে আপত্তি করিয়া নিজেই অগ্রে যাইবেন, বলেন। কামরানের এই ব্যবহারে গম্ভাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। মির্জা আবুসেক নামক এক সাহসী বোদ্ধা এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া অশ্ব ছুটাইয়া যুবরাজের সম্মুখে যাইয়া তীব্র ভাষায় তাহার অপাণ্ডিত্য বুঝাইয়া দেন, যুবরাজও তাহাতে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন। এই অবসরে গম্ভাট-গৈস্ত্র পথ পরিষ্কার করিয়া অগ্রে মুলতানের রাস্তায় অগ্রসর হইল, কামরান কাবুগ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কয়েক দিবস পর গম্ভাট গুলবাপুচে পৌঁছিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তথায় তিনি শুনিলেন, যুবরাজ হিন্দল ও যোগদার—তাহারা পূর্বেই গম্ভাট-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—যেছুটিগণ বর্ডুক অবরুদ্ধ হইয়াছেন। তাহারা তাঁহাদিগকে গুলজরটি অভিমুখে অগ্রসর হইতে দিবে না এই স্থানে আরও সংবাদ পাওয়া যায় যে, আফগান সেনাপতি খোয়াজ খাঁ এখনও গম্ভাটের গম্ভাতাছুসরণ করিতেছে এবং তাঁহাদের ৪০ মাইল পশ্চাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

যুবরাজ হিন্দল ও যোগদার আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া গম্ভাট-শিবিরে প্রত্যাবর্তন করতঃ গম্ভাটের পদ-বন্দনা করিলেন।

খুসাব হইতে যাত্রা করিয়া সামান্য অভিবানে গম্ভাট-গৈস্ত্র আউটের (১) নিকটবর্তী হইল। তথা হইতে বন্ধাগেজা নামক এক পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীর নিকট সংবাদ প্রেরিত হয় এবং তৎসঙ্গে ‘খাঁ জাহান’ (পৃথীখর) উপাধি সম্বলিত একখানি ফারমানও তাঁহাকে দেওয়া হয়। একখানি তাম্র একখানি ঢাল এবং চারিটা হস্তী তাঁহাকে উপঢৌকন প্রদত্ত হয়। এই সম্মানের বিনিময়ে যোগল-গৈস্ত্রের খাদ্যসামগ্রী প্রেরণের নিমিত্ত এবং জিনিষপত্র বহনের জন্ত নৌকা (২) সরবরাহ করিতে লেজা আদিষ্ট হন। বন্ধা নিজে গম্ভাটের অভ্যর্থনা করিতে আগমন করেন না, কিন্তু নৌকা প্রভৃতি সরবরাহ করেন।

বন্ধা লেজার প্রদত্ত নৌকাতে আউটের নিকটে নদী উত্তীর্ণ হইয়া, হুমায়ন গৈকত-ভূমি আক্রমণ করিয়া বিকারে উপনীত হইলেন। তথায়

(১) "The Oxysdrace of the Greeks",—Stewart.

(২) Vessels of 200 tons may ascend the river Indus 760 miles. See Edinburgh Gazetteer.

টাট্টার (১) শাসনকর্ত্তা শাহ হোসেন জুলতানের উদ্যানে তিনি শিবির সম্মিলন করেন। শাহ হোসেন, সম্রাট ভাইমুরের বংশাবতংশ, কাজেই 'সম্রাট' উপাধি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

কিয়াদবস অবস্থানের পর সম্রাট, যুবরাজ হিন্দলকে তদীয় অমুচরবন্দ সহ সেওয়ান জেলার পাত্নগরাভিমুখে এবং দির্জা যোদগারকে নদীর চল্লিশ মাইল ভাটিতে বেবিলতে যাত্তে আদেশ করেন। কাবের বেগ এবং রেভারেণ্ড (পীর জাঘে) মীর জাহরকেও দূত স্বরূপে টাট্টার শাহ হোসেনের নিকট প্রেরণ করেন।

দুঃখ নিরাপদে টাট্টার উপনীত হন কিন্তু অনেক দিন গত হইলোও সম্রাট তাহাদের কোনও সংবাদ জ্ঞাত হইতে পারেন না। তজ্জন্ত তিনি তাহাদিগকে হয় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে, না হয় তাহাদের কার্যের কণ্ডূর কি হইয়াছে জানাইতে, বলিয়া পাঠান। প্রত্যুত্তরে তাহারা সম্রাটকে বৈখ্যাবলম্বন করিতে লিখিয়া পাঠান; তাহারা যে সকলো প্রতিনিবৃত্ত হইবে তাহারও ইঙ্গিত করেন। অতঃপর বহুদিবস অতিবাহিত হইল তত্রাচ তাহারা ফিরিলেন না বা আর কোন সংবাদ পাঠাইলেন না। কাজেই সম্রাট পুনরায় লিখিয়া পাঠাইলেন,—“বদি তোমরা শাহ হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে না পার, তবে অবিলম্বে নিকারে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে।” এই আদেশ প্রাপ্তমাজ কাবের বেগ কার্যসামান্য মানসে সম্রাটকে রাখিয়া একাকী টাট্টা পরিত্যাগ করিলেন। আসিবার সময় গুটিকরেক তাম্বু ও গালিচা, নয়টা অশ্ব, একটা উষ্ট্র ও খচ্চর ইত্যাদি রুতিপয় সামান্য দ্রব্য শাহ হোসেনের নিকট হইতে উপহার প্রাপ্ত হন এবং তাহাই সঙ্গে করিয়া রওনা হন।

টাট্টার বাহা ঘটয়াছিল ও বাহা তিনি দেখিয়াছিলেন, কাবের বেগ তৎসমুদয় সম্রাটকে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, শাহ হোসেন প্রথমতঃ সম্রাটের সহিত যোগদান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন কিন্তু পরে কোন ছলে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন তিনি কি করিবেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। এমতাবস্থায় আনাদের অভিধান হইতে নিবৃত্ত থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে।

এই ঘটনার পূর্বে যুবরাজ হিন্দল, সম্রাটের পক্ষ হইতে সেওয়ান বা সেওয়ান জেলা অধিকার করিয়া গইবার অমুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু

সম্রাট তৎকালে তাহাতে আপত্তি করিয়া তাঁহাকে জানান—“সেওয়ান শাহ তোমেনের শাগনাদীন ; আমি তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছি । তাহার কিসিয়া না আসা পর্যন্ত এ কার্যে হস্তক্ষেপ করা যায় না ।” এখন দুতের বাচনিক সমস্ত অবগত হইয়া সম্রাট, যুবরাজকে তৎবিষয় বলিয়া পাঠাইলেন এবং জানাইলেন যে, সম্রাট-সৈন্য শীঘ্রই তোমার সহিত মিলিত হইবে, তৎপর তুমি তোমার কথামত কার্যে প্রবৃত্ত হইও ।

অতঃপর সম্রাট যাত্রা করিলেন এবং চারিদিনে বাহেলিতে উপনীত হন । তথায় মির্জা যোগদার শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন । সম্রাটের আগমন সংবাদ জ্ঞাত হইয়া যোগদার মহাসমারোহে আতিথ্য সৎকার করিলেন । তৎপর দ্বিগুণ সম্রাট পুনরায় যাত্রা করিলেন । তিনি মির্জাকে বলিয়া গেলেন যে, তিনি স্বয়ং যুবরাজের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে যাইতেছেন । তুমি যেখানে আছ সেইখানেই অবস্থান কর, পরে তোমার কর্তব্য বিষয় জানান যাইবে ।

তিন দিন পথভ্রমণ করিয়া সম্রাট, ঈন্দাসের কুড়ি মাইল পশ্চিমস্থিত পাতনগরে উপনীত হইলেন । যুবরাজ হিন্দল, নগরের বহির্ভাগে আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং সম্মানে তাঁহাকে নিজ আবাসে লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচর্যা রত হইলেন ।

শ্রীব্রজসুন্দর সাম্রাট ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ।)

পুরাকালে যখন মহিষাসুর অসুরগণের ও পুরন্দর নাগক ইন্দ্র দেবগণের অধিপতি ছিলেন, তৎকালে শত বর্ষ পর্যন্ত দেবাসুরের সংগ্রাম হইয়াছিল । সেই যুদ্ধে মহাবলশালী অসুরগণ কর্তৃক দেবসৈন্য পরাজিত হইলে সমগ্র দেবগণকে জয় করিয়া মহিষাসুর স্বয়ং ইন্দ্রকে গ্রহণ করিয়াছিল ।

দেবাসুরের যুদ্ধে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের ভায় দেবশক্তির সহিত পুরুষকারের

শতাব্দে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারিলে ইন্দ্র লাভের অধিকারী হওয়া যায়, সেই জন্য ইন্দ্রের এক নাম “শতক্রতু”। পুরন্দর শতাব্দে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দৈবশক্তি প্রভাবে (অদৃষ্টবলে) ইন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহিষাসুর পুরুষকার প্রভাবে বাহুবল দ্বারা পুরন্দরকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং দৈবশক্তির সহিত পুরুষকারের যুদ্ধে প্রথমতঃ পুরুষকারেরই জয় হইল। কিন্তু যখন গর্ভাক্ষ মহিষাসুর অধ্যক্ষাচারী হইয়া দৈবগণ ও প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, তখন ক্রুদ্ধ দৈবগণের শরীর হইতে ঐশীশক্তি আবির্ভূত হইয়া মহিষাসুরের (বা অধ্যক্ষের) বিনাশ এবং দৈবগণকে (বা সাধুদিগকে) রক্ষা করিলেন।

এহলে চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে দৈবগণ সেই অসুরনাশিনী ঐশীশক্তির ত্বন করিয়া বর প্রাপ্ত হইলেন যে, আবার যখন দৈবগণ কোনরূপ বিপদে পতিত হইয়া সেই মহাশক্তির শরণাপন্ন হইবেন তখন আবার তিনি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন।

অপরঞ্চ—

“পুরা শুভ নিশুস্তাভ্যা মসুরাভ্যাঃ শচী পতেঃ।

ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হুতা মদবলাশ্রয়াৎ ॥

পুরাকালে শুভ নিশুস্ত নামক অসুরদ্বয় গর্ভ ও শক্তিবলে দেবরাজ ইন্দ্রের ত্রিলোকাধিপত্য ও যজ্ঞভাগ ভ্রমণ করিয়া, তাহারাই চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের, বস ও বরুণের অধিকার গ্রহণ করিল এবং তাহার। বায়ু ও অগ্নির কার্য্যও সম্পাদন করিতে লাগিল।

এহলেও পুরুষকারের নিকট দৈবশক্তি পরাস্ত। দৈবশক্তি-সম্পন্ন শতক্রতু ইন্দ্রের অদৃষ্টায়ও অধিকার শুভ, নিশুস্ত পুরুষকার প্রভাবে অগ্রহরণ করিল।

অনন্তর দৈবগণ, শুভ-নিশুস্ত মহাসুর কর্তৃক পরাস্ত, তিরস্কৃত এবং স্বর্গরাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া, অপরাধিতা শক্তিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর দৈবগণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া কোষিকী নামী ঐশী শক্তি হিমালয়ের শিখরদেশে মনোহারিণী মূর্তিতে আবির্ভূত হইলেন।

শুভাসুর দূতমুখে কোষিকীর অলোকগাম্যস্ত রূপের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার পাণি গ্রহণের প্রস্তাব করিলে পর, দেবী বলিলেন—“যে আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিলে, আমি তাহারই গৃহিণী হইব।” শুভাসুর

দেবীর অবস্থিত গর্ভিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোশে চিত্তাতিত জ্ঞানশূন্য হইলেন, এবং ধূম্রলোচন নামক অশ্বের প্রতি দেবীকে কেশাকর্ষণ পূর্বক আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন। সেট যুগ্মে দেবীর সহিত শুভ্র-নিশুভ্রের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এবং সেই যুদ্ধে শুভ্র-নিশুভ্র মটৈসে নিধন প্রাপ্ত হইল।

এস্থলে দেবগণকে দেবী বলিয়াছিলেন,—

“ইথং বদা বদা বাবাদান বোধঃ ভবিস্যতি।

তদা তদা বতীর্ণ্যাতং করিষ্যামাসি সংফয় ॥

* * * * *

রক্ষাং সি ক্ষয়িষ্যামি মুনিগাং জ্ঞান কারণাং ॥”

এইরূপ সখন বধন দানবকর্তৃক (অশ্বমুদ্রার) গীড়া উপস্থিত হইলে, সেই সেই সময় আমি অবতীর্ণা হইয়া অরিকুণ সংহার (অশ্বের নাশ) করিব এবং মুনিদিগের (সাধুগণের) পরিজ্ঞানের জন্য আমি রাক্ষসগণকে (হুঙ্করের) নিধন করিব।

এস্থলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়,—

“যদা বদাতি ধম্মন্ত” গীতার এই ভগবদ্ভক্তির সহিত চণ্ডীর এই—“ইথং বদা বদা বাবা” ইত্যাদি, দেবীর উক্তির বিরূপ অভিন্ন ভাব, একবাক্যতা ও ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষ।

গীতাত্তে কর্মযোগের শ্রেষ্ঠতা, এবং দৈব অপেক্ষা পুরুষকারের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং চণ্ডীতে দেবাসুর সংগ্রামাভিনয়ে তাহা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কলতঃ গীতা ও চণ্ডী উভয় গ্রন্থেই—

“উৎসোগিনঃ পুরুষসিংহ মুদৈতি লক্ষ্মী।

দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি ॥”

এই বাক্যের পোষকতা করিয়া অদৃষ্টবাদী অলস ব্যক্তিকে পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

কিন্তু পুরুষকারের বধন অপব্যবহার হইয়াছে, অর্থাৎ সাধুতার পরিবর্তে অশর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জগতে অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে, তখনই ভগবান্ দেহ রচনা করিয়া ঐশীশক্তি প্রভাবে হুঙ্করের (অশ্বের) বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন দ্বারা সাধুর পরিজ্ঞান করিয়াছেন।

সুতরাং ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে; গীতা ও চণ্ডীর প্রধান উদ্দেশ্য এক।

গীতার আর একটি প্রধান উপদেশ, —

“সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঃ ভিজায়তে ।

ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতি বিস্ময়ঃ ॥

স্মৃতি ভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ অণশ্চতি ।

আসক্তি হইতে কামের উৎপত্তি, কামের অপূর্ণতার ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে সংমোহ (কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা শূন্যতা), সংমোহ হইতে বুদ্ধিনাশ, এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

গীতার এই উপদেশটি চণ্ডীতে শুভ-নিশুভ বধ উপলক্ষে অভিনীত হইয়াছে । যখন দেবগণের স্ততিতে পরিতুষ্ট হইয়া জগদম্বা কোষিকী নাম্নী মনোহারিনী রমণীরূপে হিমালয়ের শিখরদেশে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন শুভ-নিশুভের ছুত চণ্ড-মুণ্ড নামক অসুর নিরুপমা রূপবতী দেবীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া দৈত্যরাজ শুভুর নিকট বাহ্যা নিবেদন করিল, — মহারাজ ! একটি পরম রূপবতী রমণী রূপপ্রভায় হিমাচল উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থিত করিতেছে । একরূপ আলোকমানন্ত অকুল রূপরাশি কেহ কখন অবলোকন করে নাই । অতএব এই রমণীর বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে গ্রহণ করুন । আলোকের বে স্থানে যে শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিল সে সমস্তই আপনি আপনার গৃহে আনয়ন করিয়াছেন ; কিন্তু একরূপ জ্বরিত কেন আপনি গ্রহণ করিতেছেন না ? দৈত্যেশ্বর শুভ, চণ্ডমুণ্ডের আশুত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগীব নামক অসুরকে দেবার নিকট প্রেরণ করিলেন ।

আসক্তিই পাপের প্রধান কারণ । আসক্তি হইতে ভোগতৃষ্ণা জন্মে । বধা—

“সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ ।

অনন্তর দৈত্যরাজ শুভুর আদেশে, সুগ্রীব দেবীর নিকট গমন করিয়া বলিতে লাগিলেন, —

হে দেবি ! আমি আলোকের পরমেশ্বর দৈত্যেশ্বর শুভের দূত, তাহাধারা প্রেরিত হইয়া আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি । যাহার আজ্ঞা দেবগণ মদ্যেও কখন প্রতীহত হয় না ; সমস্ত শত্রুগণ যাহাধারা নির্জিত হইয়াছে, সেই দৈত্যেশ্বর শুভ আপনাকে বাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন । (ক্রমশঃ)

শ্রীজগদীশ ঠাকুর ভাষ্য ।

অশ্রু ।

অশ্রু! আমি তোমায় বড় ভালবাসি। তোমার ঐ স্বচ্ছ-সুন্দর রক্তোজ্জ্বল মুষ্টিটা আমার বড়ই লাগে; তোমার অন্তর-রাজ্যের সদস্যানী অনন্ত সৌন্দর্যের বিশ্বাস পান করিয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি। অশ্রু! মনে করিয়া দেখ, মাতৃকোল হইতে নামিয়া যখন দীরে—অতি দীরে জ্ঞানরাজ্যে প্রথম পা ফেলিতে ছিলাম, সেই শুভ মুহূর্ত্তে তোমায় আমার প্রথম আলাপ পরিচয়, তারপর কত দীর্ঘ অবসর কাটিয়া গিয়াছে—কখন নীরব মধ্যাহ্নে ছায়ালীতল কনিদাস্তরে, কখনও স্নিগ্ধ অপরাহ্নে শুষ্ক তটিনীর তটভূমে, কখনও বা নীরব নিশীথে নিরালোক রুদ্ধকক্ষে তোমায় আমার কত স্বেপাদেখি মিশামিশি ভাল-বাগাবাগি চলিয়াছে। আমি কি তোমায় ভুলিতে পারি, বতদিন আমি আছি, ততদিন তুমি আমার, আমি তোমার; কণকালের ক্ষণও তোমাকে চক্ষুর বাহিরে দিতে ইচ্ছা হয় না। তাই নয়নকোণে তোমার শয়ন-সুন্দর রচনা করিয়া দিয়াছি।

অশ্রু! তুমি কি ছিলে, কোন্ যুগে কার অভিশাপে অবনীতে প্রথম অবতীর্ণ হইলে কোরাণে পূরণে তাহার সন্ধান পাই না। গোড়া ঐতিহাসিক যুগিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় নিয়া মাথা ঘামায়; অশোকের জীবনী আলোচনায় সময় কর্তন করে; দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেশের বাহাবা পাইবার ব্যর্থ আশা হৃদয়ে পরিপোষণ করে—কেবলি চর্কিত-চর্কণ নকল-তরঙ্গমার বাড়াবাড়ী—কেবলি উজ্জ্বলিত কণ্ঠের নিবৃত্তির আয়োজন—মৌলিক চিন্তার অবসর তাহার নাই। তাই তোমার জীবনের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ হয় নাই। না হোক্, আজ শব্দক সাহায্যেই সমুদ্র সিঞ্চন করিব; আজ ক্ষুদ্র বুকের সহায়তাই ত্রিকালদর্শী পুরুষের ভায় তোমার ভূৎ-ভবিষ্যৎ গণনা করিব; আজ অপরিস্রব জ্ঞান লইয়াই তোমার জীবনী আলোচনায় ব্যাপ্ত হইয়া স্বয়ং কর্তব্য সম্পাদন ও জীবন যজ্ঞ করিব।

অশোকের প্রহে বাহার প্রসঙ্গ নাই, শোকের প্রহাদিতেও যে তত্ত্বের সীমাংশ নাই, তদালোচনায় আবৃত্ত হইয়া বিজ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অন্ত উপায় নাই। সুতরাং তোমার জন্ম-মৃত্যুর কাল নিরূপণ করিতে বাইরা অশ্রু! বিজ্ঞান শাস্ত্রেরই শরণ লইতে হইগ। কার্যদৃষ্টে কারণ নির্ণয় কর, বিজ্ঞানের এই সনাতন উপদেশানুসারে তোমার প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া নির্ণয় করিয়াছি, তুমি অর্গের কেহ ছিলে; মামুষের

প্রতি তোমার প্রীতির ভাব এবং তাহার সহিত তোমার অচ্ছেদ্যস্বজনরূপ কার্যদৃষ্টে
গিফাক্ত করিয়া লইয়া ছ, তুমি জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভকালে আদি মানবের সঙ্গে
পৃথিবীতে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছ এবং শেষ মানবের সঙ্গে প্রায়-জলধিঞ্জে
আত্ম-বিসর্জন করিবে। বিজ্ঞানের প্রসাদাৎ তোমার আনির্ভাব-তিরোভাবের
সময় নির্ণীত হইল, এক্ষণে তোমার মর্ত্যসংসারের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করিয়া
তোমার শক্তি-সামর্থ্য ও সুকর্ম-কুকর্মের পরিচয় গ্রহণ করিব।

অশ্রু! তুমি কি? তুমি সংসার-মরুভূমিতে শান্তির ফোয়ারা অথবা
নিদাঘ-নিপীড়িত সংসারাকাশের বর্ষমান নবঘন। তুমি কি? তুমি মানুষের
শৌভের কবল, প্রীত্বের অশল; তুমি বোগের প্রত্যাশ, রোগের ভেষজ; তুমি
হৃর্তিক্ষের অনগজ, প্রণয়দরবারের প্রেমগজ,—অথবা ঠহা অপেক্ষাও নদি কোম
প্রিয় জিনিস মানুষের থাকিয়া থাকে তবে তুমি তাহাই। তুমি স্নেহে দুঃখে সকল
সময়েই মানুষের সহচর, স্মরণ্য প্রকৃত বন্ধু।

অশ্রু! তুমি অমরা সাধনের শক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছ। তুমি
বিন্দু হইয়াও গিকুর ছায় ফমতাশালী। মানুষের ভাষা যখন ভাবের বোঝা বহন
করিতে অসমর্থ হয়, তখন তোমার ঐ বিন্দুদেহে, গিকুর আবাস-প্রতিবধ
যারণের ছায় আমূল মানব হৃদয়টা প্রতিবিম্বিত করিয়া থাকে। দর্শক উহাতে
কখনও নিষীদের খরকরবাণ প্রভারজনিত ক্ষতিচক্ৰ সন্দর্শনে মহাভূতীর
আরোগ্যকর প্রলেপ হস্তে সে হৃদয়-অধিকারীর নিকট উপস্থিত হয়; কখনও
প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার রমণীয়া কমনীয়া রমবিলাসিনী প্রতিমা প্রত্যক্ষ করিয়া
তাহার উপাসনার আত্মপ্রাণ নিয়োজিত করিতে ব্যাকুল হয়। কখনও
বা অপার্থিব প্রেমের জ্যোতির্কর্মণ্ডিত বরাভয়দায়িনী সনাতনী মূর্তির অধিষ্ঠান
লক্ষ্য করিয়া প্রোম্পত হৃদয়ে জগৎস্রষ্টার প্রশংসাকীর্ণনে দিগন্তল মুগ্ধরিত
করিয়া তুলে। সেই জন্মই হৃতপত্রিক রাসচক্রে অপ্রবিন্দু নিরীক্ষণ করিয়া
ব্যাধাশ্রুদের মর্কটপ্রাণও অধীর হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাজ্যলষ্ট কপিশ্রেষ্ঠ সূত্রীভের
অশ্রুতে গত্যসক্ত সংবসী রবুকুলপতির হৃদয়েও জিহ্বাসাবৃত্তি প্রবল হইয়া
পড়িয়াছিল। সেই জন্মই কুরুমভানমো অপমানিতা, লাহিতা রাজসেনীর
অশ্রুতে কুরুকুলধ্বংসের একটা মহাপ্রতিজ্ঞা অদৃশ্যে জাগিয়া সিয়াছিল। সেই
জন্মই নৈক্যকরির 'মথুরাবাসিনী মধুরাসিনী শ্রামবিলাসিনী' আয়ান-পৃথিবীর
কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তে মথুরার আভীর অন্তঃপুর হইতে একটা উন্নত আকাজকা ব্যাকুল-
ভাবে বৃন্দাবনের তমাল-তরুদিকে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সেই জন্মই 'নবের'

দায়ের' প্রেক্ষিতে সমস্ত নদীরায় বাণ ডাকিয়াছিল, এবং জ্বল-প্রজ্বলিত
জীর্ণপাতে অরুণ ভগবানকে পর্য্যন্ত ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আঁসিতে হইয়াছিল ।
অথবা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ জন্ম এতদূরেই বা বাই কেন—এই দৃশ্যমান জগতে, হৃৎস্পী
বিবাদ-বিদগ্ধ-বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বহুদিন পর মিশ্রিত দম্পতি অথবা
পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্মুখে দাঁড়াইলে এবং ধ্যানমগ্ন পুণ্যাত্মা মাধু গজেনের
সমীপবর্তী হইলে, ইহার জাজ্ঞ্যামান প্রমাণ প্রত্যক্ষীভূত হয় ।

অশ্রু ! তুমি দর্শককে যেমন শাস্ত কর, আশ্রিতকে আবার তেমনি শাস্ত
কর । মাধব যখন ছুখে অভিভূত হইয়া পড়ে, যখন তাহার শোক-সমুদ্র
উচ্ছ্বসিত হইয়া হৃদয়ের কুলে কুণে ভীমবেগে আঘাত আরম্ভ করে, সে যখন
অনন্তগতি হইয়া প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুকামনা করিতে থাকে, সেই সঙ্কট সময়ে
অশ্রু ! তুমি তাহার নয়নকোণে আগিয়া দেখা দেও, গোঁমাতে কি আছে
জানি না, কিন্তু দেখিতে পাই, তোমার আবির্ভাবে যে উন্নত সিঙ্কার তরঙ্গফণা
সঙ্কচিত হইয়া পড়ে—তুমি বিন্দু হইয়াও সে সিঙ্কারি রোদ্রভেজে শুষ্ক করিয়া
লাও, মাধব অকুল হইতে কুলে পহুছে । আহারাভাবে যেমন মৃত্যু ঘটে, আশ্রি
আহারও আবার তেমনি মৃত্যু সহচর অতিসারকে আহ্বান করিয়া আনে ।
অতি দুঃখে যেমন জীবনসঙ্কট উপস্থিত হয়, অতি সুখে তেমনি আবার জীবন-
সরপের সন্ধিস্থলে আনিয়া পৌঁছাইয়া-দেয় । তাই সুখে দুঃখে সকল সময়েই
নয়ের নয়নকোণে তোমার আবির্ভাব দেখা যায় । ধন্য অশ্রু ! ধন্য তোমার
জীবন ! তুমি নীরবে মানবসংগীর কি মহান উপকারই না সাধন
করিতেছ ।

খৃষ্টানের ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেল' বলিতেছেন—

"জন্মদিন অপেক্ষা মরণদিন ভাল । ভোজগৃহে বাগুরা অপেক্ষা বিলাপগৃহে
বাগুরা ভাল । হাত্ত হইতে মনস্তাপ ভাল ।" উপরোক্ত বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত
সংস্করণে এইরূপ দাঁড়ায়—হাগি অপেক্ষা অশ্রু ভাল । কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য ।
বিস্ময়জনকভাবে আকাশ পরিষ্কৃত হয় না, কর্ণণ চাই । হাগিতে হৃদয়ের গুরুভার
বিদ্রুত হইতে পারে না, অশ্রুর আবশ্যক । সেই জন্যই অশ্রু ! তোমার এত
ভালবাসি ।

বলিয়াছি অশ্রু !, আমি কেন গোমায় এত ভালবাসি । লোকের আলি-
নিয়া-উপেকার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আমি তোমার ভালবাসিতেছি
একে ভালবাসি । তবে তুমি এখানে সেখানে অমন ছুটছুটি করিয়া ফের কেন ?

তোমার অন্তর কাছে দেখিলে আমার মনে বে নিদারুণ হিংসা আসিয়া উপস্থিত হয় অশ্রু!—আমার চিত্তচাক্ষুণ্য নিবারণ হঃসাপা হইয়া উঠে। তুমি সঙ্গে না থাকিলে আমার অন্তর যে পুড়িয়া থাক হইয়া যায়। তাই বলি অশ্রু! তোমার এই আশ্রিত প্রেমাকাঙ্ক্ষটাকে ফেলিয়া আর কোথায়ও যেও না।

পাটলিপুত্র

শাক্যবংশাবতঃ ভগবান্ বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি সময়ে বিশ্বমার মগধের অধিপতি ছিলেন। এই সময়ে রাজগৃহ নগর মগধের রাজধানী ছিল। ভগবানের কি অনির্বচনীয় প্রভাব, তিনি রাজগৃহে পদার্পণ করা মাত্র ভক্ততা আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ভগবানের প্রেমে মত্ত হইয়া গেল। স্বয়ং নরপতি বিশ্বমার বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিলেন। মহিষী ক্ষেমাদেবী ভিক্ষুণী হইয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। নগরে মহাগোলযোগ হইল; কিয়ৎকালের জন্ত মহামায়ার প্রভাব রাজগৃহ হইতে অন্তরিত হইল। রাজগৃহবাসিগণ সংসারে বীতরাগ হইলেন।

এই সুযোগে বিশ্বমারের পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া রাজগৃহের সিংহাসন অধিকার করেন। অজাতশত্রু প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। এই সময়ে বর্তমান পাটনা নগরের স্থান পাটলিগ্রাম বলিয়া কথিত হইত। পাটলির সংলগ্ন ভাগীরথীর উত্তর তীরে উজ্জীয়গণ বাস করিতেন।

উজ্জীয়গণ অতি পরাক্রান্ত ছিলেন। উজ্জীয়গণ বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে দমন করার জন্ত অজাতশত্রু পাটলিগ্রামে এক দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করেন। ভগবান্ পাটলিগ্রাম দৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—“উত্তরকালে এই গ্রাম এক পরম রমণীয় নগরে পরিণত হইবে।” অজাতশত্রু কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে কুশীনগরের নিকটবর্তী আশ্রকাননে ভগবান্ নিৰ্ব্বাণপ্রাপ্ত হন।

অজাতশত্রুর বংশধর উদয়শ্চ পাটলিপুত্র নগর সংস্থাপন করেন। এই বংশীয় শৈবীরপতি রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্র নগরে রাজধানী পরিবর্তন করেন। এই নরপতি শকাব্দ ৪৯৫ বৎসর পূর্বে মানবলীলা সম্বরণ করেন। অনন্তর মগধবংশীয় প্রথম নরপতি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মগধের রাজধানী প্রথমতঃ গিরিব্রজ নগরে অবস্থিত ছিল, পরে রাজগৃহ নগরে রাজধানী পরিবর্তিত হয়। রাজগৃহ নগরের চতুর্দিকে পর্বতমালা প্রাচীরের কাছা সন্মানন করিত। পর্বতোপরি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। রাজগৃহ এক্ষণ রাজগীর পাহাড় বলিয়া কথিত হয়। বারাণসীর দক্ষিণ পূর্বদিকে রাজগৃহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টি হইয়া থাকে। কতিপয় উন্নত স্তূপ রাজগৃহের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

নন্দবংশীয় নরপতিগণের সময় পাটলিপুত্র নগর মগধের রাজধানী ছিল। তাঁহারা শতাধিক বর্ষ রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্ব সময়ে য়ুনানী সম্রাট সেকেন্দর ভারতবর্ষে আগমন করেন। তদনন্তর সুবিখ্যাত চন্দ্রগুপ্ত মগধ-সাম্রাজ্য অধিকার করেন।

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে য়ুনানী দূত মিগাস্থিনিস পাটলিপুত্র নগরে কতিপয় বৎসর বাস করেন। তিনি পাটলিপুত্র নগরের বৃত্তাক্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শকাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান পাটলিপুত্র নগর দর্শন করেন। আমরা তাহাদের বর্ণিত বৃত্তাক্ত হইতে পাটলিপুত্রের বিবরণ প্রদান করিব।

পাটলিপুত্র নগর সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ; এই নগর কখন কখন কুমুমপুর বলিয়া কথিত হয়। সেখানে হিরণ্যবাহনদ স্রোতস্বতী ভাগীরথীতে সন্মিলিত হইয়াছে পাটলিপুত্র সেই সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। হিরণ্যবাহুর বর্তমান প্রচলিত নাম শরণদ। সম্রাটের প্রাসাদ ভাগীরথী তটে অবস্থিত ছিল ; তাহা সুগাঙ্গ প্রাসাদ বলিয়া কথিত হইত। পাটলিপুত্র দীর্ঘ আট কোশ এবং প্রস্থে দেড় কোশ বিস্তৃত ছিল ; কাঠময় প্রাচীর দ্বারা নগরের চারিদিক পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাচীর অতি সুদৃঢ়। নগরে প্রবেশ করার জন্য ৬৪টি দ্বার ছিল। শকাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে ফাহিয়ান এই কাঠময় প্রাচীর দর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই প্রাচীরের উপরে ৫৭০ টি গুহজ ছিল। নগরের মধ্য হইতে শর সন্ধান করার জন্য প্রাচীর মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র ছিল। কাঠময় প্রাচীর রক্ষার্থ প্রাচীর সংলগ্ন অসংখ্য কাঠময় স্তম্ভ ছিল। প্রাচীরের বাহিরে সুগভীর পরিখা ছিল, পরিখা প্রস্থে ৪০০ হস্ত পরিমাণ এবং বিংশতি হস্ত পরিমাণ গভীর। নগর জ্যামিতির চতুর্কোণ সমান্তরাল ক্ষেত্রের আয় ছিল।

মিগাস্থিনিস বলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে নগর পর্য্যবেক্ষণ জন্য ত্রিশ জন কার্যকারক নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের পাঁচ পাঁচ জনে এক এক ভাগ, এই নিয়মে

ইহারা ছয়ভাগে বিভক্ত ছিলেন। একদল পরিশ্রমার্জিত দ্রব্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। দ্বিতীয় দল বিদেশীয় ব্যক্তিগণের আদর অভ্যর্থনা করিতেন; তাঁহাদের বাসস্থান ঠিক করিয়া দিতেন; ইহাদের কার্য্য কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন; ইহারা কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন গোপনে তাহা অনুসন্ধান করিতেন; বিদেশীয় ব্যক্তিগণ পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া সাগরার সময় ইহারা দেশের প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগমন করিতেন; বিদেশীয় কোন ব্যক্তি পাটলিপুত্র নগরে পরলোক গমন করিলে তাঁহার সৎকার করিতেন, তাঁহার ভাতৃ সম্পত্তি তাঁহার আত্মীয়ের নিকট প্রেরণ করিতেন এবং বিদেশীয় কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে তাঁহার চিকিৎসার উপায় করিয়া দিতেন।

তৃতীয় দল জম্ম মৃত্যুর তালিকা করিতেন। চতুর্থ দল বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। বিক্রেতাগণ যে ওজন দ্বারা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেন, ইহারা তাহার শুদ্ধতা পরীক্ষা করিতেন এবং পণ্য দ্রব্য বাহাতে উপযুক্ত সনয়ে উপযুক্ত স্থানে বিক্রয় হয় ইহারা তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

পঞ্চম দল শিল্প দ্রব্যের তত্ত্বাবধান করিতেন; কোন বিক্রেতা পুরাতন ও নূতন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতে না পারেন তৎপ্রতি ইহারা দৃষ্টি রাখিতেন।

ষষ্ঠ দল রাজকীয় কর আদায় করিতেন।

এই ছয় বিভাগ ব্যতীত রাজকীয় অসংখ্য কার্য্যকারকও ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশীয় পণ্য দ্রব্য বিক্রয় স্থান পরিদর্শন করিতেন। কোন কোন ব্যক্তি নৈমন্ত্যদিগের কার্য্য পরীক্ষা করিতেন। মগদ সাম্রাজ্য মধ্যে প্রদান প্রদান যে সমস্ত নদ নদী প্রবাহিত ছিল, এই সমস্ত নদ নদীতে বাণিজ্যের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করার জন্ত একশ্রেণীর কার্য্যকারক নিযুক্ত ছিলেন। কেহ কেহ দেশীয় পয়ঃপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব সময়ে একদল কার্য্যকারক দেশের ভূমি জরিপ করিতেন। যাহারা স্থানে স্থানে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া হিংস্রজন্তু বধ করিত তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করা এক দলের কর্তব্যকর্ম্ম ছিল। একদল দেশীয় কাষ্ঠ বিক্রেতা, স্তম্ভধর, কন্মকার এবং খনি খননকারকদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এই শ্রেণীর কার্য্যকারকগণ রাজ্য মধ্যে বস্ত্র নির্মাণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে দ্রব্য নির্ণয়ের জন্ত এক একটা কাষ্ঠ পুতিয়া রাখিতেন। *

একদল কার্য্যকারক রাজকীয় প্রাগাদ কুলিকাদির তত্ত্বাবধান করিতেন।

ইহারা সর্বসাধারণের উপাসনার মন্দিরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, এবং দেশীয় বন্দরের পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদের কার্য্য ছিল ।

নগরে প্রজাগণের বিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য কতিপয় প্রাঙিনাক নিযুক্ত ছিলেন ।

এতৎসাত্তীত নৈমিক বিভাগে কতিপয় কার্য্যকারক নিযুক্ত ছিলেন । ইহারাও ছয়ভাগে বিভক্ত ছিলেন । প্রথম দল যুদ্ধ-তরীর নৌসেনাপতির আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন এবং সৈন্তগণের ও পশ্বাদির আত্মর্য্য ইত্যাদি ও যুদ্ধোপযোগী বিবিধ জায়গস্তারনাই পো-শকট সমূহের তত্ত্বাবধান করিতেন ; দ্বিতীয় দল যুদ্ধ সময়ে বাস্তবকর, অশ্বের পরিচর্যাাকারক এবং সেই শ্রেণীর অন্যান্য ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন । পশ্বাদির জন্য উপযুক্ত ঘাস সংগ্রহ করার ভার ইহাদের প্রতিপত্ত ছিল ।

এই সমস্ত কার্য্যকারক মধ্যে তৃতীয় দল পদাতিকগণের তত্ত্বাবধান করিতেন, চতুর্থ দল অস্বারোহিগণের, পঞ্চম দল, রথারোহিগণের এবং ষষ্ঠদল হস্তারোহিগণের কার্য্য পর্যবেক্ষণ করিতেন ।

অশ্ব এবং হস্তা রাখবার জন্য অশ্বশালা ও হস্তাশালা নির্দিষ্ট ছিল । যুদ্ধের অন্তঃশস্ত্রাদি রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত অট্টালিকা ছিল ।

চীন-পরিব্রাজক কাহিয়ান শকাব্দার চতুর্থ শতাব্দীতে পাটলিপুত্র নগর দেখিয়াছেন কিন্তু শকাব্দার ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিয়ান্ সাঙ্ পাটলিপুত্রের ভ্রমাবশেষ দেখিয়াছেন । অতএব ইহার মধ্যে কোন সময়ে (সম্ভবত শকাব্দার পঞ্চম শতাব্দীতে) পাটলিপুত্র নগর ধ্বংস হইয়াছে । পাটলিপুত্রের বর্তমান নাম পাটনা ; কিন্তু শগনদ বর্তমান পাটনার নিকট ভাগীরথীতে সম্মিলিত হয় নাই । কালে শগের গতির পরিবর্তন হইয়াছে । প্রাচীন সাময়িক কোন কোন নদীর অস্তিত্ব নিলুপ্ত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে নৈমিক সরস্বতী সর্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য । কোন কোন নদ নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়াছে । এক সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ জিলা দুইভাগ করিয়া ময়মনসিংহ নগরের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত ; এক্ষণ ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ নগর হইতে ত্রিশকোশ ব্যবধান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে ; ব্রহ্মপুত্র নদ এক্ষণ ময়মনসিংহ জিলার পশ্চিম সীমা । এক্ষণ সে নদ তথায় যমুনা নদী নাম ধারণ করিয়াছেন । অতএব শগনদ পাটনার নিকট গঙ্গায় সম্মিলিত হয় নাই এক্ষণ পাটলিপুত্র এবং পাটনার অভিন্নত্ব সন্দেহ করা যাইতে পারে না ।

১৭২৮ শকাব্দে পাটনার চকবাজারের নিকটবর্তী একস্থানে পুষ্কর খনন করা হইয়াছে। খনকরণ কোন স্থানে আট হাত কোন স্থানে দশ হাত পরিমাণ খনন করিলে পাটলিপুত্রের কাঠিনয় প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। অতএব বর্ধমান পাটনাই প্রাচীন সাময়িক পাটলিপুত্র ইহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই।

এক সময়ে ত্রাশ্বলিষ্ঠ নগর বঙ্গীয় উপসাগরের তটে স্থিত ছিল; এই নগর হইতে অৰ্ধনবান সিংহ, নাবা প্রভৃতি দ্বীপে এবং তথা হইতে চান দেশাভিমুখে যাত্রা করিত। চীন-পরিব্রাজক হুইং জনপথে প্রথমতঃ ত্রাশ্বলিষ্ঠ নদদ্বারা পদার্পণ করেন। এক্ষণ ত্রাশ্বলিষ্ঠের ভগ্নাবশেষ তমলুক সমুদ্র-টে হইতে বহু দূরবর্তী।

পাঁচশত বৎসরের অধিক হইবে শাশনদ গতি পরিবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদগণ পাটনার নিকট শগের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন।

মিগাস্থিনিন্স বলেন, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পাটলিপুত্র ভারতবর্ষে সর্বপ্রধান নগর ছিল। যে সমস্ত নগর বৃহৎ নদ-নদীর বা সমুদ্র-তে অবস্থিত ছিল তাহার প্রাচীর কাঠিনয় ছিল, কিন্তু যে নগর নদ-নদী বা সমুদ্রের তটে অবস্থিত ছিল না তাহার প্রাচীর উষ্ট্রকনয় ছিল।

পাটলিপুত্রের দীর্ঘত্ব সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া থাকেন; মেজর রেনেল বলেন যে, এই নগর দীর্ঘে পাঁচ ক্রোশ এবং প্রস্থে এক ক্রোশ ছিল। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে বাহ্য বর্ণনাছি তাহা অসিদ্ধান্ত করার কোন কারণ নাই। মিগাস্থিনিন্স বহুকাল পাটলিপুত্র নগরে বাস করেন; তৎপ্রদত্ত বর্ণনায় সন্দেহ করার কি কারণ আছে? প্রাচীনকালে ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান নগর এক্ষণ দীর্ঘ থাকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গোড়নগর দীর্ঘে আট ক্রোশের অধিক ছিল, মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজ-বাজারের সন্নিকটে গোড়নগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। যোগল সম্রাটগণের রাজধানী দিল্লীনগর ইহার অল্পতর দৃষ্টান্ত; সাজাহানাবাদ সহ দিল্লীর শেষপ্রান্ত আটক্রোশ হইতে অধিক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণেশচন্দ্র ।

(৮)

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে ঘরে ছিলেন তাহা দোকানঘর হইতে একটু দূরে ।
প্রাণেশচন্দ্র যখন দেখিল—এই ঘরে কেহ নাই, তাহাদের জিনিসপত্র নাই, দরজা
জানালা খোলা রহিয়াছে, তখন সে মনে করিল, ইহারা অতি ভাড়াভাড়ি
চলিয়া গিয়াছেন, দোকানদারকে সংবাদ দিতে পারেন নাই ; তাহা না হইলে
ঘর একরূপ খোলা পড়িয়া থাকিত না । তিনি বিলম্ব না করিয়া দোকানদারের
ঘরের নিকট যাইয়া তাহাকে ডাকিলেন । বহুবার ডাকিলার পর একটু মুহূ মেয়েলী
গলায় কে বলিতে লাগিল “ওগো ওঠ, কে ডাকছে ।” স্বয়ং নিদ্রাদৈবীর নাকে
নস্ত ধরিলে বুঝিবা তাহাকে জাগান যাইতে পারিত ; কিন্তু নিদ্রিত মহাজন
দোকানদারকে চৈতন্ত করান মেয়ে-স্বরের পক্ষে সহজ হইল না । প্রাণেশ-
চন্দ্রের ঘন ডাক, মেয়েটার মুখ ছাড়িয়া হাতের ধাক্কা, ধাক্কার বর্ধিত বেগের
অল্পপাতে খাটের মড়মড় শব্দ—দোকানদার ঘুমের ঘোরে “চোর আসছে”,
“প্রি়মীম জাল্” বলিতে বলিতে উঠিয়া বসিল । তখন প্রাণেশচন্দ্র বাহির
হইতে জিজ্ঞাসা করিল—ঐ ঘরে যাহারা আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা কোথায়
গেল—সে তাহার কিছু জানে কি না । দোকানদার বাহির হইয়া পড়িল,
বলিল—“কিছু জানি না, ওরা ভাড়ার পয়সা পর্য্যন্ত দিয়া যায় নাই । চলেন-ত
দেখি কি অইল ।” উভয়ে যাইয়া ঘর ও ঘরের চারিদিক অল্পসন্ধান করিল,
ঘটনা কিছুই বুঝিতে পারা গেল না ।

দোকানদার । ম'শায় ব্রাহ্মণ ।

প্রাণেশ । হাঁ, ব্রাহ্মণ ।

দোকানদার ভক্তির সহিত প্রাণেশের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, “আপনি
ওনারের কি অন ।”

প্রাণেশ । কিছু নয় ।

দোকানদার । তবে ওনারের সঙ্গে মিল্লেন্ কেমতে ।

প্রাণেশচন্দ্র গমস্ত বলিলেন ।

দোকানদার । তবেই অইছে, আপনায় ডরেই ওনারা পলাইচে ; সঙ্গে
মুতী মাইয়া ।

প্রাণেশচন্দ্র । বল কি, তাহলে আমার তোরঙ্গটা রেখে যেতো । তাহ কি

হয়? আগার ভয়ে পলাবে, আমার আমার বাড়ীর নিকটের লোক—আত্মীয়তাও আছে।

দোকানদার। আমার মনে কয়, আজকা রাত্রে অনেক লোক আমার দোকানে আনাগোনা কর্চে—এমন ভো আর দেখ্চি না, পদ্মাপাড়ের লোক—আপনার কোন কু-মতলব আছে জানাইয়া ঠাকুরকে আগনার সজ্জা ছাড়বার জন্তে ঘর হইতে বাহির কর্চে, পরে তাবা কি কর্চে না কর্চে কে জানে।

প্রাণেশ বসিয়া পড়িল। সেই সময়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলে দ্বীলোকের প্রতি হুর্জু ভগ্নের ভীষণ অত্যাচারের কথা সংবাদপত্রে আলোচিত হইতেছিল, প্রাণেশ-চন্দ্র তাহা পড়িয়াছে। প্রাণেশচন্দ্র, বন্দোপাধ্যায়ের মেয়েটির প্রতি লালনার আশঙ্কা করিয়া একবারে উন্মাদের ভায়ে হইয়া উঠিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর। এখন কি করা যায়, থানা কত দূর, কাহার পরামর্শ লওয়া যায়। ভদ্রঘরের বিষয়, নহলোককে জানানইবা যায় কি করিয়া—প্রাণেশচন্দ্র চিন্তার অকুলসাগরে ভাসিতে লাগিল।

দোকানদার। ঠাকুরের নাম শশী বাক্‌যা।

প্রাণেশ। হাঁ, শশী বাড়ুয়ো।

দোকানদার। এখানে থাক্‌তে ডর পাইয়া যদি আর কোন ঘরে বাইরা থাকেন—ডাক্‌যু।

প্রাণেশ। ডাক।

দোকানদার। “ও বাড়ুয়া মশয়, ও শশী বাড়ুয়া ঠাকুর, ও ঠাকুর মশয়” বলিয়া গলা উচ্চে চড়াইয়া, শেষ শব্দের তান সুদীর্ঘ করিয়া ডাকিতে লাগিল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ পদ্মা কল কল ধ্বনি করিতেছে। এই কল ধ্বনিতে দোকানদারের ডাক মিশাইয়া বাহিতে লাগিল। বন্দরের বিপণিতে বিপণিতে এবং নদীর আঁকে আঁকে প্রহত হইয়া এদিকে ওদিকে ডাকের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি উঠিল।

কোন উত্তর আসিল না। গভীর রাত্রি—কেহ কোন সাড়া দিল না।

প্রাণেশচন্দ্র ভাবিতে লাগিল—কেনই বা বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম, কেনই বা পদ্মাতীরে আপন গানে মুগ্ধ হইয়া এত সময় কাটাইয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে পলাইয়া আসিলাম, মুক্তিকে ফেলিয়া আসিলাম, সে বেন বন্দ—ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইলাম; মেয়েটির প্রতি কেমন এক মসৃণা জন্মিল—এও বেন বন্দ!

দোকানদার প্রাণেশকে অনেক প্রবেশ দিল। রাত্রি প্রভাত পর্যন্ত

অপেক্ষা করিতে বলিল, গেই ঘরে লইয়া গেল, “প্রদীপ জ্বলিল, শব্দা করিয়া দিল, বলিল, “ডর পাইবেন না, আসি কাছেই আছি।”

দোকানদার আগুন ঘরে চলিয়া গেল। প্রাণেশচন্দ্র ভুটল না, ঘরের মধ্যে ছাটিতে লাগিল। পাভাড় মাথায় করিয়াও বুঝিবা চলা যায়, হুস্তিতার পাখা-চাপ অসহ্য হইয়া উঠিল, প্রাণেশ বিছানায় বসিল, বসিয়া থাকা অসম্ভব হইল, উইয়া পড়িল—নিদ্রা আসিয়া নিমেষে নিশ্চিন্ত করিয়া দিল।

পূর্বদিকে উষার আলোক দেখা দিয়াছে; কিন্তু কোরাসার আগুনে আলোক ছুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দোকানদার প্রাণেশচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—“ও ঠাকুর মশায়, উঠ, শিগগির আইস।”

প্রাণেশচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বলিল, “কোন সংবাদ পাইয়াছ?”

দোকানদার। কথা কইও না ঠাকুর, আমার সঙ্গে আইস।

প্রাণেশচন্দ্র মস্তনুকের ভায় তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল।

(২)

কলেজস্ট্রীট—পুস্তকের দোকানের সারি পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ণব, শূদ্র চারিধরের প্রায় সকল বংশের ভিন্ন ভিন্ন মাজ সম্ভার বহু দোকান। এদিকে ওদিকে, মুসলমানগণও ছুই একখানি দোকানের কপালে “আদার” কসাইয়া পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকেন। ঠংরেজের নিউমেন, থেকারের মে বিপুলতা সে দোকান্দার এখানে নাই। গৃহগুলি ক্ষুদ্র, আলমারিগুলি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রের চাপে পড়িয়া পুস্তকগুলি একে অত্রের গায়-মাথায় গিষিয়া বাইতেছে। দোকানের মুণ্ডাগে বাস্তব সম্মুখে করিয়া কেরাগী বসিয়াছেন। তাহার বাঁদে দক্ষিণে দাঁড়াইবার স্থান অনেক স্থলেই সঙ্কীর্ণ; অনেক স্থলে গাথে দাঁড়াইয়াই পুস্তক চাহিতে হয়। কলেজস্ট্রীট—কলেজের কেল্লা। এদিকে প্রেসিডেন্সী, সিটি, এলবার্ট, কেথিড্রেল—ওদিকে বিদ্যাসাগর হইতে দেখুন, দেখুন হইতে এসেমব্লি সমস্তই এই কেল্লার সীমানার অধীন। দোকানগুলি কেল্লার কারখানা। পুস্তকগুলি কারখানার গুলি-গোলা, অস্ত্র-শস্ত্র। পুস্তকের দোকানে বাঙ্গালি আলফগণের গতিবিধি যথেষ্ট।

* * * কোম্পানি একখানি পুস্তকের দোকান। সম্মুখভাগে সেইদপ সঙ্কীর্ণ। কিন্তু দোকানের পশ্চাতের একটা প্রকোষ্ঠ অতি প্রশস্ত, এতৎসম্বন্ধে রাস্তা বারটা। চারিদিকের লোকের গাড়া শব্দ নাই। কিন্তু এই

প্রাকোষ্ঠের কখনও গুরু বিষয়ের আলোচনার গভীর, কখনও হাত্তামোদে উছলিয়া উঠিতেছে ।

এই প্রাকোষ্ঠের এক আলমারিতে লেফেইটী, গেরিবন্দী, মেজিনী, কন্থু প্রভৃতির জীবনচরিত, অন্য আলমারিতে এলিসন, গিবন্স, গ্রোট, বেঙ্কফট প্রভৃতি রচিত ইতিহাস । কোন আলমারিতে নিউমেন, মার্টিনো, পার্কার চেম্বিংএর ধর্মগ্রন্থ, কোনদিকে ত্রাদার হেল্প, বুক অব মার্টার প্রভৃতি আত্মোৎসর্গের গ্রন্থ রহিয়াছে ; যাহার প্রতি বেক্রপ নির্দেশ আছে । উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনি সেই অনুসারে পুস্তক পড়িতেছেন । এককোণে কতকগুলি মুদ্রার ও ডম্বেল—৮ নবগোপাল ও ৬ অশু বাবুর পুরাতন শিষ্যগণ এখানে অপরাক্তে কুস্তি শিক্ষা দিয়া থাকেন ।

পাঠ সমাপ্ত হইলে সকলে আসিয়া একখানি টেবিলের চারিদিকে সমবেত হইলেন ।

অন্য । তবে কি প্রাণেশচন্দ্রের কোন সংবাদ লওয়া হইবে না ?

দাদা ম'শায় । লওয়া হইয়াছে—এই কার্ড পড় ।

অমৃত । দাদা ম'শায়ের দূত সর্দার ।

ইস্মাইল । ভাল এক কথা—দাদা ম'শায়, সকলেরই দাদা ম'শায় হলেন কিরূপে ?

করুণা । তাই-ত—বাপ, মা, মেয়ে, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র সকলেরই দাদা ম'শায় । এ কেমন ?

অনাদি । ব্রহ্মা পিতামহ যেমন ।

ইস্মাইল । ও-সব কথা আমরা বুঝি না । তোমাদের দাদা ম'শায়ই থাকুন, আমরা বল্‌বো তাই-সাহেব ।

অনন্ত । তা কখনই হবে না । তোমাদেরও দাদা ম'শায় বলতে হবে । দাদা ম'শায়ের অনুবাদ 'তাই সাহেব' হ'তে পারে, কিন্তু দাদা ম'শায়, তাই-সাহেব হ'তে পারেন না—হ'তে দিব না ।

ইস্মাইল । এই বুঝি তোমাদের হিন্দু মূলমানের মিলন !

দেবেন্দ্র । অনুবাদেই বিবাদ, মূল লইয়া ভর্ক আরম্ভ হইলে বোধ করি, একটা ওয়াটারলু হইয়া যায় ।

দাদা ম'শায় ইস্মাইলের মাথার ফেঙ্গ-টুপীটি পলকে তুলিয়া পলকে নিজ মাথায় পরিধান ।—দাঁড়াইলে মাথা সকলের উপরে—বসিলে মাথা সকলের

উপরে—ফেজের খুটিওয়ালা উচু চুড়ার মত দাদা-মশায় আরও মত দেখাইতে লাগিলেন ।

অনন্ত দাদা মহাশয়ের মাথা হইতে টুপী তুলিয়া লইল ।

ইস্মাইল । এট টুপীটাই সহিতে পার্লে না, কেতাব-কোরান সহিত আস্ত মুসলমানকে সহিবে কিরূপে ?

অনন্ত তাহার গলার পইতা ইস্মাইলের গলায় তুলিয়া দিল—বলিল, “সও-তো দেখি কেমন, ভাই সাহেব ।”

কথা বলিতে না বলিতে, পঠিতা গায় পড়িতে না পড়িতে ইস্মাইল সেন সাপে ধরিল বলিয়া লাফাইয়া উঠিল ।

অমৃত । এইরূপ ! এইরূপ !

দাদা মশায় । টুপী এক, পইতা আর ; কিন্তু বাজলার মাটি এক, বাজলা ভাষা এক ; বাজলার মাটিতে দাঁড়াইয়া বাজলা ভাষায় কথা কহি, হিন্দু মুসলমান—হুই এক । অনন্ত একটু বেশী হিন্দু ; ইস্মাইল, ওর ভাষা ধরিল্ না ।

দাদা মশায় ইস্মাইলকে কাছে টানিয়া লইলেন, বলিলেন—“প্রাণেশ-চক্রে সন্মুখে কি করা যায় ?”

অমৃত । যে পাতিল ফুটিবার কাঁটিয়া গিয়াছে—গিয়াছে—অ্যে গিয়াছে—তার আবার খবর কি ?

দাদা মশায় । দেখ ওরূপ বেলো না, আমার অক্ষশাস্ত্রে বিরোগ নাই সব, ধোগ । হারালে চলবে কেন, হারানকে আবার ধরতে হবে ।

অনন্ত । ও ব্রাহ্মণই বা কে, ও বিধবাই বা কে, ও পরমাত্মপ্তরী কতাই বা কে, এদের সঙ্গে প্রাণেশ জুটলোই বা কিরূপে !

করুণা চুপে চুপে বলিল “কি—ক—পে, ঐ রূপেই হয়ত মজাইয়াছে ।”

অনন্ত করুণার কাণে কাণে বলিল—“রূপে মজিলে প্রাণেশ, ব্রজেন বাবুর মেয়েকে এমন ভালবাসিত না ।”

করুণা অনন্তের কাণে কাণে “রূপ না থাকলেও মেয়েটার লাভ্য আছে ।”

হঠাৎ পুস্তক পড়িতেছিল, সে মাথা তুলিয়া বলিল “আদি সব শুনুতে পাচ্ছি—

মুক্তাকলেবু ছায়াস্বরলতমিবাস্তরা,

প্রতিভাতি বদধেবু তল্লাবগ্যমিহোচ্যতে ।

দাদা মশায় । ও সব কাণা কাণি, মল্লিমাণের ঢীকা টিপ্তরী, থাক । মূল কথা ।

হরেন্দ্র। তবে কি ভাগ্যকুল ব'লে ছুটবো।

দাদা ম'শায়। ভুগি গেলে তোমার পড়া বন্ধ হবে। তোমার ঘেরে কাজ নাই। দেখি, ভ্রমজ্ঞ বাবুকে বুঝি।

তাহাই স্থির হইল; তখন রাত্রি অনেক হইছে। অধিবেশনের অবসানে নিয়ম—কোন দিন বায়রণের Isles of Greece আবৃত্তি, কোন দিন আনন্দমঠের বন্দে মাতরং গান, কোন দিন কমলাকান্তের দুর্গোৎসবের অভিনয় হয়; ইত্যাদি।

অনন্তের গলা অতি মিষ্ট। অনন্ত মধুর কণ্ঠে তন্ময় হইয়া গাইল—

বন্দে মাতরং

নীলব নিশীথে “বন্দে মাতরং” ধ্বনি প্রকোষ্ঠ প্রকল্পিত করিয়া মুক্ত হার দিয়া বাহিরের মুক্ত পুলকিত জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়া বাইতে লাগিল।

গান সমাপ্ত হইতে না হইতে দাউ শায় বলিলেন, “অনন্ত ইস্‌মাইলকে আলিঙ্গন কর।”

অনন্ত ইস্‌মাইলকে কোল দিল, ইস্‌মাইলের টুপী আপন মাথায় তুলিয়া লইল; ইস্‌মাইল অনন্তের উপন্যাস ধলায় পরিল, বলিল—“আজ হইতে তোমরা আমাকে ইস্‌মাইল বন্দোপাধ্যায় বলিও।”

সকলে। বা!

একে অঙ্কে, সকলে দাদা ম'শায়কে কোল দিয়া এক আনন্দের কল-কোলাহল তুলিল।

এক ছদয় এক প্রাণ লইয়া সকলে আপন আপন বাগায় চলিয়া গেল।

ওগো মরিব, আমি মরিব।

১

ওগো মরিব, আমি মরিব!

পিশাচী-ছলনা,

পিশাচী-বেদনা,

পিশাচ মনে

সাধন রণে

‘মা ভৈঃ’ বলি,

নাহি ডরিব, নাহি ডরিব।

চরণে দলি,

নীলব নিঝুম শ্মশান মাঝার,

আপন ব্রত পালিব।

পতীর নিশার নিবিড় আঁধার,

মরিতে হয়, মরিব।

* এই কবিতাটি জ্যোতি সঙ্খ্যা “প্রবাসী”তে প্রকাশিত সুকবি শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মল্লিকদেব মহাশয়ের “আয়, আজি আয়, মরিব কে” নামক সুন্দর কবিতা-টির উত্তরে লিখিত।

২

চিহ্ন ভরিয়া

রক্ষা করিয়া

ওগো মরিব, আমি মরিব !

দেব-ভবনে

কণ্টক-বনে

জীবন-গণে

সংগোপনে

আমি পশিব, আজি পশিব !

আগন বাস রচিব !

সকল বিপদ, সকল বিষাদ,

মরিতে হয়, মরিব !

মানি লব মনে দেব-আশীর্বাদ,

৫

আপদের ডাক বাজাইবে শাপ—

ওগো মরিব, আমি মরিব !

অরাতিগণে

দেব-নাগার

কুসুম-হার

সমুখ গণে

আমি মরিব, গলে মরিব !

বীরের মত মরিব !

জীবনের মাঝ, জীবনের আশা,

মরিতে হয়, মরিব !

পুরাট্টে ভরা দিয়ে ভাগবাসা,

৩

ডাঠ অমির দারায়

সকল হিয়ায়

ওগো মরিব, আমি মরিব !

চটু

চেপে না নব

সাগর-বুকে

মনের স্তূ

মরিয়া লব,

আমি ভাসিব, একা ভাসিব !

অমর-বেশ মরিব !

উঠুক ঝটিকা চৌদিক বেড়িয়া,

মরিতে হয়, মরিব !

নাচুক উর্ষি গগন চুমিয়া,

৬

দ্বিবস-রজনী

বাহিয়ে হরণী

ওগো মরিব, আমি মরিব !

বিশাল সিদ্ধ

আশান নাঝে

মাধক-মাজে

মণিল-বিন্দু

আমি পূজিব, আশা পূজিব !

পুলকে জানি তরিব !

বুঝি শুনা যায় মার অট্টহাসি,

মরিতে হয়, মরিব !

শাখিত কুপাণ উঠিছে বিকাশি

৪

হৃদয়-বধিরে

মরমে বাহিরে

ওগো মরিব, আমি মরিব !

চরণে মার

আর্ঘ্যের স্তূত

গরিমায়ুত

আর্ঘ্য ভার

নাহি কুলিব, নাহি ডুলিব !

হরণে আজি সঁপিব !

আর্ঘ্যের করম, আর্ঘ্যের পরম,

মরিতে হয়, মরিব !

আর্ঘ্যের গৌরব, আর্ঘ্যের সরম,

বন্দে মাতরম্ ।

মায়ের গান

(জাতীয় সঙ্গীত)

মম্বীত মানব হৃদয়ে অপরিচীত উদ্ভাদনার সজ্জন করিয়া দেয় ।

অবিরাম পরিশ্রম ও কালি কাগজ ব্যয় করিয়া, বাখ্যী নিরবচ্ছিন্ন বক্তৃতায় দেশে
বেদেনো কাঁপাইয়া তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে যে কাজ সংসাধন করিতে পারেন—
সুগায়ক সঙ্গীতের সাহায্যে এক মুহূর্ত্তে জাতি স্থানিক করিয়াছেন ; এরূপ দুর্লভ
বিরল নহে । দেশের বর্তমান দুর্দিনে লোকের প্রাণে স্বদেশ-প্রেম জাগাই
তোলা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে । এতদ্ব্যতীত সাধনকল্পে লেখক
শক্তিধারিনী লেখনী, বাখ্যীর বজ্রনাদী বর্ষা অতিনিয়তই কার্য্য করিতেছে বি
আমাদের বিশ্বাস এ ক্ষেত্রেও সঙ্গীতের কার্য্যকারিতা অধিক—কারণ মনুষ্য
প্রাণের ভাবের কথা কয় ।

বাক্যালীর প্রাণে স্বদেশ-প্রেম জাগাইবার উদ্দেশ্যে আমরা প্রথমতঃ করে
জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া “মায়ের গান” নামক সঙ্গীত পুস্তকের প্রচার ক
বিষাভা বাক্যালীর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, বাক্যালী জাগিয়াছে—বাক্যালী আ
মাকে চিনিয়াছে, তাই দেড় মাসের ভিতরে উপযুগুপরি “মায়ের গান”
চারিটি সংস্করণ সম্পাদন করিয়াও আমরা গ্রন্থগ্রহণেচ্ছ, সকল ব্যক্তিকে গ্রহ
উত্তিতে পারি নাই । লোকের আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবার পঞ্চম সংস্ক
এ০০০ গ্রন্থ ছাপান হইতেছে । “মায়ের গানে” নিম্নলিখিত দেশপ্রসিদ্ধ মাতৃ
চিন্তাশীল মহাত্মাগণের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীতগুলি স্থান প্রাপ্ত হইয়া

১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপিনচন্দ্র পাল

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংস্করণ ২

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত

” কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

” রজনীকান্ত মেন

” প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

” সুনোমোহন বসু

শ্রীমতী সরলাদেবী প্রকৃতি।

এতদ্ব্যতীত বহু অজ্ঞাতনামা লেখকের অনেক পরিচিত সম্বন্ধীও “মাতঙ্গের” এ সংগৃহীত হইয়াছে। সর্বশেষে একটি অতি মনোরম প্রাণ-সম্বন্ধীও হইয়াছে। বাঁহারা “মাতঙ্গের গান” লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সমস্ত কারণ প্রতিদিন অসংখ্য গ্রন্থক আশাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছেন অর্ডার পাঠাইতেছেন। বিঘ্ন করিলে নিরাশ হইবেন। অশ্রাব্য পুস্তকের গ্রন্থের পুনঃ সংস্করণ যাহান অসম্ভব।

মূল্য এক আনা।

মফঃস্বলের গ্রন্থকগণ দেড় আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

অতি মত পাঁচ টাকার পাঠাইবেন। ৫ আনার কম ভিঃ পিঃ হইবে না।

বিশেষ, দ্রষ্টব্য —

বর্তমান স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে, মরমনসিংহের পল্লীগামে অনেক জন স্বদেশী সম্বন্ধী গীত লইতে শুনা যায়। উক্ত সম্বন্ধীগুলির রচয়িতা অজ্ঞান, অশিক্ষিত কৃষক-সমাজ। মরলপ্রাণের মরলভাব উক্ত গ্রামাঙ্গীতি লিখে অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। মাঠে হাল চষিতে চষিতে কৃষকগণ বখন ছল ধিয়া উক্ত সম্বন্ধীগুলিতে স্বর-মোজনা করিতে থাকে তখন প্রাণে এক ভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। তখন বস্তুতই বহুবিধ শব্দের সম্মিলিত মিলাইয়া লভে ইচ্ছা হয় “কে বলে মা তুমি অগ্নি, বহুবল বারিষ্ণী”। আমরা বহু যত্নে ঐক্য কবীগণের সুখ লইতে সে সম্বন্ধীগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি এবং ইহার “স্বদেশী-পল্লী-সম্বন্ধী” নামাকরণে দ্বিতীয় গ্রন্থ-প্রচারে উদ্যত হইয়াছি। উক্ত গ্রন্থ বঙ্গবন্ধু।

প্রকাশক

শ্রীরজনীকান্ত পণ্ডিত

স্বদেশ বঙ্গ, মরমনসিংহ।

আবৃত্তি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ।

ষষ্ঠ বর্ষ । { ময়মনসিংহ, আশ্বিন ১৩১৩ । { ষষ্ঠ সংখ্যা ।

ভূরশুট রাজ্য ।

প্রাচীনকালে যে সকল পরাক্রমী ও ঐশ্বর্যশালী বাঙ্গালীর বিস্তৃত সম্পত্তি, জমিদারী এবং রাজস্ব কাগজদ্বারা ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, ভূরশুট-রাজ্য তাহাদের অন্যতম । বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে যে স্থান ভূরশুট পরগণা দখিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, মুসলমান শাসন সময়ে তাহা সুবিস্তৃত ভূভাগকে অধিকার করিয়া একটা ক্ষমতাশালী ও সুপ্রশস্ত রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল । এই প্রসিদ্ধ পরগণায় ১৫৩ বানি সমৃদ্ধ সম্পন্ন গ্রাম এবং প্রায় ছইশত ক্ষুদ্রপল্লী সংযুক্ত ছিল । তাহাড়া জেলার আমতা গ্রামের নিকট বসন্তপুর হটতে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া গ্রাম পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান ভূরশুট পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল । এই পরগণার একদিক পের্ণেড়া এবং অন্যদিক পের্ণেড়া নামে খ্যাত ; দুইদিকেই এক নামের ছইটি গ্রাম অবস্থিত । এক্ষণে পের্ণেড়া নামে যে স্থানটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনের পার্শ্বে একটা স্টেশন বলিয়া পরিচিত, তাহা এক সময়ে মুসলমানদিগের প্রবল প্রভাপে পরিপূর্ণ ছিল ; হিন্দুরা তাহাদের নানাবিধ অত্যাচারে সশঙ্কিত থাকিত । অতি অল্পকাল পূর্বে পর্য্যন্ত এখানে হিন্দু হুগাঁপুঞ্জের অনুষ্ঠান করিতে সাহসী হইত না । এখনও তাহাৎে বাঙ্গারে মুসলমানের প্রভাৱ মস্তাছে গো-হত্যা করিয়া থাকে । বর্তমানকালে ইংরেজশাসনে মুসলমানের আর যে প্রভাব বা দন-মন্ত্রম নাট, অগ্রাৎ ধার্মিক হিন্দু এখন নিরাপদ । পাণ্ডুয়া বা পের্ণেড়া উপনগরে ত্তে প্রকাণ্ড স্তম্ভ ও মসিদ ইত্যাদি দেখিতে পা- যায় তাছাড়া হিন্দু-রাজাদিগের অবিনশ্বর কীর্তি ; এক সময়ে এইগুলি ধর্ম্মপর হিন্দুর দেবালয় ও সাধুর আশ্রমরূপে ব্যৱহৃত হইত । মুসলমানেরা বলপূ- ন্নিরীহ হিন্দুর হস্ত হইতে এইগুলি অপহরণ করিয়া মসিদ ও আজান-মিনা

পরিণত করিয়াছে । বারবারীর অভ্যস্তরে প্রবেশ করিলে এখনও অতি পরিষ্কার রূপে শুভদ্রুমমূহুর গাজ্রে মহাদেব, ঘণ্টা, শঙ্খ প্রভৃতির মূর্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় । নিকটবর্তী সাহানাদ নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে পাণ্ডব শেখর নামে হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন, বর্তমান পেঁড়ো তাঁহারই রাজ্যভুক্ত ছিল । যবনেরা তাঁহাকে সংহার, পুস্তকাগর দাহন, প্রাণাদে অগ্নিপ্রদান এবং সন্ধিরসমূহ তথ্য করিয়া দিয়া ঐ রাজত্ব অধিকার করে । ঐ রাজ্যের নামে এই রাজ্য পাণ্ডুরা বগিয়া প্রসিদ্ধ ।

জামতা একটা মহকুমা । আমতার নিকট পেঁড়ো বসন্তপুর নামক গ্রামে এখনও প্রাচীন দুর্গের (গড়ের) নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে । বাহা ইউক, উভয়দিকের গীমা মধ্যে যে বিস্তৃত রাজত্ব বা জমিদারী ছিল তাহাই একদা ভূরগুটরাজ্য বলিয়া সম্বোধিত হইত । ভূরগুট-রাজবংশে অনেক প্রখ্যাত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া বান্দগীর মুখোজ্জল করিয়া গিয়াছেন । ভূরগুট রাজবংশে বঙ্গভাষার গৌরব এবং বাঙ্গালা সাহিত্যাকাশের অত্যাচ্ছল নক্ষত্র স্বরূপ কবিবর রায় শুণাকর ভারতচন্দ্র রায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাদের কুলগত উপাধি মুখোপাধ্যায়, গোত্র ভরদ্বাজ । কুলের মুখুটি । আদিপুরুষ হইতে বংশাবলী সম্পূর্ণভাবে লিখিত হইলে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, হুগলী জেলার উত্তরপাড়া গ্রামের “মুখোপাধ্যায়” উপাধিদারী সুনিখ্যাত জমিদারগণ এবং কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বাবু নীলাধর মুখোপাধ্যায় (কাশ্মীররাজ্যের ভূতপূর্ব ভূস্বামী মন্ত্রী), মিটার কবিবর মুখোপাধ্যায় (প্রদান জজ, কাশ্মীররাজা), কবিবর কুন্তিবাগ ওঝা (রামায়ণ প্রণেতা) এবং চুঁচুড়ার বিশাখ বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই, প্রভৃতি এই বংশসম্ভূত । জামরা এখানে কেবল বিহরগুট পরগণার রাজাদিগের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম । আদিপুরুষ ভূতসিংহ, ইহার পুত্র মুরারি ওঝা ! মুরারি ওঝা শ্রীহর্ষ হইতে অদন্তন বিংশ-লকেষ এবং উৎসাহ দেব হইতে ৭ম পুরুষ । মুরারির পুত্র ভৈরব, শৌরি, মদন ঠার নিকক, বনমালী, মার্কণ্ডেয়, শ্রীনিবাস ও বাস । এই কয়েক পুত্রের মধ্যে মুরারি মালীর সম্ভানের নাম কুন্তিবাগ ওঝা, ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ । ইহা প্রাণা রামায়ণ ইহারই প্রণীত । এই সুমধুর ও সুপরিচিত বাঙ্গালা রামায়ণ দেশের যে কত প্রকার মহোপকার সাধন করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা না । বনমালীর সম্ভাদরের নাম মদন, ইহারই বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন, ঐ ইহারই বংশসম্ভূত পুরুষদিগের এখানে নাম দেওয়া গেল । মদনের পুত্র

রাধন, তন্তু সূত দেবানন্দ, তাঁহার পুত্র প্রয়াগ তন্তু সন্তান জগদীশ, ইহার সূত গোপাল, গোপালের পুত্র রামনারায়ণ, ইহার সন্তান রামকান্ত, ইহার পুত্র রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় (মুখোপাধায়), তন্তু সন্তান কবির ভারতচন্দ্র। রামকান্ত সর্বপ্রথমে ভূমিণাণ, ভূপতি, ভূগাল ও রাজা উপাধি গ্রহণ করেন, এই জন্ত রামকান্ত রায় “ভূপতি রায়” বলিয়াও খ্যাত হইয়াছিলেন। কবির ভারতচন্দ্র রায়ের পুত্রগণ মধ্যে ভগবতীচরণ ও রামচন্দ্র প্রসিদ্ধ। ভগবতী নিঃসন্তান, রামচন্দ্র পুত্র হারকনাথ তন্তু সূত অমরনাথ তাঁহার সন্তান পূর্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র। কবির রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের সময় হইতে চক্ৰবর্তী পরগণাস্তরগত মুন্সিয়াদ্ গ্রামের ভাগিরথী তটে ইহাদের বসতি হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের জন্মবর্ষ ১৬৩৪ শক, ১১১৯ সাল। কবিরামচন্দ্র ভারতচন্দ্র অন্নব্রাহ্মণ, বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, সভাপীরের কথা, সতানারায়ণের কথা, নাগাষ্টিকম্ প্রভৃতি কাব্য ও কবিতা এবং বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোক, গান, পদ্য ইত্যাদি বিরচণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী সমাজকে সম্ভাব রাখিয়াছেন। তাঁহার অন্নব্রাহ্মণ ও বিদ্যাসুন্দর অতুলনীয় কাব্য। কবির ভারতচন্দ্র হিন্দি, পারস্য, আরবি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার পিতার কনিষ্ঠ সন্তান, অপর তিন মহোদয়ের নাম চতুর্ভূজ, অর্জুন ও দয়ারাম।

কবিরায়ের পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় বর্দ্ধমানের মহারাজা শ্রীমৎ কীর্তিচন্দ্র বাগছুরের জননীকে বিবাহস্থত্রে কটুক্তি করায় বর্দ্ধমানের সেনারা মহারাজাজ্ঞানুসারে নরেন্দ্রনারায়ণের ছর্গ ও প্রাণাদ লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ ও দ্রব্য স্থানান্তরিত করিয়াছিল। ভারতচন্দ্র রায়, মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন গাজীপুর পল্লীর নিকট নওয়াপাড়া গ্রামে মাতৃশালায় সংস্কৃত শিক্ষা করেন; ঐ গ্রামের নিকট সারদা গ্রামের আচাৰ্য্য মহাশয়দিগের বাটীতে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। ছগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁহার পারভ্রাভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা হইয়াছিল। ঐ গ্রামের সুযোগ্য জমিদার শ্রীমৎ রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয় তাঁহার আশ্রয়দাতা এবং বিশিষ্ট সহায় ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা কর্তৃক নিৰ্ম্মাতিত হইয়া ভারতচন্দ্রের পিতা (রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ) হীনাবস্থায় পতিত হইলেন, এক্ষণে কবিরকে অনেকপ্রকার অনুরোধ ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। ক্রমে ভারতচন্দ্র রায় বর্দ্ধমানের মহারাজার কর্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া রাজবাটীতে আগমন পূর্বক নৈতিক সম্পত্তির কিয়দংশ উদ্ধার করিতে

সমর্থ হয়েন, কিন্তু ভাটারা নিয়মিতরূপে মহারাজার শুদ্ধ প্রদানে অশক্ত হওয়ার বর্জমানের মহারাজা ইহাদের অনেক ইজারা থামভুক্ত করিয়া লয়েন, ভারতচন্দ্র ইহাতে আপত্তি করায় কারাগারে আনদ্ধ হইলেন। কৌশল্যে কারাগার হইতে তিনি মুক্ত হইয়া কটক, পুরীধাম, বৃন্দাবন, কাশীধাম, প্রয়াগ এবং হুগলী জেলাসুতর্গ থানাকুল কৃষ্ণনগর প্রািন প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এইরূপ ভ্রমণে মনুষ্যারা বহুদর্শী ও প্রাজ্ঞ হয় : ভারতচন্দ্রও নানা ভাস্য, নানা শাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়া বহুদর্শী পণ্ডিত হইয়াছিলেন। Travel's complete education অর্থাৎ ভ্রমণে বিদ্যার পরিময়াস্থি হয়। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানার্জন করিতে হইলে পরিভ্রমণ নিত্যস্থ আবশ্যিক।

এই সময়ে ফাগুনী গবর্ণমেন্টের দেওয়ান “শ্রোত্রিয় পালাধি” বংশীয় বাকু ইজ্ঞানারায়ণ চৌধুরী, ভারতচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়া বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় ওলন্দাজ গবর্ণমেন্টের দেওয়ান (পৌদলপাড়া নিবাসী) বাকুরামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও কবিত্বকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ছিলেন। চৌধুরী মহাশয়ের সুপারিশে ভারতচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের মহারাজদিগকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এষ্ট রাজবাটীতেই তাঁহার উন্নতি, প্রখ্যাতি, দেশব্যাপী সুখ্যাতি এবং অমরকীর্তি স্থাপনের উপায় নির্ণীত হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্র মূল্যবোধে বাস করিয়াও নিরাপদ ছিলেন না, মেন্যানেও বর্জমানের রাজবাটীর লোকেরা অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। বসন্তঃ বর্জমানের মহারাজাদিগের সহিত কলহ করায় ভূগুণ্ট পরগণার রাজগণও তাঁহাদের রাজত্ব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মহাকবি ভারতচন্দ্র শুণাকর ১১৬৭ সালে (১৬৮২ খ্রীঃাব্দে) ৪৮ বর্ষ বয়সক্রমকালে বহুমূরোগে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ সুবিখ্যাত বিদ্যালুন্দর গ্রন্থ ১৬৭৪ খ্রীঃাব্দে বিরচিত হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি “চণ্ডী নাটক” লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন ॥

শ্রীশ্রীশ্রী মহাভারতী :

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, তৃত্বাংকণ্ডেয়

পুরাণান্তর্গত চণ্ডী ।

(পূর্বা প্রকাশিতের পর)

“এই ত্রিলোক সংসার সমস্তই আমার অধীন, সমস্ত দেবতারাও আমার আজ্ঞানুযায়ী, সমস্ত দেবগণের সমস্ত পৃথক পৃথকরূপে আমিই ভোগ করিয়া থাকি। ত্রিভুবনে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব আছে সে সমস্ত এবং গজরত্ন ঐরাবতও আমারই অধীন। দ্বীপোদনথনোদ্ধৃত উচ্চৈশ্রবা নামক অশ্বরত্ন বাহা দেবেজের বাহনরূপে নির্দিষ্ট ছিল, দেবগণ তাহাও প্রাণপাত পূর্বক আমাকেই অর্পণ করিয়াছে। হে শোভনে! আমি আর অধিক কি বলিব, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মাগ প্রভৃতির বাহা বাহা শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, সম্প্রতি সে সমস্তই নতশিরে আমাকে অর্পণ করিয়াছে। হে দেবি! এক্ষণ আমারই সর্ব্বপ্রকার রত্নের উপভোক্তা এবং তোমাকে আমার ত্রিলোক মধ্যে দ্বীপরত্নভূতা বলিয়া মনে করি, অতএব (দ্বীপরত্নরূপা) তুমি আমাদিগকে আশ্রয় কর। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! তুমি যখন দ্বীপরত্নরূপা তখন তুমি আমাকে অথবা আমার অন্তর অন্তর পরাক্রমশালী নিমন্তকে ভজনা কর। তুমি আমাদিগকে ভজনা করিলে অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী হইবে। ইহা মনে মনে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া আমাদিগের মধ্যে একজনকে পত্ররূপে গ্রহণ কর।”

কি অসামান্য গর্ব্ব! যদিও সমস্তই সত্য বটে, তথাপি একরূপ আত্মা-ভিমান আত্মরিক ভাবেরই পরিচায়ক। একরূপ আত্মশ্লাঘা নিত্যন্ত পাণ্ডাঘ, এবং এইরূপ গর্ব্বই পতনের কারণ। দেবী দূতের এইরূপ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন :—

হে দূত! তুমি যে বলিলে, “দুস্ত ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং নিমন্তও তৎসদৃশ”; সে সমস্তই সত্য, তুমি কিছুই মিথ্যা বল নাই। কিন্তু আমি যে একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিরূপে তাহার অত্যাধা করিব? আমি অল্পবুদ্ধিপ্রযুক্ত পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। “যে আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিলে, সে আমার দুর্গ চূর্ণ করিলে, সংগ্রামে সে আমার তুল্য বলশালী হইবে, সেই আমার ভক্তা হইবে। অতএব পরাক্রমশালী দুস্ত অথবা নিমন্ত একজন আগমন পূর্বক আমাকে জয় করিয়া অবশেষে আমার গাণিগ্রহণ কর।”

দেবীর ঐকরূপ গর্ভিণীকায় প্রবেশ করিয়া দূত বিজ্ঞ হইয়া কহিল,—

“হস্তাভ্যাং সকল দেবাঃ স্তব্ধাঃ বৈবাং ন সমুদ্রগে ।

শুভ্রাদীনাম্ কথং তেষাং জাগ্রয়াস্বপি সমুদ্রং ॥”

ইজাদি সমস্ত দেবগণ যাহাদিগের সহিত যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারে না, তুমি অবলা হইয়া সেট শুভ্র নিশাস্ত্র সহিত সংগ্রামের বাসনা করিতেছ ?

তথাপি দেবী বলিলেন —

“কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে বদনালোচিতা পূরা ।”

আমি পূর্বের যখন আলোচনা না করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন আর কি করিব ।

তখন দূত অমর্ষপূরিত চিত্তে দৈত্যরাজ শুভ্রের নিকট ঘাইয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিল ।

“কামাং ক্রোধোহভিজায়তে ।” (গীতা)

“বাসনা চরিতার্থ না হইলেই ক্রোধের উদয় হয় ।” দূতের ঐকরূপ বাক্য শ্রবণে অমুরেশ্বর শুভ্র অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আজ্ঞা করিলেন,—

“হে ধুম্রলোচন! তুং স্বসৈন্ত পরিবারিতঃ

তামানয় বলাদুষ্টাং কেশাকর্ষণ বিহ্বলাং ।”

হে ধুম্রলোচন! তুমি সমস্ত নিজ সৈন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই দুর্বৃত্তা রমণীকে বলদ্বারা কেশাকর্ষণ পূর্বক নিপীড়িত করিয়া (আমার নিকট) আনয়ন কর ।

“তং পরিত্রাণদঃ কশ্চিৎ যদি বা তিষ্ঠতৈহুপরঃ ।

স তন্তন্যোহসর বাপি বক্ষ গঙ্কর্য এব বা ॥

যদি সেই দুর্বৃত্তা রমণীর পরিত্রাণকর্ত্তা কেহ থাকে, তবে সে দেব হউক, বক্ষ হউক, গঙ্কর্য হউক তাহাকে বধ করিবে ।

অনন্তর দৈত্যেশ্বর শুভ্রের আদেশে ধুম্রলোচন দেবীর নিকট ঘাইয়া, কর্কশ-ভানে শুভ্রের আদেশ জানাইল, দেবী প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ্য করার, ধুম্রলোচন দেবীর প্রতি ধানমান হইল । দেবী অমনি হস্তাধার ভাষাকে তত্ত্ব করিলেন । অর্থাৎ ইঙ্গিতমাত্র দেবীর ক্রোধোদ্রোহে ধুম্রলোচন পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত হইল । তৎপর ধুম্রলোচনের বষ্টি সহস্র সৈন্তও সমরে নিহত হইল । দৈত্যাদিপতি শুভ্র সসৈন্তে ধুম্রলোচনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন ।

ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ।” (গীতা)

“ক্রোধ হইতে সংমোহ (কার্য্যাকার্য্য) নিবেচনা শূন্যতা) জন্মে।” ক্রোধের আভিশাষ্যে দৈত্যের গুপ্ত কাণ্ড্যাকার্য্য নিবেক পরিশূন্য হইলেন।

তখন চণ্ড ও মুণ্ড নামক মহাপরাক্রমশালী অসুরদ্বয়কে আজ্ঞা করিলেন,—
হে চণ্ড! হে মুণ্ড! তোমরা বহু সৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া রণস্থলে গমন কর,
এবং তথায় যাউয়া সেই রমণীকে শীঘ্র আনয়ন কর। তাহাকে কেশাকর্ষণ অপবা
নন্দন করিয়া আনিবে। যদি তাহা না পার, তবে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া
নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা তাহাকে প্রহার করিবে, এবং যখন সেই দুটো রমণী
মৃতপ্রায় হয়, তখন তাহার সিংহকে বিনাশ করিয়া ঐ অধিকাকে বন্ধনপূর্ব্বক
লইয়া আসিবে।

রমণীর প্রতি এইরূপ বলপ্রকাশ যে নিতান্ত অপর্য্যের কার্য্য, তাহা আর
অধিক বলিতে হইবে না। অথচ দেবগণ যাহার নিকট পরাভূত তাহাকে দমন।
করিবার ও অস্ত্র উপায় নাই। সুতরাং

“যদা যদাহি ধম্মস্ত ম্মানির্ভবতি ভারত” ইত্যাদি।

ভগবদ্বাক্যানুসারে অপর্য্যের বা দুষ্ক্রিয়াক্রমের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন বা
সামুদ্রিগের পরিজ্ঞাপ জন্ত ঐশীশক্তির আবির্ভাব (অবতারের) প্রয়োজন
চণ্ডীতেও “ইখং যদা যদা বাধা”—ইত্যাদি পরমেশ্বরের বাক্যানুসারেও ঐশীশক্তি
আবির্ভাবের আবশ্যকতা প্রকাশ পাইয়াছে।

গুপ্তাসুরের আজ্ঞানুসারে চণ্ড-মুণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেবীকে গ্রহণ
করিতে উত্তত হইলে ক্রোধে দেবীর মুখমণ্ডল সমী (সেফালিকা পুষ্পের বৃন্তের
স্তায়) বর্ণ হইল, এবং তাহার ক্রোড়ভাগে ললাটফলক হইতে করালবদনা “কালী”
বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। যথা—

“কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসি পাশিনী।

বিচিত্র খট্টাক ধরা নরমাগা বিভূষণা ॥

দ্বাপিচর্ম্ম পরিধানা শুক মাংসাতি ভৈরবা।

অতি বিস্তার বদনা জিহ্বা ললন ভাষণা ॥

নিমগ্না-রক্ত নয়না নাদাপূরিত দিঘ্রুখা ॥”

ব্যাক্রচর্ম্ম পরিহিতা কালীর এইরূপ ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণন শুনিয়া, কেহ কেহ
হয়-ত কালীকে আদিমকালের ঘোর অসত্য পার্শ্বত্য-নারী বলিয়া নাগাকুলে
করিতে পারেন, এবং—

“সি বেগেনাতি পতিতা ধাতরস্তী মহাস্থান্ ।

গৈলো তজ সুরারীনাগভক্ষয়ত তদ্বলং ॥

সেই মহাভীমা কালী অসুরশৈল্য মধ্যে অতি বেগে আগতিতা হইয়া মহাস্থরদিগকে আহত করিতে করিতে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । এইরূপ নরনাশ ভক্ষণদ্বারা আদিম অসভ্যতা প্রতিপন্নের আরও সুযোগ পাইতে পারেন । কিন্তু যদি নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করা যায়, তবে বুঝিতে পারিবেন এ “কালী” সামান্য রমণী নহেন, ইনি লোকক্ষয়কর মহাকাল শক্তিভূতা সংহাররূপিনী “কালী” । গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ বর্ণন উপলক্ষে যে,—

“ব্যাস্তাননং দীপ্ত বিশাল-নেত্রং ।

দৃষ্টাহি ত্বাং প্রব্যথিতাস্তরাশ্বা ॥

লোলিহু স্যে প্রসমানঃ সমস্তা-

চ্যোতান্ সমস্তান্ বদনৈর্জলন্তিঃ ॥”

এবস্তূত ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এ কি রূপ ? তখন ভগবান্ উত্তর করিলেন,—

“কালাহ্মি লোক ক্ষয়কুং প্রবুদ্ধো ।

লোকান্ সমাহন্তু মিহ প্রবৃত্তঃ ।

আমি লোকক্ষয়কারী কালস্বরূপ, সম্প্রতি আমি হুজ্রিশক্ত লোক সকল সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি । এক্ষণ বুঝিতে পারিবে এই করালবদনাও সেই লোকক্ষয়কারী কালের শক্তিভূতা—কালোদ্ভবা,—“কালী” ।

বিশ্বরূপের কালানল সন্নিভ করালবদনে যেমন,—

“যথা প্রদীপ্ত জলনং পতঙ্গা ।

বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগা ॥

তথৈব নাশায় বিশস্তি লোকা-

স্তবাণি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥”

পতঙ্গগণ যেমন মরণের জন্য অতিনেগে দাবিত হইয়া প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করে, তজ্জণ এই হুজ্রিশক্ত লোক সকল মরণের নিমিত্ত অতিবেগে তোমার করাল-মুখ বিনয়ে প্রবিষ্ট হইতেছে ।

এ স্থলেও সেইরূপ কালী,—

“পাক্ষি-গ্রাহাঙ্কুশ-গ্রাহী দোষ বণ্টা সমধিতান্ ।

সমাদারৈক হন্তেন মুখে চিক্লেপ বারমান্ ॥

তদৈব যোমন্তরগৈ রথং সারথিনা সহ।

নিষ্কিপ্য বজ্রে দশনৈশ্চর্য্যস্ব্যতি তৈরবং ॥”

করালবদনা কালী পার্শ্বরক্ষক হস্তিপক যোদ্ধা এবং ঘণ্টাদি সমন্বিত তত্তী সকল একহস্তঘারা গ্রহণ করিয়া মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং অপর হস্তে সারথিগৃহ রথ, অশ্বের সহিত অশ্বারোহী গ্রহণপূর্ব্বক বহনে নিক্ষেপ করিয়া দত্তঘারা অতি ভীষণরূপে চৰ্চণ করিতে লাগিলেন।

এ কি, সাধারণ নারীর কার্য্য? এ সেই মহাকাশের করাল বজ্র! এ সেই কালরূপিনী কালী চক্রের বিনাশার্থ ঐশীশক্তিরূপে অবতীর্ণা হইয়া কালপূর্ণ অমুরগণকে হস্তী, অশ্ব, রথাদি সহ মহাকাশের করালবজ্রে নিক্ষেপ করিতেছেন। প্রলয়ঙ্কর মহাভবনে মহাহরকৃৎ ঐশীশক্তির রণরঙ্গিনী চামুণ্ডাবেশে তাজব নৃত্য হৃদয়ঙ্গম করা ভক্ত-ভাবকের কার্য্য। সাধারণ দৃষ্টিতে কালীরূপ যে, আদিম অসভ্যা নগ্না-রাক্ষসী ভাবাপন্ন। নারীর কল্লব আনয়ন করিলে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

(ক্রমঃ)

শ্রীহর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্ববত্ত্ব।

চন্দ্রগুপ্ত।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে কোশলরাজ্য মতাপরাক্রম শক্তিরূপে বিখ্যাত হয়। এত সময় কোশলরাজ্য প্রশেনাশ্বরের পিতা মহাকোশলের শাসনাধীনে উন্নতির সু-উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। মহাকোশলরাজ্য একদিকে গিরিপ্ৰান্ত হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত, অপরদিকে—পশ্চিমে কোশল এবং রামগঙ্গা নদীতীর ও পূর্ব্বগঙ্গক পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণে কতিপয় ক্ষুদ্র নরপতি স্বাধীনতা-সুখ উপভোগ করিতেন। পূর্ব্বকোশল বহুকাল শকরিগের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে কিন্তু ক্ষমতাশালী লিচ্ছত্বিগণের প্রতিবন্ধকতার উত্তরকালে উন্নতিলাভে অক্ষম হয়। ইহার দক্ষিণদিকে নগর এবং চম্পা নামক দুইটা ক্ষুদ্ররাজ্যের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। মহাকোশল নৌভর-বুদ্ধের বল্যকালে যগবগণ শেষ সংগ্রামে জরলাভ করায় এই কলঙ্কের চিরসমাপ্তি ঘটে। ভারতের অমর দক্ষিণপূর্ব্ব এই নূতন নক্ষত্রের অভ্যুদয় স্থাপন আলোচনা করিলে নানা নয়ন-মনোহরী চিত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

এই নবশক্তির অভ্যুদয় ও বিস্তৃতি বিষয়ে যোগাধিনিসের বিদ্যুতবশেষ

বিবরণী ও "Ceylon Chronicles"এ অনেক কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ, মগধরাজ্য যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী লাভ করেন। মগধের অভ্যুদয়েই কোশল-রাজ্যের অবনতি সূচিত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ও পশ্চিম-কোশলে মগধের আধিপত্য স্বীকৃত হয়। দূরবর্তী গঞ্জাব ও উজ্জয়িনী প্রদেশও মগধরাজ্যের নিরীক্ষাচিত প্রতিনিধিকত্বক শাসিত হইত। ভারতের এই সময়ের ইতিহাসে প্রথম দেখা যায় যে, আফগানিস্থান হইতে আর্ঘাভূমিতে প্রবেশ করিয়া পূর্বাভি-মুখীম বঙ্গদেশ এবং হিমালয় হইতে মধ্য প্রদেশ পর্য্যন্ত এইবিস্তীর্ণ ভূভাগ একচ্ছত্র শাসনাধীন হয়। মগধরাজ্য কীকট দেশ নামেও পরিচিত ছিল। মহাভারতে মগধ ও কোশল সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা দৃষ্টিগোচর হয়,—

ইঙ্গিতজ্ঞাশ্চ মগধাঃ প্রোক্ষিতজ্ঞাশ্চ কোশলাঃ ।

অর্দ্ধোক্তাঃ কুরুপাক্ষালাঃ শালায়াঃ কুংস্রামুশাসনাঃ ॥ ৮ । ৪৫ । ৪৮

আসিরিয়া এবং মিশরের ভ্রায় ভারতের সমস্ত প্রাচীন রাজধানীগুলির ভূ-বল উত্তমরূপে খনন করিয়া না দেখা পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না, কিরূপে এই মহান্ পরিবর্তন প্রকৃত প্রস্তাবে সংঘটিত হইয়াছে। পরি-বর্তনের ক্রম ও কারণ সমূহ অপরিস্ফুট হইলেও পূর্বোন্নিধিত গ্রন্থদ্বয় হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঐরূপ পরিবর্তন ব্যাপার প্রকৃতই সংঘটিত হইয়াছিল।

মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণী বহুদিন হইল বিশ্বস্তির অঙ্কে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। পরবর্তী গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব গ্রন্থে স্থলবিশেষে বাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সোয়ানবেক (Schwanbeck) মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া ম্যাক্রিন্ডেল (Meerindle) সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ Ancient India গ্রন্থে অনূদিত হয়। গ্রন্থকারগণের উদ্ধৃত এই সকল অংশগুলির প্রতি নিঃসন্দেহে আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না, কারণ তাহা মেগাস্থিনিসের নিজের লিখিত কি না তৎসম্বন্ধেও ঘোর সন্দেহ বিদ্যমান রহিয়াছে।

হিন্দু নরপতি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব সময়ে গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বহুকাল ভারতবর্ষে অতিবাহিত করিয়া নানারূপ প্রত্যক্ষ ও জনশ্রুতিমূলক এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত গল্প লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সকল কথা সত্য বলিয়া সুধা-সমাজে গৃহীত হয় নাই। গ্রীক পণ্ডিতগণও মেগাস্থিনিসের বিবরণীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। ভারতে তিন বিঘত পরিমাণ উচ্চ মনুষ্য আছে, ইহাদের কাহারো কাহারো নাসিকা নাই, নিখাস প্রাণ্যের নিগিত যুগের উপরিভাগে দুইটি ছিদ্র

মাত্র আছে। হোমরের বর্ণনামুসারে এই তিন বিষত মনুষ্যের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও পাটিল পক্ষীরা যুদ্ধ করিত। কারণ উহারা ইহাদের ডিম্ব বিনাশ করে। মেগাস্থিনিএর এই সকল কথা কি বিশ্বাস্য? কেহুকি বলিতে পারেন তিন বিষত উচ্চ মনুষ্য সত্য সত্যই ভারতে বাস করিত? তৎপর আগাদনযুক্ত কর্ণ বিশিষ্ট ইন্টকোটটাই জাতি, অথ হটতেও ক্রতগমনশীল; অকুকাডিজ জাতি, কুকুরের ন্যায় কর্ণ বিশিষ্ট মনুষ্যটাই জাতি, নাগাগ্র বর্জিত অমুকটারিজ প্রভৃতি অদ্ভুত মনুষ্যজাতির বিবরণ এবং স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা প্রভৃতি নানা অদ্ভুত পশুপক্ষীর বিবরণও তুল্যরূপে অবিস্মাস্য। Strabo এই সকল বিষয় একবারে মচা কথা বলিয়া অতিমত বাক্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এতৎ স্বষেও ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে, তাহার মূল্য সামান্য নহে। পূর্বোক্তরূপ প্রচুর অদ্ভুত বিবরণের মধ্য হইতে এই ঐতিহাসিক বিবরণ উদ্ধার করিতে পারিলে, তাহা হইতে নানা রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। মেগাস্থিনিস মগধ-রাজধানী পাটলিপুত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

ভারতবর্ষের বৃহত্তম নগরীর নাম পালিবোথো—এরনোবাস্ (Erannobas) ও গঙ্গার সংযোগ স্থলে অবস্থিত। এই নগরী দৈর্ঘ্যে ৮০ স্টেডিয়া (প্রায় দশ মাইল; এক স্টেডিয়াতে ২২১ গজ হয়) এবং প্রস্থে পনের স্টেডিয়া (প্রায় ছই মাইল) ছয় শত ফিট প্রস্থে এবং ত্রিশ হস্ত গভীর একটা পরিখা দ্বারা এই নগরীর চতুঃপার্শ্ব পরিবেষ্টিত এবং উত্তর চারিদিকে ৫৭০টি গম্বুজ (tower) ৬৪টি ভোরণ-দ্বার ছিল। মেগাস্থিনিস আর একটা আশ্চর্য্যকর কথা বলেন যে, প্রত্যেক ভারতবাসীই স্বাধীন, তাহাদের মধ্যে একজনও ক্রীতদাস নাই।

৩০০ খৃষ্টাব্দের পাটলিপুত্রের এই বিবরণ সত্য বলিয়াই মনে হয়। রিজ ডেভিড্ মহোদয় তাহার নথ্যপ্রচারিত Buddhist India নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“The number of towers allows one to every seventy-five yards, so that archers, in the towers, could cover the space intervening between any two. The number of gates would allow one to each 660 yards, which is quite a probable and convenient distance. The extent of the fortifications is indeed prodigious.”

ভারতবাসীর ধারণা যে, তাহাদের প্রাচীন নগরাদি বহু বিস্তৃত ছিল। ইহার পোষকতা নথ্য প্রমাণেরও অভাব নাই তখন পাটলিপুত্রের আকার

ও প্রাকার সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস বাহা বিবৃত করিয়াছেন তাহা অসিদ্ধাস করা যায় না। কিন্তু দাসপ্রথা সম্বন্ধে পৰ্যটকের উক্তিটির প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে মন অগ্রসর হয় না। কারণ নান্য প্রমাণ পরস্পরা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালের দাসপ্রথা ভারতবর্ষের একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কিন্তু গ্রীক লেখক যখন ইহার বিপরীত উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অস্বাভাবিকতা বহির্ভূত পাবে যে, মেগাস্থিনিসের সময় ভারতবর্ষে যে ভাবে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে তাঁহার পক্ষে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হইয়াছিল। যে সময়ে লেখকের স্বদেশ, গ্রীসে দাসপ্রথা প্রবলরূপে পরিবর্তিত হইতেছিল, সে সময়ে ভারতের দাসপ্রথা কেন যে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না, তাহা বুঝা যায় না *। মেগাস্থিনিসের এসম্প্রকার বর্ণনা পাঠে অস্বস্তি হয় যে, তিনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করেন নাই। আমাদের এইরূপ অনুমানের আর একটা কারণ এই যে, তিনি ভারতীয়গণকে সাতটি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভারতীয় জনসাধারণ সম্বন্ধে তাহার অভিমত এই যে,—ভারতীয় বৃষ্টিপূজকদিগের সংখ্যা মুসলমানগণের ৫।৬ গুণ বেশী। আশ্চর্যের বিষয় এই, বিপুল জনসংখ্য বৃষ্টিমত ব্যক্তিকল্পক শাসিত হয় এবং সমাজেই মুসলমান নরপতিগণের প্রাধান্য স্বীকার করে। কিন্তু যখন আমরা দেখিতে পাই যে, জাতীয় কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া তাহারা আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপে পরস্পর হইতে বিভিন্ন এবং পরস্পর ক্রোধান্বিত, তখন সে আশ্চর্য্যভাপ তিরোহিত হয়। * * * লোকে সাধারণতঃ ৭২টি জাতির কথা বলিয়া থাকে কিন্তু তাহাদের সাতটি প্রধান। যথা,—(১) দ্বাশনিক পণ্ডিত, (২) কৃষকশ্রেণী, (৩) পশুপালক, (৪) শিল্পব্যবসায়ী; (৫) যুদ্ধব্যবসায়ী; (৬) গুপ্তচর বা পরিদর্শকশ্রেণী এবং সম্রাটগণ। মেগাস্থিনিস কাগ্যক্ষেত্রে ভারতবাসীকে যে সকল কার্যে নিযুক্ত দেখিয়াছিলেন, তাহা লইয়াই সাতটি জাতি কল্পনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—ভারতের জন্মগত এই চতুষ্টয়, মেগাস্থিনিসের নিকট তাহা

* প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে দাসপ্রথা প্রচলিত থাকা স্বত্ত্বেও যে তাহা নিবেদনী ভ্রমণকারিগণের দৃষ্টিগোচর পতিত হয় নাই তাহার কারণ ভারতবাসীরা দাসদিগের প্রতি নিম্নরূপ ব্যবহার করিত না; তাহাদিগকে অগণ্য পরিবারের লোকের প্রায় সম্বন্ধেই পালন করিত। তজ্জন্ত নিবেদনী ভ্রমণকারীরা তৎকালে সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল না বলিয়া মনে করিয়াছেন।

Vide R. C. Dutt's History of Ancient India অঃ ৭৮।

ব্যবসায় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—“স্বশ্রেণীর বাহিরের লোকের সত্বে কেহ উদ্ধৃত করিতে এবং স্ব-ব্যবসায় পরিভাগ করতঃ অপর বৃত্তি অবলম্বন করিবার অধিকারী নহে * । যেমন মৈনিক-ব্যবসায়ী পুরুষ কখনও কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে বা শিল্প ব্যবসায়ী কখনও দার্শনিক পণ্ডিত শ্রেণী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না ।” বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—

রাজ্যের প্রধান কামচারীবৃন্দের মধ্যে কাহারও প্রতি বাণিজ্যের, কাহারও প্রতি নাগরিক বিভাগের, কাহারও প্রতি মৈনিক বিভাগের ভারার্পিত হয় । তাহাদের কেহ নদ-সদী পরিদর্শন, মিশর দেশের ভূমি পরিমাপের ক্রায় জমি মাপ করিতেও এবং কেহ বা জল নির্গমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা পরিদর্শন ও সকল শাখাপথে বাহাতে সমান জল যায় তাহার ব্যবস্থা করিতেন ।

তাহাদের প্রতিই শিকারিগণের (সম্ভবতঃ রাজ্যস্থগৃহীত শিকারী) তত্ত্বাবধারণ এবং তাহাদের দোষগুণ বিচার করিয়া তদনুসারে পুরস্কৃত করিবার ভার অর্পিত ছিল । ইহারা রাজস্ব আদায় এবং ছুজপর, হুজপর, লৌহকার ও খনিজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যবসায়িগণের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতেন । ইহারা রাজপথ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রত্যেক দশ ষ্টেডিয়া পর পর একটি করিয়া পথ প্রদর্শক ও দূরত্বজ্ঞাপক স্তম্ভ স্থাপন করিতেন ।

বাহাদের প্রতি নাগরিক বিভাগের ভার অর্পিত ছিল, তাহারা ছয় দলে বিভক্ত, এক এক দলে পাঁচজন করিয়া লোক থাকিত । প্রথম দলের সভাগণ প্রধানতঃ দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত । দ্বিতীয় দল বিদেশীয় আগন্তুকদিগের অভ্যর্থনাদি করিত । আগন্তুকগণের অবস্থানের যে অপরিজ্ঞাত ছিল তাহাও আশানুগত মনে হয় না । কারণ প্রসঙ্গক্রমে তিনি হানান্তরে লিখিয়াছেন যে, লোকে ৭২টি জাতির কথা বলিয়া থাকিলেও আমি তাহাদের প্রাধান পুরোহিতের মিস্ট্র শুনিয়াছি যে তাহারা প্রধানতঃ চতুর্ভুজ বিভক্ত । এই মূল চারি শাখা হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে । এতদ্ভিন্ন চতুর্ভুজ সম্বন্ধে তিনি আর কিছু লিপিবদ্ধ করেন নাই । তাহার কল্পিত জাতি সাতটির মধ্যে একদণ একাধিকবার গণিত হইয়াছে । এই সপ্তজাতির

* Strabo-এর গ্রন্থে মেগাস্থেনিসের এই উক্তি এইরূপ রূপান্তরিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে ;—“No one is allowed to marry out of his own class, or to exchange one profession for another, or to follow more than one business. An exception is made in favour of the philosopher, who for his virtue is allowed this privilege.” XV. 49.

নিমিত্ত বাগস্থান প্রদান এবং সাংসারিক কার্যনির্বাহের নিমিত্ত ভূত্বাদি নিয়োগ করিত। তাহার দেশে ফিরিবার সময় তাহাদের সঙ্গে প্রহরী বা পথপ্রদর্শক দেওয়া হইত। কোনও আগন্তকের মৃত্যু হইলে, তাহার বিষয় সম্পত্তি তাহার আত্মারের নিকট প্রেরিত হইত। তাহাদের পীড়ার সময় রীতিমত সেবাশ্রদ্ধা করা এবং মৃত্যু হইলে সমাধিস্থ করাও এই দলের কর্তব্য কার্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তৃতীয় দল অগ্নিবাসিগণের জন্ত মৃত্যুর তালিকা সংগ্রহ করিত। করণার্থের নিমিত্ত যে এই তালিকা সংগৃহীত হইত তাহা নহে। মহৎ, নীচ যে ব্যক্তিই মরুক না কেন তাহার মৃত্যুসংবাদ রাজ-গোচরে আনা হইত।

চতুর্থদল ব্যবসায় বাণিজ্যের তথ্য তল্লাস লষ্টতেন। ইহারা ওজন (মান) ও পরিমাপ সংক্রান্ত কার্যাদি ও সাময়িক শস্ত সাধারণের জ্ঞাতসারে বাহ্যতে বিক্রীত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেন *। বিপণন কর না দিয়া কেহই ছইপ্রকার জিনিসের ব্যবসায় করিতে পারিত না।

পঞ্চমদল কলকারখানার নির্মিত সমস্ত দ্রব্য সাধারণের জ্ঞাতসারে বিক্রয় করিত। নূতন ও পুরাতন জিনিস পৃথকভাবে বিক্রীত হইত, কেহ উভয় জিনিস একত্রে বিক্রয় করিলে দণ্ডাৰ্হ হইত।

ষষ্ঠদল বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের দশমাংশ রাজকরস্বরূপ আদায় করিত। প্রতারণাপূর্বক কেহ এই দশমাংশ না দিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত।

মেগাস্থিনিস তৎপর পাটলিপুত্রের মৈত্র্য বিভাগের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও সন্দেহজনক। তিনি বলেন,—“পাটলিপুত্র-রাজের অধীনে সৈন্য সর্বদার জন্ত ৬০,০০০ হাজার পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বরোহী সৈন্য এবং আট হাজার রণকুঞ্জর থাকিত। এতদ্বারাই তাহার অতুল ঐশ্বর্য-শৈল্প্যের বিষয় অনুমান করা যায়।”

Pliny-ও এই বিবরণ অনুসারে লিখিয়াছেন,—যষ্টি সহস্র পদাতিক, ত্রিশ সহস্র অশ্বরোহী এবং নয় সহস্র হস্তী পাটলিপুত্র-রাজের ছিল। শেষ সংখ্যাটি নয় হাজার কণা বোধ হয় নিপিকর-ভ্রমপ্রসাদ। Pliny তৎকালীন অপরূপ

* This is very obscure. The words sum to imply either that sale was usually not by private barter, but by auction, or that sales took place through advertisement. Neither of these State-ments would be correct. — *Buddhist India* P. 265.

ভারতীয় নরপতির সৈন্তসংখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাও মেগাস্থিনিসের অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়। যথা,—

রাজ্য	পদাতিক	অশ্বারোহী	হস্তী
কলিঙ্গ	৬০,০০০	১০,০০০	৭০০
ভালুকতা (Talukta)	৫০,০০০	৪,০০০	৭০০
আন্ধ্র	১০০,০০০	২০০০,	১০০০,

মগধরাজের পদাতিক সৈন্ত-সংখ্যা এতদপেক্ষা অধিক না থাকিলেও তাঁহার অশ্বারোহী ও রথকূঞ্জের সংখ্যা অত্যধিক ছিল। ভারতের পুরাতত্ত্ব বিষয়ক নানা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং পূর্বপ্রদেশে ঐরূপ হস্তী পাওয়া যাইত। তৎকালে ঐসকল প্রদেশ মগধরাজের শাসনাধীন ছিল, কাজেই তাঁহার সৈন্তবিভাগে যে অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট অশ্ব ও হস্তী থাকিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। যুদ্ধকালে ঐরূপ প্রভূত হস্তীর প্রচলন—মগধরাজের ক্রমোন্নতির সহায়তা করিয়াছিল।

চন্দ্রশুভকেই এই মহান্ মগধরাজের প্রতিষ্ঠাতা বলা বোধ হয় নিরাপদ হইবে না। আলেকজেন্ডার যখন ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রদেশ আক্রমণ করেন, তিনি তখন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, মগধরাজের (চন্দ্রশুভের পূর্বপুরুষ ধানন্দ) অধীন ২,০০,০০০ পদাতিক, ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০০ যুদ্ধরথ এবং চারিহাজার যুদ্ধ-হস্তী সজ্জিত আছে*। এই সময় নিশ্চয়ই কোশলরাজ্য এবং সম্ভবতঃ কোশলের দক্ষিণ ও পশ্চিমস্থিত রাজ্যনিচয় মগধরাজের অন্তর্গত হইয়াছিল। চন্দ্রশুভ পঞ্জাব এবং ইণ্ডাসের মোহনা পর্য্যন্ত স্বরাজ্যভুক্ত করেন। এই পঞ্জাবে থাকিয়াই তিনি আলেকজেন্ডারের আক্রমণ হেতু, দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থা দর্শন করতঃ নূতনভাবে সৈন্তসংগ্রহ করিয়া ধানন্দকে আক্রমণ ও পরাজিত করেন। ইণ্ডাসের দক্ষিণ প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল কি না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। Pliny এই সময়ের বৃত্তান্ত বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, মগধসাম্রাজ্য নদীর (Indus) ঠিক দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত প্রদেশ পরে তাঁহার শাসনাধীন হইতে পারে। কল্পদামনের প্রসঙ্গ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রশুভের এক প্রতিনিধি দ্বারা ঐহান শাসিত হইত। প্রাচীন অস্ট্রোরাজ্য ও তাঁহার রাজধানী উজ্জয়িনী সম্ভবতঃ ইহার পূর্বেই মগধরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

একস্মক্রে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকগণের নিপক্ষতাচরণ করিতে সমর্থ হন। চতুর্থ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সেলিকিউস্ নিস্তের উন্নতির সুউচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ভারতবর্ষে আক্রমণ করিয়া আলেকজেন্ডারের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে আর একটি বিভিন্ন শক্তির সাফল্য পান। আলেকজেন্ডার ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ ক্রমে ক্রমে আক্রমণ করিয়া অধিকৃত করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল রাজ্যাধিপতিগণের মধ্যে সন্তোষাচ্ছন্ন না, পরস্পর পরস্পরের উন্নতিতে দ্বিধা প্রকাশ করিত। কাজেই আলেকজেন্ডারের বিরুদ্ধে অত্র রাজ্যাধিপতিগণ কিছুই উচ্চাচর্য করিতেন না। সেলিকিউস্ একবারে সুপ্রতিষ্ঠিত মগধরাজ্য আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিবার কল্পনা করেন কিন্তু তৎসাপন করে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা নিফল হয়। কতিপয় বৃদ্ধ পরাজিত হইয়া তিনি ইণ্ডাসের পশ্চিমের অধিকৃত সমস্ত প্রদেশ—এমন কি Gedrosia এবং Arachosia ও (বর্তমান আফগানিস্তানের সমতুল্য) বিজয়ের করে সমর্পণ করিয়া পলায়নপর হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া সোভাগ্যশালী বিবেচনা করেন। তিনি ভারতীয় নিজয়ী নরপতির করে প্রায় দুইতাকে সম্রাটান করেন এবং দ্বিনিময়ে জামাতার নিওট চেষ্টে পাঁচশত মন্তমাত্ত প্রাপ্ত হন।

ইহার পরই মেগাস্থিনিস দূতরূপে পাটলিপুত্রে গমন করেন। এই সময়ে গ্রীক হইতে বহু দূরবর্তী—ভারতের গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরস্থ হিন্দুরাজ্যে, ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীদ্বারা যে রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছিল, তথায় প্রায় ৩০০ খৃষ্টাব্দে গ্রীক শাসনবর্জিত আরম্ভ হয়। তৎকালে মগধরাজ্যে নানা শ্রেণীর গ্রীক-শিল্পী এবং গ্রীক-রাজহুহিতার ও রাজদূতের সঙ্গে অসংখ্য গ্রীক অচর্য মগধরাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই ভাবে গ্রীচ ও প্রতীচ্য রাজ্যের মধ্যে পরিচয় লাভের সূত্রপতি হয়। ইহার পূর্বে হইতেই তখনকার মহাত্মা বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। নির্বাণ লাভের মাসাদিক পূর্বে তিনি পাটলিপুত্রে আগমন করেন। কিন্তু গ্রীক অচর্যগণ এই মহাত্মার প্রতি একবারও কৃপাদৃষ্টিপাত করেন নাই। মেগাস্থিনিসও তাঁহার বিবরণীতে বুদ্ধ সম্বন্ধে কোনও কথাই লিগিবদ্ধ করেন নাই।

চন্দ্রগুপ্ত যে অতুচ্ছল কন্দম্বাকদ্যো দম্মা-সরদায়ের পদ হইতে ভারতের তৎকালীন সর্বপ্রধান ক্ষমতাপালা ও বৃহত্তর সাম্রাজ্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা আলোচনা করিলে বিশ্বাসভিত্তক হইতে হয়। তাঁহার উচ্চাচর্যগণ, এই ক্রম বিকাশ গ্রীক, শোক ও হিন্দুসাহিত্যে জনপ্রতির মত প্রথিত আছে।

অপরপর ক্ষমতাশালী নরপতিগণের জায় তাঁতাকেও অদৃষ্টের হীত্র বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। তাহাতেই তিনি অলোকজ্যেষ্ঠার ও Charlemagne-এর মত প্রচলিত উপজ্ঞানের নায়ক হইয়া আছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, সম্রাট আর্নস্টেড দি গ্রেটের পলাতক ও পরাজিত অবস্থা লইয়া উপজ্ঞানে কি মনোরম গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে,—ঋণক-রমণীও তাহার পিষ্টকের সুধারসের সঙ্গে কি বকন ও প্রোত্তোভানে তাহার নাম সংযুক্ত রক্ষিয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে ইংরাজ একটা গল্প Chronicle of Ceylon এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

“এক গ্রামের একটী রমণী (ইহারই উল্লেখনের পার্শ্বে চন্দ্রগুপ্ত লুক্কাইত ছিলেন) চাপাথির (পিষ্টক বিশেষ) তাজিয়া নিজপুত্রকে আহ্বার করিতে দেয়। পুত্র প্রথম একখানি চাপাথির মধ্যভাগটুকু খাইয়া চারিপার্শ্বের অংশগুলি ফেলিয়া দেয় এবং মাতার নিকট আর একখানি প্রার্থনা করে। এতদর্শনে ও শ্রবণে জননী বলে,—“এই বালকের কার্য্যও ঠিক চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আক্রমণের অমুরূপ।” বালক উত্তর করে,—‘কেন না? আমি কি করিয়াছি এবং চন্দ্রগুপ্তই না কি করিয়াছেন?’ মাতা উত্তর করিল,—‘তুমি পিষ্টকের মধ্যভাগ খাইয়া চারিধারের অংশ ফেলিয়া দিতেছ। চন্দ্রগুপ্তও মহানহিন্মিত নরপতি হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সীমান্ত হইতে আরম্ভ না করিয়া, নগরের মধ্যস্থিত খাইবার কালে, নগরের মধ্যভাগ আক্রমণ করেন। ইহাতে তাঁহার বৈশ্বজন্য বিপক্ষ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া মুতামুখে পতিত হয়, ইহাই তাঁহার নিবৃত্তি! *”

চন্দ্রগুপ্ত লুক্কাইত স্থান হইতে রমণীর এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করায় উন্নতিলাভে সমর্থ হন। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্ব-কালের নানা যুদ্ধবিগ্রহ, জয়-পরাজয়, সন্ধি-হত্যা, রাজমোহিতা ও সমাজমোহিতার মধ্যেও কূটনীতি-বিশারদ সুপণ্ডিত চাণক্যের উপদেশানুযায়ী চালিত হইয়া উত্তরোত্তর যশঃ সৌভাগ্য লাভ করেন। চন্দ্রগুপ্তের অঙ্কুর প্রকৃতি জীবজন্তুর প্রতিও কিরূপ কার্য্যকরী ছিল, তদ্বিষয়ে গ্রীক লেখক জটিন্ কতিপয় গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একদা চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষ কর্তৃক পলায়নপর হন। বনমধ্য দিয়া কিয়দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন এবং বিশ্রামার্থ একস্থানে উপবেশন করেন। কিন্তু ক্লান্তিবশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হন। ঐতাবসরে একটা প্রকাণ্ডকায় সিংহ

* Mahavamsa Tika, P. 123. (Colombo edition, 1895.)

আগিয়া তাঁহার দেহ লেহন করিয়া তদীয় বিগত বশঃ গৌরভ তাঁহার দেহে পুনঃ প্রদীপ্ত করিয়া দেয় । অতঃপর পুনরায় গৈর্যসংগ্ৰহ করিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলে একটা বহুহস্তী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইবার অভিপ्राয়ে তাঁহার সম্মুখে মস্তক নত করে ।

চন্দ্রগুপ্তের সময় হিন্দুবংশোদ্ভিত্যের বহু গদ্য রচিত হইলেও, আশ্চর্যের বিষয় যে, একখানিতেও তাঁহার ব্যাপ্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই । চানক্য নামক যে পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের সহায়তায় তিনি রাজ্যাশায়ন করিতেন এবং বাহ্যিক, সাহিত্য তিনি বিশেষ মতায় স্থাপন করিয়াছিলেন, সেষ্ট ব্রাহ্মণও সাংসর্গ্য বশতঃ ঘৃণ্য ‘মৌর্য’রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন । কিন্তু জাতীয় ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের যে চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা চিরকাল ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগরক থাকিবে । খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত বুদ্ধারাম্য নামক সর্ষসমাদৃত একখানি সংস্কৃত নাটকে চন্দ্রগুপ্ত নামকরণে অঙ্কিত হইয়াছেন । উক্ত নাটকে চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে নানা রহস্য নিহিত আছে, লায়ন মহোদয় প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে বহু চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তাহা উন্মোচিত নানা রহস্য নিষ্কাশন করিতে প্রয়াস পান । বলা বাহুল্য তাঁহার চেষ্টা ফলবতীও হইয়াছে ।

শ্রীজয়সুন্দর সারাদাস ;

প্রাণেশচন্দ্র ।

(১০)

মুক্তির একরত্তি মন আজ নিজের উপর তুলিয়া দেও ; তার মে মনটা এতদিন পাখীর পালকের মত পাতল ছিল তা আজ পাথরের মত ভারি হইয়া গিয়াছে । তার ছোট হৃদয়ের ছোট বাগানের ফুরুরে বাতাস কে বন্ধ করিয়া দিল ? কে তার ছোট ছোট সুন্দর সুসংগিত ফুলগুলি ছিঁড়িয়া লইল ? কে তার কচি গাছের কচি ডাল ভাঙিয়া ফেলিল ? এমন প্রশ্নমুষ্টি কে বিধ্বস্ত করিল ?

ভালবাসার অঙ্কশাস্ত্রে ভগ্নাংশের স্থান নাই । যেখানে ভগ্নাংশ সেই স্থানেই বিগতি । ভালবাসা চাহে—সমষ্টি, সমস্ত, সর্বস্ব । মুক্তি জানিত প্রাণেশচন্দ্র তাহাকে স্নেহ করে—সে প্রাণেশচন্দ্রকে ভালবাসে । ভাগ্যকূলে প্রাণেশচন্দ্র—তাঁহার সঙ্গে এক পরমাসুন্দরী কথা—এই কথার কপায় মুক্তির ।

মন ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছে। প্রাণেশচন্দ্রের মনের এক অংশ তবে এই বালিকা হরিয়া লইয়াছে—মুক্তি তাহা সহিতে পারিতেছে না।

প্রতিযোগিতার সামান্য হিল্লোলে প্রেমের নদীতে দেখিতে দেখিতে তরঙ্গ উঠে, ভাবনায় ভাবনায় তরঙ্গগুলি বড় হয়, স্থায়ী হয়, কুল-কিণারা ভাঙিতে থাকে। মুক্তির এতদিন কোন ভাবনা ছিল নী। প্রতিযোগিতায় তাহার সরল চিত্রে এক চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে। সে এতদিন সারাদিন প্রাণেশচন্দ্রের কথা ভাবে নাই—প্রাণেশচন্দ্র যথা সময়ে আসিত, বসিত, গড়াইত, চণিয়া যাইত; মুক্তি তাকে আদর করিত, তাহার সঙ্গে আনন্দার করিত, তাহার নিকট গড়িত—প্রাণেশ চণিয়া গেলে মুক্তি নিশ্চিন্ত মনে আগুন কাজে মন দিত। এখন তাহার মনের মধ্যে প্রাণেশচন্দ্র প্রতিগন্ধকে উঁকি দিতেছে—সঙ্গে সেই মেয়ে। চোক বুজিলে ঐ ছই মুখ লুকায় না; গড়িতে আরম্ভ করিলে পুস্তকের পাতার উপর ঐ ছই মুখ ভাসিয়া উঠে। সর্বদা চিন্তায় মুক্তির ভাবনাসার প্রকৃতিরও একটু পরিবর্তন ঘটয়াছে। বাহ্য শীতল ছিল, তাহাতে উত্তাপ আসিয়াছে। এই উত্তাপে তাহার বালিকা-ভাবের এক রূপান্তর ঘটাইয়াছে। মনের কথা বলিবার তার কেহ নাই। স্কুলের সময়ে অত্র বালিকাগণ জিজ্ঞাসা করে—“শেকের ভাই ওমন দেখায় কেন?” মুক্তি মুখ লুকায়, গড়ার সময় হইলে খুখু ফেলিবার ভলৈ উঠিয়া যায়।

‘ঐ কথা কে, এটা তার জানা আবশ্যক। কিন্তু কে বলিলে?’ তাহার দিখায়—দাদা মহাশয় জানেন। দাদা মহাশয় তাহার পিতার সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য আসিয়াছেন। মুক্তি, দাদা মহাশয়কে ঘিঁড়ির গথে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল, “বলুন নী দাদা মহাশয় ঐ মেয়েটা কে?”

দাদা মহাশয়। তোর বাবাও আমাকে দাদা মহাশয় বকো, তুইও দাদা মহাশয় বলিসু?

মুক্তি। আপনি যে দাদা মহাশয় হয়ে জন্মেছেন।

দাদা মহাশয়। তবে তুইও আমার মা হয়ে জন্মেছিল।

মুক্তি। দাদা মহাশয় তবে হলেন চেগে; না গো না, তা হবে না; যে জোঠা মহাশয়—না তাও হবে না। দাদা মহাশয়ও না, জোঠা মহাশয়ও না, আপনি আমাদের আপনি।

মুক্তি কি এক প্রকৃত্তির দৃষ্টিতে দাদা মহাশয়ের আপাদ সস্তক নিরীক্ষণ করিল।

দাদামশায় । যদি “আপনি আমাদের আগনি”, তা হ’লে তুইও আমার তুই ঃ
 মুক্তি । “বলুন না ঐ সেয়েটা কে ; আগেশ দাদা কেন ওদের সঙ্গে
 গেলেন ।”

দাদা মশায় । আমি কিছু বুঝতে পারছি না ।

মুক্তি । “আপনি কেন জেনে আসছেন না ?

দাদা মশায় । কোথায় জানবো ? সে কি এখানে—গম্বার ওপার,
 সেখানে আছে, কি কোথায় গেছে, কে জানে ।

মুক্তি । যেখানে বেয়ে থাকুন, আপনি জেনে আনতে পারবেন ।

দাদা মশায় । তোমার বাবার সঙ্গে কথা আছে, তারপর কি করা বাকি
 বলবো ।

দাদা মশায় অজ্ঞেয়বাবুর কামরায় চলিয়া গেলেন । মুক্তি দাদা মশায়ের
 ফিরিবার সময় পর্য্যন্ত সিঁড়ির রেলিংএ পীঠ দিয়া গড়িতে যত্ন করিল । বুধা যত্ন ঃ
 পুস্তক থাকিল হাতে, চোখ থাকিল পাতে, মন থাকিল গম্বার ওপারে ।

পূর্ণ এক ঘণ্টার পর দাদামশায় ঐ গথে ফিরিয়া আসিলেন ।

মুক্তি । বাবা কি বললেন ?

দাদামশায় । ব—লি—লে—ন—জা—র—ও—হু—দিন—দেখা—বাক্য ।

মুক্তি হু’দিনকে দীর্ঘ হু’মাগ মনে করিয়া বিস্ময় মনে সে স্থান হইতে অন্তর্হিত
 হইল ।

(১১)

সাঁকের উঁচায় গম্বার কোঠা—জল স্থল আকাশ না’তাল এক হইয়া
 গিয়াছে । বাতাসে কোয়ামার আবর্ত উঠিয়াছে ; শব্দে মন্মন্ শব্দ, নদীতটে
 তরঙ্গ আঘাতের তর্জ তর্জ ধ্বনি ;—এক ঐক্যতান উচ্চ বাদ্য বাজিয়া বাইতেছে ।

নদী তীরে শুণের পথ সন্ধীর্ণ—কোন স্থান মুক্ত, কোন স্থানে উত্তর পার্শ্বে
 উচ্চ শরবন । এই সন্ধীর্ণ গথে দোকানী অগ্রে, আগেশচন্দ্র পশ্চাতে—ভাগ্য-
 কুলের বন্দর হইতে দক্ষিণমুখে চলিয়াছে । দশ হাত অন্তরেও কোণ
 চেনা যায় না ।

কিয়দূর অগ্রগর হইয়া দোকানী গথ হইতে গম্বার চড়ায় নামিয়া নদীরদিকে
 চলিল । আগেশচন্দ্র একটু দূরে কোয়ামার আঁধারে অদৃশ্য হইয়া গড়িয়াছিল ;
 দোকানী গথকে ডাকিয়া গইল ।

সম্মুখে লোকের কোলাহল শুনা যাউতেছে ; কুকুর, শূগল তাড়াইতেছে ; উভয় স্থাপদের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের ধ্বনি জন-কোলাহল ভেদ করিয়া উচ্চে উঠিয়াছে। রাজার রাজার কাক, চিল, গাঙ্গ চিল, নাচরাজা আসিয়া সমবেত হইয়াছে—কলরব করিতেছে। প্রাণেশচন্দ্রের মনে ভয় উপস্থিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—“কোথায় লইয়া চলিয়াছ ?” দোকানী হাত তুলিয়া দিক্ দেখাইয়া দিল। কিন্তু দিকের কিছুই দেখিবার উপায় নাই ; তখন কোয়াসায় সব অদৃশ্য। মধ্যে মধ্যে কোয়াসার আশ্রিত কাটির বাউতেছে, পলকে অদূরে কতকগুলি স্তূপের স্থায় কি দৃষ্টিগোচর হইতেছে, আবার অদৃশ্য হইয়া যাউতেছে।

উভয়ে সেই স্তূপশ্রেণীর নিকট বাটয়া উপস্থিত হইল। ঐ স্তূপশ্রেণী আর কিছুই নহে—নৌকার ছই—এক পংক্তিতে অনেকগুলি। কতকগুলি ভূমির সঙ্গে সংলগ্ন, কতকগুলি ভূমি হইতে উচ্চ, উহার তলে বাস করিবার জন্ত নৌকার নাচালের পাটাতন ; প্রায় প্রতিগৃহের সম্মুখেই এক একটা হাঁড়িতে ঘসি কি নৌকার পুরাতন কাছি জ্বলিতেছে, কোন হাঁড়ির নিকটে হকা ও ককী আছে। চারি দিকে প্রোথিত দাঁড়ের ফলকাংশ ধ্বংসের স্থায় দেখা যাউতেছে।

মুদী দেখিল, অদূরে একটা ককী হইতে তামাকের সদ্যঃ ধূম উঠিতেছে। গন্ধ পাঠিয়া সে সেদিকে ছুটিয়া ককীটি লইল, হুঁতাতে কসিয়া তামাকে দম দিয়া নাকে মুখে তামাকের ধূম ছাড়িয়া কোয়াসার সঙ্গে মিশাইয়া বলিল—“ঠাকুর ঐ মাইয়াগার জন্তে তুমি খুব বেস্ত হইচ, মাইয়াগা বড় রূপসী—সেও তোমাকে ডাক্তাছে—দেখানু।”

প্রাণেশ। তবে পাওয়া গেছে ; আছে ; কোথায় ? কেমন ? বাড়ুঝে মশায় ? তুমি এখানে কেন এসেছিলে ?

দোকানী দ্রুত চলিয়াছে ; কথা বলিতে বলিতে প্রাণেশচন্দ্রও বাতাসের মত ছুটিয়াছে।

দোকানী। শেয়াল, কুকুর, কাক, চিল দেউপা বুনতাছুন না, ঠাকুর, এইটা জগৎবেড় জালের বন্ধ—কুই, কাতলা, বোয়াল, কত বড় বড় মাছ। ছোট জালে চাঁদা, ইচা, চাপলা, এবং কত—

প্রাণেশ। মাছের কপা রাগ, তাঁরা—তুমি কেন এসেছিলে, দেখেছ—ভাল তো ?

দোকানী। আমরা দোকানী—মাজী রাগি—এখানে মাছ মস্তা—মাছ লইতে আনিছিলাম—তারপর দেখান কি—কি ভয়ানক কাহা।

প্রাণেশ । শীঘ্র চল, শীঘ্র বল ।

পনর কুড়ি হাত দূরে দেখা গেল, অতি দীর্ঘ একটা কি দাঁড়াইয়া,—কোয়ামার মধ্যে আকৃতি বড় দেখায়—প্রাণেশচন্দ্র অগ্রগর হইয়া দেখিল দাঁড়ান পুরুষ—বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁহার পশ্চাতে একগাণি ডিম্ব নোকা ডাক্সার তোলা,—তাহার মধ্যে হাঁড়িতে আগুন জলিতেছে । অনেক লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে ।

দোকানী । ঐ দেখেন ডিম্বের মাঠপো—

বন্দ্যোপাধ্যায় । কি ভয়ানক, বাবাজি তোমার সঙ্গে যে দেখা হবে তা মনে ভাবি নাই । বড় বিপদ ।

প্রাণেশ । কি বিপদ বলুন, আপনার মেয়েটা কেমন ?

বন্দ্যোপাধ্যায় । তা পরে বলবো ; মাকে আগে দেখ ; তোমার তোরঙ্গটা আছে, ঐ পড়ে আছে—কোন ঔষধ থাকে যদি—

প্রাণেশচন্দ্র আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া দ্রুত বাস্তব ডিম্ব নোকায় উঠিয়া পড়িল ; দেখিল—মেয়েটা সময়ে সময়ে সচেতন হইতেছে, বলিতেছে—“তিনি” “তিনি”—আবার মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছে । মেয়েটার মাথার নিকটে তাহার মাসি বাতাস দিতেছেন । দুইদিকে দুইজন লোক, উভয়েরই কাপড়ে রক্ত ।

প্রাণেশচন্দ্র এই দৃশ্য দেখিয়া ঘটনা কি, জিজ্ঞাসা করিতে উদ্বৃত্ত হইল, বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল চিকিৎসার কথা বলিতে লাগিলেন ।

প্রাণেশচন্দ্র প্রথমতঃ চারিদিকে যে লোক দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদিগকে সরাইয়া দিলেন, বালিকাটাকে বাতাসের দিকে মাথা দিয়া শোয়াইতে বলিলেন । প্রাণেশের তোরঙ্গে কিছু ঔষধ ছিল । কি ঔষধ, এই অবস্থায় পাটবে কি না—প্রাণেশ তোরঙ্গ খুলিল ; একটি ঔষধ খুঁজিয়া বাতির করিয়া পাওইয়া দিল ।

দোকানী তখন দ্রুত কয়েক হালি বড় চিঙীর গোকে ধরিয়া কুলাইয়া ডিম্বের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া বলিল, “ঠাকুর মশয় বজ্রা না, কি হইচিল, স্তম্ভ, আসি গা, নাছ খুঁইয়া, আবার আশ্রম, তারেও লইয়া আশ্রম, তারে দিয়া আপনামোর কাম হইবো, বড় সেবাত ।”

তখন সূর্যের আলোক কোয়ামার আবর্ত ভেদ করিয়া এক এক বার দেখা দিতেছে । মাছের বন্ধে অনেক লোক আগিয়াছে ; চিল কাক অনেক ; শৃগাল কিছু দূরে, কুকুর নিকটে । জালের আধ ডোবা আধ ভাগা বাঁশের চোঙ্গার টোনে কাক সকল বসিতেছে, টোন ডুবিতেছে—কাক সকল উড়িয়া বাইতেছে । চিল, গাফচিল—জালের বেড়ের ভিতরের চুণা মাছ ছোঁয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া ছুটিয়া

চলিয়াছে। চিল, কাক, গাঙ্গুচিল—একের গাঙ্গু আছে কাড়িয়া লইবার জন্য একে
অন্তের পশ্চাতে ছুটিতেছে ; পরস্পর হৃদয়ে মুখের গাঙ্গু জলে গড়িয়া গাইতেছে।
পদ্মার তীরে মাছের বন্ধ ; সেন প্রকাণ্ড হাট—কি কোলাহল। মাছ পরা, মাছ
দেখা, মাছ বেচা, মাছ কেনা—এক অপূর্ণ আনন্দ। এমন আনন্দ কোতুলক
অল্প বিষয়েই দেখা যায়। মাছের চুবড়ি দেখিলে ও ঘোমটা দেখিলে উঁকি
দ্বিবার ইচ্ছা দমাঠিয়া রাখা দায়।

এই আনন্দ কোলাহলের এক কোণে, শুকনা চড়ায় একখানি ছোট ডিক্সিতে
যে হুশিচুস্তা ঝুঁঝাবনা স্থান লইয়াছিল, ডিক্সির দূরে দাঁড়াইয়া দুই এক জন
তাহার ঘটনা জিজ্ঞাসা করিতেছে। কেহ কাতকেও কিছু ঠিক বলিতে
পারিতেছে না। ছটের ছিদ্র দিয়া কেহ কেহ উঁকি দিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ কটা
শ্মশ্রু এক জন বন্ধ পানর তাহাদিককে সরাইয়া দিতেছে।

বালিকার ঘোর মুচ্ছা।

একটী তারার প্রতি ।

ওগো স্বদূরের রাণী,

কোন অলকার দ্রাক্ষা নিঙারি

ভরেছ কুস্তখানি ;

নয়নে নয়নে এত মধু কথা

মোহাগিনী তুমি শিথিয়াছ কোথা,

আকুল আঁচল পলকে পলকে

মুখে বুকে লত টানি ;

ওগো স্বদূরের রাণী !

(২)

নীল আকাশের তারা,

গভীর নিশীথে পশে মোর কাণে

তব নুপুরের সাড়া ;

তুমি স্রবগেতে আমি পরা গায়

ভবু চেনা চেনা লাগে সে তোমায়,

স্বধা মাথা কার মুখ পানি যেন

তোমাতে হয়েছে হারা ;

নীল আকাশের তারা ।

(৩)

ওগো গুরুজন ভীণ,

তুমি যে আমার মানসমোহিনী

নহ'ত অগরিচিহা ;

কত নিরঞ্জে কত মক্ষায়

শতবার দেখা তোমার আমার,

তুমি যে আমার হৃদি মাল্যে

কণক অপরাধিহা ;

ওগো গুরুজন ভীণ !

(৪)

দাঁড়াও দাঁড়াও আলি,

ভূষিত পথিকে ও দ্রাক্ষা রস

দাও দাও গণি ঢালি,

পিয়াও পীষ্ম ওগো বর নারী

হউক অমর তোমার পূজারী,

কণক বরণী ! কণক কুস্ত

হবে না তোমার খালি ;

দাঁড়াও দাঁড়াও আলি ।

(৫)

ওগো সুদূরের রাণী,

কোন অলকার দ্রাক্ষা নিঙরি

ভরেছ কুস্ত খানি ;

নয়নে নয়নে এত মধু কথা

গোলাগিনী তুমি শিখরাজ কোথা

আকুল আঁচল পলকে পলকে

মুখে বুকে লহ টানি

ওগো সুদূরের রাণী !

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কাথকুজ ।

সরস্বতী দৃশ্যভোগ্যোদেননদোষদন্তরম ।

ভং দেবনিম্বিতং দেশং ব্রহ্মবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্তাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ ।

এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো সৈ ব্রহ্মবর্ত্তাদনন্তরঃ ॥

মহুসংহিতা—দ্বিতীয় অধ্যায় । ১৭ । ১৯

মৎস্তাদিশব্দা বহুবচনাস্তা। এষ দেশবিশেষ বাচকঃ পঞ্চালাঃ কাথকুজদেশাঃ
শূরসেনকাঃ মথুরাদেশাঃ ষ্ট্যাদি কুল কভট্ট ।

কুরুক্ষেত্রং সমস্তপঞ্চকং শ্রমিদ্ধং কুরবন্তত্র অবংগতাঃ । মৎস্তাদয়ঃ শব্দা
বহুবচনাস্তা। এষ দেশবচনাঃ । ইতি মেধাতিথি !

মৎস্তা বিরাটদেশাঃ । পঞ্চালাঃ কাথকুজাচ্ছিত্রাঃ শূরসেনকা মাগুরাঃ ।
ইতি গোবিন্দরাজ ।

শূরসেনকাঃ শূরসেনাণ্য নৃপতিনা নিবাসহেন নির্মিতানাম শূরোপলক্ষিতা
দেশাঃ । ইতি নারায়ণ ।

কাথকুজের নাম বঙ্গবাসিগণের নিকট সুপরিচিত । কথিত আছে যে
আদিশূরের সময়ে এদেশে কাথকুজ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচজন কায়স্থ
আগমন করেন, বঙ্গীয় রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণ ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণের
বংশধর বলিয়া পরিচিত । দক্ষিণ রাঢ়ী এবং বঙ্গজ-কায়স্থগণ মধ্য অনেকে উক্ত
পাঁচজন কায়স্থের বংশধর বলিয়া কথিত ।

কাথকুজ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক জন-প্রবাদ রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে ।
রাবণর্ষি কুশনাভের শতকল্পা বায়ুর শক্তিতে এই প্রদেশে কুজা হন, এজন্য এই
প্রদেশ কাথকুজ বলিয়া কথিত হয় । বাস্তবিক এই প্রদেশের প্রাচীন নাম
পঞ্চাল । এই প্রদেশে মহর্ষি বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন । এখানে ঋষিদের
প্রথম মণ্ডলের ক্রিয়দংশ এবং তৃতীয় মণ্ডল রচিত হয় ; একরূপ অনুমান করা
হইতে পারে । এই স্থান হইতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, শিবনন পুত্র সুদাম নরপতির
বক্তৃতা সম্পাদন করার জন্ত পঞ্চনদ প্রদেশে গমন করেন ।

এক সময়ে পঞ্চনদ প্রদেশ ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইত ।
আদিম আৰ্য্যগণ সিদ্ধনদ অতিক্রম করিয়া প্রথমতঃ সরস্বতী নদীর অপর পারস্থ
প্রদেশে আশ্রয় স্থাপন করেন । পরিশেষে সরস্বতী পূর্বপারস্থ প্রদেশ ভারত-

বর্ণে গন্ধশ্রুতি বলিয়া সমাদৃত হয় । মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণ এবং শল্যের বাদীভূবাদ মধ্যে পঞ্চনদ প্রদেশের নানাপ্রকার নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে ।

এই প্রদেশে পঞ্চালগণ আবাস স্থাপন করিতে এই স্থান পঞ্চাল প্রদেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে । পঞ্চালবংশে সুপ্রসিদ্ধ ক্রপদ জন্মগ্রহণ করেন । পাণ্ডবমহিষী যাজ্ঞসেনী ক্রপদ-তনয়া ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে কুরুগণ পঞ্চালপ্রদেশের কিয়দংশ অধিকার করেন । কাশ্মিরানগর পঞ্চালের রাজধানী ছিল ; কুরুগণ যে স্থান অধিকার করেন, তাহার রাজধানী অহিচ্ছত্র নগরে স্থাপিত হয় । মহাভারতে লিখিত হইয়াছে কোরব-শুরু দ্রোণ ক্রপদ হঠতে পঞ্চালপ্রদেশের অর্দ্ধাংশ অধিকার করেন । প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে এই স্থান পুনরাধিকার করার জন্য পঞ্চাল ও কুরুগণ মধ্যে এক সঁমর হইয়াছিল । মহর্ষি ব্যাস সেই সঁমর বর্ণনা করিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছেন । এই সত্যবল্লী প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন, কুরুক্ষেত্র মহাসঁমর পঞ্চাল এবং কুরুগণ মধ্যে হইয়াছিল । বাস্তবিক এই শুরুতর প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের মত প্রকাশ করা, এক্ষণে আমাদের উদ্দেশ্য নহে ।

শকাব্দার সময়ে গুপ্তবংশীয় জনৈক নরপতি এই প্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন । কাশ্মিরকুজনগরে গুপ্ত নরপতিগণের রাজধানী ছিল । গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ । এই চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের অধীশ্বর ভূমি বিখ্যাত চন্দ্রগুপ্ত নহে ।

গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের সাময়িক বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । কোন কোন মুদ্রায় পার্শ্বতী, মহাদেব, মহাদেবের ত্রিশূল, হৈমবতীবাহন সিংহ প্রভৃতির প্রতিরূপ দৃষ্ট হয় । ইহারা শৈব ছিলেন ।

শকাব্দার চতুর্থ শতাব্দীতে এই প্রদেশে বসুদেব নামক একব্যক্তি রাজত্ব স্থাপন করেন ।

শকাব্দার ষষ্ঠ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত হর্ষবর্দ্ধন কাশ্মিরকুজের অধীশ্বর ছিলেন । মহাকবি বাণভট্ট তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া হর্ষচরিত রচনা করেন । এই হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । তাঁহার সময়ে চীন-পরিব্রাজক হিয়ান্‌সাঙ ৩৮৩০-৩৮৩১ খ্রিস্টাব্দে আগমন করেন ।

হিয়ান্‌ বলেন এই সময়ে শিলাদিত্য ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাধিক নরপতি ছিলেন । তিনি কামরূপের অধিপতি ভাস্করবর্ম্মার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন । (ক্রমশঃ)

ত্রীবেণতীমোহন গুহ ।

সাক্ষ্য-ভাৱা ।

যখন সূৰ্য্য অস্তাচলে গমন কৰে, ধীৰে ধীৰে আকাশ-গট হঠাৎ কোমল লোহিত কিৰণমালা অশ্রুত হৈতে থাকে, তখন পশ্চিমগগনে একটা অতুচ্ছল নক্ষত্ৰ দেখা দেয়। এই তারকাটি দেখিলে মনে হয় যেন সূৰ্য্য চাক্ষুৰ্ভাৱে একপলু হীৰকের টুকুৰা শোভা পাচিছে। তখন আকাশে সহস্ৰ সহস্ৰ ভাৱা ফুটিয়া উঠে নাই, তাই সুবিশাল নভোমণ্ডলৰ একপ্ৰান্তে বিৰাজিত এই মঞ্জুহীন সমুচ্ছল নক্ষত্ৰটি বড়ই রমণীয় দোষ হয় এবং উহা সকলৰই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিয়া থাকে। কবিতা সন্দৰ্ভে রমণীয় উচ্ছল-কলাট-শোভিত চাক্ষুৰ-বিশ্বকোষ গোষ্ঠী আকাশেৰ এই পৰিষ্কৃত সূৰ্য্যৰ ভাৱকাৰ সহিত তুলনা কৰিয়া থাকেন।

বাস্তবিক এই সাক্ষ্য-ভাৱাটি বড়ই মনোহৰ। যখন দিবসেৰ শেষৰ আলোক নিবিয়া যায়, সূৰ্য্যতল সমীৰণ বহিতে থাকে, সদা পৰিষ্কৃতিত কুসুমগন্ধে বনভূমি আমোদিত হৈয়া উঠে, বিহঙ্গগণ নীড়াভিগুণে দলে দলে ছুটিতে ছুটিতে আকাশ পথে স্তম্ভৰ স্বৰস্বৰ্ণা বৰ্ষণ কৰে, সেই শুভমুহূৰ্ত্তে সাক্ষ্য-ভাৱকা দেখা দেয়। তখন উঠাকে দেখিলে মনে হয় যেন কোন ত্ৰিদিব-বাণী স্তম্ভ আকাশ প্ৰাঙ্গণ হঠাৎ নীচৰে কোতূহলবিষ্ট চিত্তে শাস্ত, কৰ্ম কোলাহলশূন্য ধৰণীৰ শ্ৰামল শোভা আপন মনে নিৰীক্ষণ কৰিতেছেন। এই ভাৱকাটি অতীব রমণীয়; সময়ের গুণে তাৎক্ষণিক চিত্তাকৰ্ষক।

ইংৰাজীতে এই সাক্ষ্য-ভাৱাকে ভিনাম্ (Venus) বুলে। Venus অৰ্থ সৌন্দৰ্য্য এবং প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বাস্তবিক সাক্ষ্যভাৱকা Venus নামটি সার্থক। যখন দিবাসকালে সংসারের কষ্ট-চক্ৰ নিশ্চল হয়, গৰিষ্ঠাণ্ড জীৱকূল ব্যাকুলহৃদয়ে শান্তিপূৰ্ণ আগাশে ঐচ্ছিকবৰ্ত্তন কৰে, যখন গৃহে গৃহে প্ৰণয়ের স্তব সন্মিলন, তখনই সাক্ষ্যভাৱকা পৰিপূৰ্ণ যৌৱনশ্ৰী গৰৱিনী ভাসিনীৰ স্তাৱ সৌন্দৰ্য্য-ছটাৱ আকাশ আলোকিত কৰিয়া দেখা দেয়। সাক্ষ্যভাৱকা যথার্থই সৌন্দৰ্য্যেৰ ৰাণী। আবার চকুলা প্ৰণয়দেৱতাৰ স্তায় এই ভাৱকাটিও অতি অস্থিৰ স্বভাৱ। অস্থিৰতাৰ জন্ত ইহাৰ সৌন্দৰ্য্যেৰ আকৰ্ষণ আরও বৰ্দ্ধিত হৈয়াছে। আজ দেখিলে সাক্ষ্যভাৱা পশ্চিমগগনে ফুটিয়া উঠিয়াছে, দুইদিন পর দেখিলে মধ্য আকাশে দ্ৰুতিবিকিৰণ কৰিতেছে, আবার কয়দিন পর উঠাকে পূৰ্ব নভোমণ্ডলে বিকাশ পাইতে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। তাই সাক্ষ্যভাৱাকে প্ৰেম ও সৌন্দৰ্য্যেৰ ৰাণী বুলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সাক্ষ্যভাৱা অতি প্ৰাচীনকাল হইতেই কবি ও

ভাবুকদিগের চিত্ত বিমোহিত করিয়া আসিতেছে। কত কাব্যে তাহার মহিমা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ।

আজ কবির কথা না বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা এই নক্ষত্রটী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই লিখিতেছি । বৈজ্ঞানিকেরা কঠোর সত্য আবিষ্কারে নিযুক্ত ; তাঁহারা প্রেম কিম্বা সৌন্দর্য্যমুগ্ধগনপরায়ণ নহেন । তাই সাধারণতার মাধুরী দেখিয়াই তাঁহারা আশ্চর্য্যবস্থত হন নাই । বিজ্ঞানে এই তারকাটী শুক্রগ্রহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । সাধারণ দৃষ্টিতে শুক্রগ্রহ সর্কীপেক্ষা বৃহৎ জ্যোতিষ্ক বলিয়া প্রতীয়মান হয় । বাস্তবিক ইহা সর্কীপেক্ষা বৃহৎ হওয়া দূরে থাকুক প্রায় সকল গ্রহই ইহা অপেক্ষা আকারে বড় । শুক্র চন্দ্র হইতে বৃহত্তর এবং প্রায় পৃথিবীর সমান । বৃহস্পতি, শুক্র অপেক্ষা উজ্জলতায় বিন বটে কিন্তু আকারে শুক্র হইতে তেরশত গুণ বড় । আবার ‘সিরিয়াস্’ (Sirius) শুক্র হইতে একশত কোটি গুণ বড় । আমরা আমাদের ধর্ম্মজীবন বিশালতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি না । উহাপেক্ষা একশত কোটি গুণ বড় গ্রহটী কিরূপ তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য । শুক্র অপরাণের নক্ষত্র হইতে উজ্জলতর, সেই জন্য উহা দিনের বেলায়ও দূরবীক্ষণ সাহায্য ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । কিন্তু শুক্রের স্বীয় আলোক নাই । উহা চন্দ্র এবং পৃথিবীর জ্বালা সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত । শুক্রের একদিক মাত্র সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে । পূর্বে পণ্ডিতেরা মনে করিতেন শুক্রও পৃথিবীর জ্বালা আপন কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে এবং ২৩ ঘণ্টায় শুক্র একবার আপনার অক্ষ বা মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্তন করিয়া থাকে । কিন্তু সে ভ্রম এখন দূর হইয়াছে । ‘মিলানের’ এক জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শুক্রের গায় একটী কাল ছায়া এবং দুইটী উজ্জল চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেন । এই অধ্যয়নায়মীল পণ্ডিত ক্রমাগত ঐ দুই গায়কাল শুক্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন কিন্তু সেই ছায়া ও চিহ্নের কোন ব্যতিক্রম হইল না । ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে ২৩ ঘণ্টা অথবা তদপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে শুক্র আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে পারে না । ‘মিলানের’ পণ্ডিত আরও দেখিলেন ২২৫ দিনে শুক্র সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল ৩৭.৫ কিন্তু তাহার সেই কাল ছায়া এবং প্রদীপ্ত চিহ্ন দুইটী একবারের জন্যও তিরোহিত হইল না । তখন তাঁহার বিশ্বাস অক্ষল, শুক্র সর্বদা একদিক সূর্য্যভিমুখে রাখিয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । এই সিদ্ধান্তই এখন সত্য বলিয়া সকলে গ্রহণ করিয়াছেন ।

শুক্রের ব্যাস প্রায় ৬৬০ মাইল । উহা পৃথিবীর জ্বালা গোলাকার এবং দুই

মেরুগ্রাস্ত কিংকি চাপা। শুক্রের সাগরী (Mass) প্রায় পৃথিবীর সমান কিন্তু সামগ্রীর ভুলনায় ওজন খুব কম। উহার ওজন পৃথিবীর ওজনের তিন চতুর্থাংশ। শুক্রের মাধ্যাকর্ষণও সেই অনুপাতে কম। ভূ পৃষ্ঠে একটা জিনিস সেকেন্ডে ১৬ ফিট গতিতে পতিত হয়। শুক্রগ্রহে পতনশীলের গতি উহা অপেক্ষা সেকেন্ডে তিন ফিট কম। শুক্র, সূর্য্য হইতে ছয় কোটি সত্তর লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। শুক্র গ্রহের বৎসর আমাদের পৃথিবীর বৎসর অপেক্ষা দ্বন্দ্ব। পৃথিবী ৩৬৫ দিন বা ১২ মাসে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে কিন্তু শুক্র ২২৫ দিনের মধ্যে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে।

শুক্র পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের অধিক নিকটবর্তী। সেইজন্ত নৈকট্যের অনুপাতে আলো ও তাপের পরিমাণ বেশী। শুক্র, পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইজন্ত মনে হয় তথায় কোন প্রাণীর বাস নাই। পৃথিবীর উপর সূর্য্য যে তাপ বিকীর্ণ করে আত্ম যদি তাহা দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে এই শস্য শ্রামলা ধরণী উত্তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত হইবে। শুক্র, ভক্র, লতা শুক্র হইয়া যাউবে, জীবকুল অসহ্য উত্তাপে প্রাণত্যাগ করিবে। সেই জন্তই মনে হয় শুক্র গ্রহে কোন প্রাণী নাই। কিন্তু এই বিষয়ে কিছুই স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই। আমরা যে প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে বাস করি উহাই কেবল জীবন ধারণের উপযোগী বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি। কিন্তু নৈসর্গিক অবস্থার ভিতর জীবজন্তু বাস করিতে পারে তাহা নির্ধারণ করিয়া বলা মানুষের অসাধ্য। যে স্থানের অবস্থা যেরূপ, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ঠিক সেই অবস্থার উপযোগী জীব সৃষ্টি করিতে পারেন; অথবা প্রকৃতি জীবকে অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। একটা ঘটনা হইতে তাহাদিগের চৈতন্যোদয় হইয়াছে। সমুদ্রের তলদেশে জলের চাপ অতিশয় ভয়ানক অতরাং তাহা দেখিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করিয়া ছিলেন সমুদ্রতল প্রাণী শূন্য; কেননা এত চাপের নীচে কোন প্রাণীরই বাচিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। সমুদ্রের নীচে তাপ এত অধিক যে কুস্তীরের কঠিন চর্শ্ব অথবা গুপ্তারের স্বক, বাতা বন্ধুকের গুলিতেও বিদ্ধ হয় না তাহাও উহার দশ ভাগের এক ভাগ চাপে ফাটিয়া যাইবে। কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে সমুদ্রের তলদেশেও প্রাণী বাস করে। উহাদের দেহ সমুদ্রের অসাধারণ চাপের উপযোগী করিয়া গঠিত হইয়াছে। সমুদ্রতলস্থিত প্রাণীদিগকে উপরে তুলিলে চাপের অনুরোধে তেঁতু অর্দ্ধ পথেই তাহাদের দেহ ফাটিয়া যায়।

গ্রহ উপগ্রহের সহিত পৃথিবীর নৈসর্গিক পার্থক্য আছে বলিয়াই এখনা স্থির

করিয়া বলা যায় না যে তথ্য কোন প্রাণী নাই। অবস্থা ভেদে জীব জন্তর প্রকৃতিগত নৈষম্য হইয়া থাকে। 'ল্যাপলাণ্ডে' লোক বাস করিতেছে এসংবাদ শুনিবার পূর্বে যদি শুনিতাম যে পৃথিবীতে এমন একটা দেশ আছে যেখানে হ্রস্বমাসে একবার সূর্য্য দেখা দেয় এবং সমস্তটা দেশ বরফে আবৃত থাকে তাহা হইলে আমরা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোক নিশ্চয়ই মনে করিতাম ল্যাপলাণ্ডে কোন প্রাণী বাস করিতে পারে না। সেইরূপ ল্যাপলাণ্ডের অধিবাসীরাও ভারতবর্ষের ভীষণ উত্তাপের কথা শুনিয়া মনে করিত ভারতবর্ষ জন শূন্য। যে সকল গ্রহের নৈসর্গিক অবস্থা পৃথিবীর নৈসর্গিক অবস্থার অনুরূপ নহে তথ্য কোন প্রাণী নাই বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি। কিন্তু ভগবান প্রত্যেক গ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থার উপযোগী জীব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন কি না তাহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব কিরূপে জানিতে পারিব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

দেওয়ান মনোয়ার খাঁ।

দেওয়ান দীনা খাঁ মসনদ আলির প্রপৌত্র দেওয়ান মনোয়ার খাঁ একজন হৃদয় প্রভাপশালী, ভীষণ প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং অতীব সম্মানিত ভূপতি ছিলেন। তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটা স্থানে স্থায়ী আবাস বাটী নির্মাণ করিয়া তাহার দেওয়ানবাগ নামাকরণ করেন। দেওয়ানবাগে সুবিস্তীর্ণ পীরখ বেষ্টিত বৃহৎ দীর্ঘিকায় পরিশোভিত, দেওয়ানবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আজিও দৃষ্টিগোচর হয়। উত্তরদিকে মিঠাপুকুর নামে এম্বলাম মস্জিদমোদিত পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ খনিত একটা পুকুরিণী বর্তমান আছে। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় উহা অল্পমহলের অলাশয় ছিল। দীর্ঘিকার দক্ষিণ তটে প্রকাণ্ড মস্জিদ আজিও বর্তমান রহিয়াছে। যেখানে বসিয়া দেওয়ান সাহেব নামাজ পড়িতেন তাহা বহু মূল্যবান সুনীল প্রস্তরে খচিত। ছাংঘের বিষয় এই যে অল্পদিন হইল এই মস্জিদের একটা গোষজ ভাজিয়া পড়িয়াছে। উহার উপরে অনেক বড় বড় বট প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়াছে। দেওয়ান মনোয়ার খাঁর স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ এই প্রাচীন মস্জিদটা আর বেশী দিন আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। হায়! একদিন যাহা দীনা খাঁ মসনদ আলির প্রপৌত্র দেওয়ান মনোয়ার খাঁর পবিত্র তল্লালয় ছিল, কালক্রমে তাহা আজ ব্যস্ত ও শৃংখল প্রভৃতি নৃপজন্তর আবাসভূমি হইয়াছে। দেওয়ানবাগের সখায় এখন

করা যায়। তথ্যই প্রচুর পরিমাণে ইষ্টকাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহাতে অসুস্থিত হয় যে, অনেক অট্টালিকা দ্বিগুণিত ও ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে । সুপ্রসিদ্ধ মনোয়ার খাঁর রাজধানী বর্তমানে বারদীর নাগ পরিবারের প্রভুত্বাধীন ।

মনোয়ার খাঁ ঢাকার শাসনকর্তা সায়েস্তা খাঁর সমসাময়িক লোক ছিলেন । দেওয়ানবাগের কিছুদূরে—পশ্চিম ও উত্তরপূর্বদিকে কতকগুলি মধ্যবিত্ত লোকের ভদ্রাসনের চিহ্ন দৃষ্ট হয় । উহার মধ্যে গজ্জন ও ভবিত রায়ের বাড়ীই সমধিক প্রসিদ্ধ । ইহারা উভয়েই বৈদ্যজাতীয় এবং মনোয়ার খাঁর কর্মচারী ছিলেন ।

সায়ের্তা খাঁ যখন আরাকান রাজ্যের সহিত চট্টগ্রাম লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করেন, তখন দেওয়ান মনোয়ার খাঁ সায়েস্তা খাঁর অনেক সহায়তা করিয়া ছিলেন এবং অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া দিল্লীশ্বরকে পর্য্যাপ্ত সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । মনোয়ার খাঁর অসীম বীরত্বকাহিনী দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইলে সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া ১৫৬৬ খৃঃ অব্দে “ভৌমিক” বংশধর মনোয়ার খাঁকে “মনসবদার” উপাধি প্রদান করেন । ঈশা খাঁর পরে এই বংশের মধ্যে ইনিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।

হিজরীর ১০৭৮ সালে সম্রাট শাজাহানের অসুস্থতাক্রমে গা সুলতান স্বাক্ষরিত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত অতীত সম্মানসূচক একখানি পত্র এখনও বর্তমান আছে । ইহাতেই উপলব্ধি হয় যে মনোয়ার খাঁ দিল্লীর “শাহি দরবারে” অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন । সম্রাট আওরঙ্গজেবের স্বাক্ষরিত আরও একখানি পত্র বর্তমান আছে তাহা পাঠে জানা যায় যে, মনোয়ার খাঁ কিরূপ হৃদ্যন্ত ও পরাক্রমশালী ভূপতি ছিলেন । পত্রের সারমর্ম এইরূপ—

“জোনাব ! শা সুলতান বিদ্রোহী হইয়া আপনারদিকে অগ্রসর হইতেছে, আশা করি আপনি তাহাকে কোনরূপ সাহায্য না করিয়া ধৃত করিবেন । আমি আপনার নিকট অনেক আশা করি । আপনার সাহায্যার্থে কুমার জৈহুদ্দিনকে পাঠাইতেছি তাহার নিকট সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন ।”

আওরঙ্গজেবের পত্র পাইয়া দেওয়ান মনোয়ার খাঁ শা সুলতানকে ধৃত করিবার জন্ত অগ্রসর হন । শা সুলতান ভীষণ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া মনোয়ার খাঁকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন । ইহাশ্রমে কুমার জৈহুদ্দিন পৌঁছলে মনোয়ার খাঁর বল চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয় এবং তিনি ভীমবেগে শা সুলতানকে আক্রমণ করেন । শা সুলতান পরাজিত হইয়া আরাকানে পলায়ন করেন । মনোয়ার খাঁ, দিল্লীশ্বরের সাহায্যে আরাকানরাজ্য আক্রমণ করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া ফেলেন ।

“তওয়ারিখে নাগেরী” নামক উদ্ভূত ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, মনোয়ার খাঁ হাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া হাজারকেও পরাস্ত করিয়া, তৎপরে কেত কেহ তাহাকে “পিলতন” (হাজার সমান) বলিয়া ডাকিত। বহুতঃ মনোয়ার খাঁর সহায়তাই মারেশা খাঁ হৃদ্বিও প্রাণে বঙ্গদেশ আগমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঢাকা নগরোত্তে মনোয়ার খাঁর কাছারীসিড়ী, বাজার বৃহৎ মসজিদ, ও গোরহান এখনও বর্তমান থাকিয়া মনোয়ার খাঁর নাম সকলের হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে। মনোয়ার খাঁর সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেওয়ান শরিফ খাঁ অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। সংসারে অতুল ঐশ্বর্য্য পদমংলয় বালুকার স্রায় পরিত্যাগ করিয়া সম্মান্য সন্ন্যাসিনী দরবেশ হইয়াছিলেন। অধুনা তাহার দরগা ও ভক্তনালয় পারুলিয়া গ্রামে বর্তমান আছে।

গৈয়দ মুকল হোসেন।

তুমি মা ডেকেছ।

তুমি মা ডেকেছ

আর কি থাকিতে পারি ?
সারাটি দিনের যতেক খেলা,
জ্বরতি উথল বকুল মালা,
ল'য়েছি শুটোয়ে যতন করি।

তুমি মা ডেকেছ

আর কি থাকিতে পারি ?
অলগ সাঁঝেতে বিধুর করে,
পলিল আহ্বান কুটার দ্বারে
হৃদয় পরাণ আকুল করি ;

তুমি মা ডেকেছ

আর কি থাকিতে পারি ?
কেলিয়ে এসেছি খেলার বাঁশী,
বিকচ অপোক মেফালি রানি,
পাথের ল'য়েছি নয়ন-বারি,

তুমি মা ডেকেছ

আর কি থাকিতে পারি ?

ভুন ভরিয়া বিজয় গানে,

ছুটিয়া চ'লেছি নদীর পানে,
ভীরেতে ভাসিছে সোণার তরী।

তুমি মা ডেকেছ

আর কি থাকিতে পারি ?
পিছনে আঁধার আসিছে ছুটি,
সাঁঝের আঁচল পড়িছে লুটি,
দিনের আলোক যেতেছে মরি।

তুমি মা ডেকেছ

আর কি থাকিতে পারি ?
লও মা তুলিয়া আপন কোলে,
দাওনা আঁকিয়া দগধভালে,
বিজয়-তিলক যতন করি।

তুমি মা ডেকেছ

আর কি থাকিতে পারি ?
ত্রিশোঁরীমোহন মুখোপাধ্যায়।



স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু ।

Kuntaline Press, Calcutta.

আব্রতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ।

ষষ্ঠ বর্ষ । { মরমসিংহ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ । { সপ্তম সংখ্যা ।

মাতৃ-মূর্তি ।

ওগো জন্মদে বঙ্গ !

স্বর্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ তোমার—

দেববাহিত অঙ্গ ;

স্বর্ণ তোমার অঙ্গণ করিণে,

স্বর্ণ তোমার মাটি,—

স্বর্ণ তোমার শত শীর্ষে,

উজ্জল—পরিপাটি ।

নন্দন হ'তে সুন্দর তব—

শ্রাম সজ্জিত বন ।

মন্দার হ'তে গন্ধ বহন—

তোমারি কুসুমগণ ।

তব তটময়ী গঙ্গা বর্ণনা—

গাহি মঙ্গল গীতি ;

আনিছে বহিরা, স্তম্ভ-অগিয়া

মোদেরি জন্তু নিতি ।

জগদ্বর্ত্ত সম্পদ তব—

শ্রাম সুন্দর মাঠ ;

লক্ষী গায়ের অঞ্চলে যেন—

খুলিয়া গিয়াছে গাঁঠ ।

নিবিধ-বরণ-বিহগ-কাঁকলী—

—কলিত কানন তব ।

প্রভাতে, প্রদোবে, হেমসর মেঘে—

খচিত তোমারি নভঃ ।

নিদায়ে মা ভূমি ধূগর বরণা—

কর্ষিত ভূমি তলে ।

বর্ষাক্ত তব নীল মাধুরী

রাজে নিখিল জলে ।

শরদে মা, ভূমি কমলে কুমুদে—

গর' গরকের ধান ।

হেমন্তে তব হেমসর তরু—

গাফিয়া উঠিলে ধান ।

শিশিরে তোমার গাপ্ত বদনে—

নীহারের অশ-বারি ।

বসন্তে গর' বিবিধ বরণে—

খচিত রচিত শাড়ী ।

বড় ঋতু সদা গাজার তোমারে—

ক্রীত কিস্করের প্রায় ।

অমৃদি তব চরণের তলে—

সতত আছাড় ধায় ।

অম্বের তরে, পণের তরে,

জগৎ তোমার দ্বারে ।

তোমারি মত মা মুক্ত হস্ত—

আম কে হইতে পারে ?

তুমি মা যত্না, তুমি মা গণা,

ওগো মঙ্গল সরি !

খোঁয়াই মুক্তিতে মিশিয়া যেন গো,

আঁসরা ধলু হই ।

শ্রীহরি প্রসন্ন দাসগুপ্ত

পুরাতন স্থান ।

প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে বাঙ্গালার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে এতদৈবীয় শিক্ষিত বা অশিক্ষিত পুরুষদিগের দৃষ্টি ছিল না বলিলে বোধ হয় অতুক্তি হয় না । পৃথিবীর বিশেষতঃ আমিষা মহাদেশের, প্রাচীন ও লুপ্তবিদ্যা সম্বন্ধে আগোচনা করিবার জন্য, প্রায় একশতাব্দিক বর্ষকাল পূর্বে যজ্ঞের "ভদ্রানীকন গবর্ণর এবং উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় রাজকর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক কলিকাতা মহানগরীতে "আমিয়াটিক সোসাইটি" নাম্নী প্রখ্যাত সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এই সভার তৎকালে বিদ্বজ্জনগণের মনোযোগ মনোযোগ সহিত এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে চর্চা করিবার পথ প্রশস্ত করিবার জন্য উপায় সমূহ উদ্ভাবিত হইত । সুবিখ্যাত আচার্য্য রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এল, ডি, এবং সুপ্রসিদ্ধ পাণ্ডী রোভার্টেও কুমারোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, এল, এম, ডি, মহাশয়দ্বয় এতদৈবীয়দ্বয়ের মধ্যে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে গুরুপ্রথম ও গুরুপ্রধান পথপ্রদর্শক ছিলেন । এই দুই মহাত্মা নানা ভাষায় নানা বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া জগৎবাদিগণকে চমৎকৃত করিয়া ছুলিয়া ছিলেন, বাস্তবিক একজন বহুভাষাতত্ত্বজ্ঞ, বহুবিদ্যা ও বহুশাস্ত্র পারদর্শী সাধুমান সমগ্রুণ্য ব্যক্তি আদর্শে আর কেহ ছিলেন না । ইংরাজ যেমন পণ্ডিত তেমন পরিপ্রসূ পুরুষ ছিলেন । ইংরাজ কেবল যে অলপক ছিলেন তাহা নহে পরন্তু ইংরাজের প্রতিভা, অসুস্থমানশক্তি এবং প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা, পৃথিবীর সর্বত্র পণ্ডিতদিগের শুভাপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না । ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রনাথের সমগ্রুণ্য ব্যক্তি, তাঁহার জীবিতকালে, ভট্ট নোক্ষমূলের ব্যতীত, পৃথিবীতে অপর কেহ ছিল না, ইহা গুরুবাহী সমস্ত প্রাণী । রাজেন্দ্রনাথের পরামর্শমরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে কতিপয় শিক্ষিত বংশধরী ভাবধেয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয় মনোযোগ প্রদর্শন করিয়া

ছিলেন, তদ্ব্যতীত বাবু প্রকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, আচার্য্য রামদাস মেন প্রভৃতি প্রধান ও প্রসিদ্ধ । বর্তমানকালে আরও কতকগুলি বঙ্গাঙ্গী ভ্রাতা প্রাচীন তত্ত্বেরদিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আশা ও সম্ভ্রামন সহকারে ইহাদের বক্তৃতা ও পরিশ্রমের সুফল দর্শন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি । এ বিষয়ে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় সুলেখকের পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থেরা জি আমাদেরগকে বর্ণিত সাহায্য প্রদান করিতে পারে । অধিকতর সুখের কথা এই, মহানাত্ম ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উৎসাহে, অমূল্য ও প্রভূত অর্থসাহায্যে অনেক স্থানের প্রাচীন কীর্তিসমূহ আবিষ্কৃত হইতেছে, অনেক কীর্তির ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং পুরাতন ও প্রয়োজনীয় কীর্তি সমূহের রক্ষা ও পুনঃ সংস্কার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইতেছে । এই গজাবমুগা সঙ্গমে—এই সুখের সময়ে—আমরা প্রাচীন ইতিহাসের অনেক সার কথা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব একরূপ আশা করিতে পারি । প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে প্রাচীনবংশ এবং প্রাচীন স্থানের অন্বেষণ করিতে হয় । প্রাচীন স্থানসমূহ বহুসংখ্যক প্রাচীন নিদর্শনে পরিপূর্ণ থাকে । যাহা হউক, একরূপ প্রাচীন বংশ ও প্রাচীন স্থান সমূহ এখনও সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নাই । বর্তমান অবধি আমি কতকগুলি পুরাতন স্থানের এবং ঐ স্থানসমূহস্থিত প্রাচীন কীর্তির পরিচয় দিতে আকাঙ্ক্ষা করি । এত প্রয়োজনীয় স্থানগুলির বিস্তৃত বিবরণ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই ; যতটুকু বিবরণ সংগ্রহ করতে সমর্থ হইয়াছি, বঙ্গ্যমান অবধি তাহাই সন্নিবেশ করিয়া পাঠকদিগের কৌতুহল বৃদ্ধির কিয়দংশ চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিলাম । পরবর্তী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক লেখকগণের যদি ইহাতে কিঞ্চিৎ উপকার লাভ হয় তাহা হইলে আমার সপরিশ্রম অন্বেষণকে সুফল প্রদায়ক বিবেচনা করিব ।

গোয়ালতোড় । মেদিনীপুর নগর হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লাইনের যে নতুন শাখা বিড়িয়া জঙ্গল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহারই কিঞ্চিৎ দূরে গবর্ণমেণ্টের পুরাতন রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়, এই রাস্তার পঞ্চকোশ পশ্চবদিকে গোয়ালতোড় অবস্থিত । সুবিখ্যাত চন্দ্রকোণা গ্রাম হইতে গোয়ালতোড় বহু দূরবর্তী নহে । পশ্চিম ও পরিভ্রাজকবর্গ, “চন্দ্রকোণা রোড” নামক রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া গোয়ালতোড় গ্রামে বাইতে পারেন । পাঠকেরা যেন এই অঞ্চল জাহেন, চন্দ্রকোণা নামক পুরাতন ও সুবংশীয়,

উৎকৃষ্ট ধূতি ও চাদরের জন্ম পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এখানে বহুসংখ্যক ধনবান ও শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং ঐশ্বর্যাশালী ভক্তগণ বাস করে। গোয়াল-তোড়ের পুরাতন দুর্গ, “ময়নাগড়” নামে প্রখ্যাত। একটা নদীর ধারে একটা বৃহৎ দ্বীপ এবং এই দ্বীপের মধ্যে একটা উপদ্বীপ; তদুপরে এই সুদৃঢ় দুর্গ নির্মিত। নদীর পশ্চিমকূলে তঁহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গ নিশ্চয় করিবার জন্ম তৎসাময়িক রাজাদিগকে হৃদের ত্রায় দুইটা প্রকাণ্ড সরোবর খনন করাইতে হইয়াছিল। প্রথম সরোবর বা দৌর্যিকা খনন করিবার সময়ে তাহার মৃত্তিকারূপি অস্থানে নিপাতিত না করিয়া ঐ সরোবরের মধ্যে অতি কোণে ও সাবধানতার সহিত একত্রিত করা হইয়াছিল, তাহাতেই দ্বিতীয় দ্বীপের উৎপত্তি হয়। এই উপদ্বীপের চারিপারে ঘন ঘন বংশবৃক্ষের বন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভেদ করিয়া সহসা প্রবেশ করা সহজ নহে। প্রথম দ্বীপের চতুর্দিকে বড় বড় অভ্রভেদী মৌরুহ দণ্ডায়মান এবং সরোবরের চারিপার্শ্বে প্রস্তর নির্মিত নাতি ক্ষুদ্র নাতি বৃহৎ প্রাচীরের ভগ্নরাশি অদ্যাপি বর্তমান। ঈউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর বহুপূর্বে নির্মিত হইয়াছিল, এবং ঐ শতাব্দীতে অথবা তাহার পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে এতদ্রকার দ্বীপদ্বয় ও গহনারণ্য পরিসেষ্টিত সুদৃঢ় দুর্গ কোন হিন্দু বা মুসলমান মরপতি কর্তৃক নির্মিত হয় নাই, সুতরাং এই গড় একভাবে অতুলনীয়। সুবিখ্যাত কবি ঘমরাম প্রণীত “শ্রীমদ্ভট্টমঙ্গল” নামক কাব্যে লাউ সেন নামে যে রাজার বীরত্ব ও কৌন্তিকাহিনী বর্ণিত আছে, এই প্রাচীন দুর্গ তাঁহারই “কেলা” বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে, প্রাচীন গোড়দেশে যে হিন্দুরাজা ছিলেন লাউ সেন তাঁহার অধীনে অন্তঃম করদরাজা বলিয়া গণ্য হইতেন। মহারাষ্ট্র-দম্মাগণ “বর্গী” নামে প্রসিদ্ধ হইয়া যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিল, তখনও লাউ সেনের বংশধরগণ বর্তমান ছিলেন; মহারাষ্ট্রীয় দম্মাদিগের প্রবল আক্রমণ গিবারণে অসমর্থ হইয়া, রাজা লাউ সেনের তদানীন্তন বংশধর উহাদিগকে যথারীতি কর দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু পরিণামে নিয়ম মত কর আদায়ে গোলাযোগ উপস্থিত হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়েরা গোয়ালতোড় রাজ্য এবং ঐ দুর্গ লুণ্ঠন করিয়া বাহুবলেন্দ্র নামক এক প্রতাপী পুরুষকে তাহা অর্পণ পূর্বক তাহাকেই অধিকারী স্থির করিয়া চলিয়া যান। এই বাহুবলেন্দ্র নামক ব্যক্তি জাতিতে কৈবর্ত ছিল; ময়নারাজ্যের ইনিই আদি প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় একশত বৎসর বংশর পূর্বে রাজা বহুচরণ সিংহ, গোয়ালতোড় রাজধানীতে বহু

অর্থন্যয়ে, বহু বস্তু ও পরিশ্রমে এবং নানী স্থানের সুদক্ষ ভাস্করের সহায়তায় এক খিরাট মন্দির নির্মাণ করা হয় ছিলেন। এই মন্দিরে শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা তাহার ইচ্ছা ছিল। ঐ মন্দির অদ্যাপি বর্তমান আছে, এই মনোহর দেব-মন্দির “পঞ্চরত্ন” নামে প্রসিদ্ধ। পাঁচটা প্রকাণ্ড চূড়া এই মন্দিরের উপরিভাগে অবস্থিত থাকায় বহুদূর হইতে পথিক ও পরিব্রাজকেরা মন্দিরের পরিচয় পাইয়া থাকেন। এই মন্দিরের গাত্রে, চূড়ায় এবং সকল অংশে বিবিধ বিচিত্র কারুকার্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এত সুন্দর ও সুশোভন যে সহজে তাহার বর্ণনা হয় না; স্বচক্ষে না দেখিলে পাঠকেরা তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন না। মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইবার অতীতকাল পরে যখন শালগ্রাম আনিবার বন্দোবস্ত হইতেছিল তখন অকস্মাৎ ব্রাহ্মণেরা চমকিত হইয়া দেখিলেন, একটা গোবৎস মৃত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে পতিত রহিয়াছে।

অধ্যাপকদিগের বিচারে মন্দিরাভ্যন্তরে শালগ্রাম আনয়ন করা অতৈবধ বিবেচিত হওয়ায় মন্দির পরিত্যক্ত হইল। বর্তমানকালে ঐ মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে অসংখ্য প্রকার আগাছা ও কণ্টকাকুল লতাসমূহ উৎপাদিত হইয়া শূণাল, শশক, সর্প ও ছুছুন্দরের ক্রীড়াস্থল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। এই মন্দির হইতে, কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া কিছুদূরে গেলে, চন্দ্রলেখা গড় নামে আর একটা দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা চন্দ্রশেখর ইহা নির্মাণ করেন এবং ঐ সময়ে তিনি ঐ স্থানে রাজত্ব কারতেন। ইহার চারিদিকে প্রকাণ্ড পরিমাণ আছে; ইহার পরিমাণ প্রায় এক বর্গ মাইল। একটা মাত্র দ্বার, তাহা পূর্বদিকে অবস্থিত।

কাঁথি। মেদিনীপুর জিলার অরৌন ইহা একটি প্রধান মহকুমা এবং মাধারনরঃ “হিজলি কাঁথি” নামে বিখ্যাত। এক সময়ে ইহা বঙ্গদেশের অতি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল এবং গঙ্গাসাগর বাইবার যাত্রীগণ এই বন্দর দিয়া সঙ্গমভীরে গমনাগমন করিত। এই প্রাচীন, প্রখ্যাত ও প্রশস্ত নগর পুরাকালে অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল; “ফাহিয়ান” প্রভৃতি পৃথিবী-প্রসিদ্ধ পরিব্রাজকগণ প্রাচীনা কাঁথি নগরী ঘূর্ণন করিয়া অত্যন্ত প্রশংসার সহিত ইহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের যে শাখা মেদিনীপুর জিলার উপর দিয়া বিস্তৃত হইয়াছে তাহারই উপরে “কাঁথি রোড” নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া প্রায় ৫ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে কংসানতী (কাঁসাই) নদী তটে কাঁথি নগরীকে দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁথির ইংরাজি নাম কন্টাই (Contai)। এই নগরী

মধ্যে যে ঐগিক হিন্দুধর্ম আছে তাহার নাম কুরুষর ধর্ম। ইহার বহির্ভাগের প্রাচীর সমূহ এক আশ্চর্য্য প্রকারের প্রস্তরদ্বারা নির্মিত, তাহার প্রকৃত নাম অদ্যাপি কেহ জানে না। কিন্তু ধর্মটি আজও অক্ষুণ্ণভাবে বর্তমান রহিয়াছে। বাহিরের প্রাচীর দশ ফিট হইতে কক্ষিৎ অধিক উচ্চ এবং অভ্যন্তর প্রায় ৮ ফিট প্রশস্ত, ইহার চারিদিকে বিবিধ প্রকার রমণীয় ফল ও ফুলের গাছ। পূর্বদিক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে একটা শিব-মন্দিরের ভগ্নরাশি দেখিতে পাওয়া যায়, মন্দিরের মধ্যস্থানে গৃহাভ্যন্তরে মহাদেব অবস্থিত আছেন; বহু সংখ্যক লোকে অদ্যাপি তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। পশ্চিমদিক দিয়া প্রবেশ করিলে একটা মসিদের ভগ্নরাশি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহা কণ্টকাকূণ আগাছা ও বহুবিধ অস্পৃশ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ। বহুকাল হইতে ইহাতে লোক প্রবেশ করে নাই; বোধ হয় কখন ইহার ভিতরে মুসলমান প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। অত্যাচারী মুসলমানগণ যেখানে সনাতন হিন্দুর পবিত্র দেবমন্দির দেখিয়াছে, বিনা দোষে, বিনা কারণে, হিন্দুর মন্দির লুণ্ঠন অথবা ধ্বংস কিম্বা মসিদ নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছে, কিন্তু হিজলি কাঁথির মসিদের যে দিনে নির্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই রাত্রেই অসংখ্য হিন্দু আসিয়া ঐ মসিদ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। মুসলমানেরা আর সেখানে অঙ্গুলি রাখিতেও সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তাহাদিগের সেই অপকীর্তি প্রস্তরথণ্ডে পরিণত হইয়া এক কোণে অস্পৃশ্যভাবে আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মসিদ, মহম্মদ তাহের নামক এক মুসলমান দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল; প্রাচীরের গায়ে একথা খোদিত আছে; তাহা পরিষ্কাররূপে পড়িতে পারা যায়। উত্তরদিকে একাঙ সরোবর, তাহার নাম যজ্ঞেশ্বরকুণ্ড, ইহা ভীষণ কুস্তীরে পরিপূর্ণ। নিকটস্থ মোগলমারী নামক স্থান বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রখ্যাত; এখানে মোগল ও পার্শ্বানে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল।

প্রবাদবাক্যে শুনা যায়, মহারাজা কপিলেশ্বরের শাসন সময়ে কুরুষর ধর্ম নির্মিত হইয়াছিল। তৎপূর্বে বাঘশ্রী নামক রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন; সে সময়ে এস্থান অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। কাঁথি নগরী, কুরুষর ধর্ম এবং অন্তান্ত ভগ্নরাশি দর্শন করিয়া কিয়দূরে গমনপূর্বক পথিকেরা “কিয়রচাঁদ” নামক প্রান্তরের কীর্ত্তিসমূহ দর্শন করিলে বিশ্বরসাগরে নিমগ্ন হইয়া বাইবেন। এই মাঠে অদ্যাপি এক সহস্র স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়; এই কিয়রচাঁদ নামক মাঠ বহু কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। রাজা জহির সিংহের সময়ে এই স্তম্ভসমূহ নির্মিত

হইয়াছিল। ইহাদের উপরে উঠিয়া হিন্দু সনা ও গেনাপতিগণ প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানদিগের কার্যকলাপ সাবধানে নিরীক্ষণ করিতেন। এই স্তম্ভ সমূহের সাহায্যে ঠগরীদলের আক্রমণ ও প্রতিরোধ করা বাইত। “উড়াসতী” নামক স্থানে একটি মন্দির আছে তাহা প্রস্তর নির্মিত। মার্কেল পাথরের একটা পিঁড়ির উপরে খোদিত অক্ষরদ্বারা জানা যায় এই মনোহর মন্দির রাজা চোয়াণ সিংহের শাসন সময়ে নির্মিত হইয়াছিল।

দাঁতন। এই স্থান সেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত। এখানে রেলওয়ে স্টেশন আছে। দাঁতন গ্রামের সমলেক্ষা মন্দিরটি মনোহর ও প্রসিদ্ধ। মন্দিরের দ্বাৰেশ্বরে প্রস্তর নির্মিত এক শকাব্দ বৃষমূর্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, ইহার সম্মুখের দুই পদ অস্ত্রদ্বারা কর্তিত। পাঠকেরা অবগত আছেন, কালাপাহাড় নামে এক ছবৃত্ত ও মতিভট্ট ব্রাহ্মণ, কামিনী ও কাঞ্চনের লোভে, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই পাপাত্মা দাঁতন গ্রামের পার্শ্বস্থ প্রান্তরে একটা বৃষকে নিহত ও আর একটা বৃষের সম্মুখস্থ পদ অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া দিয়াছিল। প্রস্তর নির্মিত বৃষ সেই ছুরাচার কলঙ্কের চিহ্ন। পথিক ও পরিব্রাজকেরা ঐ স্থানে গমন করিলে পবিত্র সনাতন ধর্মাবলম্বী সাত্বিক হিন্দু-সন্তানেরা কহিয়া থাকেন, দেখুন, দেখুন, হিন্দু-সন্তান বিধর্মী হইলে কতদূর হিন্দুবিষেবী, সমাজটেনরী এবং জাতিটেনরী হইতে পারে!!” শুনা যায়, ভোজ রাজার সময়ে সমলেক্ষর মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবেরা কহেন, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব একদা এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতুষে দম্ভধাবন (দাঁতন) করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম দাঁতন হইয়াছে। কিন্তু বহুদল্লভ প্রণীত দাঁতনের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে দাঁতনকে আরও পুরাতন নগর বলিয়া বোধ হয়। দাঁতনের “বিদ্যাধর” ও “শশাঙ্ক” নামক দুই দিঘা বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। প্রথমটা দ্বাদশ শত ফিট দীর্ঘ এবং ১০০ ফিট প্রশস্ত। রাজা মুকুল দেবের মন্ত্রী বিদ্যাধর দেবের বায়ে ইহা খাদিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়টা ছয় সহস্র ফিট দীর্ঘ ও তিন সহস্র ফিট প্রশস্ত। রাজা শশাঙ্ক দেব ইহার জন্ত সমুদয় অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এই উভয় সরোবরের মধ্যদেশে অতি আশ্চর্য্য স্রুঙ্গ আছে, তাহা মাটির নীচে বিদ্যমান; তন্মধ্য দিয়া একটা সরোবর হইতে অল্প সরোবরে অল্প ভাবে গমনাগমন করিতে পারা যায়। এই স্রুঙ্গ প্রস্তর নির্মিত ইহার উচ্চতা ৮ ফিট এবং প্রশস্ততা পঞ্চ ফিট।

শ্রীধর্মানন্দ মহাতারতী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মার্কণ্ডেয় পুরাণাস্তর্গত শ্রী শ্রীচণ্ডী ।

অনন্তর চামুণ্ডা কালীর লিখিত মহাযুদ্ধে চণ্ডমুণ্ড সটগৈজে নিহত হইলে, ঠৈত্যোৎপন্ন গুহ্ম নিগুহ্ম যমস্ত অম্বর-গৈয়সহ স্বয়ং যুদ্ধবাহী করিলেন । তখন অগণিত অম্বরগৈজে যুদ্ধস্থল পরিব্যাপ্ত হইল । সেই আগত প্রায় মহাগৈজ্ঞ দর্শন করিয়া দেবী অরশন্ধে দ্বিভ্রাণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন । অনন্তর অম্বরগণ সিংহনাহিনী দেবীকে ও চামুণ্ডা-কাণীকে অবব্রদ্ধ করিবার জন্য চতুর্দিক পরিবেষ্টন করিল ।

তখন অম্বরগণের কল্যাণ কামনার দেবীর সাহায্যার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিক ও ইন্দ্র প্রভৃতির শরীর হইতে তত্তৎস্বরূপাশক্তি-নির্গত হইয়া দেবীর নিকট উপনীত হইলেন ।

অনন্তর মহাদেব এই সমস্ত দেবশক্তি দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া চণ্ডিকাকে বলিলেন ; “আমার প্রীতির নিমিত্ত এই হৃদান্ত অম্বরগণকে শীঘ্র বিনাশ করুন” তখন চণ্ডিকার শরীর হইতে অতি ভীষণা শত শত শিবা পরিবেষ্টিত হইয়া, অপরাজিতা শক্তি বিনিক্রান্তা হইয়া, ধুম্রজটিল শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

হে ভগবন্ ! আপনি দূত স্বরূপে গুহ্ম নিগুহ্মের নিকট গমন করিয়া সেই অতি গর্ভিহ দানবদ্বয়কে এবং যুদ্ধার্থী অস্ত্রাস্ত্র অম্বরগণকে বলুন যে, দেবরাজ ইন্দ্র ত্রৈলোক্যাধিপত্য লাভ করুন ; এবং দেবগণ স্ব স্ব যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হউন, আর তোমরা যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর তবে পাতালে গমন কর । অথবা যদি বলগর্ভে গর্ভিত হইয়া নিতান্তই যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা কর ; তবে শীঘ্র আসিয়া জোমাদিগের সাংসদ্বারা আমার শিবাগণের তৃপ্তিসাধন কর ।

দেবাদিদেব মহাদেবকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করায় এই অপরাজিতা শক্তি শিনদুতী নামে অভিহিতা হইলেন ।

“সংমোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রাণঃ”—(গীতা)

সংমোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রাণ (সহপদেণের প্রতি অবহেলা) জন্মে । গুহ্ম নিগুহ্মেরও স্মৃতিবিভ্রাণ ঘটিল, তাহার শিনদুতীর সহপদেণ গ্রহণ করিল না । তাহার অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিল ।

সেই সৰ্বলোক ভরসার মহাযুদ্ধে ক্রমে শুভ নিশ্চয়ের বহু সৈন্ত ও প্রধান প্রধান সেনাপতি নিধনপ্রাপ্ত হইলে সৰ্বপ্রধান সেনাপতি রক্তবীজ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। রক্তবীজের শরীর হইতে রক্তবিন্দু ভূমিতে পতিত হইবাগাত্র তৎক্ষণাৎ তৎপ্রমাণ ও তজ্জগৎ বলবীৰ্য্যশালী অস্ত্র সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং মাতৃগণ যতই রক্তবীজ নামক অস্ত্রসৈন্ত বিনাশ করিতে লাগিলেন, ততই তজ্জগৎ পরাক্রমশালী অস্ত্র জন্মিতে লাগিল। এবং অল্পসময়মধ্যে জগৎ রক্তবীজে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যেমন কোন্‌ প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাটের চিহ্নিত সেনাপতির শোণিতে শত্রুরাজ্য সিন্ধু হইলে তৎক্ষণাৎ অংশসাৎ সৈন্ত-সেনাপতিতে পূর্ণ হয়, তজ্জগৎ রক্তবীজের রক্তপাতেও অগণিত রক্তবীজসৈন্তে চতুর্দিক প্রপূরিত হইল।

তখন দেবী লোকক্ষয়কারিণী কালীকে বলিলেন,—আপনি করাল বদন নিষ্কার করিয়া রক্তবীজের শোণিত পান করিতে থাকুন, তবেই রক্তবীজ নিরস্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে।

প্রথমে পাণের (অধর্মের) অতি বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যখন পাণের মাত্রা বৃদ্ধির সীমা অতিক্রম করে তখন জলন্ত অনলে পতনের দ্বার কালের করাল বস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া সমূলে নিধন প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর দেবীর আদেশে লোকসংহারিণী কালী, করাল বদন ব্যাদান করিয়া ; গীতার সেই লোকক্ষয়কৃত কালের দ্বার,—

“লেলিহসে প্রসমানঃ সমস্তান্” ।

যেন সমস্ত লোক প্রাণ করিবার জন্য লেলিহান্ হইলেন। অমনি সেই অগণিত রক্তবীজসৈন্ত কালের করালবস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া প্রজ্জ্বলিত অনলে পতন-বৃষ্টি প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর দেবীর সহিত ভীষণ যুদ্ধে—মহাবীর নিশ্চিন্ত ও নিহত হইলেন।

“স্মৃতিব্রংসাৎ বুদ্ধিনাশঃ” । (গীতা)

স্মৃতিবিক্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হয়। তখন শুভাস্ত্রের স্মৃতিবিক্রম হইতে বুদ্ধি নাশ হইল, শুভ স্বচক্ষে দেবীর শরীর হইতে শিবভূতী প্রজ্জ্বলিত মাতৃগণ (ত্রৈলোক্য) উৎপন্ন হইতে দেখিয়াও বুদ্ধিনাশ হেতু, ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে, চত্বিকাকে বালিল,—

“বলীবলেন দুর্গে ত্বং মা দুর্গে ! গর্ব মাংহ ।

অস্ত্রাৰ্ণাৎ বলমাজিত্য যুদ্ধে বাতিমানিনী ॥”

হে বৃথা বল গর্কিতে জর্গে ! তুমি গর্ক পরিহার কর, যেহেতু তুমি অজ্ঞাত
দেবশক্তির সহায়তার বলদর্পিতা হইয়া বুদ্ধ করিতেছ । শুভ্র এই বাক্য
শুনিয়া দেবী কহিলেন,—

“একবাহু জগতাজ দ্বিতীয়া কা মমাপরা ।

পঠেতাং হুত ! মধোব বিশক্তি মধিতৃত্যঃ ॥”

রে মূঢ় ! এ জগতে আমি ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ আর কি আছে ? একমাত্র
আমিই অনন্ত বিধে বিরাজ করিতেছি, তুমি অজ্ঞ যে সমস্ত মূর্তি দেখিতেছ, সে
আমারই ; বিভূতি এই দেখ, সমস্ত আগাতেই প্রবেশ করিতেছ ।

“ততঃ সমস্তান্তাদেবো ব্রহ্মাণীশমুখালয়ঃ

তথা দেবাত্তনো যগ্ম এতৈকবাসীতদাধিকা ॥”

তদনন্তর ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবশক্তি সেই দেবার শরীরে বিলীন হইলেন ।
তখন কেবল সেই এক অগদম্বাই বিরাজমানা রহিলেন ।

তখন দেবী বলিলেন,—

“অহং বিভূত্যা বহুভির্নিহ লোটৈক ধ্বনাস্থিতা

তৎ সংহৃত্য মমৈকৈব তিষ্ঠাম্যাহৌ স্থিরোত্তম ॥”

আমি ঐশ্বর্যশক্তিধারা যে বহুরূপে বিরাজমানা ছিলাম, এক্ষণ সে সমস্ত
সংহরণ করিয়া আমিই একমাত্র বুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিতা রহিলাম, এখন স্থির
থাকিয়া বুদ্ধ কর ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টমত্বাদ ; চণ্ডীতে অগদম্বা এক কথাতেই প্রকাশ
করিলেন । এবং কার্য্যধারাও প্রকাশিত হইল ।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গীতার উপদেশ বা অভিপ্রায় চণ্ডীতে কার্য্যতঃ
অভিনীত হইয়াছে ।

কিন্তু এই অভ্যাসার্ণ্য ঘটনা দেখিয়াও শুভ্রের জ্ঞানোদয় হইল না । কারণ
তাঁহার বুদ্ধিনাশ ঘটিয়াছিল ।

“বুদ্ধিনাশাং প্রাপত্তি ।” (গীতা)

বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হয় । শুভ্রও বুদ্ধিনাশ হেতু সেই মহাবুদ্ধে
সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল ।

(জগদগঃ)

শ্রীজগদাদাস ঠাকুর তত্ত্বত্ব ।

প্রাচীন ভারতের বায়ু বিজ্ঞান ।

সম্প্রতি প্রযুক্ত সত্যউপেন্দ্র মল্লিক প্রাচীন ভারতের বায়ু বিজ্ঞান বা নভো-বিজ্ঞান (Meteorology of Ancient India) সম্বন্ধে Central Hindu College Magazine নামক সাময়িক পত্রে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন । প্রবন্ধটি বেশ কোতূহলোদ্দীপক । আমরা 'আরতি'র পাঠকপাঠিকাগণের কেতুহল নিবৃত্তির জন্য তাঁহাদিগকে ঐ প্রবন্ধের কিয়ৎকংশ উপহার দিলাম ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পৌষ মাস সমগ্র বৎসরের দর্শন স্বরূপ,—এই মাসের প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই সমগ্র বৎসরে জল বায়ুর অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা অনুধারণ করা বাইতে পারে । পৌষ মাসকে ১২ ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে ; তাহা হইলে প্রত্যেক বিভাগে আড়াই দিন পড়িবে । এই এক এক আড়াইদিনের প্রাকৃতিক অবস্থার অনুরূপ এক এক মাসের অবস্থা হইবে । এই সকল বিভাগে বায়ুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই প্রাচীন ঋষিগণ জল বায়ু সম্বন্ধে বৎসরের ফলাফল অনুধারণ করিতেন । বায়ু প্রবাহিত না হইলে বৃষ্টি হইবে না, এবং বাতাস প্রবাহিত থাকিলে খুব বৃষ্টি হইবে ।

পূর্ব কথিত এক এক বিভাগ পাঁচ দণ্ড দ্বারা বিভাগ করিলে এক এক দিনের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা প্রতিফলিত হয় । প্রথম ২১ দণ্ড দিব্য ভাগের অবস্থা জ্ঞাপক ; শেষ ২১ দণ্ড রজনীর অবস্থা জ্ঞাপক ।

এই সকল দণ্ড বিভাগকে পুনরায় বিভাগ করিয়া এবং সেই ক্ষুদ্র বিভাগে বায়ুর গতি কোন দিকে প্রবাহিত থাকে, তাহা দেখিয়া দিবা রাত্রির কোন সময়ে বৃষ্টি হইবে না হইবে তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা বাইতে পারে ।

যদি গুরু গন্ধের দিবাভাগে আকাশমার্গ ধূলিতে ধূসর হইয়া উঠে, বিদ্যায় দেখা দীর্ঘাকারে দেখা দেয় এবং দিগ্‌মণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলে আগামী বৎসর পৌষ মাসের ঠিক সেই তিথিতে যথেষ্ট বৃষ্টি পাত হইবে ।

যদি পৌষ মাসের কোন দিন বৃষ্টি না কুয়াসা হয়, তবে আষাঢ় মাসের সেই তিথিতে প্রবলবেগে কারিগাত হইবে । রাঢ় দেশেও এইরূপ প্রবাদ মূলক কবিতা প্রচলিত আছে ।

বিবিধ বাঙ্গলাগ্রন্থে বায়ু বা নভো-বিদ্যাবিবরণক গাথা দেখা যায় । তৎসমুদয়ের মূলে কি পরিমাণ সত্য আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বায়ু বা নভো-বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ।

ভরসা করি, 'আরতি'র কৌতুহলাক্রান্ত পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের দেশে
প্রচলিত বায়ু বা নভো-বিদ্যা বিষয়ক গাথা গুলি গত মূলক কি না তাহা পরীক্ষা
করিয়া দেখিবেন ।

ত্রিভুদেন্দ্র ।

সূর্য্য ।

অতি প্রাচীনকালের অধিবাসিগণ সূর্য্যকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিত ।
কেবল ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই আদিম লোকেরা এক কালে
সূর্য্যের উপাসক ছিল । ভারতবর্ষীয় আৰ্য্যগণ সূর্য্যকে দেবতা দিগের মধ্যে অতি
উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছিলেন । সবিতার গুণাবলী কীর্তন করিয়া তাঁহারা
যে সকল সরল স্থললিত স্ততিগান রচনা করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে
চিত্ত বিমোহিত হয় । সরল-হৃদয় আৰ্য্যগণ স্রষ্টাকে চিনিবার পূর্বে সৃষ্ট পদার্থের
মধ্যে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন ; অথবা সৃষ্ট পদার্থের ভিতরই তাঁহারা
ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন ।

বাস্তবিক ক্ষমতা এবং উপকারিতা দেখিয়া যদি কোন পদার্থকে দেবত্ব
প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা হইলে সূর্য্যকে সর্ব্বাপেক্ষে স্থান দেওয়া উচিত ।
মহুযা, পশু, পক্ষী এমনকি বিটপিও সামান্ত তৃণ বস্তুরা পর্য্যন্ত সকলেরই জীবন
সূর্য্যোত্তাপের উপর নির্ভর করে । আলোক এবং উত্তাপ ব্যতীত কোন প্রাণীই
জীবিত থাকিতে পারে না । যদি দীর্ঘ কালের অন্ধ সূর্য্যদেব নভোমণ্ডল হইতে
ভিরোহিত হইয়া যান তাহা হইলে প্রাণিগণের ধ্বংস অনিবার্য্য । আর যদি
ঠঠাং সূর্য্যের উত্তাপ দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেও জীবগণের পরিণাম
ধ্বংস । সুতরাং প্রাতি মুহূর্ত্তে মহুযা হইতে তরু লতা পর্য্যন্ত সকলই স্বীয় স্বীয়
জীবনের অন্ধ সূর্য্যের অমুকম্পার উপর নির্ভর করিতেছে ।

সূর্য্যের তাপে জল বাষ্প হইয়া আকাশে মেঘ হয় । মেঘ হইতে বারিপাত
হয় । বারিপাত না হইলে আমাদের এই “সুজলা সুকলা শস্ত শ্রামলা ধরনী
উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হইত । ফল, ফুল, শস্ত কিছুই উত্তাপ
ব্যতীত জন্মিতে পারে না । বড় ঋতুর পরিবর্তন ও সূর্য্যের উপর নির্ভর করে ।
সূর্য্য কেবল তাপ ও আলোক দেয় না । সূর্য্য আপন আকর্ষণ বলে পৃথিবী
এবং অপর বহুসংখ্যক গ্রহ উপ গ্রহকে উহাদের আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে
ধরিয়া রাখেতেছে ।

সূর্য্যের উপকারিতা সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উহা সর্বজন বিদিত । সূর্য্যমণ্ডলের আয়তন এবং তদীয় অবস্থা বিবরণ অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক ; ঐ সকল ব্যাপার বর্ণন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে আয়তনে অনেক বড় । এত বড় যে বলিলে তাহার বৃহৎ সম্যক জবয়জম করা সকলের অসাধ্য । আমাদের পৃথিবীর জায় ১২ লক্ষ পৃথিবী একত্র সংযুক্ত করিলে সূর্য্যের সমান হইতে পারে । পৃথিবীর আয়তনের বিশালতাই আমরা চিন্তা করিতে পারি না ; ১২ লক্ষ পৃথিবী একত্র করিলে যে কিরূপ ব্যাপার দাঁড়াইবে তাহা আমাদের কল্পনাক্রমও অতীত ।

যদি একখানি ডাকগাড়ী ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে অনবরত চলিতে থাকে তাহা হইলে সূর্য্যের পরিধিটা একবার ঘুরিয়া আসিতে উহার পাঁচ বৎসর কম লাগিবে না । যদি সূর্য্যকে সমান দশ লক্ষ ভাগে বিভক্ত করা যায় তাহা হইলেও উহার এক এক ভাগ আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী হইতে আয়তনে অনেক বড় হইবে । সূর্য্যের আয়তন সমুদায় গ্রহের আয়তন সমষ্টির অপেক্ষাও প্রায় ৬০০ শত গুণ অধিক । যদি সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তর ভাগ ধনন করিয়া মুক্ত করা যাইত এবং আমাদের পৃথিবীটাকে তাহার কেন্দ্র স্থানে স্থাপিত করা যাইত তাহা হইলেও পৃথিবীর চতুর্দিকে এত স্থান থাকিত যে চন্দ্র এখন পৃথিবী হইতে বহু দূরে অবস্থিত আছে (২৪০০০০ মাইল) তাহার অপেক্ষা ৮১০০০ কোশ দূরে স্থাপিত হইলেও অনায়াসে চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে পারিত ।

কিন্তু সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তন হইতে যে পরিমাণ বড় উহার গুণন তত অধিক নহে । একটা বিরাট দাঁড়ি পাল্লায় একদিকে সূর্য্যকে রাখিয়া যদি অপর দিকে তিন লক্ষ পৃথিবীকে চড়ান যায় তাহা হইতে দুই দিক প্রায় সমান হইবে । অবশ্য এরূপ দাঁড়ি পাল্লা কেবল কল্পনার রাজ্যে প্রস্তুত করিয়াই স্থাপন করা যাউতে পারে ।

সৌর জগতের সমস্ত জ্যোতিষ্করাজি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে । প্রত্যেকেরই আবর্তনের একটী নির্দিষ্ট পথ আছে । যে গ্রহ বহু নিকট সেই গ্রহকে সূর্য্য তত প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছে । কিন্তু গ্রহগুলি সেই প্রকৃতির আকর্ষণে সূর্য্যের উপর না পড়িয়া অধিকতর দূর গতিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । দূরবর্তী গ্রহগণের উপর ব্যবধানের অনুরূপে সূর্য্যের আকর্ষণ কম তাই উহার দূর গতিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে । পটেনশ্যর প্রতি ঘণ্টায় ২৬৮০ কোশ, বৃহস্পতি ১২৭৬০ কোশ, পৃথিবী ২২৯৩৭

ক্রোশ, শুক্র ৩৪২০০ ক্রোশ এবং বুধ ৪৮১১৮ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া থাকে।
উল্লিখিত গ্রহগণের মধ্যে বুধ নিকটতম তাই উহার গতি সর্বাপেক্ষা অধিক।
• সৌর জগতের সকল গ্রহ উপগ্রহই সূর্যালোকে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।
কাহারও স্বকীয় আলোক নাই। এবং সূর্য্যই সৌর জগতের একমাত্র তাপাধার।
সূর্য্যের উত্তাপ অতীব ভয়ানক। কোন নৈজাতিক উপায়েই এরূপ ভীষণ
তাপ উৎপন্ন করা যাইতে পারে নাই। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অথবা তড়িত
সাহায্যে অসাধারণ তাপ উৎপাদন করা যায় নটে কিন্তু সেই তাপও সূর্য্যোত্তাপের
তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে যদি সমস্ত
পৃথিবী কেবল ২৬০ গজ গভীর একটা সমুদ্র দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত তাহা
হইলে পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় যে উত্তাপ প্রাপ্ত হয় সেই উত্তাপেই বরফে পরিণত
সমুদ্রবারি ফুটন্ত জলে পরিবর্তিত হইত। যে উত্তাপ পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া থাকে
তাঁহা সূর্য্য বিকীর্ণ তাপের দুই শত কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। অনন্তরত
সূর্য্য হইতে প্রদত্ত উত্তাপ তরঙ্গ চতুর্দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। এক সেকেন্ডে
সূর্য্য হইতে যে তাপ বিকীর্ণ হয় তাহাতে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ বন মাইল দিক্ত
বরফরাশি ফুটন্ত জলে পরিণত হইতে পারে। ✓

সূর্য্যকে একটা ভীষণ অসন্ত চুম্বি বলা যাইতে পারে। আগুন কেবলই
অলিহুহু এবং উহার উত্তাপেরও নানানিকটা হয় না। আমার সূর্য্যমণ্ডলে
ভয়ানক ঝড় হইয়া থাকে। সেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সহিত অমল ঝটিকা
সম্মিলিত হইলে কিরূপ ব্যাপার হয় তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। 'পৃথিবীর'
কোন ঝড় বায়ু লক্ষ কয়লায় তূণ একবারে একত্র প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে
কিরূপ ভয়ানক কাণ্ড হইবে! সূর্য্যের অনলনিধার গর্জন যতই অসম্ভাবনীয়
আগ্নেয়গিরির অরোহণতকালে দশ পনর মাইল স্থান পর্য্যন্ত ভয়ে অস্ফুট
হইয়া যায়। আর উহার শব্দ ২০। ২৫ মাইল দূরত্ব হ্রাসের সৌক্য কহিয়া
হইয়া উঠে। সূর্য্যে কি কাণ্ড হয় তাহা অনুমান করিলেও বিশ্বয়ে ভয় অভিস্রুত
হইয়া যায়। সূর্য্যমণ্ডলে ঝটিকা ও ঝড়বর্ষ্য অনিশ্চয় নহিতেছে। সূর্য্য
উত্তাপের গতি নত ভীষণ। পৃথিবীপৃষ্ঠে যে ঝড় হয় তাহার গতি কতটা
একশত মাইলের অধিক নয়; কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলের ঝড়বর্ষ্যের গতি এক সেকেন্ডে
একশত মাইলেরও অধিক। সূর্য্যস্থিত অনলনিধার তুলনায় হিমালয় পর্ব্বতও
অতিসূত্র বোধ হইবে। অধিকাংশ অগ্নিশিখার উচ্চতা আশায়েই পৃথিবীর
বেশবড়ের বশত। সূর্য্যগত হইতে আগ্নেয়গিরির ভায় অমল নিঃসৃত হয়।

সেই অনলশ্রোত এমনি বেগে ছুটিয়া বাহির হয় যে তাহার গতিতে অল্প কিছুনা গতিরই তুলনা হয় না । আমরা গতির বিষয় বলিতেই ডাক গাড়ী অথবা কামানের গোলায় কথা বলিয়া থাকি । ডাকগাড়ী সেকেন্ডে এক মাইল এবং কামানের গোলা দশ এগার মাইলের অধিক বাইতে পারে না । এতি সেকেন্ডে পৃথিবী ১৮½ মাইল ভ্রমণ করে ; বুধের গতি উহার দেড়গুণ । এমন কয়েকটা ধূমকেতু দেখা গিয়াছে তাহার। এতি সেকেন্ডে তিন শত মাইল অতিক্রম করিয়াছে ; কিন্তু সূর্যের অন্তর্নিহিত জলন্ত পদার্থ সমূহ তদাধিক দ্রুত বেগে অর্থাৎ সেকেন্ডে পাঁচশত মাইল গতিতে ছুটিয়া বাহির হয় ।

সূর্যের ব্যাস প্রায় ৮৬৬০০০ আট লক্ষ চরমটি মাইল । সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি উনত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত । সংখ্যাটা পুন জাকল হইল বটে কিন্তু উহা দ্রুত হৃদয়ঙ্গম করিবার বিশেষ সাধায়া করিলে মনে হয় না ।

পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত যদি রেলের লাইন থাকিত এবং আমরা যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল চলিতে পারে এইরূপ দ্রুতগামী একখানি গাড়ীতে চড়িয়া সূর্যের দিকে অগ্রসর হইতাম তাহা হইলে সূর্য্য পৌছিতে আমাদের ১৭২ বৎসর লাগিত । একশত বাহর বৎসর মানুষ বাঁচে না ; সূর্য্য পৌছিবার পূর্বে আমরাই মৃত্যুবরণ করিতে হইত । সূর্য্য এত দূরে অবস্থিত আছে সুতরাংই ক্ষুদ্র যৌথ্য খালার ভাৱ প্রতীতমান হয় । পূর্বেই বলিয়াছি সূর্য্য অতি দ্রুত এত দ্রুত যে তাহার বিশালত্বের সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায় না । কিন্তু তাই বলিয়া কেহ একথা মনে করিবেন না অনন্ত আকাশে বিরাজমান জ্যোতিষমণ্ডলীর মধ্যে সূর্য্যই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । রজনীতে মেঘ নির্মুক্ত আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অসংখ্য নক্ষত্র পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার ভিতর কতকগুলি অতিশয় হীনপ্রভ, আমাদের সূর্যের তুলনায় সেইগুলি দীপ শিখার ভাৱ বোধ হয় । বাস্তবিক ঐ সকল নক্ষত্র এক একটা বিরাট সূর্য্য । উহাদের সহিত তুলনা করিলে সৌরজগতের সূর্য্যকে অতি সামান্য নক্ষত্র ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না । ঐ সকল নক্ষত্র এত ক্ষুদ্র দেখাইবার কারণ উহার অতিশয় দূরে রহিয়াছে । যদি সূর্য্যকে উহাদের স্থানে স্থানান্তরিত রাখা হইত তাহা হইলে সূর্য্য একবারে অদৃশ্য হইয়া যাইত । ঐ সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্যের বিষয় আমরা বারাস্তে প্রকাশ করিয়া পাঠক পাঠিকার কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইব ।

সূর্যের উপাদান পৃথিবীর উপাদানের ভাৱ বর্ত্তিন নহে । সূর্যের ভিতরের

অংশ কঠিন কি না তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাট। কিন্তু বহির্ভাগ বাষ্পরূপে আবৃত। সূর্য্যের যে সকল প্রতিফলিত হোলা হট্টাভে ঐ সকল প্রতিফলিত হট্টাতে প্রতীয়মান হয় যে সূর্য্যবিষয়ের সকলভাগ সমান উজ্জ্বল নহে। ইহা কারণ অপেক্ষাকৃত অল্পজ্বল বাষ্পরাশি মেঘের ভাষ সূর্য্যের উপরিভাগে স্থানে স্থানে ভাসিয়া রতিয়াছে। পৃথিবীর আকাশস্থিত মেঘরাশি জলকণার সমষ্টি মাত্র কিন্তু সূর্য্যের চারিদিকে বিরাজমান মেঘরাশি বাষ্পবয় নানাপ্রকার ধাতুদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সূর্য্যনিষে মাসে মাসে কৃষ্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে 'সৌরকেতু' (Sun spot) বনে। আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে কেতুকে রাহব পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বেশ হয় রাহু-অঙ্ককারময়, কেতু-চিহ্ন, হট্টতেই সূর্য্যনিষে প্রকটিত কৃষ্ণচিহ্নের নাম 'কেতু' হইয়াছে। এমন বৎসর যায় না যে বৎসর একটী না একটী চিত্রের উদয় না হয়। সৌরকেতু মধ্যে মধ্যে এমন দৃশ্য হয় যে ভাষা খালি চক্ষেই প্রত্যক্ষ করা যায়। সৌরকেতু দেখিতে হট্টলে কোন উপায়ে সূর্য্যতেজঃ হ্রাস করিয়া লইতে হয়। একথণ্ড কাঁচকে প্রদীপের ভূষা মাখাইয়া লইয়া চকের সম্মুখে ধরিলে সূর্য্যোত্তাপে চকুর অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। এই প্রণালীতে আমাদের দেশের লোক বহুকাল হইতে সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়া আসিতেছে; কোন অঙ্ককারময় পৃথের ছিন্নপথে সূর্য্যাকিরণ প্রাণিষ্ট হইলে এবং সেই কারণে একথণ্ড সাদা কাগজ ধরিলে সূর্য্যবিষ দেখা যায়। বিশেষ বৃহৎ কেতু থাকিলে তাহাও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ১৩১১ সনের মাঘ মাসে সূর্য্যবিষে একটী অতি প্রকাণ্ড কৃষ্ণচিহ্ন দেখা গিয়াছিল। ঐ কেতু আমরা খালি চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই বৎসর ঠিক সেই সময়েই অতিশয় নীতাতিলম্ব হইয়াছিল। অল্পসংসার লোকে উত্তরের মধ্যে কার্য্য কারণ লব্ধ অল্পমান করিয়াছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা কেতুর আবির্ভাবে সূর্য্যের-উত্তাপের গুরুতর হ্রাস হইতে পারে একথা স্বীকার করেন না। প্রভাগগুলোর অভ্যন্তর হান অপেক্ষা কেতুহান নীতল হয় বটে কিন্তু এত বৃহৎ হয় না যে তদ্বারা সূর্য্য বিকীর্ণ তাপের সহস্রাংশের একাংশ হ্রাস হইতে পারে।

সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণকালে একটী অভ্যন্তর্য্য ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণের সময় পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে চন্দ্র অবস্থিত করে। চন্দ্র দ্বারা সূর্য্য ঢাকা পড়ে। পূর্ণ গ্রহণকালে চন্দ্র সূর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখে। সেই সময়ে দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে কতকগুলি বিশাল

প্রজ্জ্বলিত অনলশিখা পূর্বাংশে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল শিখা চক্রে কক্ষাবয়ব হইতে বিনির্গত হয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু বাস্তবিক শিখাগুলি চক্রে গচ্ছাৎস্থিত সূর্য্যদেহ হইতে নির্গত হইতেছে ইহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। প্রথমতঃ শিখাগুলি পূর্বাংশে দেখা যায় কিন্তু পশ্চিমাংশে কোন শিখা দৃষ্টিগোচর হয় না। চক্রে যতই পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় ততই পূর্বাংশের শিখাগুলি ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে থাকে। তখন পশ্চিমভাগ চক্রে আবরণোন্মুক্ত হওয়াতে সেই ভাগে আর কতকগুলি শিখা দেখা দেয়। চক্রে যখন সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় তখন আবার সূর্য্য ভীষণ তেজঃপূঞ্জীভূত হইয়া সৌরজগত উদ্ভাসিত করে। তখন সৌরশিখাগুলি আর দেখিতে পারা যায় না।

জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা ঐ সকল সৌরশিখা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এক প্রকার প্রজ্জ্বলিত বাষ্প হইতে ঐ সকল শিখা নির্গত হইয়া থাকে। অগ্নিময় দ্রাতিমান বাষ্পরাশি হাঝা বাষ্পস্তরের দ্বারা সূর্য্যকে ঢাকিয়া রহিয়াছে। বাষ্পস্তরের গভীরতা ৫।৬ হাজার মাইলের নূন হইবে না। সূর্য্যদেহের চতুর্দিকবাস্তব জলন্ত বাষ্পরাশিই আমরা সর্বদা দেখিতে পাই। উহাকে “প্রভামণ্ডল” বলে। সূর্য্যের বহিরাবরণস্বরূপ প্রভামণ্ডলই তাপ ও আলোকের আধার। প্রভামণ্ডলের নীচে “বর্ণমণ্ডল” অবস্থিত। খালি চক্ষে এমন কি দূরবীক্ষণ সাহায্যেও বর্ণমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা দেখা যায় তাহাই প্রভামণ্ডল।

পূর্বেই বলিয়াছি এক একটা সৌরশিখা এত বৃহৎ আকৃতি ধারণ করে যে তাহার তুলনায় পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্বরূপ হিমালয় পর্বতও নিতান্ত ক্ষুদ্র। প্রফেসর ইয়ং লিখিয়াছেন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর বেলা সাড়ে দশ ঘটিকার সময় সূর্য্যের দক্ষিণপূর্বদিকে একটা সৌরশিখা দেখা দিয়াছিল। উহা প্রথমাবস্থায় ৪০ হাজার মাইল উচ্চ হইয়াছিল। তারপর দেখা গেল ঐ শিখা বিগুণ উচ্চ হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ঐ শিখা উচ্চ হইতে হইতে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মাইল উচ্চ হইল; তৎপর বেলা সাড়ে বারটার সময় বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া একবারে তিরোহিত হইয়া গেল।

সৌর শিখাকে পণ্ডিতেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। এক প্রকারের সৌরশিখা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভাসমান মেঘমালায় দ্বায় কিন্তু জলন্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সৌরশিখাগুলি অনল-উদ্গারী (Eruptive)। উহাদিগের

মধ্য হইতে ভীষণ অমল-জিহ্বা বক্ লক্ করিয়া উজ্জ্বল আফালন করিতেছে। উহাদের গতি সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি। সৌরশিখার কেবল আকৃতিগত বৈষম্য নহে, উহা যে বাষ্প হইতে উৎপন্ন হয় ঐ বাষ্পের উপাদান ও স্বতন্ত্র। মেঘ-সদৃশ সৌরশিখার প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন; দ্বিতীয় শ্রেণীর সৌরশিখা নানা ধাতব বাষ্পসম্মত। প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল মেঘমালাকে (luminous cloud) আমরা খালি চক্ষে দেখিতে পাই উহাকে বৈজ্ঞানিকেরা photosphere বলিয়া থাকেন আমরা ইহাকে প্রভামণ্ডল বলিয়াছি কারণ এই বহিরাবরণই প্রভার আধার। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিখাগুলি দূরবীক্ষণ সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ গুলি প্রভামণ্ডলের নিম্নে অবস্থিত এবং cromosphere বা বর্ণমণ্ডল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

সৌরকেতুকে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ প্রভামণ্ডলের গহ্বর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এই গহ্বর গভীর নহে এবং শূণ্যগর্ভও নহে। সূর্য্যমণ্ডলে সর্ব্বত্র ঝটিকা বহিতেছে; বাতাবর্ত্তে যেমন একস্থানের বায়ু অপোগামী হইয়া থাকে সূর্য্যের বাতাবর্ত্তেও তেমনি হয়। অপর উজ্জ্বলিত বাষ্পরাশি যখন শীতল হয় তখন বেগে প্রভামণ্ডলে প্রবেশ করিতে থাকে এবং তৎপর দৃষ্টির জায় সূর্য্যদেহে পতিত হয়। শীতল বাষ্প অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ সেই জন্ত আমরা কতকটা স্থানে কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পাই। প্রভামণ্ডিত সূর্য্যের দেহে কোন স্থানে কৃষ্ণবর্ণ প্রত্যক্ষ করিলেই আমরা উহাকে সৌর কেতু বলিয়া থাকি। বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র (Spectroscope) সাহায্যে জ্যোতির্বিদগণ সূর্য্য মণ্ডলের ঐ সকল তথ্য অবগত হইয়াছেন। বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর হইতে অনন্ত আকাশে বহু দূরে নিরাজমান নক্ষত্র সমূহের সম্বন্ধে অনেক অভিনব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। অত্যাৎমকষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যেও যে সকল বিষয় জানিতে পারা যায় না, বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তাহা বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। এই অগাবক্ষ্যকীয় যন্ত্র জ্যোতির্বিদদিগের গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যালোচনায় প্রধান সাহায্য হইয়াছে।

জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা সূর্য্য এবং গ্রহ উপগ্রহ সকলের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ করিয়াছেন। সূর্য্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্বের এক চতুর্থ মাত্র। সূর্য্যের সমান বৃহৎ একটি জনপিতৃ হইতে সূর্য্য ১৬ গুণ ভারী। সূর্য্যের আয়তনের তুলনায় উহার ওজন গুণ কম। ইহা হইতেই অনুমান হয় সূর্য্য একটি প্রকাণ্ড জলন্ত বাষ্প পিতৃ মাত্র।

সূর্য্যের সাম্যাকর্ষণ পৃথিবীর সাম্যাকর্ষণের ২৭ গুণ। পৃথিবী পৃষ্ঠে যে

জিনিস এক মণ ভারী হইলে সেই জিনিস যদি স্থায়ী নহয় তাহা হইলে তাহার ওজন সাতাশ মণ হইবে ।

সূর্য্য হইতে আমরা আলোক প্রাপ্ত হই । সূর্যমলোক দেখিতে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ । কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে সূর্য্যরশ্মি সাতটি মূল বর্ণের সমষ্টি মাত্র । স্বাভাবিক পদার্থ সূর্য্য্য কিরণোদ্ভাবিত হইয়া নানাবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে । বাগানে নানাপ্রকার চিত্রিত বর্ণানুরঞ্জিত কুসুমরাশি দেখিতে পাওয়া যায় । ঐ সকল মনোহর বর্ণসমূহ, কুসুমরাশি সূর্য্য্যকিরণ হইতে প্রাপ্ত হয় । গোলাপের বর্ণ গোলাপের নিজস্ব নহে উহা সূর্য্য্য রশ্মি হইতে সংগৃহীত । গোলাপ কেবল সূর্য্য্য রশ্মি হইতে লাল বর্ণটি বাছিয়া হইয়া স্মীর কোমল দেহে রঞ্জিত করিয়া দেয় এবং সেই বর্ণ দর্শকের চক্ষে প্রতিফলিত করে । সূর্য্য্য রশ্মিতে যদি অল্প বর্ণের গম্ভীরালাবর্ণ মিশ্রিত না থাকিত তাহা হইলে সূর্য্যালোকে লাল গোলাপ ফুল দেখিতাম না ।

“All the rose does is to grasp the Sun beams which fall upon it, extract from these beams the red which they contain and radiate that red light to our eyes”.

Sir Robert Ball.

দ্রাব্যলোকে যে রংটি উজ্জ্বল দেখা যায় তাহা দীপালোকে তাহা তজ্জপ দেখা যায় না । রং অতি উজ্জ্বল আলোকেও কোন কোন জিনিসের রং স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হয় না । তাহার কারণ জিনিসের যে রং তাহা সূর্য্যালোকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে কিন্তু অল্প আলোকে সেই পরিমাণে না থাকায় ঐ রং আর উজ্জ্বল হয় না ।

সুন্দর নভোগুণে যখন বর্ণ রঞ্জিত অপূর্ণ সূর্য্য রাসময় বিকাশ পায় তখন সূর্য্য রশ্মির গম্ভীর দৃষ্টি গোচর হয় । বৃত্তিকালীন লগবিন্দু সমূহে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে ঐ কিরণ বিস্তৃত হইয়া যায় । তিন পল বিশিষ্ট কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ আসিলে ও তাহা বিস্তৃত হয় এবং তখন রাসময়র ত্রায় গম্ভীরবর্ণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় । গম্ভীরতা বর্ণ বিস্তরণ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই ; তাহার ঐ সকল বর্ণ কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহাও নির্ধারণ করিয়াছেন । নানা প্রকার ধাতু হইতেই সূর্য্য রশ্মির বিচিত্র বর্ণের উদ্ভব হয় । মেগ্নেসিয়াম (magnesium) ধাতু দহন করিলে অতি উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণের আলোক উৎপন্ন হয় । সোডিয়াম (Sodium) হইতে নীত

বর্ণ এবং ষ্ট্রন্টিয়াম (Strontium) হতে লাল বর্ণ বাহির হয়। এইরূপে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন নানাপ্রকার ধাতু হতে সূর্য্যরশ্মির সম্ভব উপর হইয়াছে। আলোক পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সূর্য্যে জলহান, অক্সারক, দস্তা, তাম্র, সীস, টিন, রোপা কেলসিয়াম, সোডিয়াম, নিকেল মেগ্নেসিয়াম, কোবল্ট, এলিউমিনাম, ক্রোমিয়াম, ষ্ট্রন্টিয়াম, মেন্ডানিস্, কেডমিয়াম এবং পটাসিয়াম বিদ্যমান আছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত সূর্য্যমণ্ডলে স্বর্ণ, নাইট্রোজেন, গন্ধক, ফস্ফরাস ও পারদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই।

বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইবে ততই অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। বিজ্ঞানই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অনির্ব্বচনীয় মহিমার শক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিতেছে। যাহারা বলে, বিজ্ঞান নিরীশ্বরবাদিতার প্রতিপোষক তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। বিজ্ঞান সর্ব্বজন সম্মুখে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে। বিজ্ঞান মঙ্গল ময়ের মঙ্গল নিদান সমূহের তথ্য আবিষ্কার করিয়া তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীমতীজনাথ মজুমদার ।

প্রাণেশচন্দ্র ।

(১২)

যমুনা। বইনদিদি, আমার পাছা মাছ ছুগা তুই বেঁচা দিবি।

পদ্মা। কেন্নো মনি, তুই গন্তে যাইবি না ? আমি যদি বেঁচা তোম্বে কম পরমা দেই।

যমুনা। তা দেস্, দিবি।

পদ্মা। কম না দেই, তুই বেচিলে যে দাম হুইত তাতো বইন হইনো না।

কি বউরা তোর মাছের দাম তো দেয় না, তোর চাঁদ মুখ খানির দাম দেয়।

পদ্মা যমুনার ছুই গালে ছুই চুমো দিয়া বলিল—“যাইবি না কেন্ ?”

যমুনা। দেখ্চস্ না, ঐ ডিকিতে এউগ্গা মাইরা, বাবা বল্ছে ওর লাইগা ছদ্ম আইনা দিতে। মাইগা না, যেন্ গঙ্গা ঠাকুরাণ জল থাইকা উইঠা আইছে—বেরাম।

যমুনা তার চুনড়ী হইতে ডালার উপর এগং, পুঁটি, খরসুনার ছা, গিলাচাকি, চাঁদা, চিঙড়ী তুলিল। চিঙড়ী ওলি জ্যাক্স—ছিটকিয়া পড়িতেছিল। যমুনা

পদ্মাকে বলিল—“চৌধুরী বউগারে কটনু এই মাছ যমুনার ।”

পদ্মা । কইনু, উঠামু তো আমি, তোর সোণা হাত, তোর গিঠা কথা—
চৌধুরী বৌ তো তা পাইত না ।

যমুনা । দাম লইসু না, মাছ দিরা আগিসু । কাইল আমি দাম আনুসু ।

যমুনা মন মাছ পদ্মার চুনড়ীতে তুলিয়া দিয়া ডিক্কির কাছে বাইয়া তার
পিতাকে কি জিজ্ঞাসা করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল । অত্যাশ্র জেলেনীরা আপন
আপন চুনড়ী লইয়া গন্তে চলিল ।

তখন বেসু বেলা হইয়াছে, বাড়ী পৌঁছিতে যমুনার আরও বেলা হইল ।
বাড়ী হইতে যখন ফিরিল তখন সে জেলেনী যমুনা নয় । যমুনার পরিধান
পরিষ্কার লাল পাইড় শাড়ী ; যমুনা স্নান করিয়াছে ; তার সুদীর্ঘ কৃষ্ণ, কৃষ্ণিত
মুক্ত চুল, শাড়ীর উপর দিরা ছড়াইয়া পড়িয়াছে । দাইন হাতে রূপার মত চক্চকে
ঘটি ; ঘটির মধ্যে সদ্য দোহা পাটি ছুপ—গরম, কেণা উপচিয়া গড়িতেছে ।

উপরে অনন্ত নীল আকাশ, নীচে বেগবতী অকুল পদ্মা, তীরে শুভ্রবসনা,
স্নাতক্লিষ্টা, মুক্তকেশী যমুনা—রজতোজ্জ্বল দুগ্ধপাক্ত হস্তে রোজে দাঁড়াইয়া ।

মহানন্দ । মা আইচ, ছুপ আনুচ, মা ঠাকুরাণকে দেও ।

মাসীমা তখন ডিক্কি হইতে বাহির হইয়াছেন, যমুনা ঘটি রাখিয়া তাঁহাকে
প্রণাম করিল । মাসীমা যমুনার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন । হৃদের
ষট্টি ধরিতে তার নিলম্ব হইল । তিনি বলিলেন “মা তুমি বুড়ার মাইয়া ?”
যমুনার দিকে চাহিয়া “মাছ টাচ লাগে নাই তো, ছুপ পাটি তো,” বিশ্বাস আর
এমন জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইল না । চুলা জলিতে ছিল ; তিনি ছুপ
ছাঁকিয়া কড়াতে তুলিয়া দিলেন । অন্ন গরম করিয়া জুড়াইয়া মেয়েটিকে
খাওয়াইলেন । মেয়েটার ফিট তখন বন্ধ হইয়াছে, চৈতন্ত হইয়াছে কিন্তু শরীর
বড় দুর্বল ।

এতক্ষণ ইহাদের কেহ ডিক্কির মধ্যে কেহ বা বাহিরে ডিক্কির ছায়ায় বসিয়া-
ছিলেন । বেলা প্রায় বিপ্রহর—ডিক্কির আর ছায়া নাই ।

মুদি তাহার স্ত্রী যোগাশয়িকে লইয়া আগিয়াছে । মহানন্দ তখনও বাড়ী
ধার নাই । যমুনা বাহিরে রোজে ডিক্কির গলুই ধরিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েটিকে
দেখিতেছে, মাসীমাকে হুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, মাসীমার অনেক
কথার উত্তর দিতেছে, অনেক কথার উত্তর দিতেছে না । “এত বড় মেয়ে”
“কই বিয়া হইচে” “বোয়ামী কই” যমুনা এই সব প্রশ্নে সাপা নীচু করিয়া নীরব ।

মাগীমা রান্না করিতেছেন—চুলা ছাপরের ছায়ায় । রান্না করিতেছেন আর ডিকির ভিতরের সংবাদ লইতেছেন ।

প্রাণেশচন্দ্র, বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে উপরে জ্বেলেনের ঐ ছাউনীর ভিতর লইয়া গিয়াছেন । প্রশ্ন—ঘটনা কি ?

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যস্থলে, চারিদিকে যুগল, বৃদ্ধ, নালক দীঘল সকল ; প্রাণেশচন্দ্র, বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্মুখে ; তাহার দাইনে মুদি । সোণামণি ডিকির নিকট ছিল । এই স্থানে জটলা দেখিয়া সে আর থাকিতে পারিল না ; যমুনা তার পরিচিতা, যমুনাকে লইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল । বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন—

“লোকগুলি শাস্তিপুরের—

প্রাণেশ ! শাস্তিপুরের লোক ! এখানে ! আপনাকে—একুপ কেন ? কিরূপে জানলেন শাস্তিপুরের ?

বন্দোপাধ্যায় । আমরা এই মুদির ঘরে লোকের যাতায়াত ও ভাব স্বভাব দেখিয়া বুঝিয়াস ব্যাপার ভাল নয় । তখন আমাদের ডিকি আসিয়াছে ; মাঝি আসিয়া আমাদের খবর লইয়াছে ; নৌকায় উঠিব । এদিকে আপনাকে ডাকিয়া পাইতেছি না । আপনার একটা গতি চাইবে ; পরে তব্ব লইবেন ও লইব । এই ভাবিয়া আমরা ডিকিতে উঠিয়াস ।

প্রাণেশ । জলে আসিয়া ভাল করেন নাই ।

বন্দোপাধ্যায় । ডাকায় বাঘ কিংক জলে কুমীর তা তখন ভাবি নাই । ডিকি কতকদূর চলিতেই দেখি পেছনে একখানা ডিকি আসিতেছে । খুব ভয় হইল । এক মাঝি হালের বটঠা আর এক মাঝি ডাঁরের বটঠা কসিয়া নাইজো লাগিল । তাঁরের মত ডিকি ছুটিয়াছে । পেছনের ডিকিও ছুটিয়াছে কিন্তু তারা যেন খুব বাইতে পারিতেছে না । আমাদের ডিকি আসিয়া এই অগতঃ-বেড় জালের বাঁশের চোঙ্গার টোনের উপর থড় থড় করিয়া উঠিল ।

মহানন্দ । আমরা কে কে করিয়া উঠিয়াস ।

বন্দোপাধ্যায় । পেছনের ডিকি আসিয়া তখন আমাদের উপর পড়িয়াছে । দুই জন লোক আমাদের নৌকায় উঠিয়াছে । হাতাহাতি গারামারি আরম্ভ । আমাদের এক মাঝি মাথায় আঘাত পাইয়া পড়িয়া গেল । আর একজন অল্প আঘাত পাইল । জ্বেলের ছাউনী—ভিসকলের চাক ; ধব্ ধব্ শব্দে লোক আসিয়া ঘিরিল—কোন্ ডিকি ডাকাতির, কোন্ ডিকি আমাদের তাদের বুঝা

কঠিন । এত লোক দেখিয়া ডাকাতেরা ডিজি বাহিরে ধরিতা দিল—গালাগালি করিতে লাগিল ; গলা—শাস্তিপুরের ।

মহানন্দ ও অন্ত্র সকল জেলেরা—“কর্তা, আমরা না থাকিলে কি, চটত গঙ্গা মা জানেন, যা গঙ্গা রক্ষা করতেন । আপনাদের সঙ্গে তো কিছু দেখি না, তবু ডাকাত—”

প্রাণেশ । শাস্তিপুরের লোক কেন ?

বন্দোপাধ্যায় বলিতে বাইরা খামিরা গেলেন, বলিলেন যে সকল কথা পরে চটবেন ।

বেলা প্রায় একটা, রাত্রা প্রস্তুত হইয়াছে । বন্দোপাধ্যায় স্নান করিয়া পূজা আফিক করিলেন, তৎপর আহার করিলেন । সকলের আহার হইল । খাবারদের অনুগ্রহে মাছ প্রচুর, তাহারা প্রচুর ছপ আনিয়া দিয়াছিল । তাহারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিল—অনেকে প্রসাদ লইয়া কৃতার্থ হইল । বন্দোপাধ্যায় যখন ডিজি জলে নামাইতে বলিলেন তখন মহানন্দ অপর কয়েকজন লইয়া সঙ্গে বাইনে বলিয়া প্রস্তাব করিল । যমুনা বাড়ী যায় নাই, মাগীমা তাকে বাড়ী বাইতে দেন নাই । যমুনা তাহার বাবাকে বলিল আঞ্জিনা অনেক দূর নয়, তাদের কুটুম্ব সেখানে আছে, সে এই সঙ্গে বাইবে । মহানন্দ অসম্মত হইতে পারিল না ।

এক ডিজিতে বন্দোপাধ্যায়, প্রাণেশচন্দ্র, দুই মাকি, মাগীমা ও যমুনা । অপর ডিজিতে পাঁচজন জেলে—যুবক ও বলবান ; মহানন্দ বৃদ্ধ হইলেও বলিষ্ঠ । মুদি বিদ্যার লইল । ব্রাহ্মণ তাহাকে তাহার ভাড়া দিতে উত্তম হইলেন, মুদি ভাড়া লইল না ; বলিল,—“পারের ধূলা দেও ঠাকুর, পরমা তো অনেক রোজগার করি—কিন্তু ধূলা কয় বামনে দিবার পারে ?” সোণামণি “সেবা দিয়া” সরিয়া দাঁড়াইল ।

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সেই ছাউনীর জেলদের মাতবরের হাতে দুইটা টাকা দিলেন, বলিলেন—“সন্ধ্যা বেলা হরিরপুঠ দিও, হরি ঠাকুরের নিকট মঙ্গল মাগিও ।”

দুই ডিজি পাশাপাশি হইয়া ছুটিগ । মোরে বইটা পড়িতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে ভাগ্যকূলের তীর হইতে ডিজি অদৃষ্ট হইল ।

পরের তীরে মুক্ত আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া সন্ধ্যা বেলা যখন জেলে যুবক, বৃদ্ধ বালকেরদল লুঠ গাইতেছিল, গাইতেছিল আর বন্দোপাধ্যায় পরিবারের অন্ত মঙ্গল কামনা করিতেছিল, এদিকে সেই সন্ধ্যা বেলায় দুই ডিজি আঞ্জিনার ঘাটে লাগিল ।

বাটে ভিজি দেখিয়া বন্ধোপাধ্যায়পত্নী বাহির হইয়া আসিলেন ; দেখিলেন এক দিকে তাঁহার তরী আর এক দিকে স্বামী, রেংরেং মধ্যে রাখিয়া ধরিত্রী ধীরে ধীরে লইয়া আসিতেছেন ।

বন্ধোপাধ্যায়পত্নী কাদিয়া উঠিলেন, বন্ধোপাধ্যায় বলিলেন, “কাদিও না কঁদর ইচ্ছার বাঁচিয়া আসিয়াছি এই ভাগ্য ; কি কুফলে পু বাড়াইয়া ছিলাম । তিনি রেংরেং গৃহে রাখিয়া প্রাণেশচন্দ্রকে লইয়া গেলেন । যমুনা সেতুর নদীতে গিয়াছিল । তাঁহার আগ্রহে মহানন্দ তাঁহার দল লইয়া ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হইল । অবিলম্বে বাতাসা আসিল—ধীরে ধীরে উঠে গান ধরিল । ইহার গাইতে জানে, বাজাইতে জানে, ইহার তত্ত্ব । ভাল মানে কীৰ্ত্তন শ্রবণ করিয়া গেল । প্রাণেশচন্দ্রের কাণে কীৰ্ত্তনের সুর ভাল পৌঁছিল না ; সে বাহির বাড়ীর একখানি ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—শাস্তিপুত্রের লোক ভাণ্ডাকূলে আসিয়া বন্ধোপাধ্যায়ের ভিজি চড়াও করিল কেন ?

(১০)

দাদা মহাশয় । দেখেছ, সংবাদ পড়ে কি লিখেছে । কি অভ্যাস !
অনন্ত । কি লিখেছে ?

দাদা মহাশয় সংবাদ পত্রখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন । অনন্ত পরিবার পূর্বে অমৃত উহা লুফিয়া লইল । জঙ্গলের মধ্যে একটা ধরণীশেখর বাজা খুঁজিয়া বাহির করা বরং সহজ কিন্তু মস্ত খাউসী ছন্দের সংবাদ পত্রের স্তম্ভ হইতে—কি দেখা, কোন্ বিষয়ে লেখা—না জানিয়া একটা বাহির করা অসম্ভব । অবুতের হাত হইতে অনাদি “দেখি” “দেখি” বলিয়া কাগজ কাড়িয়া লইল । এ স্তম্ভ, সে স্তম্ভ—এ পীঠ ও পীঠ—

ইয়াইল । দাদা মহাশয়, ভায়াগা বে আঁধারে হাংড়াছেন, ন’লে দেও না—বিষয়টা কি ?

দাদা মহাশয় । প্রেরিত-স্তম্ভে দেখ—ভাণ্ডাকূল, রমণীর প্রতিভাষণ অভ্যাস ।
করণা । বলেন কি, রমণীর প্রতিভা—দেখি, দেখি ।

প্রেরিত-স্তম্ভ বর্ডেস টাইপে—অনাদি, অনন্ত, অমৃত, ইয়াইল, ভরেন্দ্র দশ চোকে হু হুতর দেখিতে না দেখিতে করুণা চিলের মত ছৌ মারিয়া কাগজ লইয়া উঠে গেল পড়িতে আরম্ভ করিল—

“হৃকৃত্তের অভ্যচার ক্রমেই ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে—যাহা এতদিন ময়মনসিংহে আবদ্ধ ছিল তাহা ঢাকা জেলায় নিম্নত হইয়া পড়িয়াছে। স্থল অপেক্ষা জলপথ অধিকতর আপদসঙ্কুল। সে দিন ভাগ্যকূলে পদ্মাবক্ষে একটি বালিকার প্রতি যে অভ্যচার—”

ইস্মাইল। ভাগ্যকূল—তবে বা সেই বালিকা।

“একটি বালিকার প্রতি যে অভ্যচার হইয়া গিয়াছে শুনিলে শরীর শিহরিতা উঠে। সঙ্গে কলিকাতার কোন কলেজের একটি ছাত্র না থাকিলে—

অনন্ত। তবে সেই মেয়ে, তবে এ আশ্রমের প্রাণেশচন্দ্র।

“একটি ছাত্র না থাকিলে ব্রাহ্মণ পরিবারের যে কি লাঞ্ছনা হইত বলা যায় না।”

ইস্মাইল। দাদা মশায় ঐ কার্ডখানা আপনার সঙ্গে আছে কি ?

দাদা মহাশয় কার্ডখানা পকেট হইতে বহিষ্কার করিয়া দিলেন। কার্ড গড়া হইল—

“প্রাণেশবাবু ভাগ্যকূল নামিয়াছেন, সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ, একটি স্ত্রীলোক—বিধবা, ও একটি কন্যা—পরমাসুন্দরী।”

অনাদি। প্রাণেশচন্দ্র, তাতে কোন সন্দেহ নাই ; যাক্ তবু সে একটা কাজ করলো।

দাদা মহাশয়। বিপন্ন মহিলাদিগকে রক্ষা করা তোমাদের জীবনের এক উদ্দেশ্য এবং তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করেছ তার একটি প্রধান প্রতিজ্ঞা। প্রাণেশচন্দ্র—প্রাণেশ যদি হয়—প্রাণেশচন্দ্র যদি এঁট কাজ ক’রে থাকে তবে সে একটা মহৎ কাজ করেছে, তার জীবন গার্হক হয়েছে। এ যে প্রাণেশ আমারও সেই বিশ্বাস।

সমস্ত প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করা হইল। উহাতে হৃকৃত্ত দমনের উপায় সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হইয়াছে। নারীজাতিকে একবারে অসহায় জ্ঞান করিয়া রাখিয়া তাদের আত্মরক্ষার পথে বাধা দেওয়া হইয়াছে ইত্যাদি কথার আকোচনা আছে।

ঔহাদের ঐ মিলন-মন্দিরে তখন আরও অনেকে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন—নরেশ, নরেন্দ্র, সুবোধ, নবকুমার, শিবেন্দ্র ইত্যাদি। হৃকৃত্তের অভ্যচার ও হৃকৃত্ত দমন বিষয়ে আলোচনা হইতেছে।

নবকুমার। এই ক্ষেত্রে আমাদের কি কোন কর্তব্য নাই ?

শিনৈজ্জ । অগিরা ছাত্র, আমরা কি করিতে পারি ?

নরেশ । আমরা অনেক করিতে পারি । বন্ধের সময়ে দেশে ঘাইয়া কোন গ্রামে দুর্কৃত আছে তাহার সংবাদ লইতে পারি, দুর্কৃত ধরাইয়া দিতে পারি, মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে অর্থদ্বারা অত্যাচারিতের সহায়তা করিতে পারি ।

সুবোধ । কিন্তু এই সমস্ত কার্যে বিপদ বহু । তারপর সেদিন আমার একটা উকীল বন্ধু বলিয়াছিলেন, সংবাদপত্রে দুর্কৃত দমন সম্বন্ধে যে আন্দোলন উঠিয়াছে তাহা ভাল হয় নাই ।

অনন্ত । কেন ? দুর্কৃত দমিত হইলে মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস পাইবে, উকীলের খোরাক কমিয়া যাইবে, তাই !

অমৃত । রোগের উপর ডাক্তারের জীবিকা, লোকের দুশ্চরিত্রের উপর উকীলের উপজীবিকা ;—একরূপ একটা উদ্দেশ্য আরোপ করা অস্বাভাবিক নয় ।

সুবোধ । কিন্তু তাঁর ওরূপ বলিবার অজ্ঞ হেতুও থাকিতে পারে । যা হোক, এ সব কাজে বিপদ বহু ।

দাদা মহাশয় । কাজ যখন ভাল, তাকে বিপদ যখন বহু, তখন বিপদের বহুদূরই ঐ কাজের গুরুত্বের একটা অকাটা প্রমাণ ।

ইসাইল । হজরত মহম্মদের জীবন উহার দৃষ্টান্তস্থল ।

দাদা মহাশয় । কেবল মহম্মদ কেন, মহাপুরুষ নাজেরই জীবন উহার দৃষ্টান্ত স্থল । যিনি কোন সাধুকার্যে হাত দিলেন তাঁর জীবনেই অগ্নি পরীক্ষা পড়ে পড়ে । রমণী-শক্তি যে অত্যাচার হইতেছে তা' দমন জন্ত যথেষ্ট যত্ন করা আবশ্যক । নরেশ্বর লেছেন ঐ প্রস্তাব উত্তম । নারীজাতির রক্ষা, নারী-জাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা ব্যতীত এই মুক্ত জাতির মধ্যে বর্ণাশ্রম শক্তি সঞ্চারের কোন পন্থা নাই । ইউরোপের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা তুলিয়া দেও, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও উন্নতি তিলান্নি তিষ্ঠিবে না । মহিলাগণের শিক্ষা আনন্দিকার ঐশ্বর্যের মূল । স্ত্রীলোক শিক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার না করিলে, জাপান জগতের বিশ্বয় উৎপাদন করিতে পারিত না । রমণী শক্তি—রমণী প্রকৃতি—“পুরুষার্থ প্রবর্তিনীং প্রকৃতিং” কুমারে তা পড়িয়াছ ; “যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি-রূপেণ সংস্থিতা” চণ্ডীতে তা শুনিয়াছ । মহিষাসুরের দৈব-নির্ঘাতন বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রহ্মা কিছু মহেশ্বর হইতে যে জ্যোতি নির্গত হইয়াছিল তাহা “একমতং তদব্জরী ব্যাপ্ত লোকজয়স্বিবা” । ব্রহ্মার বধের পর দেবগণের আত্মপ্রাণা শুনিয়া শিক্ষা দিবার জন্ত যে জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছিল, উমা হৈমবতী ব্যতীত

কেহ সেই কোথিকে চিনাইয়া দিতে পারেন নাই । বহুদিকের অনিন্দনমণ্ডে বন্দে মাতরং অপূর্ণ সজীতে জন্মভূমির মাকড়সির যে স্তুতি করিয়াছেন, মহিলা-গণই ঐ বন্দে মাতরং এর “মা” । গজ-প্রেরক বথার্থই লিখিয়াছেন— “নারীজাতিকে অসহায় করিয়া রাখা হইয়াছে ।” তোমরা যে ত্রুত গ্রহণ করিয়াছ তাহা পালন করিয়া কৃতার্থ হও । প্রাণেশ যে এই সময়ে এই সুযোগ পাইয়াছে ইহাতে তোমরা অগ্ন্যুই সুখী হইয়াছ ।

অনন্ত । আমি যদি ঐ জন-দস্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সুযোগ পাইতাম ।
অমৃত । আমি—

সকলেই “আমি” “আমি” বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করিয়া উঠিল ।

দাদা মহাশয় । তা হবে । একণ প্রাণেশের তরঙ্গ চাই ।

অনাদি । সংবাদপত্র হইতে সংবাদভার নাম ও ঠিকানা জানিয়া লইলে তাহাছারা অনুসন্ধানের অনেক সুবিধা হইতে পারে ।

দাদা মহাশয় । অমৃত তো এই সংবাদপত্রে লিখিয়া থাকেন ; অমৃতের উপর সংবাদ দাতার নাম ও ঠিকানা জানিবার ভার থাকিল । প্রাণেশকে তোমাদের মধ্যে না দেখিয়া কত ব্যথা পাইতেছি, বুঝিতে পার ।

সকলে দাদা মহাশয়ের স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে তাকাইল । স্বর্ণেক পরে তাহারা সম্মুখের তাহাদের নিত্যত্রুত “বন্দে মাতরম্” গান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল ।

সুভাষিতাবলী ।

৩৬ । দাক্ষয় হস্তী, চর্ম্ময় মৃগ এবং উষা সেন্তের ভায়—বিজা-বিহীন মনুষ্য, মনুষ্য-দেহধারী মাক ।

৩৭ । শর-শব্যশায়ী কুরু-পিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন— “বৎস ! ধর্ম্মের লক্ষণ কীৰ্ত্তনকরা অতীব দুষ্কর । জীবগণের অভ্যাসের নিগিত স্ববিগণ ধর্ম্মের প্রচলন করিয়াছেন, অতএব যাহা জীবগণের অভ্যাস-সম্বিত, তাহাই ধর্ম্ম ।”

৩৮ । যাহারা ধর্ম্মের নিগিত ক্রেশ-স্বীকারে পরাভূত,—যাহারা দীন-ধরিজদিগকে কিছু দান না করে,—যাহারা গাণের আদরন । এতাদৃশ মনুষ্য মনুষ্যাকৃতি প্রোত-গদশ ।

৩৯। বাহাদের ধর্ম কপটতা নাই—বাক্য সকল সত্য ও প্রিয়তর,—
অর্থ সকল সংকার্যে নিয়োজিত,—তাহারা মানবগণের নিদর্শন-স্বরূপ।

৪০। বাহা হইতে কেহ ভয় হয় না, যিনি আপন মানের দিকে দৃষ্টি না
করিয়া অপরের সম্মান করেন, মনে হয় ধরিজী তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া,
শ্রকীয় নম্রমতী নাম সার্থক করিয়া থাকেন।

৪১। যে নির্লজ্জ লোক অশ্লাঘনীয় কর্মের দ্বারা স্লাঘা করে, তাদৃশ
পুরুষাধম বস্তুরঃ উপেক্ষিতব্য। অল্পমতি লোকের বাক্যে বুদ্ধিমান বিচলিত
হন না।

৪২। ক্রোধ ও লোভের মধ্য হইতে অশ্রয়ার আবির্ভাব হয়;—সর্বভূতে
দয়াদ্বারা তাহার শান্তি হইয়া থাকে।

৪৩। লোভ হইতে ক্রোধের জন্ম হয়। ক্রোধ পর দোষ দ্বারা উদ্ভোজিত
হইয়া ক্ষমা দ্বারা নিবন্ধ ও নিবৃত্ত হয়।

৪৪। কুল মর্যাদা, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য্য হইতে মদ জন্মে; ঐ সকলের
বর্ধার অবগত হইতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ মদ বিনষ্ট হয়।

৪৫। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃভূলা, দাস দাসী স্ত্রীর ছায়া-স্বরূপ; অতএব ঐ সকল
ব্যক্তিদ্বারা উভ্যক্ত হইলেও অসম্বর হইয়া ঐশ্বর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক কর্তব্য-পালন
করা উচিত।

৪৬। যে শঠ, সে অন্তকেও শঠ জ্ঞান করে। বিতর্ক-জয় সাধুব্যক্তি
সতত মুদিত ও নির্ভয়-চিত্ত হইয়া বিচরণ করেন; তিনি আশ্রয়ের ব্যক্তিতে
সহসা হুস্তরিত দেখিতে পান না।

৪৭। যিনি সমস্ত জীবকে অভয়-দান করেন, তিনি সমস্ত বস্তুর কল
লাভ করেন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী—সালদহঃ।

দেব-বালা ।

অকলে কুড়া'য়ে লয়ে ছড়ান-রতন
কে ভূমি লাগণামরি ! করিছ গমন
অরুণ-সুশিভ-পথে—ত্রিদিব-অঙ্গনে ?
সারি রজনীর খেলা সিন্ধু-শান্ত-কণে

সফল-সমাপ্তি মাঝে ছইল কি শেষ
 বিশ্ব-মনোরমা অগ্নি ! জাগাইয়ে ত্রিদেব
 নৃপ-নিকুণ তব উঠিছে ধ্বনিয়া
 অসুখ জগত-চিত্তে রহিয়া রহিয়া !
 নিরমল গন্ধবহ হে দেব-সুন্দরি,
 ত্রীঅঙ্কোচ্চিহ্ন তব মঙ্গল-কঙ্করী
 দূর-বসুন্ধরা-বক্ষে আনিছে উজ্জয়ে
 অসীম আনন্দ ভরে ! তুলিছে ফুটায়
 কঙ্কণ-চাহনি তব অগ্নি বরাঙ্গনে ।
 বিকচ কুসুম-কলি কাননে কাননে !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

একটি আলো ।

কত যে বরষা	কত যে ঝঞ্ঝা	থাকিতে নারিত ছেলেরে বারেক
কত বান বহে গেল,		কাছ ছাড়া করি কভু,
‘কুম্বরের কুলে’ তবু রাতে অলে		কটে মরিত, আঁচলের নিধি
এখনো একটি আলো !		আঁচলে থাকিত তবু।
কেহ নলে উহা নয়নের ভুল,		একে একে ছেলে বড় হ’ল তার
কেহ বা আলোয়া বলে,		খাইবে কেমন করে
জানে শুধু ভাল কারণ ইহার		প্রভাতে উঠিরা “থেতে পাটিবারে”
প্রাসে বাগদীর দলে।		যেতে হ’ত নিতি দুরে।
‘শুনি’ বলে তা’রা ওই খানে ছিল		প্রভাত হঠতে সারা দিনমান
এক ছাশিনীর বাড়ী,		মনিবের কাজ সারি,
ভয় ভিটার ও বকুলগাছ		‘আ’ল’ পথ দিয়ে গান গে’য়ে গে’য়ে
নিজ হাতে রোপা তারি।		ফিরে সে আসিত বাড়ী।
সে ছিল ওখানে অনেক বাতনা		বদি কোন-দিন বেঁধে রাত হ’ত
অনেক কষ্ট মরে—		ফিরিতে তাহার ঘরে,
আঁধার কূটরে আঁধার প্রদীপ		আঁধা পথ চেয়ে রহিত জননী
একটি তনয়ে লয়ে।		ধরি দীপখানি করে।

এক রজনীতে এলো না তনয়,
মার্তা সারা নিশি জাগি,
ক্ষণে শতবার ঘারে ছুটে আসে
বাকুল স্তনের লাগি
বাতাসে কবাট যদি নড়ে অহা
আশাতে ভরে যে বুক,
ঘর খুলে দেখে আঁধার আঁধার,—
নিরাশে শুকায় মুখ।
পোহাইল রাতি এলো না তনয়
শেষ আশা গেল টুটি,
নয়নে আগিল অশ্রুক্ষোয়ার
ভূমে সে পড়িল লুটি।
আত্মীয় জন বুঝাইল তারে,
মরেনি তনয় তার,
চাকুরী পাইয়া গেছে দূরদেশ
গঙ্গার আন পার।
কোথায় তনয় কোথা অভাগিনী
দেখা হইবার নয়,
তবু সে বুঝিল, মরে যাওয়া চেয়ে
দূরে যাওয়া প্রাণে নয়।
আশায় বাঁধিল ভাঙা বুকখানি
মুছিল নয়নবারি,
জল দিয়ে নিজের রাখিল জিয়ায়ে
তনয়ের তরু সারি।
হেলের হাতের মাছুরা তগী
রাখিল বতন করে,
তনয় যে তার চাকুরী করিয়া
কিরিয়া আসিলে ঘরে।

সন্ধ্যায় এক! বিবশা ছুশিনী
গৃহ-ভ্রমণীর তলে
পড়িয়া রহিত ভিজাইত মুণ
হুটী নরনের জলে।
প্রতিদিন রাতে দীপখানি জালি
দূর পথিকের আশে
কৃষিত নয়নে বসিয়া রহিত
আপন নিজের বাসে।
সারা নিশি ধরি স্তনিত অভাগী
মান্বদের সারি গীতি
নিশিধ তরীর সব দাঁড়ি মাঝি
ও আলো দেখিত নিতি।
কতদিন হ'ল অভাগিনী হার
গেছে চলি ধরা ছাড়ি,
বিশটা বরষা তপ্ত ভবনে
ঢেলেছে শান্তিবারি।
নন্দ ঝটিকা বরষ বরষ,
গেছে সেই দিকে চলি,
সন্ধ্যায় সেই আলোটি কিন্তু
তেমনি উঠে গো জলি।
কোথা ছেলে তার আগিল না ফিরে
আছে কোন দূরদেশে,
'কুসুরের' বানে ভবনের শেষ
চিহ্নও গেছে ভেসে।
তবুও জলিছে জলিবে এখনো
কত নিশা নাতি জাগি,
ভাষনা জড়িত জননী হিয়ার
স্নেহের প্রদীপখানি।

শ্রীকুমারজন সন্নিব।

আরতি ।

বহুদিন পরে এসেছি জননী
আরতি করিতে তোমারে ।

নিলাসের বশে ভার্য্যে চেষ্টন,
বহুদিন মোহে তিমু নিমগন,
বহুদুঃখ শিরে করিয়া বহন
নিরাশার ঘোর আধারে ;

বহুদিন পরে এসেছি জননী
আরতি করিতে তোমারে ।

সভসা ভেঙ্গেছে এ স্নেহের খেলা,
আঁপি মেলে দেখি হ'য়ে গেছে বেলা ;
উঠ এই বেলা, উঠ এই বেলা
কে যেন ডাকিল আমারে ;

বহুদিন পরে এসেছি জননী
আরতি করিতে তোমারে ।

কি দিয়ে পূজিব নাহি কোন ধন,
দীন আমি, অতি দীন নিবেদন,
সুজলা সুফলা জননী চরণ
অকুল ভুবন মাঝারে ।

বহুদিন পরে এসেছি জননী
আরতি করিতে তোমারে ।

প্রাণে নব আশা হৃদে নব বল,
বদ্বিগ্ন মা, কিছু নাহিক গম্বল,
তনয়ার তব আছে আঁধি জল
ভকতি হৃদয় মাঝারে ;

বহুদিন পরে এসেছি জননী
আরতি করিতে তোমারে ।

সঁপিতে জীবন তোমারি চরণে,
বরদে ! বর দে দীনহীন জনে,
ও চরণ পরি, তব নাহি করি
জীবনে সরণে কাহারে ।

বহুদিন পরে এসেছি জননী
আরতি করিতে তোমারে ।

শ্রীউবাগমোদিনী বহু ।

আব্রতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ।

ষষ্ঠ বর্ষ । { ময়মনসিংহ, ভাদ্র, ১৩১৩ । { অষ্টম সংখ্যা ।

মহাত্মা আনন্দমোহন বসু ।

যুগধর্মের অবর্ত্তকগণ পরবর্ত্তী জনসমাজের জ্ঞাত যে আদর্শ রাখিয়া যান হই প্রকারে উহার প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে । কখনও তাঁহাদের চিন্তা ও কর্মের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ গ্রহণ করিয়া নূতন কর্মপুঙ্খের আবির্ভাব হয়, কখনও একই জীবনে তাঁহাদের সমগ্র গুণাবলির সমন্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু একরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল । যুগপ্রবর্ত্তকের ভিন্ন ভিন্ন গুণের আদর্শে গঠিত মহাপুরুষগণ, বৎকালে আপন আপন স্বতন্ত্র এবং চিহ্নিত চরিত্রচ্ছটায় চারিদিক্ আলোকিত করেন, তৎপরবর্ত্তী সময়ে একাধারে সকল গুণের সমাবেশ অতি স্বাভাবিক । মহাত্মা আনন্দমোহন বসু প্রকৃতির এই শিল্প নৈপুণ্যের ফল ।

রাজা রামমোহন রায় ভারতে নবযুগের প্রতিষ্ঠাতা । মহর্ষি দেবেজ্ঞানাথ, ব্রজানন্দ কেশবচন্দ্র, মহাত্মা বিদ্যাগাগর, মনস্বী কৃষ্ণদাস গালের জীবন যুগস্রষ্টার চরিত্রের বিভিন্ন আদর্শের চরম পুষ্টি । রাজা রামমোহন নূতন যুগের যে রেখা চিত্র অঙ্কিত করিয়া যান, মহর্ষি দেবেজ্ঞানাথ ও ব্রজানন্দ কেশবচন্দ্র তাহার ধর্মের দিক্ পূরণ করিয়াছেন, বিদ্যাগাগর সমাজের দিক্, কৃষ্ণদাস গাল রাজনীতির দিক্ গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই জ্ঞাত তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনের বিশেষত্ব স্পষ্ট ও পরিষ্কৃত । দেবেজ্ঞানাথে যোগীর তপস্বিত্ব, কেশবচন্দ্রে ভক্তি এবং বিশ্বাসের প্রাবল্য ও উদ্দীপনা, বিদ্যাগাগরে অপরাজিতা দয়া ও জনহিতৈষিতা এবং কৃষ্ণদাসে রাজনীতিক বিচক্ষণতা আদর্শের উপযুক্ত উপকরণ প্রদান করিয়াছিল । নিধাতা একাধারে দেবেজ্ঞানাথের তপস্বিত্ব, বিদ্যাগাগরের দয়িত্ব, কেশবচন্দ্রের ভক্তি ও কৃষ্ণদাসের মনস্বিতা দেখিবার জন্মই যেম আনন্দমোহনের কৃষ্টি করিয়াছিলেন । এতদ্ব্যতীত আনন্দমোহনের জীবনে একরূপ বিশেষত্ব ছিল বাহ্য দ্বারা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট উপলব্ধ হইয়া থাকে । আর তাঁহার কার্যাবলীর

মুখ চিহ্ন উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার চরিত্রের আলেখ্য প্রদান করিব, এমন সম্ভাবনা আমাদের নাই। সমুজ্জল রক্তচুটী যেমন আবরণ ভেদ করিয়া আপন আপনি ফুটিয়া বাহির হয়, তাঁহার অনাবিল আড়ম্বরহীন কর্মজীবনের মধ্যেও তেমনি কতকগুলি বিশেষত্ব সাধারণ ভাবেই লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইত। আল তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

মহু বলিয়াছেন—

বদ্বরাপং বদ্বজ্ঞেরং বদ্বহুংহং যন্ত দ্বস্তরম্।

তৎসর্বং তপসা সাধ্যং তপোহি পরমং বদ্বম্ ॥

বাল্য জীবন হইতে আনন্দমোহন এই মন্ত্রের প্রধান সাধক। তপস্তার অর্থ যদি দীপ্তি লাভের জন্ত একাগ্রতা হয় তাহা হইলে আনন্দমোহনকে আমরা প্রকৃত তপস্বী বলিব। তাঁহার একাগ্রতা সাধারণ শ্রেণী হইতে বহু উচ্চে। যেখানে বাহু জগত অন্তর্ভুক্ত বিলীন হয়, সমস্ত চিন্তাবৃত্তি এক অতীন্দ্রিয় সম্বলিত নিকট সম্ভাবনত করিয়া তাহার দাসত্বে নিয়োজিত হয়, তাঁহার একাগ্রতা এই প্রকারের ছিল। ঐ একাগ্রতা আয়াসে অর্জিত হইবার নহে, —উহাই প্রকৃত প্রতিভা। সাধনা উহার ধর্ম। ক্ষেত্রে উপযুক্তরূপ কর্ণ জাই। শক্তির উপযুক্ত সাধনা চাই। এই দুইটির একত্র সমাবেশ না হইলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হইতে পারে না। প্রকৃতি আগুন শিল্প নৈপুণ্যে আনন্দমোহনের মধ্যে যে উচ্চ প্রতিভার সংযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তদনুরূপ সাধন শক্তিতে তুষিত করিতেও তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। যেখানে অসাধারণ কৃতকার্যতার দৃষ্টান্ত সেখানেই এই দুই শক্তির অপূর্ণ সংযোগ। বিদ্যাগাগর ছাত্র জীবনে বিরূপ পরিশ্রমী ছিলেন, তাঁহার জীবনে সাধনার বিরূপ বিকাশ ছিল, তাহা প্রত্যেকেই অবগত আছেন। বাহ্যিক জীবনে কৃতকার্যতার তেমন পরিচয় দিতে পারেন নাই অথচ ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতির উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিলে এই সত্য অধিকতর স্পষ্টরূপে দেখা পায়মান হইবে। কেশবচন্দ্র সেন বা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে পরিচিত হইতে পারেন নাই, কিন্তু যখন তাঁহাদের অতুল বশের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, তখনকার কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহাদের সাধনা কি অপূর্ণ। শুনিয়াছি উমেশচন্দ্র বৃদ্ধবয়সেও গভীর রজনী পর্যন্ত জাগ্রত থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন; বহু সময় পাঠ করিতে করিতে তাঁহার রজনী প্রভাত হইয়া বাইত।

ছাত্রজীবন হইতেই আনন্দমোহন তপস্বী, ছাত্রজীবনেই তিনি গাংক এবং লিঙ্গ। তাঁহার পাঠ্যবহুর ইতিহাসে অদ্ভুত সাধনার বিকাশ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন।

একদিকে প্রকৃতির বিপুল দান, অন্যদিকে সাধনার ও তপস্যার পূর্ণ প্রভাব স্মরণে স্মরণতন্ত্রের তাঁহার বৈজ্ঞানিক উচ্চতম চূড়ে স্থান পাইবে বিচিত্র কি? তিনি কলিকাতার বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভারতীয় শ্রেষ্ঠতম জয়মাণ্য লাভ করিয়া ছিলেন। পূর্ব বঙ্গের প্রাচ্যতম প্রান্তের এক অজ্ঞাত কুটীরে জন্ম গ্রহণ করিয়া আনন্দমোহনের গৌরবচ্ছটা প্রতীচ্য প্রদেশেরও শেষ সীমা স্পর্শ করিয়াছিল। ভারতীয় যুবক যে দিন ইংলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম গণিত পরীক্ষার স্রাংলার হইলেন সে দিন ইংলণ্ডবাসী ভারতীয় প্রতিভার নূতন পরিচয় পাইয়া নিশ্চিতই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

কেবল ছাত্র জীবনে নহে, পরিণত বয়সেও তিনি সর্বদা লগাধি মহাপুরুষ। তাঁহার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিকট শুনিরাছি, একদিন তিনি আনন্দমোহন বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাটী গমন করেন। যখন তিনি তথায় গিয়াছেন তখন আনন্দমোহন পূর্ববঙ্গের একখানি বাজলা সংবাদপত্র করিতেছিলেন। বসু সম্মুখে কিংবা আনন্দমোহনের বেন বাস্তুটি লম্বা অস্তান্তরে নীল হইয়া গিয়াছে। তিনি তথায় “নবদ্বার নিবন্ধ বৃত্তি”। স্মরণে বহুগণ প্রায় স্মরণের সহিতও সম্ভাষণ করিলেন না; বসু আনন্দমোহনের প্রকৃতি জানিতেন, তিনি বিস্মিতনেত্রে তাঁহার গভীর সমাধি দেখিতেছিলেন; অবশেষে যখন পাঠ শেষ হইল, আনন্দমোহন তখন ধ্যাননেত্র উন্মোচন করিলেন, তিনি প্রিয় বন্ধুকে পাইয়া যেমন স্তম্ভী হইলেন, তাঁহার অভ্যর্থনা নিজেই কষ্ট হইয়াছে তাহা অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্লম হইলেন।

অতঃপর ছাত্র জীবনের গৌরব লগাটিকার বিভূষিত হইয়া আনন্দমোহন কর্মজীবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কর্মজীবন ধর্মের সুশ্রুত আলোকে সর্বদা হস্তগত। যেখানে এত প্রেম এত শ্রীতি এত মধুরতা সে তাঁহার আনন্দমোহন নামের অঙ্গরেঅঙ্গরে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পুণ্য জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইত। এক্ষেত্রে তাঁহার পারিবারিক জীবন, তাঁহার সংসর্গ, বিধতা অমুকুল করিয়া গঠিত করিয়াছিলেন। বৃক্ষের সতেজবৃদ্ধি একমাত্র ভূমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে না, উহার জন্য উপযুক্ত আলোক চাই, বায়ু চাই। তাঁহার মাতা, তাঁহার ভ্রাতা, তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার জীবন গঠনের নিয়িত বিধিদত্ত আলোক ও বায়ু; তাঁহার

মহশীল ভ্রমণ হইতে তিনি দয়ার মন্মাদিনী লাভ করিয়াছিলেন, তাতার মধুর স্বভাবে তাঁহার জীবন দিব্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিল।—সহধর্ম্মীর ধর্ম্মপ্রাণতায় তাঁহার ধর্ম্মের জ্যোতি আরও উজ্জ্বলতর হইয়াছিল। ইহার উপর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র গাধু অঘোরনাথ, তত্ত্ব বিজয়কৃষ্ণের ভ্রাতা, মহাত্মার পুণ্যস্পর্শ। যুগধর্ম্মের নূতন শিক্ষায় তাঁহার চিন্তাশ্রোত নূতন দিকবর্তী হইতেছিল; সুতরাং উহা যখন কেশব বিশালক্ষেত্র ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইল তখন দেশ নূতন সম্পদে বিভূষিত হইবে না কেন? তিনি বালাজীবনে ময়মনসিংহ নগরে “মনোরঞ্জিকা” সভা স্থাপন করিয়া দেশহিতৈষণার যে অঙ্গুর বণন করিয়াছিলেন ইংলণ্ডের মুক্ত বায়ুস্পর্শে তাহা নূতন ক্ষুদ্র লাভ করিয়াছিল। এদেশে আসিয়াই তিনি মুনভাবের নবপ্রেরণা লইয়া অত্রান্ত সহযোগীদের সহিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ছাত্রসভা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সিটিকলেজ, বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় প্রভৃতির স্থাপনায় একসঙ্গে রাজনীতি, শিক্ষানীতি ও ধর্ম্মনীতির মনো স্থরিত কার্যশ্রোত প্রবাহিত করিলেন।

দেশ-হিত্রতে দীক্ষিত হইয়া আনন্দমোহন ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বৈদেশিকের নিকট আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে গেলে ভারতবাসীকে সাময়িক শক্তির উচ্চ পরিচয় দিতে হইবে। তিনি নিজ জীবনের সকলতা হঠতে এই ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন; তাহার ছাত্র জীবনের কৃতিত্ব তাহাকে দেশে ও বিদেশে উচ্চ সম্মানের অধিকারী করিয়াছিল, এষ্ট কৃতিত্বের ফলে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন কালে তৎকালীন অধ্যক্ষ কর্তৃক সম্মানে রাজ প্রতিনিধির নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন, এই কৃতিত্বের ফলে তিনি ইংলণ্ডের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বন্ধুত্ব অর্জন করিয়াছিলেন সুতরাং দেশের হিতকর অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া গর্বাগ্রেই শিক্ষার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

তিনি বাল্যে যে স্থানে অধ্যয়ন করিতেন আজ সেই ভূগির উপর তাঁহার স্থাপিত ময়মনসিংহ সিটিকলেজ ও স্কুল সহস্র সহস্র লোককে শিক্ষা বিতরণ করিতেছে। কলিকাতায় যে স্থানে ভারতাত্মম ছিল, তিনি যে স্থানে প্রার্থনা করিতেন আজ সে স্থানে গৌরব দীপ্ত সিটিকলেজ উচ্চ শিক্ষার পতাকা উড়াইয়া দেশে শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিতেছে। এ দেশে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে মহাত্মা বিদ্যাসাগর যে নূতন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন এ পর্যন্ত অনেকেই তাঁহার অনুবর্তী হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার পণ্ডিত গদ্যায় অঙ্গুরণ করিয়া কখন সম্পূর্ণ নিকান

আমি এত ভ্রমের সাধনা করিতে পারিতামেন ? মহাত্মা আনন্দমোহন বসু স্বার্থকে সম্পূর্ণ দূরে রাখিয়া শিক্ষা বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সিটিকলেজ স্থাপন করিয়া তিনি বহুদিন পর্যন্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে উহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পরিশেষে স্বত্বাধিকারিত্ব ত্যাগ করিয়া উহাকে একটি সাধারণ সভার অধীন করিয়া দিলেন; কিন্তু নিজে ভক্ত সেবকের ভাৱ চিরদিন উহার পরিচর্যায় নিমগ্ন রহিলেন।

আনন্দমোহন এক মাত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাট, শিক্ষা বিস্তারের সহিত তাঁহার জীবন সম্বন্ধ ছিল। নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি কল্পে তিনি অজস্র পরিশ্রম করিয়াছেন; তাঁহার দৃষ্টান্ত ও উদ্যোগে বেথুন কলেজ বর্তমান স্তরে উপনীত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিত কল্পেও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন; বিশ্ববিদ্যালয় কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে দুইবার ঔপদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্বাচিত করেন।

সর্ব সাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চর্চার প্রথম প্রবর্তকরূপে আনন্দমোহনের নাম চিরদিন এ দেশবাসী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিলে। ইংলণ্ড হইতে যে-কয়টি মহান আদর্শ লইয়া আনন্দমোহন জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ছাত্রগণের অনুকরণে যুবকগণের মধ্যে মৈত্রিক আদর্শ সংস্থাপন এবং এদেশে রাজনৈতিক আলোচনার বহুল প্রচার, এই দুইটি প্রধান; এ সময়ে হুরেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজসেবার পংক্তিভূত হইয়া স্বদেশ-সেবার আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আনন্দ তাঁহাকে সহযোগী পাইলেন। এ মণিকাঞ্চনের পবিজগৎবোলে এদেশ নূতন উদ্বীপনার আগিরা উঠিল। তাঁহাদের রাজনৈতিক আলোচনার প্রধান ফল, লর্ড লিটনের প্রোগ-এন্ট ও রিভাগ টেমসনের চৌকীদারী আটিনের প্রতিবাদ এবং প্রজাতন্ত্রাধিকারী সংসদীয় আইনের সংস্কার। ইহারাই এই উপলক্ষে এদেশে আন্দোলনের তুমুল তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

রাজনীতিক জীবনে আনন্দমোহন বসুর কৃতিত্ব অসাধারণ বিশেষত্বে পরিপূর্ণ; সে বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে তাঁহাকে বুঝা উচিত। তাঁহার নিকারজীবনে আত্মলোপের একটা সমস্ত প্রয়াস আতিকার্য্যে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; তিনি আত্ম শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন কিন্তু আপনাকে অগ্রবর্তী হইতে দিতেন না। "কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে একজন মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন He was born to lead & never to be led." আনন্দমোহন বসু সম্বন্ধে লজ্জা কথা। তাঁহার উচ্চ

প্রতিভা, তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাঁহার অসাধারণ অনুধাবনশক্তি এবং সুনির্মল চরিত্র তাঁহাকে নেতৃত্বের সমস্ত প্রয়োজনীয় গুণাবলীতে ভূষিত করিয়াছিল ; কিন্তু তিনি আপনাকে অন্তরালে রাখিয়া বিশ্বাসিত আত্মদান করিতে ভাল বাসিতেন । দেশ হিতৈষণায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল কিন্তু তিনি দেশহিতৈষী (patriot) নাম গ্রহণ করিতে কখনও অভিলাষী ছিলেন না । উচ্চ প্রতিভার সহিত অহং জ্ঞানের (Ego) প্রায়শই একটু নিকট সম্পর্ক দেখা যায় । প্রতিভাবান ব্যক্তি জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে বাইয়া বহু সময়ে অপরের ব্যক্তিত্বের উপর অজ্ঞার আঘাত করেন ; কিন্তু আনন্দমোহনের জীবন অহং জ্ঞানের মলিন স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ দূরে ছিল ; তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা, অসাধারণ ডেজিন্টিভিটি এবং অদম্য উৎসাহ, গাম্ভীর্য ও উদার-শাস্ত্র-গুণের কাচ পাत्रে স্থাপিত হইয়া এক দিব্য শোভা ধারণ করিয়াছিল ; এ জন্ত তিনি রাজনীতিক বিচক্ষণতায় বর্তমান সময়ের নেতৃবৃন্দের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, এ কথা বলিলে অত্যাক্তি হয় না ; কিন্তু রাজনৈতিকক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক কোলাহলের ভিতর আনন্দমোহনের নাম কখনও শ্রুত হয় নাই । তাঁহার মধুর প্রকৃতি চিরদিন আত্মত্যাগশীল ; সুতরাং উহা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে বাইয়া প্রাকান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিত না । তথাপি কি আনন্দমোহন রাজনৈতিক জীবনে অজ্ঞাত ছিলেন ? এ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা কে তাঁহার নাম জানিত না ? প্রতিভার পূজা করিতে জগৎ ব্যাধা ; উহা যতই আত্মগোপনশীল হউক, জগৎ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই করিবে । বহু কখনও বন্ধে আবৃত হইতে পারে না ; প্রতিভা কখনও অজ্ঞাত থাকিতে পারে না । এই জন্তই যে আনন্দমোহন একদিন বোম্বে জাতীয় মহাসমিতিতে বিশিষ্ট দর্শকগণ মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হন নাই, দশবৎসর বাইতে না বাইতেই সেই আনন্দমোহন সমস্ত দেশবাসীর উচ্চতম শ্রদ্ধার মুকুট পরিধান করিয়া মাস্ত্রাজ-অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন ।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের দ্বর্ষটনার কথা বোধ হয় কেহ বিস্মৃত হন নাই । প্রেগ নিবারণ করে বোম্বে-গবর্ণমেণ্ট কতগুলি বিধিব্যবহার প্রচলন করেন ; উহা বোম্বে-বাসীর তত মনঃপুত হইয়াছিল না ; তাহার গবর্ণমেণ্টের সহদেস্ত বৃত্তিতে না পারিয়া নানারূপ অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, এইজন্য তথায় নানারূপ দ্বর্ষটনার অনুষ্ঠান হয় ; ইহাতে ইংলণ্ডবাসী ইংরেজ সম্প্রদায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠেন । র্যাণ্ড ও এয়ারস্টে সাহেবের হত্যাকাণ্ডকে তাহার কারণবিশেষের পূর্ব

দৃঢ়তা বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। সেই হুঃসময়ে আনন্দমোহনের জ্ঞান কৃত্তীপুরুষ ইংলণ্ডে না থাকিলে এ দেশের রাজনৈতিক গগন ঘোর ঘনঘটাজ্বর হইত। তিনি সভার উপর গভীরা করিয়া ইংলণ্ডবাসীকে ভারতের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার অপূৰ্ণ বক্তৃতাশক্তি সৰ্ব্বদা আমরা এপর্যন্ত কোন কথা বলি নাই, সে বক্তৃতার প্রবল উচ্ছ্বাসে যাহারা সম্মুগীন হইয়াছেন তাঁহারা জানেন উহাতে কত শক্তির সমাবেশ। কখন প্রবল জলধির গভীর গর্জন, কখন কবির উন্মুক্ত বক্তার, কখনও বীরের দৃঢ় হৃদয়, কখনও শাস্ত্রতত্ত্বের মনোমোহকরপ্রবাহ, যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে যুগপৎ ক্রীড়া করিয়া যাইত। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে একাধারে কাব্যের সৌন্দর্য, আলংকারিকের অলংকারচ্ছটা এবং সংগীতের মনোহারিত্ব ছিল। তিনি ছাত্র জীবনের অবসান সময়ে ব্রাইটন নগরে এক বক্তৃতার ফসেটের জায় ব্যক্তিগণকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার অপূৰ্ণ শক্তিতেই তিনি ইংলণ্ডবাসীর ভ্রাম্যশ্লক ধারণা সহজে দূর করিতে সমর্থ হইলেন।

তাঁহার ধর্মজীবন সৰ্ব্বদা কয়েকটি কথা উল্লেখ করা কর্তব্য। তিনি ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য, তাঁহার ধর্মাস্তর গ্রহণের সহিত তাঁহার জীবনের কার্যাবলী দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। তিনি যে সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীন কর্মস্রোতের সমুদার বাধা হ্রাস হইয়াছিল। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও সময়ের অভাব এ দুইটির প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার ধর্মাস্তর গ্রহণ সৰ্ব্বদা কোন কথা বলা উচিত নহে।

বিশ্বাস ও প্রীতি ধর্মের মূল। এই বিশ্বাস ও প্রীতি যেখানে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া বিশ্বজনীন ধর্মের মুক্ত প্রাঙ্গণে ছুটিয়া যায়, তখন তাহাকে যে কোন ধর্মাবলম্বী আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। আনন্দমোহনকে আমরা কোন সাম্প্রদায়িক গভীতে নিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহি। তাঁহার স্বাধীন চিন্তাস্রোত আপনার জন্ত নূতন আদর্শ গঠন করিয়া লইয়াছিল। উহাতে সর্ব ধর্মের সার সঙ্কলন ছিল, উহাতে ভাগবত সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ ছিল। আনন্দমোহন ভগবানের নামে সর্বদা বিভোর ছিলেন। তাঁহার উচ্চ নৈতিক আদর্শ ও ধর্মমন্ত্র প্রাণ তাঁহাকে ঋষির যোগ্য আসনে উন্নীত করিয়াছিল। যিনি তাঁহার সংস্পর্শে কোনদিন থাকিবার সুবিধা পাইয়াছেন তিনিই একথা স্বীকার করিবেন। তাঁহার ভগবৎপ্রেমে মন্ডাকিনীর মুক্ত ধারা বহিত। ভগবানের নামে, ভক্তিপ্রসঙ্গের আলোচনার তাঁহার মুখে এক দিব্যকাস্তি স্ফুটিয়া বাহির হইত।

আর ৩০ সংখ্যার পূর্বে কলিকাতার সিটি-কন্সল্ড Re-union উপলক্ষে একটি অক্ষয়ালক আশ্বাষ্যরূপে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেছিল। অনেকেই তাঁহাকে অনেক রকম শ্লোক জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন কিন্তু আমার মনে পড়ে, আনন্দমোহন এই শিশুর মুখে ভক্তির কথা শুনিতে বাগ হইয়াই বাকুলভাবে এক একটি ভক্তিমূলক শ্লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং যখন-শিশু শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিতেছিল তখন তাঁহার স্বর বেন আনন্দে ডুবিয়া গিয়াছিল। তাঁহার সে সময়ের সেই শ্রাস্তমূলের চিত্রখানি আজও যেন সম্মুখে ভাসিতেছে।

তাঁহার উদারতা, সহন্যতা এবং বহুশ্রীতিও অতি উচ্চ শ্রেণীর ছিল। তিনি ব্যবহার মাধুর্য্যে সকলকে মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনার করিয়া ফেলিতেন। মরমনসিংহের স্থিতি তাঁহার মনে কতই মধু ঢালিয়া দিত। মরমনসিংহ হইতে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি তাঁহাকে সহজে পরিভাগ্য করিতেন না; অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মরমনসিংহের সমস্ত সংবাদ জ্ঞানিয়া লইতেন। তাঁহার বাল্যাবস্থা স্থানের আমগাছটির কথা পর্য্যন্ত তিনি গাথিতে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিতেন না। তাঁহার সহৃদয়তার কাহিনী অসংখ্য। আজ 'আরতির' ক্ষুদ্র একে আমরা তাঁহার পরিচয় দিতে পারিলাম না। তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় জাতৃগণের অকাল মৃত্যুতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার জীবন নীলা এত শীঘ্র সাদা হইয়া গেল। যখন বঙ্গদিক্ষেদের ভীষণ দুষ্কৃত্য মরমনসিংহে অধির হইয়া পড়িয়াছিল তখন আনন্দমোহন শেষ সময়ের জন্ত এখানে পঙ্গুপর্ণ করেন। মরমনসিংহ সেদিন চরকালের জন্ত তাঁহার সে সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া লইয়াছে, তাঁহার মূর বাক্য শুনিয়া গইয়াছে; আর তাহার তাঁহাকে দেখে না, তাঁহার গম্ভীর বক্তৃতা শুনিবার জন্ত সহস্র সহস্র লোক আর ছুটিয়া আসিলে না।

বড় হুঃসময়ে তিনি ইচ্ছা লোক পরিভাগ্য করিলেন। এদেশে এখন নবজীবনের স্পন্দনের সঙ্গে মতবিবোধের চঞ্চল স্রোত বহিয়াছে। আনন্দমোহনের জ্ঞান দক্ষ ও সাধুচরিত্র পুণ্যাত্মা এ সময়ে জীবিত থাকিলে বহু সঙ্কটস্থলের দহজে নিঃশাস্ত হইত, দেশে আত্মকলহের বিষণ্ণ বাজিয়া উঠিত না।

তিনি জীবনের অপরাহ্নে অণুও বঙ্গ ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; উহা নিশ্চিন্ত হইলে তাঁহার রাজনৈতিক তপঃসিদ্ধির এক উজ্জল স্তম্ভ হইয়া থাকিলে। আর তাঁহার পুণ্যজীবনের আদর্শ বাঙ্গালীর চরিত্রে প্রতিবিম্বিত হইলে সুস্থিতে পারিব, তাঁহার প্রতি আমরা প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করিতেছি।

শ্রীশরৎকুমার বেন গুপ্ত

নৈষধ । *

মুজাতি ঢাকা জেলার অন্তর্গত, বেজারা গ্রাম নিবাসী, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ সেন মহাশয়ের বাসিতে কয়েকখানা অ-পূর্ব প্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা ক্রমে তাহার পরিচয় প্রদান করিব।

প্রস্তাবিত গ্রন্থ মহাভারতোক্ত নলোপাখ্যান অবলম্বনে রচিত কিন্তু উহার অল্পবল মাত্র নহে। এই গ্রন্থে কবি কান্যোপখ্যোপী বিবিধ রস-বৈচিত্রের অনুভব করিয়া খ্রীঃ অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। হস্তগত পুঁথিখানা উল্লিখিত জগন্নাথ সেন মহাশয়ের পিতামহ-ভ্রাতা স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সেন মহাশয়ের হস্তলিখিত। শ্রীকংসখ্যা অনুমান ৩৪০০। বাঙ্গলা ১২২১ সনের ২৭শে কার্তিক তারিখে এই পুঁথির লিখনকার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই হিসাবে ধরিতে গেলে, এই অল্পলিপি ৯২ বৎসরের প্রাচীন। হস্তগত পুঁথি হইতে কবির সময় এবং পরিচয়, সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে ভূমিতল একস্থলে লিখিত আছে ;—

“মনে পুষ্পাঙ্গনী দিয়া, প্রেমসি শঙ্কর-প্রিয়া,
যে করিল পূর্ণ মনস্কাম।
মনে করি বড় প্রীত, রমহাশু নৈষধবীত,
বিরচিল বেজ দুর্গারাম ॥”

ইহাধারা প্রতীয়মান হয় যে, কবির নাম দুর্গারাম এবং তিনি বৈদ্যবংশ সন্নিহিত ছিলেন। কবির সময় সম্বন্ধে এই মতল বলা বাইতে পারে যে তিনি “কৃষ্ণচন্দ্র যুগের” পরবর্তী।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে, বঙ্গভাষার দীনতা ফালনের সূত্রপাতরূপে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য প্রচারিত হয়। ইতঃপূর্বে কবিরজন রামপ্রসাদ সেন ও কৃষ্ণরামকর্তৃক এই বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত হইয়াছিল বটে কিন্তু পূর্ববর্তীগণ হইতে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সর্বোপায়ে সম্পন্ন। অনন্ত বিদ্যাসুন্দর কাব্য আলোচনা করিলে উহাতে অনেক অসামাজিক অপরোধ পরিলক্ষিত হইবে, তথাপি উহার কুৎসন্য শব্দ-মত্রে পাঠকের হৃদয়, বংশীভ্রাত বিবধরের দ্বারা স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, তাই এত দোষ স্বত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর

* উক্ত নামধের দুইখানা পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছে ; একখানা দুর্গারাম কৃত, অপরখানা রামনারায়ণ দ্বারা লেখিত। (লেখক)

লোকসমাজে এতদূর প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে!

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের আদর্শ লইয়া, তৎপরে বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর আরও, কয়েকখানা কাব্য রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ‘চন্দ্রকান্ত’, ‘কামিনীকুমার’, ‘জীবনতারা’, এই কাব্যত্রয় পদ-লালিত্যে বিদ্যাসুন্দরেরই অনুরূপ কিন্তু নৈতিক অধোগতিতে বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষাও একাধিক নীচে। আমাদের প্রভাবিত গ্রন্থও সেই শ্রেণীর একখানা।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের স্থায় ‘বিহার’, ‘নারীগণের পতিনিলা’ প্রভৃতি অখ্যার ইহাতেও স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কুরুচির পুতিগন্ধ নিবন্ধন নাগিকা বন্ধ করিয়া ইহার ভিতর দিয়া চলিয়া গেলে, ইহার পদলালিত্য ও রচনার পারিপাট্যে হৃদয় মোহিত হয়। ভারতচন্দ্র ও আলোচ্য গ্রন্থকারের রচনায় এমন সৌগাৎশ্রু যে, এককথায় ইহাকে ভারতচন্দ্রে অনুরূপাণিত বলা যাইতে পারে। পাঠকগণের অবগতির জন্ত আমরা নিম্নে, কয়েকটা স্থান ইহাতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। *

“গোনলো হাসিনী গমনে মোহিনী,
রূপেতে সুন্দর বট।
কার দূতী হইয়া, ফির পট লইয়া,
রীতি দেখি অতি নঠ ॥

“কুলনীলধানি, কর টানাটানি,
ই কিল হুর্কার দল ?
সুজন জানিল, নিকটে আগিল,
বুঝিতে নারিল খল ॥

“সে মাইয়া কেমন করিবে এমন,
কি বুঝি হইব রাজী।
পুথুলা ভজিব, জীবন সঁপিব,
দেখিয়া ভোজের বাজী ?

* উদ্ধৃতাংশের বখান্ধানে বিরাম চিহ্ন প্রদত্ত হইল এবং লিপিকারের বর্ণাঙ্কিত সংশোধিত হইল। এতদ্ব্যতীত ভাষা সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। (লেখক)

“পাবে অপমান, ঘাইবে পরাণ,
দূর, দূর, দূতী উঠ।
সখীয়ে আনিবে, রান্নিরে কহিবে,
কাটিয়া ফেলিবে ঠোট

“হংসী বোলে একি, ঠত ভাল দেখি,
কপালের দোষ ঘোরে।
বার ভরে মরি, এতদূর করি,
দূর, দূর কক্ষে মোরে ॥

“করেছিল মন, যশঃ উপার্জন,
যশের কপালে ঝাঁক।
ভুনি লাগে জাশ, ইকি সর্বনাশ,
লাঞ্জে কাটা যাবে নাক ॥

আনিয়া রতন, করিয়া যতন,
নাথিকা, হীরার কণা।
আ-মুগে পাইয়া, দিল ফেলাইয়া,
না চিনি রান্ন কি যোগা ॥”

বিদ্যাসুন্দরের হারে মালিনী, প্রস্তাবিত গ্রাহ্য হংসিনী—উদ্ভয়েই দূতী, উভয়েই চতুয়া, তথ্যগি হীরে মালিনী অধিকতর উজ্জ্বল কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের নায়িকা সুন্দরের হস্তনির্মিত সামান্য কলা-কৌশল দর্শনেই এতদূর বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার আর নায়ক সম্বন্ধে অত্যাশ্রয় দোষ গুণ বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না। আলোচ্য গ্রন্থের নায়িকা তদপেক্ষা পৈশ্যশালিনী এবং গভীর। তিনি চিত্রপটে নলের ভূবন বিমোহন রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়াও গর্হিতভাবে দূতীর মুখের উগর বলিয়া দিয়াছেন—

পুথুগা ভজিব, জীবন সঁপিব,—
দেখিয়া ভোজের বাজী ?

অর্থাৎ তিনি রূপজমোহে ভুলিবার সৈরে নছেন। তৎপর তিনি দ্বীপমুখে
নলের ঐশ্বর্য্য এবং গুণ গরিমার বিষয় অনগত হইয়া পুনরায় পটের প্রতি দৃষ্টি-
পাত করিলেন এবং এবার পট-লিখিত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া প্রকৃত পক্ষেই
মোহিত হইলেন। এই রূপমোহ অস্বাভাবিক নহে। এহলে দময়ন্তীকর্ত্তৃক
পটলিখিত নলের রূপবর্ণনা পাঠকগণকে উপহার দেওয়ার আলোচন ভাষ্য
করিতে পারিলাম না।

“শুনিয়া বচন, মনেতে মগন,
হইল নৃপতি মন্নি।
ছাড়িয়া সরম, জায়া তরম,
কহিছে শুনগো হুগিনী;—

“ই কিল, ই কিল, বল কি দেখিল,
মনোহর রূপ পটে।
অসম্ভব যেই, শুধাইছি তেই,
সাতা নি এমনি বটে।

“সহজে চমকে, ভুরু কি ঠমকে,
বিধাতা করেছে বৈক্য;
কামের কামান লবে তার মান,
বখন হইবে দেখ।”

“কুরবানী গনে, তুলা কি নয়নে,
চিহ্নি কোন তার আঁধি!
ও ছুটী নয়ন, নাচিছে যেমন,
কমলে ধ্বজন পাখী।

“ই কিল, ই কিল, কেমনে লিখিল,
 হুথানি প্রতির কাছে!
 মনে অনুমানি, মুখচন্দ্রখানি,
 রাহু খাপে বসিরাছে।

মনগত ধন, বীদিতে কারণ,
 ছিত্তজ গঠিছে খাসা ।
 ঠেকিবে বখন, বুঝিবে তখন,
 পুনঃ কি মোচন আশা ?

কৃষ্ণচন্দ্র যুগকে বঙ্গসাহিত্যের সংস্কার যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগে কবিগণ রূপ বর্ণনার দিকে বড় বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। রূপ বর্ণনার যে বহু ক্রতীও দেখাইতে পারিতেন, তাঁহার কাবাই লোকসমাজে তত প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিত। নিম্নে কবির আর একটা রূপ বর্ণনার নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।

“পদ্মনাগে কিবা তুলা কাঁটাশুলা তার ।
 ভূদন-ও গজওঙে কিছু অভিশ্রায় ॥
 অগ্নিতে পুরিয়া তারে কসিয়া কসনে ।
 তথাপি কনক নহে অঙ্গের বরণে ॥
 কমলে মুকুতা গাঁথা বিধির স্বজন ।
 অসম্ভব অমূল্যবে বুঝিছ দশন ॥
 লাজে মরে বিজুলী সে অঙ্গছটা হেরি ।
 নিগরিয়া মেঘেতে লুকার বেরি বেরি ॥
 সিংহ কটি প্রায় কটি যে বলে বলুক ।
 আমি বলি ভয়ে সিংহ লুকারেছে মুখ ॥
 জলজ পঙ্কজ দল জল বিনা রহে ।
 তবে বুঝি যদি তার নাতি দেখি কহে ॥
 নিতম্বেতে কি বন্ধিব বিধি মনোগত ।
 স্বজিয়া গোপন কৈল গোপার পর্বত ॥
 রস্তা নব তরু জিনি উরু করে দস্ত ।
 কে দিল রতির ঘরে কনকের স্তম্ভ ॥
 নথ মপি কি বোলে তিমির করে আলা ।
 অমূল্যপ ভাবি চাঁদ হিয়া কৈল কালা ॥
 গতি অতি মনোহর দুলাইয়া অঙ্গ ।
 প্রাশংসে হংসিনী তার তুলিয়া প্রসঙ্গ ॥
 স্বজিছে স্বজনকর্তা রূপ মনোহর ।
 দেখিলে চিনিতে নায়ে দেব কিবা নর ॥

বোগগুরু মহাঈদব বসি বোগাগমেনে ।
 সান্ধিতে সোপের ধান অরি ঠৈল মনে ॥
 সুররাজ আদি কত সুরাসুর স্মরি ।
 মোহিনী কাঠার মন না করিছে চুরী ॥
 ভূগলে ভুলেছে কত তুণতি কৌশরে ।
 কত থানে কত জন বসি তপ করে ॥
 আছুক মানন দেন পক্ষী কোথা যায় ।
 শরীর মোরতে অলি উড়ি পরে গায় ॥

বাহ্য ভরে আর উদ্ধৃত করিলাম না । গ্রন্থের সর্বত্রই এইরূপ স্থলশিত্ত
 পদকদম্বে পরিপূর্ণ ।

প্রাচীন বঙ্গ কবিগণের কাব্যগ্রন্থ পর্যালোচনা করিলে, সর্বত্রই পরিলক্ষিত
 হয় যে, ছন্দ বিস্ময়ে তাঁহারা অত্যন্ত উদ্যোগী ছিলেন । কৃত্তিবাস কাশীদাস
 হইতে আরম্ভ করিয়া, ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী ছোট বড় সমস্ত কবির কাব্যগ্রন্থই
 ছন্দপতন দোষে অত্যধিক দুষ্ট । ভারতচন্দ্র সর্বপ্রথমে বঙ্গ কবিতার এই দীনতা
 মোচন করিয়া, পরবর্তীগণের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন । অক্ষরের
 সাক্ষাৎ এবং যতি-ঠিক রাখিয়া, শেষ অক্ষরের মিল রাখিলেই সে কবিতা শ্রুতি-
 মধুর হইবে, এমত নহে ; এতদ্ব্যতীত কবিতার সাধুর্থাৎ রসের আর একটি নিয়ম
 আছে ;—কোন শ্লোকের প্রথম চরণের শেষাক্ষরের পূর্ববর্তী অক্ষর যে স্বরযুক্ত,
 পরবর্তী চরণের শেষাক্ষরের পূর্ববর্তী অক্ষর সেই স্বরযুক্ত হইলে কবিতা অপেক্ষা-
 কৃত্ত শ্রুতিমধুর হয় । ভারতচন্দ্র কবিতার এই কল কোশল অবগত ছিলেন ।
 তাঁহার কবিতার সাধুর্থাৎ ইহাও অস্বতম কারণ । প্রস্তাবিত গ্রন্থে এ নিয়মের
 লক্ষ্যন কচিং দৃষ্টিগোচর হয় ।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ।

প্রবাসে ।

আজ্জকে আমার কুলের বনে,

মেঘের ধারায় বিষাদ আনে,

নিবিয়ে দেছে গন্ধভরা জোনাকজালা রাতি,

গগনভরা অন্ধ আঁধার

শব্দবিহীন নিজন পাপার

জুটছে এসে মলিনবেশে, বক্ষে আসন পাতি;

উপল-গড়া নিঝর তটে,

অশ্রুপ্রাণি ফেনিয়ে উঠে,

হাওয়ার সনে স্রুপের স্রুর উড়িয়ে গেছে নেশা,

বিরস বদন গজল আঁধি,

রক্ত-চেলির আঁচল রাখি

নীরব হুখে, ঢাকছে বুক মলিনমুখী আশা ।

নদীর তীরে তমাল শাখে,

ধারা-শীতল পাতার ফাঁকে

নিবিড় হ'য়ে উঠছে ফুটে গভীর তমস্বিনী,

স্রুপের ছবি লুপ্ত করি,

হুঃখ যেমন মূর্তি ধরি,

দাঁড়িয়ে আছে, মরমকূলে মুক্ত করি বেগী ।

আজ্জকে কেবল মনে পড়ে,

কোন্ স্রুপের স্বপ্ন-নৌড়ে

হুঃখ কেমন বিধছে কাঁধের হিয়ার পাতে পাতে,

স্রুপের কুঞ্জ নীরব দেখি

কাঁদছে কক্ষণ নিশার পাখী

প্রতিধ্বনি, বনের মাঝে কাঁদছে তার গাথে !

তিলক রচি' কপোল'পরে

কে বরিছে একলা ঘরে,

ছবির শূন্য সিংহাসনে আশার গরতিমা ।

শ্রামল অঙ্গে কাঁচল টানি,
 ঢাক্ছে বৃকের মরুভূমি,
 দেখলে কেউ নাই বুঝিবা অমঙ্গলের সীমা ।
 কোথায় পিতার অভয় বাহু,
 বকুল-শাখে পিকের কুহু,
 তৃপ্তিবিহীন তৃষ্ণাভরা, প্রিয়ার হাসিরানি,
 গারুল চাঁপা স্বর্ণলতা,
 হাজি-উজল ভগ্নি-ভ্রাতা,
 কোথায় তা'দের সোহাগভরা কোমল মেহ কীসি !
 আস্ছে না আর পিছু পিছু,
 আমার প্রাণের স্বপন-শব্দ,
 কোথায় গো মা, মাজননী মেহের মন্দাকিনী,
 কোথায় সুখা, কোথায় মেহ,
 কোন্ সোপালি দেশে গেহ,
 ধূলার যাকে কোথায় ঢাকা, আমার স্বপ্ন-খনি !
 দিগন্তেরি ললাট পরে,
 ঘনের শ্রামল আঁচল ধরে
 চন্দ্র প্রথম পরায় যথায় জ্যোৎস্না আবরণ,
 সেখায় সেই স্বপ্নপুরে,
 মেহ আমার বন্দী করে
 হেখায় শুধু স্বপ্ন দেখায় নিখিল নিরঞ্জন ;
 শ্রীহরেশচন্দ্র সিংহ,
 সুগন্ধ ।

আব্রতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ।

ষষ্ঠ বর্ষ । { ময়মনসিংহ, আশ্বিন, ১৩১৩ । { নবম সংখ্যা ।

এসিয়ার আগরণ ।

উন্নত গগন প'রে, ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ক'রে,
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিয়া,
মানবে দেখায়ে পথ, চলেছে তড়িতসং,
অভ্যুত্তরা ভবিষ্যৎ, ভূমণ্ডল ভাঙিয়া ।

হেমটল ।

রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান অপরূপ এবং উজ্জ্বল জয়শ্রী লাভ করাতে পাশ্চাত্য জাতি সকলের অনতিক্রম্য শ্রেষ্ঠতা সন্দেহে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, এবং প্রাচ্যদেশ সমূহে নব উদ্বোধনার সঞ্চার হইয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া এসিয়া অগতির নিম্নায় অভিভূত ছিল; এবার জাগ্রত হইয়াছে। চারিদিকে, এই আগরণের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে; সর্বত্র ঢাকলা দেখা দিয়াছে দেশপতির বধেছে শাসনশক্তির বিরুদ্ধে সূত্রত রব উখিত হইয়াছে, এবং প্রজাপুঞ্জের স্বভাবজাত অধিকার ও স্বত্ব অক্ষুর রাখিবার জন্য প্রবল আকাজক স্পষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সর্বত্র জাতীয় স্বাধীনাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এবং প্রাচ্যজাতি সকলের শক্তি সামর্থ্যে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ইহার ফলে এসিয়ার দেশ সমূহে আনুসঙ্গিক শাসনপ্রণালী প্রবর্তন করিবার জন্য অকুণ্ঠ আগ্রহ জন্মিয়াছে। বর্ত্তমান এসিয়া স্বাধীন দেশ এখন আর রক্ষণশীলতার প্রতিমূর্তি স্বরূপ নহে।

দৃষ্টান্ত হলে আমরা চীন, পার্শ্ব, আফগানিস্তান এবং ভারতবর্ষের নাম উল্লেখ করিতে পারি। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর হইতে চীনারা নুতনভাবে চক্কর হইয়া উঠিয়াছে; সুবিবীর অন্ততম প্রধান রাষ্ট্রশক্তিরূপে পরিগণিত হইবার

• Indian Review নামক এসিয়ার মাসিক পত্রের প্রকৃতি এবং অবলম্বনে লিখিত ।

নিমিত্ত তাহাদের প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে । চীনজাতি বহু শতাব্দীর জড়তা এবং রক্ষণশীলতা পরিত্যাগপূর্বক সাম্প্রতিক অগ্রগতি সিংহের ভায়, আগিয়া উঠিয়াছে । চীনজাতির দৃষ্টির সমক্ষে জাতিগত পাশ্চাত্য-শিক্ষা, পাশ্চাত্যশিল্প, পাশ্চাত্যশাসনপ্রণালী এবং পাশ্চাত্য স্থূলত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়া অতুল রাজশক্তির অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে । এই কারণ সহস্র সহস্র চীন-সন্তান জাপানের শিক্ষামন্দির এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জনে নিরত রহিয়াছে ।

আট বৎসর পূর্বে চীনরাজ মাজ হুইজন চাক্রকে জাপানে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন । পাঁচ বৎসর পূর্বে জাপানে বিদ্যার্থী চীন-সন্তানের সংখ্যা ৫০ ছিল । ১৯০১ সনের শেষভাগে এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ২৪০৬ এ দাঁড়ায় । ১৯০৫ সনের নবেম্বর মাসে চীনরাজ গণনা করিয়া দেখেন যে, ৮৬২০ জন চীনসন্তান জাপানে জ্ঞানার্জন করিতেছেন । বর্তমান সময়ে জাপানে বিদ্যার্থী চীন-সন্তানের সংখ্যা নুনাধিক দশ হাজার । গত বৎসর চীনরাজ বহুসংখ্যক চীন-সন্তানকে জাপানে বিদ্যাশিক্ষার জন্ত প্রেরণ করিয়া এগিয়ায় এক মহা বিপ্লবের সূচনা করিয়াছেন । শত শত চীনযুবক শিক্ষা সমাপন অন্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক স্বদেশীয়দিগকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্পর্কে বিপুল ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন । ফলতঃ চীন-দেশে প্রজার হিতকর উদার শাসনপ্রণালীর প্রতিষ্ঠার জন্ত এক্ষণে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে । কতিপয় সুশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ইউরোপের নানা দেশের শাসনপ্রণালী পর্যালোক্য করিবার উদ্দেশ্যে ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া ঐ সকল দেশের শাসনপ্রণালী অবলম্বনে চীনের উপযোগী প্রজার হিতকর উদার শাসনপ্রণালীর উদ্ভাবন করিবেন । সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, চীনের বুদ্ধা মহারাণী, শাসন ও রাজস্ব বিষয়ে কোন কোন সংস্কার সাধন জন্ত অনুমতি প্রদান করিয়াছেন এবং জাপানের আদর্শে তত্তত শাসনপ্রণালী গঠিত হইবে ।

একদিকে চীনদেশ উদার শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্ত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে ; অপরদিকে পারস্যদেশের সমগ্র সমাজ,—বিভিন্ন সম্প্রদায় সকল জাপান স্থূলত নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে, এমন কি, চির রক্ষণশীল পুরোহিতগণও নূতনতাবের সংস্পর্শে নূতন জীবনের আকাঙ্ক্ষা হইয়া পড়িতেছেন । জাপানের হস্তে স্বর্ষের পরাভবের পর একজন পারসীক ধর্মবাক্য বলেন,

“জাপান ইউরোপীয় বিজ্ঞান বলে স্বত্বকে বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে, যদি এই সত্য উপলব্ধি করিতে না পারি, তবে আমরা অন্ধ। বিজ্ঞান বলে,— একমাত্র বিজ্ঞান বলে আমরা স্বদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয়তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব। এস, আমরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।”

এ কারণ পারস্তও জাপানের জায় কর্ম্মঠ ও শক্তি সম্পন্ন হইবার অভিপ্রায়ে চীনের মত পাশ্চাত্য পন্থার অনুসরণ করিতে সংকল্প করিয়াছে। পারস্তের ধর্মশিক্ষার্থী মুগ্ধমানগণ ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে রসায়নশাস্ত্র, পদার্থ-বিদ্যা, ইতিহাস এবং বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল। পারস্য ভাষায় জাপানের একখানি ইতিহাস রচিত হইয়াছে; এই গ্রন্থ পারস্তের সর্বত্র সাদরে পঠিত হইতেছে। এই সকল পরিবর্তনের ফলে সমগ্র পারস্তদেশ আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কারার্থী দেশহিতৈষী দলের শক্তি পারস্তের অধিপতির হৃদয়ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সংস্কারার্থী দলের সম্ভাব্য বিধান জন্য পারস্তের রক্ষণশীল উজীর পদচ্যুত হইয়াছেন। কতিপয় গণ্যহীন অতিবাহিত হইল পারস্তের শাহ জাতীয় পরিষদের গঠন জন্য অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। রাজধানী তিহারণে এই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং কয়েক রাজপুত্রের প্রতিনিধি, পুরোহিত, ওমরাহ, মহাজন ও ব্যাবসায়ী প্রভৃতি নানাত্রেণীর লোক সদস্য পদে নির্বাচিত হইবেন। পরিষদের সদস্যগণ গুরুতর রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত প্রদান করিতেন। তৎকালে স্বদেশের হিতকল্পে কোন সংস্কার প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে, তৎসম্বন্ধে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে পারিতেন। প্রধান মন্ত্রীর বোণে পরিষদের অভিমত পারস্তাধিপতির নিকট তাঁহার স্বাক্ষরের জন্য প্রেরিত হইবে এবং তিনি স্বাক্ষর করিলেই ঐ অভিমতানুসারে রাজপুরুষগণ কাজ করিবেন। পারস্তের জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচন জন্য রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। পরিষদের জন্য ১৫৬ জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে রাজধানী তিহারণ হইতে ৬০ জন এবং অন্যান্য স্থান হইতে অবশিষ্ট ৯৬ জন নিযুক্ত হইবেন। জাতীয় পরিষদের অভিমত অনতিক্রম্য হইবে বলিয়া শাহ ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। দুই বৎসর পর পর সদস্যের নির্বাচন হইবে *।

নব যুগের প্রভাবে পারস্তদেশের ব্যবস্থাচারী অধিপতিও ক্রিান্তে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিলাম। আকপাৎ

পরিষদের নির্বাচন শেষ হইয়াছে এবং বিপুল আর্থবলে কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

হানের অধিগতিও এই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। আমীর প্রকৃতিপুঞ্জের উন্নতি সাধন জন্য বিপুল আয়াস সহকারে কষ্টক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইরাছেন। আফগানিস্থানে বহুশিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য যথোচিত ব্যয় হইতেছে ; হাজার প্রভৃতি নানা নগরে বহুশিল্পালয় স্থাপিত হইরাছে, এই সকল শিল্পালয়ে অতি উৎকৃষ্ট রেশম ও কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। আমীর সময় সময় পারিতোষিক প্রদান করিয়া শিল্পী ও শ্রমজীবীদের উৎসাহ এবং জনসাধারণের আগ্রহ বর্ধন করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি স্বরাজ্যে শিক্ষার বিমল আলোক বিস্তার জন্য বহুপরিকর হইরাছেন। আমীর একটী বক্তৃতা শ্রবণে বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া আমি তোমাদিগকে জ্ঞানার্জন করিবার জন্য প্রবুদ্ধ করিতেছি, কারণ এই পৃথিবীতে যিনি জ্ঞানী, কেবল তিনিই শ্রেষ্ঠ।” তাহার ইসলামীর কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার আবদুল গণি, আফগানিদের রীতিনীতি এবং উন্নতি সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে আফগানজাতির ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। তিনি বলিয়াছেন, কালক্রমে আফগানিস্থান আপানের দ্বার পরাক্রমশালী হইয়া উঠিবে। আফগানজাতি শিক্ষার প্রভাব অনুসারে আপনাদের রীতিনীতি গঠন করিতে অভ্যস্ত ; তাহার সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রভাব অতিক্রম করিতে অসমর্থ নহে ; অন্যান্য জাতির বিধান সকলের অনুসরণ করিয়া আপনাদের দেশের ও সমাজের উপযোগী বিধান প্রবর্তন করিবার ক্ষমতাও তাহাদের আছে। বিশেষতঃ আফগানজাতি অতি উদ্যমশীল, আফগান ব্যবসায়ী ভারতের সর্বত্র এবং অষ্ট্রেলিয়া, চীন, এমন কি, আমেরিকার দ্বার দূরবর্তী দেশেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। আফগানিস্থানে জাতীয় বোধশক্তি আগ্রত হইরাছে। আমীর প্রকৃতিপুঞ্জের নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন ভাবের প্রারম্ভিক। তিনি নূতন আকাঙ্ক্ষা—নূতনভাবের পরিতৃপ্তি সাধন জন্য সরদার নশিরুজা খাঁর সহকারিতায় মন্ত্রণা সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ডাক্তার আবদুল গণির মতে এই মন্ত্রণা সভার কার্য অতি সুশৃঙ্খলভাবে নির্বাহিত হইতেছে। আফগানরাজ্যের নানা বিভাগের পরিচালন জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার তার এই সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সভার সভ্য সংখ্যা ৪২। সরদার নশিরুজা খাঁ এই সভার সভাপতি। সভ্যগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আপন আপন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে সভার সকল বিষয় মৌখিক হইয়া থাকে। সভ্যগণ বিশেষ সংসদ ও বোধ্যতা সহকারে আপন আপন অভিপ্রেতি

আগ্রহ করেন। যথাগতি সরদার নশিকরা খাঁও স্বকর্তব্য অতি প্রশংসনীয় ভাবে সম্পাদন করিতেছেন। মন্ত্রণাসভা কর্তৃক প্রণীত নিয়মানলী আমোরেজ অনুমোদন জন্ত প্রেরণ করিতে হয়। তিনি সাধারণতঃ এই সকল নিয়ম অনুমোদন করিয়া থাকেন। যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে তিনি দ্বিগত করেন, তবে, ঐ বিষয় পুনরালোচনার জন্ত মন্ত্রণাসভার সদস্তগণ সমবেত হন। অনেক স্থলে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, এই পুনরালোচনার পর আমীর স্বমত পরিত্যাগ পূর্বক মন্ত্রণা সভার মতানুসারে কার্য্য করিয়াছেন।

নূতন যুগ-মাহাত্ম্যে চির রক্ষণশীল চীন, পারস্ত ও আফগানিস্থানের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিলাম। এই সকল দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তৃত হয় নাই এবং জনপুঞ্জ, মিল, বার্ক এবং ড্রাইটের প্রভাবও লাভ করে নাই, তথাপি নূতন যুগের মাহাত্ম্যে জনপুঞ্জের হৃদয়ে নূতন আকাজকা, নূতন ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষে নূতন আকাজকা, নূতনভাবের উদ্ভব কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার বহুগ বিস্তার হইয়াছে, এবং তৎকাল বিদ্যা-বুদ্ধিতে ইংরেজের সমকক্ষ বহুসংখ্যক ভারতবাসী আবির্ভূত হইয়াছেন। এই সকল ভারতবাসী স্বদেশের শাসনয়ন্ত্র পরিচালনে নিযুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা হইয়া উঠিয়াছেন।

বস্তুতঃ ভারতবাসীর দাবী একটুও বিস্ময়কর নহে। বহু বৎসর পূর্বে যখন ভারতবর্ষে প্রথম ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়, তৎকালে ইংরেজী শিক্ষার অন্ততম প্রবর্তক খ্যাতনামা লর্ড মেকলে ঘোষণা করেন, “ইংরেজী শিক্ষার ফলে ইংরেজ রাজত্বের অন্ততম উদ্দেশ্য সফল হইবে,—সেই উদ্দেশ্য ভারতবাসীকে সামরিকশাসনের উপযুক্ত করা। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ভারতে নূতন আকাজকা,—নূতনভাব জাগ্রত হইয়া উঠিবে; ইংরেজ-রাজত্বের শাসননীতি এই নূতন আকাজকা,—নূতনভাবের বিরোধী হইবে না।”

কলতঃ বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে গভীর চাক্ষুশ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আগানের জরলাভ জন্ত নহে। বিংশতি বৎসর পূর্বে বোম্বাই নগরীতে জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনে সর্বপ্রথম নবভারতের অক্ষুটক্সনি সম্প্রদায় প্রতীকিত হয়। আরপর জাতীয় মহাসমিতির স্মৃতিত আন্দোলন-কল্পণ-দীর্ঘকালের হইয়া উঠিতেছে। একদা আগানের জরলাভে নবভারতের

শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ; নগরভরত অধিকতর আশাষিত, অধিকতর সাহসী, অধিকতর কণ্ঠশীল, অধিকতর উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে ।

চীন, পারস্য ও আফগানিস্থানের যথেষ্টাচারী রাজভ্রমণ সময়ের গতি উপলব্ধি করিয়া বিশেষ বিজ্ঞতা ও সাহস সহকারে নূতন আকাঙ্ক্ষা,—নূতন ভাবের পরিভূতির ক্ষমতা অভিনব ব্যবস্থা সকল প্রবর্তন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন । এই তিনজন প্রাচ্য নরপতি প্রজার হিতকর্মে যথেষ্টাচার পরিভ্রমণ পূর্বক আপনাদের বংশাভ্যুগত স্বত্ব ও অধিকার সন্মুচিত করিয়া তুলিয়াছেন । ইংরেজরাজের সমক্ষে অতি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত ; ভারতের শাসননীতি এই পরিবর্তনের যুগে কোন্‌পথে চালিত হইবে, তাহা এখনও অদৃষ্টের গর্ভে ।

শ্রীস্বদেশী—

নাটক, উপন্যাস ও ইতিহাস ।

প্রবন্ধের শীর্ষক দেখিয়া অনেকে হয়-ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন । অনেকস্থলে উপন্যাস, ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও উপন্যাস ইতিহাসের একটি প্রধান সহায় । ইহা বিবৃত করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ।

মূলতঃ উপন্যাসকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । প্রথমতঃ, যে সকল উপন্যাস জাতীয় জীবনে নবযুগের অবতারণা করে ; অর্থাৎ সাধারণ এমনই প্রভাব দে উহা পাঠ করিয়া জনসাধারণের চিন্তার স্রোত পরিবর্তিত হয় । ইংরাজীতে তহাকে Epoch-making বা যুগপ্রবর্তক গ্রন্থ বলে । ফরাসী উপন্যাসিক ভিক্টর হিউগোর “লে মিসেরাবল্” ইহার অঙ্গুল দৃষ্টান্ত । দরিদ্র-জীবনের ঘোরতর অবনতি, অসমাদ ও কলঙ্ককাহিনী জগতে আর এমন নাই । দরিদ্রদিগের সম্বন্ধে বহুকাল উদাসীন ফরাসীজাতি ইহারই প্রভাবে অবশেষে নানারূপ মনুষ্যোচিত বিধি প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল । সাহিত্য-জগতে এরূপ অনেক যুগ-প্রবর্তক গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে । কিন্তু তাহা সমগ্র সমাজের উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করে না বলিয়া উহা আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত ।

দ্বিতীয়তঃ, আর এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে, তাহাতে সমাজের চিত্র এমন অসমরভাবে প্রতিবিম্বিত হয় যে তাহা হইতে ঐতিহাসিক ভাষার মনোমত উপাধান সংগ্রহ করিতে পারেন । ইংরাজী সাহিত্যে ডিকো, ফারাসিন্ সাহিত্যে

রাবেলা, ইতালীর সাহিত্যে বোকাচিও, বঙ্গীয় সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

সমাজের শিক্ষা, রীতিনীতি প্রভৃতি নাটক, উপজাতিগে যেমন স্থান পায় এমন আর কুজাপি নহে। সংস্কৃতে সুচ্ছকটিক নাটক না কাদম্বরী উপজাতিগের কথা ধরুন। উপজাতি বলিতে আজকাল আমরা বাহা বুঝি, সংস্কৃত-সাহিত্যে কাদম্বরীই তাহার একমাত্র উদাহরণ। উহাতে স্বর্ষ্যর তপোবন, রাজপ্রাসাদের আটার পদ্ধতি, কুমারগণের শিক্ষাপ্রণালী, অংশেবে প্রেমের বিশ্ববিজয়ী প্রাভাব উপজাতিগের তুলিকার দিব্য পরিষ্কৃত হইয়াছে। তবে বলিবার রকমটা একটু অদ্ভুত। তা, প্রাচীন সাহিত্যিক মাত্রেই একটু অলঙ্কারপ্রিয়। পুরাকালে জীবন-সময় এমন কঠোর ছিল না। লোকের সময়ের অভাব হয় নাই। তাই “দীর্ঘ-দীর্ঘ-সমাস-সমষ্টি-বাক্যাবলী-সমলংকৃত”-কাব্যশাস্ত্র করিতে লোকের বিরক্তি জন্মিত না। আর তখন সাহিত্য ভিন্ন সাধারণ লোকের মন আকৃষ্ট করিবার মত বিষয়ও বড় ছিল না। আজকাল যেমন বিজ্ঞান শতশাহ প্রসারিত করিয়া লোকের চিন্তাশীলতার প্রায় সমস্ত দিকটাই আকর্ষণ করিতেছে, তখন তেমন ছিল না। তখন “কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।” উল্লিখিত প্রথম শ্রেণীর নাটক উপজাতি পৃথিবীতে অতি বিরল। বঙ্গসাহিত্যে এখনও সেরূপ হয় নাই। কখনও হইবে কি না তাহা কে বলিতে পারে?

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপজাতিগের বিশেষত্ব এই যে উহাতে একটা জাতির ভাৎকালিক ভাবগুলি চির-নিবন্ধ হইয়া থাকে। জাতির জীবনে এমন এক এক সময় আসিয়া পরে যখন কতকগুলি ভাব যেন শূন্য আকাশে নিচরণ করিতে থাকে। তাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শিশুর মনের আকাঙ্ক্ষার মত কখনও বা মনেই নিলীন হয়, কখনও বা ছুই একটা অক্ষুট কথার বিক্ষমাজ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে ভগবানের প্রেরিতের জাতি সাহিত্যজগতে নাটক-উপজাতি-কর্মীর আবির্ভাব হয়। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ইংরেজী শিক্ষার প্রথমযুগে এতদেশে সকলের হৃদয়েই জাগরুক হইয়াছিল। কেননা স্বাধীন শিক্ষার প্রভাবে সকলেই দেশের কল্যাণের দিকে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত পুষ্টিলাভ করিতে না পারিয়া কালে উহা “ভারত-উদ্ধার” নামে বঙ্গবাসীর উপহাসভাজন হইয়াছিল।

বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠের গান ও ভাবগুলি জাতির জীবনের এক নূতন আধার। বঙ্গ নদীর মত জাতির জীবনের যে মানসিক স্রোত অলঙ্কৃত

প্রদাহিত হইতেছিল উহা তাহারই অভিনয়িক্তি মাত্র। বহুকাল পর আজ মনোমোহন বহুর নাটকের গান বাজানী-দ্বন্দ্বের তড়িৎ প্রদাহিত করিতেছে।

অজ্ঞানিকে “বিবরুক”, “কুককাস্তের উইল”, তারক গাঙ্গুলীর “স্বর্ণলতা”, রমেশবাবুর “সংসার”, অমরবাবুর “লহরী”, রবি বাবুর “চোখের বালি” প্রভৃতি উপজ্ঞানের কথা মনে করুন। শতবর্ষের পর বঙ্গ-সমাজের ইতিহাসবেত্তা উহা হইতে আর উৎকৃষ্ট উপাদান কি পাইবেন? তার ওয়ান্টার বেগান্ট বলিয়াছেন যে একমাত্র ডিকোর উপজ্ঞান সকল অবলম্বনে তিনি তাত্‌কালিক সমাজের একটা পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন।

তাহার পর বঙ্কিমের “সীতারাম” ও “রাজসিংহ”, রমেশবাবুর “বঙ্গবিজেতা” হারাণবাবুর “বঙ্গের শেষ বীর”, রবিবাবুর “বধু ঠাকুরাণীর হাট” এইরূপ আরও ছই একখানা ঐতিহাসিক উপজ্ঞান ইতিহাসকে অতি মধুরোজ্জ্বলভাবে আমাদের নয়নের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। ইতিহাসবেত্তারা গিটনের *Last days of Pompeii* অথবা হেনরিক সিন্‌ কিউইচের *Quovadis* পড়িতে উপদেশ দিয়া থাকেন! বস্তুতঃ ইতিহাসের শুষ্ক গন তারিখ উপজ্ঞানিকের বাহু বিদ্যায় জীবন্ততাব ধারণ করে। ঐতিহাসিক গ্রীণ বলিয়াছেন যে তিনি টেনিসনের *Harold* নাটক হইতে গেই সময়ের বেক্রপ অঙ্গদৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ আর কিছুতেই নহে। আজকাল ইয়ুরোপে চিত্তার প্রায় সমস্ত বিষয়ই উপজ্ঞানের আকার ধারণ করিতেছে। দার্শনিক, জ্যোতিষিক, রাজনীতিক প্রভৃতি অনেক কথা উপজ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয়।

তবেই দেখা যাইতেছে, যেমন মধুকর, সকল কুসুম হইতেই মকরন্দ সংগ্রহ করে কিন্তু স্নিগ্ধ-পরিমল কমলই তাহার সমধিক প্রীতিকর, সেইরূপ ঐতিহাসিক, জানা স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিলেও তাহার সামাজিক ইতিহাস গঠনের প্রধান উপাদান, নাটক ও উপজ্ঞান।

ঐকামিনীকুমার সেন।

চন্দ্র।

মাক্রোড হইতেই আমাদের চন্দ্রের সহিত পরিচয়। শৈশবে মারের কোল হইতে কচিকচি হাত তুলিয়া অর্ধফুট সমধুর ভাবার টানকে “আর আর” বলিয়া কত ডাকিয়াছি। গভা হইলেই ব্যাকুল নয়নবৃণল বিশাশ

ভূমীল গগনে চন্ড্রের অন্বেষণ করিয়াছি। চাঁদকে খুঁজিয়া পাইলে সকল কান্দাকাটি, সকল আকার দুঃ হইয়া গিয়াছে। চাঁদের হাসি দেখিলে বাণেশ্বর কোমল অধরে আর হাসি ধরিত না। তখন চাঁদের দ্বিধা-অনির্ভয় জ্যোৎস্নার ভাষা আমাদের হৃদয় কোমল ও পবিত্র ছিল। আকাশে চাঁদ দেখিয়া যখন শিশুরা সুখে, আহ্লাদে অধীর হইয়া উঠে তখন তাহাদের সরল প্রাণের মধুর উচ্ছ্বাস দেখিয়া বিগত শালাজীবনের অশ্রুস্রাবী স্মৃতি আবার আগরিত হয়। হায়! আবার যদি শৈশব ফিরিয়া আসিত!

আহ্লাদ প্রদান করে এই অর্পে 'চন্দ্র' নাম হইয়াছে। বাস্তবিক অধাঃকর্ণনে কাহার না হৃদয়ে আহ্লাদ জন্মে। আকাশে চন্ড্রের মত এমন সুপরিচিত জ্যোতিষ্ক আর একটাও নয়। চাঁদের সম্বন্ধে কত গল্প, কত কাহিনী আজও আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। এই রমণীয় জ্যোতিষ্কের বিষয়ে কত বিচিত্র বিবরণ হিন্দু-কান্য-পুরাণেতিহাসে স্থান পাইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আর চন্ড্রের নামই বা কত। কাল্পনিক কাহিনী পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে সকল অসম্ভব অত্যাশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন আমরা আজ তাহারই বিষয় আলোচনা করিব।

পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে একখানা গোল ঝক্ ঝক্ রূপার খালার ভাষা দেখায়। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে দেখা বাইবে চন্দ্রও পৃথিবীর ভাষা গোলাকার এক প্রকাণ্ড জড় পিণ্ড।

জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা চন্দ্রপৃষ্ঠের বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন; ঐ সকল তথ্য নিশ্চয় এবং অসম্ভবভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার সম্প্রদায় সহিত বলিয়া থাকেন "Astrologers know the surface of the moon better than Geographers know the interior of Africa." আফ্রিকার সম্যভাগ ভৌগোলিকগণের নিকট বহুটা পরিচিত নহে, জ্যোতির্বিদগণের নিকট চন্দ্রপৃষ্ঠ ততোধিক পরিচিত। বাস্তবিক একথা মথার্য্য। গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পর হইতে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা রজনীতে চন্দ্রোদয় হইলে বিনীত নয়নে পৃথিবীপৃষ্ঠরূপে নানা তথ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। এসিয়া, আফ্রিকার জঙ্গল বা মরুময় প্রদেশের যুগান্ত কেহই অবগত নহে, তজ্জন্ত ঐ সকল মহাদেশের মানচিত্রে অনেক স্থান গাদা পড়িয়া আছে। ফটোগ্রাফের সাহায্যে চন্দ্রের যে সকল চিত্রসমূহ প্রতিক্রম আঁকিত হইয়াছে তাহা পৃথিবী-পৃষ্ঠের দেশ, মহাদেশের মানচিত্র অপেক্ষা কোন অংশেই নিকট

নহে। চন্দের মানচিত্রে আগাধের পাঙ্কার মত ক্ষুদ্র স্থানগুলিও বর্ণনামূলক অঙ্কিত হইয়াছে।

চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ বা পারিপার্শ্বিক (Satellite) যে সকল জ্যোতিষ স্বর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহাদিগকে গ্রহ কহে। পৃথিবী স্বর্যের একটি গ্রহ। কিন্তু বাহ্যিক গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে তাহাদিগকে উপগ্রহ বলে। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে সুতরাং চন্দ্র একটি উপগ্রহ। সৌরজগতে বহু-সংখ্যক চন্দ্র বিরাজমান। আমাদের পৃথিবীর একটি মাত্র চন্দ্র; উহার সৌন্দর্য্য ও অপরূপ মাধুরী কাব্য-কলায় প্রতিনিয়ত কীৰ্ত্তিত হইতেছে। অনেক গ্রহেরই একাধিক চন্দ্র উহাদিগের চারিদিকে ঐ সকল অনির্করচরিত্র শোভা প্রকাশ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। নেপচুনের চন্দ্র একটি, বৃহস্পতির চারিটি, ইউরেনাসের চারিটি এবং শনির আটটি চন্দ্র। যখন ঐ সকল গ্রহের চারিদিকে বহু সংখ্যক চন্দ্র ঘুরিতে থাকে তখন না জানি কি অপূর্ণ রমণীয় সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়। আমাদের একটি চন্দের স্থানে যদি আটটি চন্দ্র থাকিত তাহা হইলে আকাশে কি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যই দেখিতে পাইতাম। ভবিষ্যতে সৌরজগতে আরও নূতন চন্দ্র আবিষ্কৃত হওয়ার অসম্ভব নহে। আমরা এই প্রবন্ধে কেবল পৃথিবীর চন্দের কথাই বলিব।

খালি চক্ষে দেখিলে চন্দ্রকে সকল গ্রহ উপগ্রহ এবং নক্ষত্র অপেক্ষা অনেকটা বড় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টান্তঃ আয়তন এবং উজ্জ্বলতার তুলনায় স্বর্যের পরই চন্দের স্থান বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। বাস্তবিক তাহা নয়; চন্দ্র একটি অতি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ মাত্র। চন্দ্রকে এত বড় এবং দীর্ঘ উজ্জ্বল দেখাইবার কারণ চন্দ্র আমাদের অতি নিকটে অবস্থিত। চন্দ্র ছই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল মাত্র দূরে থাকিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। নক্ষত্রগুলির দূরত্বের তুলনায় ছই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৭৯১৮ মাইল এবং চন্দের ব্যাস প্রায় ২১৬০ মাইল অর্থাৎ চন্দের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় $\frac{1}{4}$ মাত্র। পঞ্চাশটি চন্দ্র একত্র করিলে পৃথিবীর আয়তনের সমান হইবে। সুতরাং চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশভাগের একভাগ মাত্র। কিন্তু চন্দের উপাদান অতিশয় লঘু। পৃথিবীর তুলনায় উহার ওজন খুব কম। আশীটি চন্দ্র একত্র করিলে পৃথিবীর ওজনের সমান হইবে। আবার চন্দের ঘনত্ব সর্বত্র সমান নহে। এই ক্ষুদ্র চন্দ্রের কেন্দ্র ও

ভারকেষ্ট ঠিক এক নহে। প্রত্যুত এই চন্দ্র কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৩৩ মাইল। চন্দ্রের ভারকেষ্ট অপেক্ষা প্রকৃত কেন্দ্র পৃথিবীর নিকটবর্তী।

চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে; উহার উপর সূর্যের আলোক পতিত হয় এই জন্যই তেজোময় দেখায়। পৃথিবী যেমন দিবসে সূর্য্যকরোদ্ভাসিত হয়, চন্দ্রও তদ্রূপ সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হইয়া রজনীতে আমাদের কাছে জ্যোৎস্না বিস্তরণ করে। চন্দ্রে লোক থাকিলে তাহারাও রবি-কর-দীপ্ত পৃথিবীকে উজাদের চন্দ্র মনে করিত। আমাদের চাঁদ যেমন বড় ছোট হয় চাঁদের চাঁদও তেমনি বড় ছোট হইয়া থাকে। চন্দ্র যেমন গুরুপক্ষে ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া পূর্ণিমা দিন পূর্ণচন্দ্র হয়; আবার ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া পনর দিন পর একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। তেমনি আমাদের পৃথিবীকেও চন্দ্রলোক হইতে ক্রমে ক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি পাইতে দেখা যাইবে। আমাদের চাঁদের উদয় আছে, অস্ত আছে কিন্তু চন্দ্রে লোক থাকিলে তাহারা তা'দের চাঁদকে সর্বদা এক স্থানে সমভাবে বিরাজিত দেখিতে পাইত। তা'দের চন্দ্রের উদয়াস্ত নাই; উহা কেবল একটু ইতস্ততঃ দোলে এবং ক্রমে ছোট হইয়া অদৃশ্য হয় আবার ক্রমে বড় হইয়া পূর্ণচন্দ্র হয়। অমাবস্তার দিন পৃথিবী সূর্য্য অগোচ্য ১৫ গুণ বড় উজ্জ্বল চন্দ্রের ত্রায় দৃষ্ট হইবে কিন্তু পূর্ণিমার দিবস পৃথিবী চন্দ্র হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে না।

পৃথিবীর আন্থিকগতি দ্বারা যেমন দিন ও রাত্রি হয় তদ্রূপ চন্দ্রের আন্থিক গতিদ্বারা চন্দ্রের দিন-রাত্রি হইয়া থাকে। চন্দ্রের যে ভাগে সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, সেইভাগে দিন ও অন্তর্ভাগে রাত্রি। একবার সূর্য্য উদয় হইলে সেখানে চৌদ্দ পনর দিন পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। আবার চৌদ্দ পনর দিন সূর্য্য অদৃশ্য থাকে। তখন চন্দ্রের রাত্রি। আমাদের চৌদ্দদিনে চন্দ্রের একদিন এবং চৌদ্দ রাত্রিতে এক রাত্রি। সেখানে কাজ করিবার সময় কত! আবার ঘুমাইবারই-বা সময় কত! চন্দ্রের দিন ভয়ানক গরম, রাত্রিতে তেমনি ভয়ানক শীত।

চন্দ্র নিজ সেকেন্ডের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। আমরা চন্দ্রের একদিক মাত্র দেখিতে পাই। কারণ যে সময়ে চন্দ্র একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসে ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই চন্দ্র একবার নিজ সেকেন্ডের উপর আবর্তন করে। চন্দ্রের ভ্রমণ পথ প্রায় বৃত্তাভাস এবং পৃথিবী এই বৃত্তাভাসের কেন্দ্রবিন্দু কেন্দ্রে (focus) অবস্থিত। সুতরাং পৃথিবী

হঠাৎ উহার দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে না। পৃথিবী যেমন একদিনে একবার নিজ মেরুদণ্ডে আবর্তন করে চন্দ্রও সেইরূপ একদিনে নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্তন করে। কিন্তু চন্দ্রের একদিন আমাদের ২৯½ সাত্বে দীর্ঘদিন।

চন্দ্র স্বয়ং জ্যোতিঃ ধীন, সূর্য্যরশ্মিধারা আলোকিত হইয়া উজ্জ্বল দেখায় ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রাচীন আৰ্য্য জ্যোতির্বিদগণ এই তথ্য অবগত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য বহু সমস্র বৎসর পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন “চন্দ্রের কোন তেজ নাই; চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্য্যভিমুখে অবস্থিত করে সেই অংশ সূর্য্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া প্রকাশ পায়। অপর অংশ সূর্য্য্যকিরণে প্রতিফলিত না হওয়ার শ্রানল বর্ণ থাকে। যেসকল রৌদ্রে একটা ঘট রাখিলে তাহার একাংশই প্রকাশিত হয় অপরভাগ তাহার নিজের ছায়ায়ই অপ্রকাশিত থাকে, এ স্থলেও সেইরূপ। যে দিন চন্দ্রের অধ্ভাগ অর্থাৎ যে ভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেইভাগে সূর্য্য্যকিরণ পতিত হয় না, সেইদিন আমরা চন্দ্র দেখিতে পাই না। ইহারই নাম অমাবস্তা। চন্দ্র ও সূর্য্য একরাশিই অর্থাৎ সমস্থত্রপাতে অবস্থিত হইলে একরূপ ঘটয়া থাকে।”

চন্দ্রের জন্ম সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বলেন, অতি প্রাচীনকালে পৃথিবী যখন অত্যন্ত ঘনীভূত বাষ্পাকারে ভীষণবেগে শূন্যগর্বে ঘুরিতেছিল তখন হঠাৎ কতকটা অংশ কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে (centrifugal force) পৃথিবীর দেহছাড়া হইয়া ছুটিয়া পড়ে। পৃথিবীর যে অংশ ছুটিয়া পড়িয়াছিল তাহাই শেষে এগন চিত্তবিমোহন চন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী দেহ হইতে এতটা সামগ্রী চলিয়া যাওয়াতে একটা বিরাট গর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই বিরাট উৎক্ষিপ্ত ভাগ আর মৃত্তিকাদ্বারা পরিপূরণ হয় নাই। সেই নিম্নভাগই আমাদের প্রসাত্ত মহাসাগর। পণ্ডিতদিগের এই মত অভ্রান্ত কি না তাহা আমাদের বলিবার শক্তি নাই।

শুধু চক্ষে টাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে উহার গায় কাল কাল দাগ দেখা যায়। রমণীয় জ্যোৎস্না পুলকিত শশাঙ্কদেহে ক্রকচ্ছ দৃষ্টি করিয়া আদম অধিবাসিগণ উহা কি জানিবার জন্ত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও ঔৎসুক্য অনুভব করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তখন দূরবীক্ষণ বস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং বহুদূরস্থিত চন্দ্রের আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিবার তাঁহাদের কোনই উপায় ছিল না। সেই সময়ে নানা বিচিত্র ধর্ম্মে উদ্ভাবন করিয়া তাঁহারা

লোক-কোভুল নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে ঐ সকল কৃষ্ণচিহ্নের নানা প্রকার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সেই সময়ের কল্পিত বিচিত্র ব্যাখ্যাসমূহ পাঠ করিলে এখন চিত্ত-গম্বরণ করা যায় না। একটা প্রবাদ এই দক্ষরাজের শাপে চন্দ্রের রাজনন্দ্য হয়, তাহার প্রতিকারের জন্য তাহার ক্রোড়ে একটা মৃগ আছে। এই জন্তই চন্দ্রে কৃষ্ণচিহ্ন দেখা যায়। আবার কোন কোন প্রাচীন মতে চন্দ্র, গুরুপত্নী তারার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আশঙ্ক হইয়াছিলেন, সেই পাণে চন্দ্রের দেহে কলঙ্ক হইয়াছে। তাহা ছাড়া আমরা শৈশবে শুনিয়াছি, চন্দ্রের মধ্যে একটা বিশাল বটগাছ আছে, পতি-পুত্র-বিহীন এক বুড়ী তাহার তলায় বসিয়া হতা কাটিতেছে। বটগাছ এবং বুড়ীর ছায়াতেই আমরা চন্দ্রের কলঙ্করূপে দেখিতে পাই। শৈশবে কল্পনার সাহায্যে প্রতিরজনীতে বুড়ীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া লইয়াছি। কিন্তু বিজ্ঞান সকল কনি-কল্পনা এবং অলৌকিক বিচিত্র কাহিনীর মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে। দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পরেই চন্দ্র-কলঙ্কের প্রকৃত কারণ নির্ধারিত হইয়াছে।

আমরা চন্দ্রক্ষে চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ বেরূপ মন্থণ ও উজ্জ্বল দেখি বাস্তবিক উহা তদ্রূপ নহে। ভূমণ্ডলের ত্রায় চন্দ্রপৃষ্ঠও অসমান, কোনস্থান উচ্চ, কোন স্থান নিম্ন। এইজন্য চন্দ্রের ফটো-চিত্র এমন দেখায়। দূরবীক্ষণ সাহায্যে দৃষ্টিপাত করিলে চন্দ্রে অসংখ্য বিশাল উচ্চ পর্বত এবং গভীর গহ্বরাদি দেখা যায়। আমরা চন্দ্রের যে ভাগ দেখিতে পাই সেই ভাগের কথাই বলিতেছি। চন্দ্রের দুই পৃষ্ঠ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। চন্দ্র সর্বদাই একদিক পৃথিবীর দিকে রাখিয়া স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। অপর ভাগ দেখিবার কোন উপায় নাই। চন্দ্রের যে যে অংশ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর উহা উচ্চ পর্বত এবং মধুচন্দ্রের ত্রায় রক্ষু বিশিষ্ট শৈলসমাচ্ছাদিত উচ্চ স্থান।

পাহাড়ে সূর্যালোক প্রতিফলিত হইলেই দীপ্তি বিকীর্ণ হয়। পাহাড়গুলি যখন রবিকরে উদ্ভাসিত হয় তখন উহাদের পার্শ্বে কৃষ্ণছায়া পতিত হয়। চন্দ্রের পাহাড়গুলির যে ছায়া পড়ে তাহা অতিশয় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়। পৃথিবী-পৃষ্ঠে এরূপ নিবিড় কালছায়া পড়িতে পারে না। চন্দ্রে বায়ু নাই, পৃথিবীতে বায়ু আছে। পৃথিবীস্থ বায়ু অনেক পরিমাণ আলোক প্রতিফলিত করিয়া দেয় কিন্তু চন্দ্রলোকে আলোক এরূপ বিক্ষিপ্ত হয় না; তাই তথায় ছায়া অতিশয় কৃষ্ণ হইয়া থাকে। চন্দ্রের যে দিকে সূর্যের আলোক প্রতিফলিত হয়

ভাগের বিপরীতদিকে ছায়া পড়ে। পাহাড়ের ছায়াগুলি অষ্টমী নবমী তিথি পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু তারপর ক্রমে অস্পষ্ট হইতে থাকে। পূর্ণিমার সময় সূর্যালোক চন্দ্রের উপর ঠিক সমুখ হইতে পড়ায় তখন ছায়াগুলি অদৃশ্য হয়, সেটুকু পাহাড়গুলিও তত স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু যখন সূর্য্যাকিরণ ঠিক একপাশ হইতে চন্দ্রের উপর পতিত হয় তখন পাহাড়ের ধারে কক্ষছায়া দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহাতে সূর্য্যকরদীপ্ত পাহাড়গুলি খুব উজ্জ্বল দেখা যায়। দূরবীক্ষণ সাহায্যে ঐ সকল ছায়া বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ছায়ার সাহায্যে চন্দ্রস্থিত পর্ব্বতের উচ্চতা নিরূপিত হইয়াছে। চন্দ্রে অনেক গভীর গহ্বর আছে। ঐ সকল গহ্বরে সূর্য্যাকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না, তাই চির অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে।

চন্দ্রের পাহাড়গুলি কেবল সামান্য নয়। এমন পাহাড়ও চন্দ্রে আছে যাহার উচ্চতা ৪।৫ মাইল অর্থাৎ হিমালয়ের সমান। চন্দ্র আয়তনে পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র সুতরাং চন্দ্রের আয়তনের তুলনায় হিমালয় সাদৃশ উচ্চ আয়ের পর্ব্বত যে অতীব ভীষণ সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। চন্দ্রের পর্ব্বতগুলিকে পণ্ডিতেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ম—বিচ্ছিন্ন পর্ব্বত;—বহু সংখ্যক পর্ব্বত সমতল ক্ষেত্র হইতে উঠে উঠিয়া একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ২য় পর্ব্বত শ্রেণী;—গারো ও হিমালয় পর্ব্বতের ভায় সূদীর্ঘ পর্ব্বত শ্রেণী চন্দ্রের নিম্ন প্রান্তরের চারিদিকে প্রাচীরের ভায় অবস্থিত আছে। ৩য়—চন্দ্রের গুহা সকল। ঐ সকল গুহা মধুচক্রের ভায় চন্দ্রের বার আনা অংশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। চন্দ্রের গহ্বরগুলি অতিশয় বিস্ময়জনক এবং কোতুলোদীপক। এই সকল গুহা বড় নগণ্য নয়। উহাদের কোন কোনটার ব্যাস ৬০।৭০ মাইল। গুহার চতুর্পার্শ্ব উচ্চ এবং ক্রমশঃ হ্রস্ব ও শিথরের নিকট কূপাকৃতি গহ্বর।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন চন্দ্রের পাহাড়গুলি হইতে এককালে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হইত। পর্ব্বতের মুখ বা Crater গুলি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অগ্ন্যুৎপাতকালে যখন ভিতর হইতে বেগে গলিত পাতব নিঃস্রব বহির্গত হয় তখন শিথরের অগ্রভাগ উড়িয়া গিয়া মুখ (Crater) হয়। পূর্বেই বলিয়াছি চন্দ্রে এরূপ অসংখ্য মুখ—গহ্বর রহিয়াছে।

চন্দ্রের মানচিত্রে গুহা সকলকে ঠিক মধুচক্রের ভায় প্রতীয়মান হয়। টাইকো (Tycho) নামক অগ্নিসিদ্ধ গুহাটী অতিশয় জড়ত ও বিস্ময়জনক।

চন্দ্রের চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে উপরিভাগের একটা স্থান হইতে অভূজ্জল আলোক-রেখা বহির্গত হইতেছে, উহাই টাইকো শুভা। এই শুভা প্রায় ৫০। ৬০ মাইল বিস্তৃত এবং প্রাচীরের ভায় সমুদ্রত পর্বতমালা উহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। শুভাটি ঠিক কটাহাকার; ইহার মধ্য হইতে সূর্য্যাকিরণ প্রতিফলিত হয়। 'টাইকো' নিরাট 'রিফ্লেক্টরের' কাজ করিতেছে। 'টাইকোর' চতুঃপার্শ্ব গিরিরাজি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া এক শৃঙ্গের আকার ধারণ করিয়াছে। সেই শৃঙ্গ হইতে টাইকোর অভ্যন্তর প্রায় বিশ সহস্র ফিট গভীর। সেই আকাশস্পর্শী ভীষণ গভীর গিরিশৃঙ্গের উপর দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নে টাইকোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। টাইকোর ভায় আরও অনেকগুলি শুভা হইতে আলোকরশ্মি বহির্গত হইয়া থাকে। আবার এমন শুভাও অসংখ্য আছে বাহার মধ্যে সূর্য্যাকিরণ কখনও প্রবেশ করিতে পারে না। কেহ কেহ অনুমান করেন চন্দ্রের শুভা হইতে যে আলোকময়ী রেখা বহির্গত হইতেছে উহা প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মি নহে; অগ্ন্যুদ্গমনকালে যে শাতবনিঃস্রব বাহির হইয়াছিল উহার স্রোত এখন কঠিন হইয়া রহিয়াছে। চন্দ্রে বায়ু এবং জল না থাকায় ঐ কঠিনীভূত ধাতুস্রোত এখনও সমুজ্জল রহিয়াছে। ঐ সকল ধাতুস্রোতই আলোকরেখার ভায় প্রতীয়মান হয়। আলোকরেখার কোন কোনটা দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই সহস্র মাইল।

চন্দ্রে জল বায়ু না থাকায় চন্দ্রপৃষ্ঠের কোন পরিবর্তন হয় নাই। জল এবং বায়ুই ধ্বংসের মূল কারণ। পৃথিবীর নিত্য কত পরিবর্তন হইতেছে। বিশাল পাহাড়পর্বত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অত্রভেদী গিরিচূড়া ধূল্যবলুপ্তিত হইতেছে। সুশোভন কারুকার্য সম্পন্ন প্রাসাদমালা দিন দিন জীর্ণ হইয়া ইষ্টকরাশিতে পরিণত হইতেছে। জল ও বায়ু নীরবে তিল তিল করিয়া সমস্ত জড় পদার্থকে ক্ষয় করিতেছে। উহাদের নিকট মানুষের সকল চেষ্টা পরাস্ত হইয়াছে। হায়! উহারা কত নৌদিকিরীটিনী নগরী আশানে পরিণত করিয়াছে; কত কীর্ত্তিরামি পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে মুছিয়া লইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই!

চন্দ্রে জল বায়ু না থাকাতে গিরি-গহ্বরাদি অকত রহিয়াছে বটে কিন্তু চন্দ্রের প্রাকৃতিক অবস্থা অতীব ভীষণ হইয়াছে। চন্দ্রলোকের তুলনায় সাধারণ মনুষ্যও তত ভয়ানক নহে। আমাদের ধরনী সূর্য্য-সুফলা-শুশ্রূষা-শ্রামণী! এখানে প্রাকৃতিক ঈশানর্থে কত অগ্নি, অক্ষয়ভাণ্ডার! কত বৈচিত্র্য,

কত মাধুরী ! চক্ষুে বিস্তীর্ণ প্রান্তরময় প্রান্তর ধু ধু করিতেছে, তাহার মধ্যে অসংখ্য বন্ধুর, অগণ্য পক্ষিপক্ষী বিশৃঙ্খলভাবে দণ্ডায়মান । তথায় জন-প্রাণী নাই ; তরু-শুভ্র-লতা জন্মে না । সেই দৃশ্যের কথা বলনা করিলেও হৃদয় আতঙ্কে আড়ষ্ট হয় ! সেখানে বৃষ্টি নাট, কুসুমটিকা নাট, মেঘ নাই । রাত্রিতে ভয়ানক শীত, দিনের বেলায় ভয়ানক রোজ ! যে চক্ষুকে দেখিয়া স্তম্ভিতা বিপাতার সর্বশ্রেষ্ঠ রমণীয় সৃষ্টি বলিয়া মনে করি, যাহার মাধুরীর সহিত অগণ্যের সকল সৌন্দর্য্যের তুলনা করিয়া দেখি, সেই চক্ষুর এই অবস্থা !

তাই বলিতেছি, যাহাকে ভালবাস, যে তোমার চিত্ত বিমোহিত করিয়াছে তাহাকে দূর হইতে পূজা করিও, তাহার কাছে গিয়া দেখিও না । দূর হইতে তাহাকে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া স্মৃণী হইও । কাছে গেলে, দূরবীক্ষণের চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে, তাহার শত দোষ, শত ত্রুটি বাতির হইয়া তোমার হৃদয়কে বিচলিত করিলে, তোমার প্রেমের বন্ধন শিথিল করিয়া দিবে । ভালবাসার জনকে খুটিনাটি করিয়া পরীক্ষা করিও না ।

চক্ষুে লোক আছে কি না একথা জানিবার জন্ত হয়তো কাহারো কোঁতুলল জন্মিতে পারে । চক্ষুে বায়ু নাই, জলও নাই । জলবায়ু ছাড়া পৃথিবীর কোন প্রাণী কি উদ্ভিদ জীবিত থাকিতে পারে না । তারপর চক্ষুে, দিনের বেলায় কাঠকাটা রোজ, আর রাত্রে হাড়ভাঙ্গা শীত । সেই দিনরাত্রিও আবার অসাধারণ দীর্ঘ । আমাদের চৌদ্দদিনে চক্ষুর একদিন আর চৌদ্দ রাত্রিতে একরাত্রি । এরূপ অবস্থার মধ্যে আমাদের স্বভাবসম্পন্ন কোন প্রাণী এবং এই পৃথিবীর উপযুক্ত কোন উদ্ভিদ নিশ্চয়ই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না । সর্বশক্তিমান চক্ষুর নৈসর্গিক অবস্থার অনুরূপ কোন প্রাণী তথায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন কি না তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই । চক্ষুলোকে হাতীর মত বৃহৎ জীব থাকিলেও তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণে দেখা যাইবে না । চক্ষুে লোক থাকিলে তাহাদিগের বড়ই অসুবিধা হইবে । উহার স্মৃষ্টি সঙ্গীত শুনিতে পারিলে না, ঢাক, ঢোল বাজাইলেও সে শব্দ তাহাদের কাণে প্রবেশ করিবে না । পরস্পর কথা বলিতে পারিবে না । হাতের সঙ্কেত করিয়া সকল মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইবে । কারণ চক্ষুে বায়ু নাই । বায়ু না থাকিলে কোন শব্দ শোনা যায় না । আমাদের বিদ্যালয়ের মত কোন বিদ্যালয় থাকিবে না, কেবল মুক-বধির বিদ্যালয় বসিবে । আবার কোন স্নগন্ধ কি দুর্গন্ধ কিছুই তাহারা পাইবে না ।

ঐশ্বরীশ্রীনাথ মজুমদার ।

কবিতা ।

কেনে ভূমি গো' স্থলোচনে জীবন-উষার
 দাঁড়িয়েছ আলোকিয়া হৃদয়-কানন,
 সাজাইছ মরু-হৃদি নব সুবসায়,
 করিতেছ সুতপ্তাণে সুখা বরিষণ ।
 শারদ-কৌমুদী-সিঁথি-সুকেমল হাসি
 রয়েছে ভাগিয়া তব চারু-বিছাপরে,
 দিবানিশি দেখিতেছ তব রূপরাশি
 তথাপি তলো না তৃপ্ত পাশুল অন্তরে ।
 চিনিয়াছি ভূমি কপি-চিত্ত-বিনোদিনী
 সরলা জিহবাবালা কবিতা-সুন্দরী ;
 তু'ষতে এ দক্ষ তিরা ননিগ-তোষিনি
 এসেছ এ শূন্য স্থানে বুকি দয়া করি ।
 আগিয়াছ যদি তপে থাক এ হিম্মার
 আজীবন ভক্তিতরে পূজিব তোমার ।

স্বর্গীর কুসুম ।

(প্রাণাধিক ছোট লাতার মৃত্যুতে)

ছ'দিনের তরে শুধু এসেছিল সে যে ;
 কুটম্ব কুসুম প্রায়, মায়ের মেহের ছায়
 কুটেছিল প্রাণাধিক কুসুমের সাজে ।

না চিনিয়া মোরা তারে বাসিয়াছি ভালো ;
 জানি নাই অমরার কুল সে যে সুধাধার,
 এসেছে ছ'দিন ধরা করিবারে আলো ।

কেন-বা তাহার লাগি ঝরে আঁখিজল
 জানি সে মোদের নয়, নন্দনের কিশলয়
 স্বপ্নের মন্ডলের রেখা নিরঙ্কল ।

সংসারের তাপে ক্লিষ্ট হয়েছিল সে যে ;
 রোগে তাপে পেয়ে ক্লেশ, ভবলীলা করি শেষ
 তাড়াতাড়ি স্বর্গপুরে জুড়াইতে গেছে ।

এসেছে তাহার চোখে শাস্তিগমী ঘুম
 ভাই সে ঘুমাতে গেছে, সুখের ভারতা এ যে
 ধরায় কি ছুট থাকে স্বর্গীর কুন্ডল ?

শ্রীসুকুচিবালা সেন—নোয়াখালী ।

ঢাকাই মলমল ।

স্বর্ণভূমি বঙ্গদেশ একদিন নানাবিধ শিল্পকার্যের জন্য শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল । একদিন বঙ্গের শিল্পকারগণ সৌর শিল্পচাতুর্য্যে সমগ্র এগিরা, ইউরোপ এবং আফ্রিকাসিগণকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । আজ আমরা লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য মাথেকটারের কৃপাভিচারী হইয়া আছি । কিন্তু একদিন আমাদেরই পূর্ববঙ্গের ঢাকাই মলমল ইউরোপের ধনী এবং গণ্যমান্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ আগ্রহের সহিত ব্যবহার করিতেন । বঙ্গদেশের বস্ত্র না হইলে ইউরোপবাসিগণের চলিত না । কেহ কেহ বলেন এসিরিয়া যখন পৃথিবীতে অত্যন্ত উন্নত ছিল, তখনও ঢাকাই মলমল অস্থিতীয় সূক্ষ্মবস্ত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল । আর জর্জ উড মহোদয় বঙ্গদেশের প্রাচীন শিল্প-বিবরণীতেও ঢাকাই মলমল অতুলনীয় বস্ত্র বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন । প্রাচীনকালে আরব এবং মিসরে যে সমস্ত জিনিস রপ্তানী হইত তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গের মলমল অতি প্রসিদ্ধ বস্ত্র বলিয়া মিসরের শিল্প-বিবরণীতে লিখিত আছে । আরবিন মিসরী নামক জনৈক গ্রীক গ্রন্থকার স্ব-রচিত “ছিয়াহান্ত বাহরে রোম” নামক আরব্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “ঢাকাই মলমল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নির্মল বস্ত্র ।” খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে হুইজেন আরবীয় মুসলমান পর্য্যটক ভারতবর্ষ ও চীনের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন । সেই গ্রন্থ একজন ইংরেজ ভাষান্তরিত করিয়াছেন । তাহাতেও ঢাকাই মলমলের সম্বন্ধ ও উন্নতা বিষয়ে অত্যন্ত প্রশংসা বর্ত্তমান রহিয়াছে ।

ঢাকাই মলমল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও ইউরোপে অনেক রথানী হইত। তখন রোসের ফারসারগণও ঢাকাই মলমল অতি মনোরঞ্জনার বস্ত্র বিবেচনার ব্যবহার করিতেন। রোমক সম্রাট এবং সম্রাট ব্যক্তিগণের মহিলাবৃন্দ ঢাকাই মলমলকে অতি আদরের সাধন্যী জানিতেন। এমন কি সম্রাটমহলে ঢাকাই মলমল ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্রের ব্যবহারই ছিল না। প্রসিদ্ধ ভারত আবিষ্কারক 'ভাস্কা ডা গামা' ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তদীয় প্রভু পর্তুগাল-সম্রাট ডন ম্যাথুয়েলকে ভারতীয় বস্ত্রের মধ্যে বঙ্গদেশের অতি সুন্দর ও শুভ মলমল উপহার প্রদান করিয়াছিলেন; তাহাতে সম্রাট ডন ম্যাথুয়েল অত্যন্ত পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

মোগল সম্রাটগণের সময়ে ঢাকাই মলমলের অত্যন্ত সম্মান ছিল। "আইনে আকবরী" গ্রন্থে সম্রাট আকবরের পরিচ্ছদের বিবরণে লিখিত আছে "পূর্ববস্ত্রের মলমলদ্বারা সম্রাটের উষ্ণীয় প্রস্তুত হইত।" জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, ও আওরঙ্গজেবের সময়েও বস্ত্রের মধ্যে ঢাকাই মলমলেরই সম্মান অধিক ছিল। কারণ ঢাকাই মলমল ভিন্ন সম্রাটগণের উষ্ণীয় হইত না। সম্রাজ্ঞী জুরজাহান ঢাকাই মলমলের অত্যন্ত পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনি ঢাকাই মলমল ভিন্ন প্রায়ই অন্য কোন বস্ত্র পরিধান করিতেন না। মোগল সম্রাটগণের দরবারে ঢাকাই মলমলের যে কিরূপ সম্মান ছিল তাহা তৎকালের ইতিহাস-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। তখন প্রত্যেক মন্ত্রী, ফৌজদার, হাকিম, সুবাদার, সেনাপতি, আমির উমরাও এবং সৌখীন ব্যক্তি মাত্রই ঢাকাই মলমল পরিধান করিতেন। অন্যরমহলে-ত ঢাকাই মলমল ভিন্ন চলিতই না।

মোগল সম্রাটগণের সময়ে পুনরায় ইউরোপে ঢাকাই মলমলের সম্মান বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তৎকাল প্রত্যেক "সোসাইটিতে" ঢাকাই মলমল শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্বন্ধে রক্ষিত হইতে লাগিল। নিলামী আমির উমরাওগণ অতি উচ্চ মূল্যে ঢাকাই মলমল ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ঢাকাই মলমলে ইউরোপের তত্ত্বাবগণের মনে বিষম কলঙ্ক উপস্থিত করিয়া গিয়া। তাহারা অনেক বস্ত্র ও চেষ্টা করিয়াও ঢাকাই মলমলের মত বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিল না। কাজেই তাহারা পরশ্রীকণ্ডিত হইয়া, ক্ষুণ্ণতাপ্রশ্নে ঢাকাই মলমলের অস্তিত্ব বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইল। অনেকে মনে করেন যে, কেবল ভারতবর্ষে যে সমস্ত বস্ত্র প্রস্তুত হইত, সম্রাট ঢাকাই মলমলই মলমল ও

সুপ্রসঙ্গের শীর্ষস্থানীয় ছিল ; অত্যাশ্রয় দেশে ঢাকাই মলমল অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বস্ত্র দ্রষ্টব্য ছিল না । কিন্তু উহা তাঁহাদের বিষম ভয় বলিতে হইবে, কারণ সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও ঢাকাই মলমলের মত মন্থণ ও শুভ্র বস্ত্র কোথাও পাওয়া যাইত না । বর্ত্তমান নৈজ্ঞানিক শিল্পবহুল যুগেও ঢাকাই মলমল বা মসলিন শুভ্রতা, মন্থণতা, ও কোমলতার আদিতীয় বস্ত্র ।

ভার চার্লস লক্‌গাস, ইণ্ডিয়া হাউজে নমুনাশ্বরূপ একখান ঢাকাই মলমল আমদানী করিয়াছিলেন ; তাহার মন্থণতা ও শুভ্রতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন । কিন্তু ঢাকার শুভ্রবায়গণের নিকট উহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর মলমল বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল । ১৮ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের হিন্দু মহিলাগণই এই সমস্ত মলমলের উৎকৃষ্ট সূতা কাটিতে পারিতেন । কারণ এই বয়সেই সাধারণতঃ মনুষ্যের দৃষ্টিশক্তি ভাল এবং হস্তপদাদি স্থির এবং কার্যক্ষম থাকে । সুতরাং অতি হৃদয় সূতা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন । তাঁহারা দিনের ১ম ও ৪র্থ প্রহরে অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে মলমলের সূতা কাটিতেন এবং বয়ন করিতেন । কারণ এই দুই সময়েই মৃদু মৃদু বায়ু বহিতে থাকে, সুতরাং সূতা ছিঁড়িয়া যায় না । দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে সূর্য্যের কিরণ সামান্যই ধারণ করে । অল্প সময়ে সূর্য্যের খরতর উত্তাপে সূতা শুষ্ক হইয়া ছিঁড়িয়া যায় ।

ঢাকাই মলমলের অসাধারণ মন্থণতা ও হৃদয়তা বিষয়ে বহু গল্প প্রচলিত আছে । সেই সকল গল্পের একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নহে । যিনি উক্ত মলমলের কয়েকখানি নমুনা দর্শন করিয়াছেন, তিনি জানেন মলমল কত হৃদয় হইত । ডাক্তার টেইলার সাহেবের নিকট ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে একখান মলমল ছিল । তাহার সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেব লিখিয়াছেন যে, “ঐ বস্ত্রখানা ৪০ হাত লম্বা এবং ২১০ সোয়া দুই হাত পরিমার ছিল কিন্তু ওজনে মাত্র ৫ তোলা ।” ডাক্তার সাহেব আরও লিখিয়াছেন যে, “সম্রাট জাহাঙ্গীর যে মলমল পরিধান করিতেন, তাহা ১০ হাত লম্বা, ২১০ সোয়া দুই হাত পরিমার, ওজনে ৫ পাঁচ তোলা, সূতা ৪০০ চারি স্তর সিকা হইত । সম্রাট সমস্ত এড্‌ওয়ার্ডকে ফ্রান্সাধিপতি অক্সফোর্ডের লেজ যে তিনখান মলমল উপহার দিবার জন্য ঢাকার তৈয়ার করাইয়াছিলেন তাহা ২০ বিশ গজ লম্বা, এক গজ পরিমার এবং ওজনে ৩০ সোয়া তিন আউন্স ছিল । ঢাকাই মলমলের এইরূপ অনেক গল্প বর্ত্তমান আছে । মিঃ টিউনির লিখিয়াছেন যে, “এই মলমল এতই মন্থণ ছিল যে, পরিধান করিলে সমস্ত শরীর স্পষ্ট দেখা যাইত । এই মলমল ভিন্নদেশে রপ্তানী করিতে

মোগল-সম্রাটগণের বণিক সম্প্রদায়ের প্রতি নিষেধ ছিল। ঢাকার শাসনকর্তা সমস্ত মলমল বেগমসর্গ ও দিল্লীর সম্রাস্ত মহিলাগণের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিতেন। কারণ গ্রীষ্মকালে এই মলমলট তাঁহাদের প্রাধান পরিধেয় বস্ত্র ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতেই পূর্ববঙ্গের এই পণিক শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়। ইহার অবনতির কারণ আর ভর্তুকি বার্ডউড লিখিয়াছেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বারতানিয়াতে পাঁচ লক্ষ থান ঢাকাই মোটা মলমলের নমুনা প্রস্তুত করা হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডবাসীদের সকলেরই ইচ্ছা ছিল যে ঢাকার মলমলের আর মলমল প্রস্তুত করিতেই হইবে, কিন্তু অনেক বস্ত্র, চেঁচা ও জেদ করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। ইংলণ্ডের সম্রাস্ত, বিলাসী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্বদেশের নিকট মলমল কিছুতেই ক্রয় করেন না দেখিয়া, ইউরোপের বণিকগণ রাজার সাহায্য লইয়া ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের উপর শতকরা ৭৫ টাকা শুল্ক ধাৰ্য্য করাইয়া লন। সুতরাং সেই সময় হইতে ঢাকাই মলমল বিলাতে রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ৩০ খ্রিশ লক্ষ টাকার মলমল বিলাতে গিয়াছিল, কিন্তু ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে অধিক শুল্ক ধাৰ্য্য হওয়ার মাত্র ৮০ সাড়ে আট লক্ষ টাকার মলমল বিলাতে রপ্তানী হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩০ সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মলমল বিলাতে রপ্তানী হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে মলমলের রপ্তানী একবারেই বন্ধ হইয়া যায়।

ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, একসময়ে ঢাকাই মলমল অনেক দূরদেশে রপ্তানী হইত এবং তৎকালীন বড় লোকেরা অতি আদরের সহিত উচ্চমূল্যে ঢাকাই মলমল ক্রয় করিতেন। ইহাতে পূর্ববঙ্গের তত্ত্বায়গণ বিশেষ লাভবান হইতেন। কিন্তু ইংরেজ বণিকগণ নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য এই মলমলের ব্যবসায় ধ্বংস করিয়া নিত্যন্ত সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছেন। ঢাকাই মলমলের ইতিহাসে ইংরেজের নীচতা ও স্বার্থপরতার কথা চিরদিন ঘোষিত হইবে।

ভাই বাঙ্গালি! একদিন ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, আরলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, আরব, মিশর, তুরস্ক, তাতার, প্রাচীন রোম প্রভৃতি দেশের সম্রাট, আমির, উমরাও এবং সম্রাস্ত ব্যক্তিগণ ঈগরিবারে তোমাদের দেশের বস্ত্রসম্বন্ধেই লজ্জা নিবারণ করিতেন। তোমাদের দেশের বস্ত্রকেই অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র মনে করিতেন। তোমাদেরই শিল্প-চাতুর্য্যে সমস্ত বিশ্বাসী বিমোহিত ছিলেন। আর আজ তোমরা স্বীয় লজ্জা নিবারণ জন্য ইংলণ্ডের কৃপাভিখারী। থিক্‌ ভোঁদাঙ্গিকে!

সৈয়দ হুসেন।

আসিবে সুদিন ।

পৰ্কত হইতে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী
যখন 'নহিরা' যায়,
এদিকে ওদিকে ফিরে তার গতি
মাগাছু উপল যায় ;
কিন্তু একে একে যবে তার সাথে
বহু স্রোত মিলে আসি
গন্ত ঐরাবত পড়িলে তাহার
তৃণবৎ যায় ভাসি ।
ক্ষুদ্র মোরা অতি হীন, অসহায়,
নাহিক সংশয় তবু
যদি ত্রিশকোটি হৃদয়ের বল
সম্মিলিত হয় কভু,
ছুৎকারে মোদের যাইবে উড়িয়া
দুরন্ত অরাতি চয় ;
সে দিন আবার আসিবে সুদিন
হবে নব অভ্যুদয় ।
আপন শক্তিতে করিও বিশ্বাস
হয়ো না নিরাশ ভাই
আসিবে সুদিন আসিবে নিশ্চয়
অধিক বিলম্ব নাই ।

ভঙ্গ তপস্যা ।

মনে-পড়ে বুঝি তারে দেখেছি কোথায়	সেই কক্ক আখি-তারা
মরতের সীমা তীরে কিছা অসরায় ;	অপার্থিব মেহেতরা
মৃচ্ছান্তি স্রোচ্ছনার	অধানয় হিয়াখানি করুণা আলয়
তরঙ্গিত মেঘছায়	জিহ্বিবের অধারানি
আখ উজলিত সেই কায় মোহনয়	একাগ্নানে লাহে নিশি

শান্তির পবিত্র উৎস নতে আগময়,	অকস্মাৎ ভাঙিল স্বপন
বিস্ময় ভকতি ভরে	বুঝি কল্প ভ্রমাস্তরে
শত প্রাণপাত করে	পাণের সিপাহী তরে
জ্বালামুহুরে গগন-কমল চরণ,	আরম্ভিল প্রায়শ্চিত্ত প্রথম সোণান
পাদ্য-অর্ঘ্য সযতনে	মন্ত্রমুগ্ধ তপস্তায়
প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দানে	কে বাদ সাধিল তার
সাধনার মন্ত্রে দীক্ষা লইল তখন।	কেড়ে নিয়ে জীবনের শক্তি-প্রাশ্রয়।
অনশনে তপস্তায়	ভূতপূর্ব মোহরাশি
সেইরূপ মনোময়	হৃদয়ে গিশিল আগি
কল্পনার ঠেং দেবী মানস প্রতিমা	উন্মত্ত বায়না প্রাণে জ্বলিল আবার
সংসার বাসনা আশা	নিজাভঙ্গে যেন হায়
আসক্তি আকুল ত্বা	লুপ্ত স্বপ্ন অভিনয়
সুখে গেল জীবনের বিষাদ-কালিদা	জীবন নাটকে হ'ল নিদর্শন তার।
	—প্রতিভাময়ী দেবী।

নব যুগ।

বহু শতাব্দীর পর ভারতবর্ষে এক নবযুগের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুদূর অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন পল্লীগাঁন হটতে সূচাক প্রাসাদমালা-সুশোভিত রাজধানী পর্যন্ত সর্বত্রই এই নবযুগের স্ফূর্তি দেখিতে পাইতেছি। দীনের পর্ণকুটিরে এবং ধনীর সুসজ্জিত অট্টালিকায় সমভাবে এই নবজীবনের নবোচ্ছ্বাস প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যে স্থানে দুইজন লোক একত্র হইতেছে সেই স্থানেই দেশের কথা, “স্বদেশীর” আলোচনা। যেন সমগ্র জাতির হৃদয়ে নবীন আশার তড়িতপ্রবাহ ছুটিয়া সকলকে এক নবভাবে অমুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে। এ জীবন্ততার মৃত-ভারতে কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। এমন জগন্ত আকাজকা লইয়া নির্জীব ভারতবাসী কখনও কৰ্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই। এই মৃতজাতীর হৃদয়ে কে সজীবনী-স্বধা বর্ষণ করিল? কোন্ ভগীরথ স্বদেশ-প্রেমের পুত-জাহ্নবী-স্রোত ভারতবাসীকে আনিল? এমন উৎসাহ, এমন উচ্চ আশা, এমন আত্ম-বিসর্জনের জগন্ত আকাজকা কোন দিন প্রত্যক্ষ করি নাই।

কেত কেহ বলিতেছেন বঙ্গ-বিচ্ছেদই এই জাতীয় জীবনের উন্মেষক। লর্ড কার্জনের শক্তিশেলের অকল্পিত বঙ্গবাস অধীর হইয়া অস্থূল বাঙ্গালীজাতি এবার জাগরিত হইয়াছে; বাঙ্গালীর অদৃষ্ট কাতর চীৎকার-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভারতের বিভিন্নজাতি প্রবুদ্ধ হইয়াছে এবং বহুবর্ষ পরে তাঁহারাও তজ্জালসলোচনে উন্মীলিত করিয়াছে।

বঙ্গ বিচ্ছেদ জাতীয় উদীপনার প্রত্যক্ষ কারণ সন্দেহ নাই কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ অধীর অতীতের গর্ভে সমাহিত রহিয়াছে। পর্বত হইতে বহন করিয়া আসা স্রোতস্বিনী মুহূর্ত্ত মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসে তখন সামান্য উপলব্ধি তাহার গতি পরিবর্তন করিয়া দিতে সক্ষম হয়। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বাণীর ভ্রমনি আমাদের জাতীয় জীবনের গতি পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে মাত্র কিন্তু স্রোতের উৎপত্তি স্থান আরও উপরে, আরও দূরে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান বহু শতাব্দী পরে আবার এই পতিত জাতির প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সভ্যতার আদিস্থান এই পবিত্রভূমি, চির-অশান হইয়া পড়িয়া থাকিলে ইহা বিধাতার উচ্চা নয়।

এ দেশ কেবল মাটি নয়; জল-স্থল, বন-উপবন, পর্বতকান্তারের সমষ্টি নয়। আমাদের জন্মভূমি কি কেবল “শুজলা-সুফলা-শম্ভুখামলা”, কানন-কুন্তলা, সাগর-মেখলা? এ দেশ কি কেবল “কুন্ন-কুসুমিত-ক্রমদল-শোভিনী”, “শুভ্র তুষার-কিরীটিনী”, নদী-সৌমস্বিনী? না, এ সেই দেশ, যেখানে প্রাথম জ্ঞানের জ্বালোক্ষ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল; এ সেই দেশ, যে দেশের প্রতি জনপদের সহিত আমাদের অতীত স্মরণের স্মৃতি, গৌরবের স্মৃতি চির-বিজড়িত রহিয়াছে। এ দেশের প্রতি পরমাণু ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরগণের চরণ-স্পর্শে পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। কত সাধক, কত ভক্ত, কত তাপস এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার স্তরে স্তরে মিশিয়া রহিয়াছেন। তাই এ ভারতভূমি ‘স্বর্গাদপি গরীমসী’। যে দেশে রাম-কৃষ্ণ, বুদ্ধ-চৈতন্য প্রভৃতি ভগবানের অবতারণণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে দেশ চির পতিত থাকিতে পারে না। তাই আবার বহু শতাব্দীর পর ভারতে নবজীবনের উন্মেষ দেখিতেছি। নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, নূতন আশা, সকলের হৃদয়ে ফুটিত হইতেছে।

ভগবৎ প্রেরণা আসিয়াছে, ইহা আমরা স্পষ্টই অনুভব করিতেছি। বিধিতির ইতিহাসেই আজ সমগ্র জাতি মন্ত্রমুগ্ধের আয় নিভীকচিত্তে দণ্ডবর্ত্তমান হইয়াছেন। ভারতবাসীর গতি চির-অশ্রুতিহিত থাকিলে। আবার ভারত

গুপ্তকীৰ্ত্তি উদ্ধার করিতে সন্মত হইবে। বিধাতার ইচ্ছায় এই পতিতজাতি পুনরাঃ সমুন্নত ভবিষ্যৎ বশতঃ অধিরোহণ করিবে—ইহা ঐক্য সত্য। নবযুগের আশ্রয় আমরা দেখিতেছি, কিন্তু এ যুগকে চির প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার আমাদের উপর। সন্ধিহলে আমরা দণ্ডায়মান হইয়াছি; সুদিন আসিয়াছে, উঠাকে চিরস্থায়ী করিতে হইবে। দূরদর্শী বুদ্ধিমান কৃষক বস্ত্রের জল আসিলে দূর হইতে কেবল উহার ভাঙ্গা দেখিয়া নয়ন সার্থক করে না, সে তখন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া সেই জন “আইল” বাধিয়া সংরক্ষণ করে এবং ভবিষ্যতে কার্যে ব্যবহার করে। আমাদেরিগকেও এই স্বদেশপ্রেমের উচ্ছৃঙ্খিত স্রোতকে অনন্তকালের জন্ত হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে হইবে। একবার এই স্রোত গেলে আর ফিরিবে না। জাতীয় জীবনে এমন সুযোগ দৈবাৎ আসে এবং উহার সদ্ব্যবহার করিতে না পারিলে সে সুযোগ চিরদিনের জন্ত অন্তর্হিত হইয়া যায়। আর ফিরিয়া আসে না।

পূর্বেই বলিয়াছি বঙ্গের অঙ্গাঙ্গন আমাদের জাতীয়জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে নাই, জাতীয়জীবনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা তিল তিল করিয়া বহুদশ পূর্বে হইতে হইতেছে। এতদিন উঠা কেহ লক্ষ্য করে নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে সকলের অজ্ঞাতভাবে আমাদের জাতীয়জীবন গঠিত হইয়া আসিতেছে। এখন হঠাৎ উহার বিকাশ এবং পরিণতি প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন। সমাজ এ শক্তি একদিনে লাভ করে নাই, একটী ঘটনায় জাতীয়-জীবনের গতি নির্দ্ধারিত হয় নাই, একজনের আঘাতে সমগ্রজাতির হৃদয় স্পন্দিত হয় নাই। বহু কারণ-সমন্বয়ে এট ফল জন্মিয়াছে। সেই বিচিত্র সূক্ষ্ম কার্য-কারণ-শৃঙ্খল বিচার করিয়া তথা নির্দ্ধারণ করা অতীব দুষ্কর ব্যাপার। কিন্তু তাহা অবিসংবাদিত সত্য যে ইংরেজের ভারতগমনের পর হইতেই এ দেশে জাতীয়তার ক্রম-বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ইংরেজের একচ্ছত্র শাসনাধীন হইয়াই ভারতবাসী আত্মপরিচিন্তে পারিয়াছে। আজ সকল দেশের লোক এক সুখ-দুঃখের ভাগী, ইংরেজশাসনের সুফল ও কুফল সমস্তই সমভাবে বিদ্যমান। ব্যাধি ও প্রতিকার সকলেরই একরূপ। সুতরাং সকলজাতির লোকের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি জন্মিয়াছে। সহানুভূতি প্রেমে পরিণত হইতেছে। বিপদ ঘটই স্বীকৃত হইতেছে, নৈরাশ্রের ভিমির বতই ঘনীভূত হইতেছে, অত্যাচার ও অবিচারের মাত্রা বতই ক্রমশঃ পাইতেছে ততই পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় হইতেছে, পরস্পর পরস্পরকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে রাখিয়া গাইতেছে। একত্রি-
বিন দিন জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

প্রাণেশচন্দ্র ।

(১৪)

একদিন গেল, দু'দিন গেল, আজ ছ'দিন; প্রাণেশচন্দ্র আজিনা হইতে এক পা নাড়াইতে পারিতেছেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে ছাড়িতেছেন না। শীতের দিন—আজ পুলী, কাল পাটিনাটা; তৃতীয় দিন ক্ষীরের সুরুচাকলী; পরদিন খেজুর রসের পায়স; মাছ অপৰ্য্যাপ্ত। ব্রাহ্মণ এক এক দিন এক এক রূপ আহারের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণেশচন্দ্রকে বাঁধিয়া রাখিতেছেন। রাখেন সেই মাসী; প্রাণেশচন্দ্রকে ভাত দেয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই কত্তা উপমা।

ঊঁমারে অবশুষ্ঠনে, অর্দ্ধ-অবশুষ্ঠনে, অর ও বেদনার মধ্যে উপমাকে প্রাণেশচন্দ্রের ভাল করিয়া দেখা হয় নাই; ভাগ্যকুলে নয়; নৌকায় ও নয়। স্বাতা, কৃষ্ণ-পার্শ্বরেখ-শুভ্রবাস পরিহিতা, শুভ্রবসনোপরি বিভ্রন্ত-মুক্তকেশী অবশুষ্ঠন বিরহিতা উপমা যখন প্রাণেশচন্দ্রের সম্মুখে অন্ন-বাজন পরিবেশন করে তখনও দেখা যায়, দেখা যায় না। পদযুগল কত সুন্দর, পদাঙ্গুলী কত সুন্দর, মণিবন্ধ পর্য্যাপ্ত হস্ত কি সুন্দর; অঙ্গুলী চম্পক-কলিকা-তুল্য, বর্ণ কবিত কাঞ্চন-তুল্য। মুখেরদিকে চাহিয়াও চাওয়া যায় না; দেখা হইল, বুঝি-বা দেখা হইল না; চক্ষুর উৎকর্ষ ও অভিশ্রুতি, ভোজনের তৃপ্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিতেছে। আকর্ষণ গিঠার নয়—ঐ পদযুগলের, আকর্ষণ মস্তকের ঝোলের নয়—ঐ মুখ-কমলের। তবু-ও তাহাকে প্রাণেশচন্দ্রের প্রাণভরিয়া দেখা হয় নাই।

সপ্তম দিনের অপরাহ্ন; যমুনা আসিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঁক দেওয়া বড় ঘরের বারেন্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—উপমার অনুসন্ধান করিতেছে।

বাঁক দেওয়া বড় ঘর—ঐ ঘরে শয্যা ঐ ঘরে কোষাগার, ঐ ঘরে তোবাখানা, মাথার উপরে স্তরে স্তরে পাটাতন—এক পাটাতন হইতে অপর পাটাতনে সিঁড়ি বহিয়া উঠিতে হয়। পাটাতনের কোলে কোলে গাৰ দেওয়া ডালা, কুলো, চালুণী ঝুগানো রহিয়াছে। পাটাতনের উপর নিত্য নৈমন্তিক প্রয়োজনের সামগ্রী অনেক।

যমুনা ঘরের ভিতর উঁকি দিয়া দেখিল—উপমা সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া বাইতেছে। যমুনা কোন কথা বলিল না। উপমার চুল গিঠ ছাওয়া পড়িয়াছে; সিঁড়িতে সিঁড়িতে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ আলোড়িত হইতেছে—পা কেমন

জ্বরে জ্বরে পড়িতেছে—কাপড় কেমন পায়ের কতদূর উঠিতেছে, আবার ঢাকিয়া বাইতেছে। কোন দেবকন্ডা সিঁড়ি বহিয়া স্বর্গে উঠিতেছে—যমুনা একরূপ ভাবিয়াছিল কি না জানি না ; কিন্তু উপমাকে ঐ ভঙ্গীতে উঠিতে দেখিয়া যমুনা অনিমেষ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিল। সকলের উপরের পাটাতনের এক কোণে ঘরের ছাপরের বাখারীর সঙ্গে এক ছড়া সুপক্ক অমৃতমাগর কলা ঝুলান ছিল। উপমা এক ছই করিয়া উহা হইতে কতকগুলি লইল, এক ছই করিয়া গণিল, আবার লইল, আবার গণিল, কেন গণিল, কাহার জন্ত গণিল ; কার কথা তার মনে আসিল ; সে কথা থাক্। নামিয়া আসিয়া একখানি ডালায় যখন সাজাইল, সাজাইয়া লইয়া যখন বাহির হইল, তখন দেখিল—যমুনা বারেন্দ্যার একপাশে দাঁড়াইয়া আছে।

যমুনা। ঠাকুরবি, কেমন উপরে উঠাছিল, আবার নাইমা আইলা, তবে এখন খুব ভাল হইচ। কলা—কত বড়, কেমন সুন্দর, এত কলা, কার লাইগা, কে খাইব ? ঠাকুরবি, এই যে একটি ঠাকুর তোমাগর সঙ্গে আইচে, তোমাগর বাড়ীতে আছে, এই ঠাকুরটী তোমাগর কে লাগে ?

উপমা, তার হাতে কলা, রামপালের উৎকৃষ্ট অমৃতমাগর কলা—কলার কথা বেস্, কিন্তু তার সঙ্গে যমুনার মনে ঠাকুরটীর কথা কেন কেমন করিয়া আসিল তা স্থির করা কঠিন নয়। কিন্তু উপমা—“এই ঠাকুরটী তোমাগর কে লাগে”—এই কথায় উপমা কঠিন সমস্তায় পড়িয়া গেল। উপমা বলিল, “শরীরটা ছই দিন বড় খারাপ আছিল, এখন তো ভালই, ভাল দেখ্‌তাছিস না কি যমুনা ?”

যমুনা। এত ভাল দেখ্‌তাছি যে কইবার পারি না ; ঠাকুরবি, এই ঠাকুরটী তোমাগর কে লাগে, তা তো কইলা না। বড় ঠাকুরকে দেখি, মাচের জন্ত আমাগর পাড়ার, হৃদের জন্ত গোয়াল পাড়ার, রসের জন্ত গাছীদের কাছে—ঠাকুর বড় বেশ। কও না, ঠাকুর বি, এই ঠাকুরটী কে লাগে ?

উপমা। আমাদের কেউ লাগে না।

উপমার বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, মুখ, কাণ লাল হইয়া উঠিল।

যমুনা। না ঠাকুর-বি, লাগে।

উপমা। যা—কিছু না। ঐ তো দেখ্‌ছিস্ আমাদের সঙ্গে আন্‌ছেন, বাবা বাইতে দেন নাই।

যমুনা। বাইতে যেন দেন না ; ঠাকুরটী বেস্ সুন্দর ; তোর সিঁথিতে সিঁদুর উঠুক।

উপমা। যমুনার গা টিপিয়া দিয়া কলা, লইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল ।
 যমুনা যেদিন আজিনার আগিয়াছে তার পরদিন হইতেই সে প্রতিদিন
 তিন বেলা বন্দোপাখ্যায়-বাড়ী আসে, বসে এবং উপমার সঙ্গে আলাপ করে ।
 উপমা। ব্রাহ্মণের কত্না, যমুনা জেলের কত্না । যমুনা ঘরে গাটতে পারে না,
 কিন্তু বাহিরে বুদ্ধিবার উপায় নাই—এই দুইটা কথা ব্রাহ্মণ ও জেলে-আতির—
 যমুনা উপমাকে ছুইছে, ঘেসিয়া, বসিতেছে । উপমা তত্ত্ব-কাঞ্চন-বর্ণী, যমুনা
 শ্রামাঙ্গিনী ; কিন্তু এমন শ্রাম-যমুনা দেখিলে হুকু জুড়ায় । উপমা যমুনার চুল
 বাধিয়া দেয়, যমুনা উপমার চুলে নিত্য নূতন বেণী গড়ে, নূতন নূতন ছন্দের
 কবরী রচনা করে ।

উপমা কলা রাখিয়া আগিয়া যমুনাকে টানিয়া লইয়া তাদের ঘরের পশ্চাতে
 আগের বাগানে লইয়া গেল । আমগাছে কোনটাতে মুকুল দেখা দিয়াছে,
 কোনটির মুকুল ফুটিয়াছে, কেমন এক উন্মাদকর গন্ধ ; সুখা অস্ত্র বাইবার
 অধিক বাকী নাই—মধুকরগুলি মধুসঙ্গে সস্তর হইয়া গুণ্ণ গুণ্ণ ধ্বনি ঘন
 করিয়া তুলিয়াছে । কোকিল তান-লয়-হীন অনিবদ্ধ দুই পাঁচটা কুহ—কুহ—
 কুক—পিক্ শব্দে সাক্ষা-আরতি করিয়া উড়িয়া গেল । এই আত্ম-কাননের
 পশ্চাতে মাঠ—মাঠের অপরদিকে একটি ক্ষুদ্র খাল । খাল ও মাঠ কোয়ারার
 এবং গোশালার ধূম আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে । রাখাল গোশালার গন্ধ রাখিয়া
 গাইয়া বাইতেছে—

কেন রে কুণীর মাঠিয়া হইলাম রে—

যমুনার কাণে এই গান পৌঁছিল, যমুনা ভিজাসা করিল—“ঠাকুর কি,
 তোমার শাস্তিপুরে যাওয়ার কথা তো শুনাগাম—এই ঠাকুরটা—”

উপমা। তোর সিঁথিতে তো সিঁহুর নাই—তোর সিঁথিতে সিঁহুর
 উঠবো কবে ?

উপমা যমুনার সিঁথিতে শুধু আঙ্গুলে একটি শুধু টিপ বসাইয়া দিল ।

যমুনা । তবে ঠাকুর-বি, তুমি আমারে বিয়া করণা—

হো হো করিয়া তাগিয়া যমুনা উঠিয়া দাঁড়াইল ।

উপমা । আমি তোরে বিয়া করলে যদি তুই মুখী হস্ মন কি ?

উপমা উঠিয়া যমুনার গলা জড়াইয়া ধরিল ।

যমুনা । এই ঠাকুরটা—

উপমা যমুনার মুখ চাপিয়া রাখিল ।

তখন তৃতীয়র চক্ষু আলোক ছড়াইয়াছে, আত্ম-কাননে স্থানে স্থানে চায়, স্থানে স্থানে আলোক ॥ যমুনা বলিল, “আটছা বন্না না; রাস্তার হইল, এখন বাই-”

উপমা। আর একটু থাক না। আমি গেরে বাগান পার কইরা দিয়া আসিম।

যমুনা বাইতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, যত পীড়াপীড়ি, উপমা যমুনাকে ততই জড়াইতে লাগিল।

আমবাগানের অপরদিকে ছোট মাঠ, ঐ মাঠ পার হইলেই যমুনার কুটুম-বাড়ী। বাড়ী দেখা যায়। হুঁজনে গলাগলি শরয়াই যমুনার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। আমবাগানের সীমায় একটা খাত; খাত গভীর—ঝির ঝির করিয়া মাঠের জল চলিয়াছে। ঐ খাতের উপর ছুটী মাত্র বাঁশে পাতা একটা সাঁকো। গলাগলি করিয়া হুঁজনে এক সঙ্গে ঐ সাঁকো পার হওয়া অসম্ভব। যমুনা উপমার গলা ছাড়িয়া আগে সাঁকোতে উঠিল, তারপর উপমা। হুঁজনের ভারে সাঁকো ছলিতে লাগিল। ঐ দোলনের সঙ্গে হাসিতে হাসিতে, শরীর আঁকিয়া বাঁকিয়া হুঁজনেই পার হইল। অতি অল্পদূর বাইয়াই উপমা ফিরিয়া আসিল। সম্মুখে ঘন আত্মকানন—উপরে উজ্জল জোৎস্না—উপমা উহা দেখিতে দেখিতে ফিরিয়া সাঁকোর উপর আসিয়া উঠিল। উপমা বাই সাঁকোর মধ্যস্থলে তখন আর একব্যক্তি ঐরূপ অনন্ত মনে সাঁকোর উপর। উপমা পশ্চাতে না বাটলে ঐ ব্যক্তি বাইতে পারে না; ঐ ব্যক্তি না ফিরিলে উপমা পার হইতে পারে না। এই অবস্থায় ইতস্ততঃ বুদ্ধিতে বা হইবার তাহাই হইতেছে—কিন্তু উপমারপক্ষে এক পলক—ঐ ব্যক্তির সর্বাঙ্গ বস্ত্রে আবৃত—পুরুষ। উপমার শরীর কাঁপিতেছে, ভাবিবার সময় নাই, ভয়ে নীচে পড়িয়া যায় আর কি? পড়িয়া যায়—ঐ অপরিচিত পুরুষ তাকে দুহাতে ধরিয়া কেলিল।

উপমার মনের অবস্থা ভাবিয়া দেখ। উপমা বুদ্ধিমতী, কোন চীৎকার করিল না। ঐ ব্যক্তি তাকে সাঁকোর এই পারে ধীরে ধীরে লইয়া আসিয়া বলিল—“কোন ভয় নাই—ঘরে যান—ঘরে বাও। পড়িয়া বাইলে কি ভয়ানক হইত।”

উপমা স্বরে চিনিল, সন্ত্রস্তে সলজ্জে চাহিয়া দেখিল—প্রাণেশচন্দ্র।

প্রাণেশ এক মুহূর্তও অপেক্ষা করিল না, বাহির বাড়ী হইতে পথ এই সাঁকোর কাছে আসিয়া মিলিয়াছে; সে এই পথে মাঠে বেড়াইতে বাইতেছিল

সে মাঠের দিকে চলিয়া গেল। উপমা স্বর্গে কি মর্ত্যে বুঝিতে পারিতেছে না, গভয়ে কত কি ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিল—অনেকক্ষণ প্রদীপ জলিয়াছে। মা, উপমাকে খুঁজিতেছিলেন।

মা। এত দেরি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

উপমা। যমুনাকে দিতে—

মা। তারপর—

উপমা কি উত্তর দিবে ?

(১৫)

শশিধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থা এক সময়ে বেশ ভাল ছিল। ব্রাহ্মণ মাত্রেয়ই উপার্জন কমিয়া গিয়াছে—বন্দ্যোপাধ্যায়েরও কমিয়াছে। তাঁহার চারি কন্তা ও একটি পুত্র জন্মে। বড় ছেঁট কন্তার বিবাহে তিনি সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, সে কন্তা ছোট্টরও পরলোক হইয়াছে; পুত্রটি নিরুদ্দেশ—তাঁহার বয়স এতদিন পঁচিশ বৎসর হইত—আজ দশ বৎসর তন্মাস করিয়াও তাঁহার কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই। পুত্রটি লিখা পড়ায় উত্তম এবং দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। কেন চলিয়া গেল—সে সম্বন্ধে লোকে অনেক কথা বলিয়া থাকে। এখন ছোট্ট কন্তা বর্তমান—একটি উপমা। বন্দ্যোপাধ্যায় “উপমা কালিদাস্ত্র” এই চরণ স্মরণ করিয়া কন্তার নাম রাখিয়াছেন। কনিষ্ঠা কন্তার নাম কমলা। কমলা জর-শ্রীহার একরূপ শযাগত। বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যৈষ্ঠ কাত্যায়নী এই কন্তাটি লইয়া বাড়ী ছিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপমা ও উপমার মাসিকে লইয়া শাস্তিপুর গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার গৃহে তিনি, তাঁহার জ্যৈষ্ঠ, শ্রীলক্ষ্মী ও ছোট্ট কন্তা।

একখানি পাকা চণ্ডিমণ্ডপ আছে, তাহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, উহার উপরে ঝটপাছ সকল উঠিয়াছে। জিনিসপত্র প্রায় সমস্তই বার্ষিক্যের একটা বিধাদ-চিহ্ন পড়িয়াছে। বাহিরে হুঁখানি চালাঘর, হুঁখানিই হেলিয়া আছে; বাঁশের ছেলা খুঁটিতে উহাদিগকে দয়া করিয়া পতন হইতে রক্ষা করিতেছে, খাট—চারিখান বা আছে—মনে হয় উহাদের তত্ত্ব অপেক্ষা লোহার পেরেকের ভার বেশী; অষ্টপুটে কত পেরেক পাতামই যে বসিয়াছে তাহার অন্ত নাই। কলসী জা—সচ্ছিন্ন, ধূপধারা ছিদ্র বন্ধ করা হইয়াছে; ঘটা, বহুগুণা, গামলা প্রায় সকলেরই একই দশা। ভাল আছে ঐ একখানি ঘর—বাক দেওয়া বড় ঘর। এই ঘরের একপাশে একখানি শয্যা কমলা শুইয়া আছে। মা ও মাসী

নিকটে কাজ করিতেছেন। কমলার বয়স তের বৎসর কিন্তু রোগে তাহাকে পাঁচ বৎসরের শিশুটির মত করিয়া রাখিয়াছে।

এক কোণে তৈলের প্রদীপ, তৈল অন্ন, দীপ নিব্বা বাটতে চাহিতেছে। কমলা বলিল, “দিদি বাস্তিটায় তেল দেও।” উপমা উঠিল না, সে কথা সে শুনিতেই পায় নাই। কমলা আবার বলিল; উপমা বসিয়াই রহিল। কমলা বলিল, “—বাবা এখনও ফিরেন নাট—বাহিরের ঘর আঁধার; ঠাকুরটী-না ঐ ঘরে আঁধারে আছেন, দিদি, বারেন্দ্রায় বাস্তিটা কেন রাখিয়া আইস না।”

কাত্যায়নী। তাই-ত বাস্তি দেস্ নাট, বাস্তি দিয়া আর।

কমলার মুখে “ঠাকুরটী” শব্দে উপমার যেন তন্ত্রা ভাঙিয়া গেল। কিন্তু এখন প্রদীপ লইয়া উপমার পক্ষে ঐ ঘরের দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। প্রাণেশচন্দ্র এতক্ষণ যদি ফিরিয়া থাকে, যদি ঐ ঘরে বসিয়া থাকে। উপমার পা চলিল না। সে মাসীমাকে বলিল, “মাসী-মা, বাস্তিটা তুমি রাখিয়া আঁটস।”

মাসী-মা প্রদীপ রাখিতে যাওয়া দেখিলেন—ঘরের বারেন্দ্রায় একজন লোক বসিয়া আছে, সম্মুখে একটা বাগ; লোকটির হাতে একটা মোটা মন্ত লাঠি লম্বভাবে মাটিতে লম্ব হইয়া লোকটির মাথা ডিঙাটয়া উঠিয়াছে। মাসী-মা অপরিচিত লোক দেখিয়া প্রদীপটী বারেন্দ্রার এক কোণে রাখিয়া আসিয়া তাঁহার ভগ্নীকে জানাইলেন—কে একজন লোক বারেন্দ্রায় বসিয়া আছে।

বাহিরের অঙ্গন ও ভিতরের অঙ্গনের মধ্যে একখানি বাঁশের বাঁকা বেড়া। উপমা, উপমার মা ও মাসী উকি দিয়া দেখিতে লাগিলেন। আগন্তুক নীরব বসিয়া আছে; কোন পুরুষের সাড়া শব্দ নাই, কাত্যাকে কি জিজ্ঞাসা করবে।

এই সময়ে প্রাণেশচন্দ্র আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন, দেখিলেন একটা লোক বারেন্দ্রায় বসিয়া আছে। প্রদীপের সলিতা স্তম্ভ—এদিকে পবনেরও বিশেষ অলুগ্রহ, দীপ নিব্বা গেল।

প্রাণেশচন্দ্র। কে—ও?

আগন্তুক। এই বাড়ী শশিধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের?

প্রাণেশচন্দ্র স্বর শুনিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিল।

আগন্তুক। এ বাড়ীতে প্রাণেশচন্দ্র মুণোপাধ্যায় নামে কেহ আছেন?

বারেন্দ্রা অন্ধকার। উঠানে জ্যোৎস্না থাকিলেও প্রাণেশচন্দ্রের মাথা ঢাকা। কেহ কাত্যায়ণ মুখ দেখিতে পাইতেছেন না। তখন প্রাণেশচন্দ্র বারেন্দ্রায় উঠিয়াছেন।

প্রাণেশচন্দ্র : আগনার নাম ? কোথেকে আসছেন ?

“কে-ও প্রাণেশচন্দ্র ভাল-ত ?”

“কে-ও দাদা ম’শায় ? কি আশ্চর্য্য ! কি ক’রে এখানে এলেন ; কি ক’রে জানলেন আমি এখানে—কল্কাতার সব ভাল-তো ?

দাদা ম’শায় উঠিয়া প্রাণেশচন্দ্রকে সম্মুখে কোল দিলেন । প্রাণেশচন্দ্র অমনে কান্নাকণ্ঠে বলিল, “বাস্তবিকই আশ্চর্য্য—আপনার অসাধা কিছুই নাই, ছ’পরে কি ধেরেছেন ? একটা আলো পেলে হজ্ঞে ।

দাদা ম’শায় । মেয়েরা আলো দিয়া গিয়াছিলেন, নিবে গেছে ।

প্রাণেশ । আলো ড় ক’ছ ।

দাদা মহাশয় আলো ডাকিতে বারণ করিয়া দিয়া তাঁহার মস্ত পকেট হইতে এক পকেট-লঠন বাহির করিলেন—ন্যেচ্ জালিয়া লঠনের মম-বাতিতে ধরাইলেন, লঠনের আলোর দিক্ প্রাণেশের মুখেরদিকে ধরিয়া বলিলেন—
দেখ্লে ভায়া, এইরূপে পলাতক ধম্মে হয়, ধরেছি-গো ।”

প্রাণেশ । বাস্তবিক কি ক’রে খোঁজ পেলেন ।

দাদা ম’শায় । সংবাদপত্রে ।

প্রাণেশ । সংবাদপত্রে ?

দাদা ম’শায় পকেট হইতে সংবাদপত্র বাহির করিয়া দিলেন । বলিলেন—
“একটা জঙ্গলে চিনীমুখে পিপড়ে দেখে, ডি-টক্টিভ ডাকাত ধম্মে পারে আর এত বড় একটা সংবাদপত্র প’ড়ে তার লেখক ধ’রে—লেখকের খোঁজ ক’রে, একটা পলাতক লোককে ধরা যাবে না ? তুমি এখানে ক’দিন ? বাড়ী যাও মি ? এখানে সব ভাল তো ?

এই সময়ে বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । উপমা, তাঁহার মা ও মাসি অন্তরাল হইতে দোখতোছিলেন ও কথাবার্তা শুনিতেছিলেন, তাঁহারা গৃহের ভিতর চলিয়া গেলেন ।

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় দাদা মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া অতিশয় সুখী হইলেন, আশ্চর্য্য হইলেন—তাঁহার পকেট এবং ব্যাগের সামগ্রী সকল দেখিয়া । লঠন, বাটলুই, প্লেট, গ্লাস, ঘটী, ঔষধ বহু, পুতুল, খাবার সামগ্রী কত, বস্ত্র অনেক ।

শশিধর । এত ঔষধ ? আপনি কি ভাতার ?

দাদাম’শায় । না, এই ওলাউঠার সময় বহুলোকের উপকার হ’তে পারে ।

পশিধর। এত কাপড় ?

দাদাম'শায়। শীতেরদিন, দেশে গরীব অনেক।

পশিধর। এত পুতুল ?

দাদাম'শায়। ছেলে-মেয়েদেরে দিলে তারা কত সুখী হবে।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর শুনিয়া বিশ্বর-ভক্তিতে আগন্তকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার আহ্বারের আয়োজন করিবার প্রসঙ্গ করিতেই দাদাম'শায় বলিলেন “আমি ব্রাহ্ম—এইটুকু আপনাকে জানান আবশ্যক।”

বন্দ্যোপাধ্যায়। একটা ‘ণ’ কারের কম বেশী এই ত ? আপনি অভিধি—আপনি পূজনীয়।

“পূজনীয়” শব্দে দাদা মহাশয় করবোড়ে আপনার বিনয় জানাটলেন।

সাজিতে আভ্যন্তরের পর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শাস্তিগুব বাজা, ভাগ্যকূলে ভাষ্কাতের আক্রমণ এবং তাঁহার ক্রমা কস্তার অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা হইল। প্রাণেশচন্দ্র কত উপকার করিয়াছেন—ব্রাহ্মণ শতযুগে তাহার প্রশংসা করিলেন।

পরদিন প্রভাতে দাদা মহাশয় প্রাণেশচন্দ্রকে লইয়া প্রস্থানের প্রস্তাব করিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ততঃ একদিন থাকিবার অন্ত বহু অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দাদা মহাশয় মিষ্টিকথা ও গল্পের বিনয় অঙ্গনে তুষ্ট করিয়া প্রাণেশচন্দ্রকে লইয়া নৌকার উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার বাওরা হইল না, তিনি প্রাণেশচন্দ্রকে বলিলেন—“বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন তাঁহার ছোট মেয়েটা গেরাম, একদিন থাকিয়া অবস্থাটা দেখিয়া গেলে হয় না ?”

প্রাণেশচন্দ্র মনে মনে ভাবিল—একদিন কেন পাঁচদিন থাকিলেও হয়; বলিল “তা দেখে যান না।”

দাদা মহাশয় কিরিয়া আসিলেন। মেয়েটাকে দেখিয়া বাইবেন—শুনিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুখী হইলেন। একদিন নয়, তিন দিন থাকিতে হইল। তিনি যে ঔষধ দিলেন তাগাতে উপকার দেখা গেল। দাদা মহাশয় ঔষধ ও ব্যবস্থা দিয়া অবস্থা সম্বন্ধে তাহাকে নিশিবার কথা বলিয়া চতুর্থদিনে বিদায় লইলেন।

প্রাণেশচন্দ্র চলিয়া গেল। উপহার মনের কথা—সে এক বৃহৎ গাছ, অঙ্গুর হরণ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

মহাকাব্যের ইতিহাস—মৌলবী মেথ আবদুল জব্বার প্রণীত । মূল্য ১০ আনা, বন্ধা মহাপুরুষ মত্মদেবের জন্মস্থান । ভক্ত মূলমানগণ পবিত্র মহাকাব্যের দর্শন অল্প ব্যাকুল । মহাকাব্যের নাম শুনিলে তাঁহাদিগের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে । এই পুণ্য ভূমির প্রতি রেণু পরমাত্মার সন্তিত কত পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে । হিন্দু মূলমান উভয়ই এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম পরিভোষ লাভ করিলেন । এই ইতিহাসখানি অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ । মৌলবী সাহেবের ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং ওজস্বিনী । গ্রন্থকারের শ্রম সফল হইরাছে । ইতিহাস খানি পাঠক সমাজে আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব ।

কল্পিণী—কাব্য । শ্রীমতী বিন্দুবাগিনী দাসী প্রণীত । শ্রীমদ্ভাগবতের কল্পিণী চরিত্রই এই কাব্য বর্ণনার বিষয় । গ্রন্থকার চারুকলিকার কল্পিণীর চরিত্রটা বেশ উজ্জ্বল-মধুরে কুটির উঠিয়াছে । কল্পিণীর কৃষ্ণপ্রেম যেন কাব্যের প্রতি পৃষ্ঠায় উভলিয়া পড়িতেছে । সে প্রেম কত গভীর, কত উচ্চ, কত উদার ; পড়িতে পড়িতে হৃদয় ভক্তিরসে ভ্রূণীভূত হয় । বাস্তবিক কল্পিণী পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইরাছি । গ্রন্থকার ভাষা স্নানধুর, বর্ণনা চিত্তাকর্ষক, ভাব প্রকাশের কোশল প্রাণসন্নিয় ।

আনাদিগের অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের এই কল্পিণী কাব্যখানি পাঠ করা একান্ত কর্তব্য । আজকাল যে সমস্ত কদর্যা অশ্লীল, নাটক, নভেল অস্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছে তাহাতে প্রতিগৃহে বিষময় ফল ফলিতেছে । ধর্মের বন্ধন, নীতির বন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া পড়িতেছে । বৈদেশিক বিলাসিতা-প্রোতে পল্লীগ্রামের দীন-গৃহস্থের কুটির পর্যাস্ত দ্রাবিত হইয়া গিয়াছে । এখন সেই প্রাচীন ধর্মপ্রাণ সরল-হৃদয় আৰ্য্য নরনারীর আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে যা পারিলে আর কল্যাণ নাই ।

আমরা কল্পিণীর গ্রন্থকারকে প্রাণের সহিত মন্তব্য দিতেছি । তিনি অসময়ে, গুণবতী সাধবা কল্পিণীর পুণ্যকাহিনী সমধুর ছন্দে বিবৃত করিয়াছেন । কল্পিণীর মুদ্রাক্ষণ অতি সুন্দর হইয়াছে ।

আব্রতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ।

ষষ্ঠ বর্ষ । } ময়মনসিংহ, কার্তিক; ১৩১৩ । } দশম সংখ্যা ।

নবযুগ ।

(২)

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক শত্ৰুসাম্রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঐ সকল শত্ৰুসাম্রাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন ছিল। বিভিন্ন প্রদেশের রাজত্ববর্গের মধ্যে বড় মৌগর্দ ছিল না। বরং তাঁহারা পরস্পর ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত থাকিয়া আপনাদের শক্তির অগচয় করিতেন। এক প্রদেশ অত্র প্রদেশ হইতে ছুর্ভদ্রা গিরি-প্রাচীর অথবা সুবিশাল নদীদ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। এখনকার সময় সেই সময়েও ভাষা-বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না। এক প্রদেশের ভাষা অত্র প্রদেশের লোকের ছুরীয়া হওয়ায় ভাবের বিনিময় হইতে পারিত না। প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা, দেশ-বিজয় ভিন্ন আপন শাসিত প্রদেশের বাহিরের কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করা অনধিকার চর্চা মনে করিতেন। মোগলসম্রাট-দিগের সময় ভারতবর্ষের আয় বার আনা অংশই দিল্লীর অধীন ছইয়াছিল বটে কিন্তু ইংরেজ আমলের আর বিভিন্ন প্রদেশ মাফাং মগধে মগধ-নামে দিল্লীর অধীন ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা নাম মাত্র দিল্লীর অধীন ছিলেন। সম্রাটেরাও কেবল পার্থক্য কর পাঠিয়েই সম্রাট থাকিতেন। শাসনকর্তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বীয় স্বীয় প্রদেশ শাসন করিতেন। সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা এক রাজার অধীন থাকিয়াও স্বতন্ত্র শাসনকর্তা এবং স্বতন্ত্র শাসননীতির অধীন হওয়ায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলে ঐক্যমুখে আ- হতভে পাবে নাই। মহামুহূর্তি, মনঃসংযোগ ও মৌগর্দ মনঃসংযোগের অবশ্যস্বাধীন ফল। মোগলশাসনকালে পূর্বোক্ত কারণে মনঃসংযোগের অভাবে ভারতবর্ষের মধ্যে একতা এবং একদেশবাদী বলিয়া স্বজাতিপ্রেম ও মহামুহূর্তি বিকাশ পাই নাই।

বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, দক্ষিণাত্য প্রভৃতি প্রদেশ এক একটা স্বতন্ত্র রাজ্যের স্থায় বিরাজিত ছিল। সমস্তটা ভারতবর্ষ যে একটা দেশ একটা কাহারও মনে হইত না। প্রত্যেক প্রদেশের লোক আপন আপন সুখশান্তি লইয়াই ব্যস্ত ছিল। আপন প্রদেশের বাহিরে কোন রাজ্যধ্বংস হইলে অথবা নতুনরাজ্যের অভ্যুদয় হইলে কেহ গ্রাহ্য করিত না। এই ঐক্যের অভাবেই ভারতের সমগ্র অধিবাসী একটা রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে নাট। এই ঐক্যের অভাবেই বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এত সহজে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিল। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, চেলিসু বাঁ, নাদির সা, প্রভৃতি লুণ্ঠনকারিগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ লুণ্ঠন করিয়াছে, জনপদ ভস্মীভূত করিয়াছে, নরশোণিত-শ্রোতে সুবিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত করিয়া গিয়াছে। কেহ তাহাদের গতি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। যখন যে দেশে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে, তখন সেই দেশেরই বিপদ, অন্য প্রদেশের লোকেরা দূর হইতে মিষ্টে চিত্তে এই তাণ্ডব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ভিন্ন প্রদেশের প্রতিক্ষীকে সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য কৰ্ম্ম বলিয়া কেহ মনে করে নাই। ভারতবর্ষের রাজস্ববর্গ যদি আপনাদিগকে এক মায়ের সন্তান বলিয়া মনে করিতেন, তাহারা পরস্পর যদি ঐক্যমুখে সম্বন্ধ হইতেন তাহা হইলে সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরাঁ, বক্তিরার খিলজী, বাবর প্রভৃতি-তো দূরের কথা পৃথিবীর কোন প্রবল শক্তিই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু ভারতবর্ষ, ইংরেজরাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে স্বতন্ত্র এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল তাই প্রদেশের অধিবাসীর মধ্যে সোতাঙ্গ, সত্যমুভৃতি ও ঐক্য সংস্থাপিত হইতে পারে নাই। ইংরেজ আমলে ভারতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভাবনীয় অমুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছে। ইংরেজ অর্ধানে আসিয়া সমগ্র ভারতবাসী একটা নিরাট জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এক কথায় আমরা এদেশে Nation এর বিকাশ দেখিতেছি। স্বদেশপ্রেম বা Patriotism এই মহামূল্য জিনিসটা আমরা ইংরেজের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজের ইতিহাস এবং শাসননীতি আমাদের কাছে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, আমাদের জন্মের জাতীয়তার বীজ বপন করিয়াছে। সময়ক্রমে এই জাতীয়তার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মহাফসে পরিণত হইবে, ইহাই মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছা। পলাশীর যুদ্ধে যে জাতীয় স্বাধীনতা-গৌরব-স্বর্গ্য অন্তর্মিত হইয়াছে সেই স্বর্গ্য আবার মহামহিম দাঁড়িত

হইয়া ভারত-আকাশ প্রদীপ্ত কিরণ-ছটার আলোকিত করিবে।

সমগ্র ভারতবর্ষের জনমণ্ডলীকে একান্ত্র সঞ্চক করিয়া অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন এক মহাজাতিতে পরিণত করিবার জন্তই ভগবান ইংরেজকে এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন; নীরজাকর, উন্নীতাদ, জগৎশেষ্ঠ কেবল যজ্ঞ মাত্র স্বদেশজ্যোতীদিগের ষড়যন্ত্র কেবল উপলক্ষ।

ইংরেজ রাজত্বে ভারতে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। ইংরেজ আমাদিগের উন্নতির পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষ অতি বিস্তৃত জনপদ। এক এদেশ অল্প এদেশ হইতে নৈসর্গিক প্রাচীর গড়বাইবারা সীমাবদ্ধ। ভারতের ভারতে বহুভাষা বহুজাতি এবং বহুধর্মের প্রচলিত। সুতরাং একরূপ অবস্থায় সমস্ত ভারতবাসীর একতা, আকাশ-কুসুমের ত্রায় অসার করণা বলিয়া মনে হইত। কিন্তু ইংরেজের সাম্রাজ্য ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সকল বিষয় দূর হইয়াছে, সকল সমস্তা তিরোহিত হইয়াছে।

স্বল্পদর্শী পণ্ডিত জন-ষ্ট্যাটমিল বলিয়াছেন, এক গবর্ণমেণ্টের অধীনে বার্মাই জাতিগঠনের সর্বপ্রধান সহায়। সেহেতু এক রাজার শাসনাধীন হইলে সাম্রাজ্যের সকল অধিবাসীর স্ব-হুংগ, আশা-নিরাশা, সম্পদ-বিপদ প্রায় একরূপ হয়। এইজন্য পরস্পরের মধ্যে সহায়ত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সেই সহায়ত্বই ক্রমে স্বজাতিপ্রেমে পরিণত হয়, ভারতবর্ষেও তাহাই হইতেছে। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী এবং বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট স্কটলও ইংলণ্ডের সহিত এক রাজার অধীন হইয়া সকল নৈসর্গ্য বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে স্পেন ও পর্তুগাল প্রকৃত প্রস্তাবে একদেশে হইলেও এবং অধিবাসীদিগের মধ্যে সর্ববিধ সাম্যস্বপ্নেও রাজনৈতিক ভেদবশতঃ স্পেন, পর্তুগাল দুই স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাতিগঠন সঞ্চকে এক গবর্ণমেণ্ট যে সর্বপ্রধান সহায়, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং ইংরেজ-শাসন ভারতবর্ষে এক মহাজাতি সৃষ্টির সহায়তা করিতেছে।

ইংরেজ বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতবাসীকে একটা সার্বজনিক ভাষা প্রদান করিয়াছে। ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আমরা নোংরা, মাজাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের লোকের সহিত আলাপ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারি। একভাষা না হইলে আমরা পরস্পরের স্ব-হুংগ বুঝিতে পারিতাম না; সকলে পরামর্শ করিয়া উন্নতির উপায় নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইতাম না। পরস্পর ভাব বিনিময়ের অক্ষমতাই পশুপক্ষীদিগের হীনতার

প্রধান কারণ। ভারত সাহাবোই সমস্ত জাতির হৃদয়ের বল, সাহস এবং উৎসাহ একত্রিত হইয়া থাকে। ইংরেজী ভাষা না হইলে আমরা জাতীয় মহাসমিতি-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইতে পারিতাম না। ইংরেজীভাষা জাতিগঠনের বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র একটা ভারতীয় ভাষা প্রতিষ্ঠিত না হইবে যে পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষাই বিভিন্ন জাতির সহিত ভাষা বিনিময়ে ব্যবহৃত হইবে। সুতরাং ইংরেজের আমলে ভারত পার্থক্যজনিত অসুবিধা ও দূরীকৃত হইয়াছে।

সুদৃষ্টিগত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন কিন্তু ইংরেজ-প্রভুত্ববস্ত সৌন্দর্য্য দিয়া সুদূরবর্তী প্রদেশসমূহকে গোষ্ঠীভুক্ত করিয়া দিয়াছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সিঁদুর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সুদৃষ্টিগত হিন্দুস্থান এখন নৌচরিত্র সমাচ্ছন্ন। সর্বত্র গমনাগমনের এখন কত সুবিধা। বাহিরের ব্যবধানের সহিত অন্তরের স্ববন্দনও তিরোহিত হইয়া দাড়াইতেছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজ, বাঙ্গালা ও পঞ্জাব আর এখন পৃথক দেশ নয়, একটা বিরাট সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশ মাত্র। স্বাভাবিকের সুবিধা হওয়াতে সুদূরবর্তী স্থানের লোকের সম্মিলন অতিশয় সহজসাধ্য হইয়াছে।

রাজনৈতিক আন্দোলন অথবা বিষয় বাণিজ্য উৎসর্গে ভারতের নানা জাতির লোক এখন প্রতিদিন একত্র সম্মিলিত হইতেছে। প্রতি মুহূর্তে আমরা অনুভব করিতেছি সমগ্র ভারতবাসী এক জননীর সম্মান। আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সুবিশিষ্ট এবং আমাদের উদ্বেগ ও চরম লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। সমগ্র জাতির সম্মিলিত শক্তি দেশ হতে নিষ্কৃত করিয়াই আমরা সফল নবোদয় হইব, পূর্ব্বগৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব, বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে এ অধঃপতন চিরস্থায়ী হইবে, আমাদের ধর্ম্ম অনিশ্চয় হইবে, ঈশ্বর এখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পূর্ব্বকি ছিল না—ইহা ইংরেজশাসনের সফল।

পূর্ব্বকি বর্ণিত বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতি ও সম্প্রদায় যে কোন দিন ঐক্যস্থরে সম্মত হইতে পারিবে তাহা নিত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হইত কিন্তু ভগবান কি অচিন্তনীয় কোণে এই হৃদয় কার্য্য সংসাধন করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণকৃত হয়।

অমর কবি হেমচন্দ্র ইংরেজ রাজত্বের এই অযাশ্চর্য্য উদ্ভবল সন্দর্শন করিয়া বলিয়াছেন—

“যত্ন রে বৃটন শত জিকা তোর
 যুগযুগান্তের অমানিশা ঘোর
 তোরি গুণে আজ হ'ল উন্মোচন
 তোরি গুণে আজ ভারত ভূপন
 এ সখ্য বন্ধনে বঁধিল।”

(ক্রমশঃ)

বৃহস্পতি।

সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। এইজন্য বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল এই গ্রহ চতুষ্টয়কে কনিষ্ঠ গ্রহ (minor planets) বলে। মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যবর্তী বহুসংখ্যক গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রহ অতিশয় ক্ষুদ্র এবং সংখ্যায় শতাধিক হইবে। উহাদিগের বৃত্তাস্ত অত্যন্ত প্রবল বলব।

পূর্কোস্ত চারিটি কনিষ্ঠ গ্রহের মধ্যে পৃথিবীত মর্যাপেক্ষা বৃহৎ। শুক্র গ্রাহ পৃথিবীর সমান; মঙ্গল পৃথিবীর গ্রাহ আট ভাগের এক ভাগ। বুধ ও পৃথিবী ছইতে অনেক ছোট।

বৃহস্পতি তটতে সৌর জগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ সকলের আরম্ভ হইয়াছে। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাশ্, নেপচুন এই গ্রহ চতুষ্টয়কে গিগ্যান্ট গ্রহ (Giant planets) বলায় থাকেন। পূর্কোরিখিত গ্রহ চতুষ্টয়ের মধ্যে বৃহস্পতিই মর্যাপেক্ষা বৃহৎ। শনি উহার আধেক, ইউরেনাশ্ শনি অপেক্ষাও ছোট; নেপচুন গ্রাহ ইউরেনাশের সমান।

যে সকল গ্রহ গালি চক্ষে বেশ উজ্জ্বল দেখা যায় সেই সকল গ্রহ নক্ষত্র-জালিকে প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্কোঁচ চিনিয়া ছিলেন এবং উহাদের এক একটি নামও প্রদান করিয়াছিলেন। প্রাচীন আর্য্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে বহুসংখ্যক স্তবিশাখ গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তখন দূরবীক্ষণ আবিষ্কৃত হয় না; কেবল হৃদয় দৃষ্টি ও পর্য্যবেক্ষণ সাহায্যেই প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রাত্রির পর রাত্রি তাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে উর্দ্ধনজ্জ্রে গ্রহ ও নক্ষত্রাদির গতি ভ্রমণ পথ পরীক্ষা করিতেন। এইরূপে বহু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ

অধ্যবসারের ফলে তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য সমূহ উন্মোচিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। খালি চক্ষে কোটি কোটি মাইল দূরবর্তী গ্রহ নক্ষত্রের স্বরূপ ওব্য আবিষ্কার করা কিস্তি হুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

ইউরেনাশ্ এবং নেপচুন এই দুইটা গ্রহ আধুনিক কালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত এই দুইটা গ্রহ চিনিবার সাধ্য নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু চেষ্টা করিয়া বহু বৎসর অত্যাশ্রুত দূরবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া এই গ্রহ দুইটা আবিষ্কার করেন। এইজন্য প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইউরেনাশ ও নেপচুনের নাম নাই।

বৃহ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই গ্রহগুলি আর্য্য জ্যোতির্বিদগণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এই সকল নাম ও তাঁহাদেরই প্রদত্ত। বৃহস্পতি নামটা পণ্ডিতেরা বড়ই পছন্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রে বৃহস্পতি দেবগুরু তাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল গ্রহটার নাম বৃহস্পতি রাখিয়াছেন। অজ্ঞাত গ্রহ অপেক্ষা বৃহস্পতি আয়তনে কত বৃহৎ তাহার আভাস দিতেছি। সৌর জগতের অপর সকল গ্রহগুলিকে একত্র করিয়া একটা পিণ্ড প্রস্তুত করিলে উহা বৃহস্পতি অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র হইবে। আমাদের অধিষ্ঠান-ক্ষুতা, সুবিস্তৃত সাগর পরিবেষ্টিতা, অজন্তেদি পর্বত শোভিতা পৃথিবীর জায় সাড়ে বার শত পৃথিবী একত্র করিলেও বৃহস্পতি অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে।

বৃহস্পতি আটচল্লিশ কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া বৃত্তাভাস (Elliptic) পথে সূর্য্যকে প্রবক্ষণ করিতেছে। বৃহস্পতি যখন পৃথিবীর খুব নিকট আসে তখনও উহা, পৃথিবী হইতে সূর্য্য যতদূর প্রায় উত্তর চারি গুণ দূরে থাকে অর্থাৎ বৃহস্পতি সর্বদাই পৃথিবী হইতে পঞ্চাশ কোটি মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত করে। এইজন্যই এত বৃহৎ বৃহস্পতিকে দূরস্থিত নক্ষত্রের জায় ক্ষুদ্র দেখায়।

সূর্য্য হইতে যে গ্রহ যত দূরে সেই গ্রহের গতি তত বৃহৎ। বৃহৎ সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ উহার গতি সর্বাপেক্ষা দ্রুত। বৃহৎ পর শুক্র তারপর পৃথিবী ও মঙ্গল; ইহাদের গতি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়াছে। বৃহস্পতির গতি উহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে ১৮ মাইল হিসাবে চলে, বৃহস্পতি সেকেন্ডে ৮ মাইল মাত্র যায়।

বৃহস্পতি পূর্বোন্নিখিত গ্রহ সমূহের তুলনার অধিকতর দূরবর্তী বিধায় উহার বৃত্তাভাস জগৎ পথ (Elliptic orbit) বৃহৎ এবং উহার গতি ৩

দ্রুতবেগে অনুপাতে বৃহ। এই দুই কারণেই, সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে বৃহস্পতির প্রায় আমাদের ১২ বৎসর সময় লাগে। অর্থাৎ আমাদের ১২ বৎসরে বৃহস্পতির এক বৎসর হয়।

বৃহস্পতির গতি খুব বৃহৎ বলিয়াছি কিন্তু উহা আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে অতিশয় দ্রুত পরিভ্রমণ করে। প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহই লাঠিগের জায় আপন আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক দেয় এবং এক্ষেপে ঘুরিতে ঘুরিতে গ্রহ সকল সূর্য্যের চারিদিকে এবং উপগ্রহ সকল গ্রহের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। বৃহস্পতি আপন মেরুদণ্ডের উপর অতি দ্রুত পাক দিয়া থাকে। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টার এক পাক দেয় অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার পৃথিবীর এক দিবস হয় বৃহস্পতি ১০ ঘণ্টার এক পাক দেয় সেইজন্য বৃহস্পতির দিবস ১০ ঘণ্টা দীর্ঘ। এত তাড়াতাড়ি ঘুরিবার দরুন বৃহস্পতির মধ্যভাগটা ফুলিয়া গিয়াছে এবং উহার দেহটা কিছু বাদামী ধরণের হইয়া গিয়াছে।

বৃহস্পতির মধ্যভাগ ক্ষীত হইবার কারণ অতি সহজেই বোধগম্য হইবে। কাদার জায় নরম পদার্থ নির্মিত একটা বলের ভিতর দিয়া একটা শলাকা ঢুকাইয়া যদি দ্রুত ঘুরাণ যায় তাহা হইলে সেট বলটার দ্রুত প্রাস্ত ক্রমেই চাপা হইয়া বাইবে এবং মধ্যভাগ ক্ষীত হইবে। কেন্দ্রাপসারিণী গতি (centrifugal force) ইহার একমাত্র কারণ। আমাদের পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ উপগ্রহ এক সময়ে কোমল ছিল এবং এখনও জায় সেই সময়েও উহার আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিত এইজন্য সকল গ্রহ উপগ্রহের মধ্যভাগই ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং দুই প্রান্ত চাপা হইয়া গিয়াছে। যে বস্তু বত দ্রুত ঘুরে সেই বস্তুর মধ্যে কেন্দ্রাপসারিণী গতি তত প্রবল হয়। পৃথিবী অপেক্ষা বৃহস্পতি অধিকতর দ্রুত পাক দেয় এইজন্য বৃহস্পতির মধ্যভাগ পৃথিবীর মধ্যভাগ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষীত হইয়াছে। বৃহস্পতির কুলা অংশে অর্থাৎ নিম্নরেখার নিকটবর্তী স্থানে উহার ব্যাসের পরিমাণ ৮২৬০০ মাইল কিন্তু দ্রুত প্রাস্তের নিকট ব্যাস ৮৫০০০ মাইল। মধ্যভাগটা অতিশয় ফুলিয়া উঠাতে ঐ স্থানের ব্যাস ৫৬০০ মাইল অধিক হইয়াছে।

বৃহস্পতি পৃথিবীর জায় কোন কঠিন পদার্থে গঠিত নয় বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন (Jupiter is not so far as we can see a solid body—Ball.) পৃথিবী যেমন পূর্বে কোমল বাষ্পাকারে নিরাজিত ছিল বৃহস্পতিও এখন সেই অবস্থায় আছে। হয়তো ভবিষ্যতে বৃহস্পতি ও পৃথিবী এবং

অপর্যাপ্ত জলের জায় কঠিন হইবে। বৃহস্পতির দ্যে যে কঠিন নয় এক্ষণে অনুমান করিবার কারণ আছে। পূর্বে বলিয়াছি প্রায় তের শত পৃথিবী একত্র করিলে আয়তনে বৃহস্পতির সমান হইবে। যদি বৃহস্পতি পৃথিবীর জায় কোন কঠিন পদার্থে নিম্নিত হইত তাহা হইলে বৃহস্পতির ওজন পৃথিবীর ওজনের তের শত গুণ অধিক হইত। কিন্তু বাস্তবিক বৃহস্পতির ওজন পৃথিবীর ওজন হইতে মাত্র তিন শত গুণ অধিক। In mass he does not exceed our earth so greatly ; but still it would require the mass of three hundred earths to make up jupiter's—R. A. Proctor.

আমাদের আশাস ভূমি পৃথিবী যখন বাষ্প শিঙাকারে শূন্য পথে পরিভ্রমণ করিত তখন উহার আয়তন বর্তমান আয়তনের শত গুণ বৃহৎ ছিল কিন্তু ওজন এখন যাহা আছে তখনও তাহাই ছিল। অতএব সেই বৃহদায়তনের তুলনায় তখন পৃথিবীর ওজন যে খুব কম বলিয়া বিবেচিত হইত সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

পৃথিবী ক্রমে শীতল হইয়া ঘন ও কঠিন হইয়াছে এবং উহার আয়তনও ক্ষুদ্র হইয়াছে। ভূগর্ভে এখনও পূর্বে উত্তাপ কতক পরিমাণে নিত্যমান রহিয়াছে। ভূগর্ভের যত নীচে যাওয়া যায় উত্তাপও তত বৃদ্ধি পায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০ মাইল নীচে এত উত্তাপ যে তথায় কঠিন মাতৃ সকল অশ্লব সময়ের মধ্যে দ্রব হইয়া যায়। চন্দ্রও পূর্বে বাষ্প শিঙা ছিল কিন্তু চন্দ্র এখন একবারে শীতল হইয়া গিয়াছে, এত শীতল হইয়াছে যে চন্দ্রের আয়তনগরি সমুদ্র হইতে আর অঙ্গাঙ্গম হয় না। উত্তরা চিরদিনের তত্ত্ব নির্ধারণ হইয়া গিয়াছে। মঙ্গল, শুক্র, বুধ ও পৃথিবী শীতল হইয়া কঠিন হইয়াছে এবং উহাদের আয়তনও ক্ষুদ্র হইয়াছে কিন্তু বৃহস্পতি, শনি উইরেনাশ্, নেপচুন এখনও উত্তপ্ত রহিয়াছে ; উহাদের উপাদান ঘনীভূত হইয়া কঠিন হয় নাট বহুজাত আয়তনের তুলনায় উহাদের ওজন খুব কম। যখন ঐ সকল গ্রহ শীতল হইবে তখন উহাদের উপাদানও ভাট্টা বাধিলে এবং আয়তন ক্ষুদ্র হইবে। তখন আর আয়তনের তুলনায় ওজন নিতান্ত সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

বৃহস্পতি যে এখনও বাষ্পাকারে বিরাজিত সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। আর একটা ঘটনার পূর্বোন্নিখিত অনুমান সত্য বলিয়া নির্দ্বিগ্নিত হইয়াছে। বৃহস্পতির আকৃতি বড়ই পরিবর্তনশীল। দূরবীক্ষণ দ্বারা উহার উপরিভাগের যে দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় তাহা এক এক সময় এক এক রকম দেখায়।

উতার এক কারণ এই হইতে পারে যে বৃহস্পতি অতি দ্রুত পূর্বদিক পাক
এইজন্য উতার পৃষ্ঠের অবস্থার এক দ্রুত পরিবর্তন হয়। কিন্তু উতা একমাত্র
কারণ হইতে পারে না। বৃহস্পতির পৃষ্ঠে যে সকল কক্ষ দাগ দৃষ্টিগোচর হয় এই
সকল দাগ তির্যক নির্দিষ্ট সময়ে বুরিয়া আসিবার কথা কেন না বৃহস্পতির গতি
পরিবর্তিত হয় না, মঙ্গল একপ্রকার পাক। কিন্তু এই সকল দাগগুলি কখন দ্রুত
কখন বা ক্রমে পাকটিত হয়। পৃথিবীর দীর্ঘদিন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষাদ্বারা
হিঁর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই সকল দাগ আর কিছুই নহে, কেবল মেঘমালা।
দ্রুত মেঘমালা উৎপন্ন হইয়া বৃহস্পতির দ্রুতকে মঙ্গল সমাচ্ছন্ন করিয়া
রাখে। বৃহস্পতির পৃষ্ঠে অনবরত প্রবল ঝড় বহিতেছে। সেই ভীষণ
ঝড়িকার মেঘসমূহ একস্থান হইতে অল্পস্থানে বিতাড়িত হইয়া পাকে। বৃহস্পতির
বায়ুমণ্ডলী এক মুহূর্ত্তে জ্বল ও স্থির থাকিতে পারে না। মেঘসমূহও সেইজন্য
মঙ্গল আকার পরিবর্তন করে অথবা বারি বর্ষণ করিয়া একবারে নিঃশেষিত
হইয়া যায় এবং আবার নূতন মেঘ উৎপন্ন হয়। *

বৃহস্পতির পৃষ্ঠে ভীষণ ঝড় বহিতে থাকে। সেই ঝড়ের মত প্রবল ঝড়
যদি পৃথিবীপৃষ্ঠে বহিত তাহা হইলে গাছপালা বাড়ী ঘর কিছুই থাকিত না—
সকলই উড়িয়া যাইত। বৃহস্পতির ঝড়ের গতি প্রতি ঘণ্টায় দুই শত মাইল
আবার সেই ঝড় ছুট মাস আড়াই মাসকাল স্থায়ী হয়।

বৃহস্পতি-পৃষ্ঠে এমন ঝড় হয় কেন এবং এত মেঘই বা জন্মে কেন ইহার
কারণ নির্ধারণ করা কঠিন নহে। সূর্যের উত্তাপই পৃথিবীর ঝড়ের একমাত্র
কারণ। এবং সূর্যোত্তাপই পৃথিবীপৃষ্ঠে জল বাষ্প পরিণত হইয়া আকাশে
উঠে ও উহাতে মেঘের উৎপত্তি হয়। সূর্যে ভয়ানক ঝড় হয় তাহার কারণ
সূর্যে অচিস্তনীয় উত্তাপ। সুতরাং বৃহস্পতিপৃষ্ঠেও অসামান্য তাপমাত্রা
বশতঃই এত ঝড়, মেঘ ও প্রবল বৃষ্টি হইয়া পাকে।

দূরবীক্ষণদ্বারা পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে, অনবরত বৃহস্পতিপৃষ্ঠে হইতে
বাল্প আকাশে উঠিতেছে এবং সেই বাল্প আবার বৃষ্টিরূপে বৃহস্পতির পৃষ্ঠেই

* But these cloud zones change sometimes so rapidly in shape as to show that either some of the clouds discharged thier contents in rain and new clouds have been very rapidly formed or else that great cloud masses have been carried along with enormous rapidity by winds of hurricane force.

R. A. Proctor.

পতিত হইতেছে। বৃহস্পতি এখনও এত উত্তপ্ত যে জল উহার দেহ স্পর্শ করিবা মাত্রই পুনরায় বাষ্প হইয়া উঠে উঠে। এখন প্রশ্ন এই, বৃহস্পতি এত উত্তাপ কোথা হইতে প্রাপ্ত হয়। নিশ্চয়ই সূর্য্য হইতে এই তাপ আসে না। যদি সূর্য্য হইতে উত্তাপ আগিয়া বৃহস্পতির দেহ এরূপ উত্তপ্ত হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে সূর্য্যের উত্তাপ আরও কত ভীষণ হইত। যেহেতু পৃথিবী সূর্য্যের অধিকতর নিকটবর্তী। সূর্য্য হইতে পৃথিবী যে উত্তাপ পায় বৃহস্পতি তাহার পঁচিশভাগের একভাগ মাত্র উত্তাপ পাইয়া থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর ভ্রাম্য বৃহস্পতি এখনও শীতল ভর নাই উহার পূর্ব্ব তাপই এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই তাপেই বৃহস্পতি এখনও বাষ্পা-
কারে বিরাজিত আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহগুলি একবারে শীতল হইয়া গিয়াছে, বিরাটদেহ বৃহস্পতি একবারে শীতল হইতে আরও কত শতাব্দী লাগিবে তাহা নির্ণয় করিয়া বলা অসম্ভব। কিন্তু একদিন যে বৃহস্পতিও পৃথিবীর ভ্রাম্য কঠিন এবং শীতল হইয়া পড়িবে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন জ্যোতির্বিদ অনুমান করেন, কালে আমাদের প্রভাকরও প্রভাতীন হইয়া নির্ঝাঁপ হইয়া যাইবে। বহু লক্ষ বৎসর পর ন্যাক সূর্য্য একবারে শীতল হইয়া যাইবে। ইহা অনেক দূরের কথা সুতরাং তজ্জন্ত আমাদের ভীতিবিহ্বল হওয়ার কোনই আশঙ্ক নাই।

পৃথিবীর একটা চন্দ্র উহাকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর পরবর্তী গ্রহ মঙ্গল ; উহারও দুইটা চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। মঙ্গলের পরবর্তী গ্রহ বৃহস্পতি উহার চারিটা চন্দ্র। এই চন্দ্র চতুষ্টয় যখন একবারে আকাশের গায় প্রকাশিত হয় তখন অপূর্ব্ব মাদুরী দিখান পায়। কিন্তু বৃহস্পতিপৃষ্ঠ হইতে সে অনির্লচনীয়া সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যেহেতু বৃহস্পতির আকাশ সর্বদাই নিবিড় বাষ্পরাশি ও ঘনকুক্ষ মেঘমালাদ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে। তারপর আমাদের চন্দ্র চতুষ্টয়ে বৃহস্পতির চন্দ্র অনেক বৃহৎ হইলেও অধিকতর উজ্জল নহে। আমাদের চন্দ্রের ভ্রাম্য বৃহস্পতির চন্দ্রও সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্য এত দূরে যে ঐ সকল চন্দ্র অতি সামান্য আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৃহস্পতির চারিটা চন্দ্রের আলোক একত্র হইলেও আমাদের একমাত্র চন্দ্রের আলোকের সমান উজ্জল হয় না। তারপর ঐ সকল চন্দ্র এক সময়ে আকাশে উদ্ভিত হইলেও একবারে বোল কলার পূর্ণ হয় না। তারপর নিকটতম চন্দ্রটী যখন সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে তখন বৃহস্পতির ছায়াই ঢাকা পড়িয়া যায়।

বৃহস্পতির চন্দ্রগুলি স্থল দৃষ্টিতে কোন কাজে আসে বলিয়াই মনে হয় না। কিন্তু ভগবান তাহাদিগের দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন করিতেছেন তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত।

বৃহস্পতিপৃষ্ঠ বেক্রণ ভয়ানক ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং তথায় এক্রপ ভীষণ উত্তাপ যে বৃহস্পতিতে কোন প্রাণী বাস করিতে পারে বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। কিন্তু ভগবান সেই স্থানের উপযোগী কোন প্রাণী সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন কি না তাহা কে বলিতে পারে ?

জ্যোতির্বিদ প্রক্টার বলেন, বৃহস্পতিপৃষ্ঠ অপেক্ষা উহার চন্দ্র চতুষ্টির প্রাণীবাসের অধিক অধুনা। সমুজ্জ্বল সুবিশাল বৃহস্পতি সূর্যের জ্বাল মধ্যস্থলে বিরাজিত তাহার চারিদিকে চন্দ্রচতুষ্টয় গ্রহের জ্বাল পরিভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্রগুলিতে প্রাণী-বাস করা বিচিত্র নহে। বাস্তবিক চন্দ্র পরিবৃত্ত বৃহস্পতি অনেকটা সূর্য্যস্থানীয় এবং বৃহস্পতির রাজ্যটা যেন আর একটা মৌরজগত। বৃহস্পতির চারিটা চন্দ্র বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল গ্রহের জ্বাল বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্য ঐ সকল গ্রহের অধুপাতে বত বড়, বৃহস্পতিও উহার চন্দ্রগুলির অধুপাতে তত বড়।

শ্রীমতীশ্রীনাথ মজুমদার ।

শ্রীহরিনাম-সূত্র ।

ধর্ম্মমূলীন-ব্যপদেশেই বাক্যালিগণ পূর্বে সাহিত্য-চর্চায় রত হইতেন। প্রাচীন সাহিত্যাস্তর্গত যে কোন গ্রন্থ বা বিষয়-আলোচনা হইতে তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। ফলে সেকালের সমগ্র সাহিত্যটাই ধর্ম্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মকথার সহিত সম্পর্কিত নহে, প্রাচীন সাহিত্যে এমন গ্রন্থ অতি বিরল। অনেক গ্রন্থ শুধু ধর্ম্মপ্রসঙ্গ বিবৃত করিবার উদ্দেশ্যে বিরচিত দেখা যায়। তা ছাড়া, গ্রন্থগুলির নামে পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রসঙ্গের ছাপা আঁটিয়া দেওয়া ভইয়াছে। এই প্রবন্ধের শীর্ষোক্ত গ্রন্থখানিও আমাদের তথ্য কথিত গ্রন্থরাজির মধ্যে অন্তর্গত। ইহা একখানি ক্ষুদ্র বৈষ্ণবগ্রন্থ। গ্রন্থখানির নামেই তর্জণিত বিষয় সূচিত হইতেছে। বৈষ্ণব-সমাজে ইহার প্রভাব প্রতিপত্তি কতদূর, তাহা না জানিলেও ইহা যে তৎসমাজের সমাদর-যোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহার রচয়িতা 'দ্বিজ রামেশ্বর' সম্বন্ধে কিছুই জানা যাইতেছে না । পুঁথি-
খানি প্রাচীনকালের রচনা বটে, কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত প্রতিলিপিখানি আধুনিক ।
কেবল আধুনিক হইলেও ক্ষতি ছিল না, উহা বড়ই কদর্যাভাবে লিখিত ও
নানাস্থানে অসম্পূর্ণ ও অন্তর্ভুক্ত বহিরা বোধ হয় । পুঁথিখানি সম্ভবতঃ এই
প্রথম বিস্তৃত হইল ; সুতরাং ইহা যে দুর্লভ, তাহা বলাই বাহুল্য । একুণ
দুর্লভ গ্রন্থ অপূর্ণতা অথবা অবিস্মৃতির জন্য অনাস্থ হউক, ইহা কোনমতেই
বাহ্যনীয় নহে ভাবিয়া আমরা ইহা এখানে প্রচারিত করিয়া দিলাম । আশা
আছে, সহস্র পাঠকগণের তত্ত্ব একদিন ইহার পূর্ণতা বিহিত হইবে । পুঁথি-
খানি যেখানে যেমন ছিল, অবিকল তাহাই উদ্ধৃত হইল । কথা :—

শ্রীহরি ।

শ্রীহরিনামের সূত্র ॥

ছয় দল অষ্টদল আর ষোল দল ।

নামসূত্র জন্মস্থান গোলক মণ্ডল ॥

এক গোপাল এক গোপী ষোলদলে শেলা ।

অষ্টদলে সংকীর্তন গোপীগনে কৈলা ॥

ষোলদলে নামসূত্র ভূমি প্রচার ।

অষ্টদলে সংকীর্তন জীবের নিস্তার ॥

ছয় দলে ছ' অক্ষর তিন নাম সার ।

তিন নামে তিন দীক্ষ গোপু (গুপ্ত) সমাচার ॥

রূপাধীশ পরাধীশ মগধীশ কাম ।

তিন বীজে পূর্ণ হয় শ্রীহরির নাম ॥ ৫

সেই নাম হৈতে হুন্ম অনন্ত কোটি ধাম ।

দিবানিশি জপে জীব নাহিক পিতাম ॥

গুপ্ত কোটি মহামন্ত্র চিন্তিতে বিশ্রাম ।

আর কোন মন্ত্র নাই শ্রীহরিনামের সমান ॥ *

ষোল নাম—বজ্রিশ অক্ষর বজ্রিশ দেবতা ।

কোন অক্ষরে কোন দেবতা না কৈল গর্ব্বা ॥

* 'হরিনামের সমান' স্থলে 'কৃষ্ণসূত্রের সমান'—পাঠান্তর ।

(শুনিয়া আচার্য্য কহে ফল না কহিব ।)
 পরিণামে জিজ্ঞাসিলে সকলি কহিব ॥ (?)
 আচার্য্য বলেন শুনি পূর্ববশ তরি ।
 আর কিছু কহ কথা শুনি কর্ণভরি ॥ ১০
 ঐকন নামে ছয় অক্ষর ছয় দলে বৈসে ।
 কোন অক্ষরে কোন ফল কহিবা বিশেষে ॥
 চৈতন্য বলেন শুনি আচার্য্য মহামতি ।
 যথ অক্ষরের ফল শুনি একমতি ॥

সুবর্ণের বর্ণ হয় রবির সমান ।
 হ উচ্চারিতে পাপ হয়েত খণ্ডন ॥ *
 হ উচ্চারণ যদি মহাপাপী করে ।
 অবিলম্বে চলি যায় গোলক মণ্ডলে ॥
 রে উচ্চারণ যদি মহাপাপী করে ।
 অবিলম্বে চলি যায় গোলক মণ্ডলে ॥ ১৫
 ক-কার অক্ষরটি কোটা সূর্য্য সম ।
 স বলিতে পলাই পাপ সূর্য্যোদয়ে ভস ॥
 ছই নাম যুক্ত করি যেই জনে লয় ।
 করে কৃষ্ণ রাম নাম তারকত্রয় ॥
 ঐগুরু কপালে পাপ সব যায় ক্ষয় ।
 সৰুপাপ নাশে তার শ্রোমের উদয় ।
 ক-কার অক্ষর বর্ণ কোটিরূপ ধরে ।
 সপ্তকোটি জন্মের পাপ তৎক্ষণে ধরে ॥
 র অক্ষর জ্যোতির্ময় রূপ ধরে অতি ।
 ঃ উচ্চারিতে পাপ নাশ হয় স্রুতি ॥ ২০
 স বলিতে পাপনাশ অঙ্গ অনির্মল ।
 তুলারামি দহে যেন প্রবল অনল ॥
 করে কৃষ্ণ রাম নাম তারকত্রয় ॥
 ঐগুরু কহিলে কর্ণে সৰুপাপ ক্ষয় ॥



ত্রিচৈতন্ত চরণে কহে দ্বিজ রামেশ্বর । *

ভক্তিভাবে যেবা শুনে † মুক্ত সেই নর ॥

∴ _____ ∴

করজোড়ে কহে সেই চৈতন্ত চরণে ।

হরে২ অষ্টবার কৃষ্ণ চারি কেনে ॥

রাম২ চারিবার বলি কি কারণ ।

শুনিতে এই সব কথা লয় মোর মন ॥ ২৫

এই কথা শুনিয়া প্রভু হাসিতে লাগিল ।

প্রেমভাবে আচার্য্যকে আলিঙ্গন দিল ॥

শুন২ আচার্য্য মোর প্রশ্নের দোসর ।

তোমি বিনে বাক্যব কেবা আছে মোর ॥

অতি বড় গুপ্তকথা কৈতে অহুচিৎ ।

আচার্য্যে পরিচয় পাইলে দেখিবে বিহিত ॥ (১)

পরমহংস মন্ত্র জীবে জপে মৌরে ।

সবের আঙ্কাদী রাখা তারে বোলে হরে ॥ ‡

ঋষাশৃঙ্গ সুবাচক নির্বিগ্রহ মতিনাথ ।

অতএব প্রভুর নাম বলি কৃষ্ণ ॥ ৩০

নিকাম নিত্যানন্দ শ্রাম কলেবর ।

অতএব কৃষ্ণ বলি গৌলক জৈশ্বর ॥

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডনাথ সেই গুণধাম ।

বেদ পুরাণে সবে জানে কৃষ্ণনাম ॥

নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ সেই সে সকল ।

গুণাবিত মহাপ্রভু চৈতন্ত কেবল ॥

কমল আশ্রয় মাত্র সুখযুক্ত নিরন্তর ।

ভাষারে সে রাম বলি শুনহ সত্বর ॥

* ‘চরণে’ স্থলে ‘কৃপাত্র’ ও ‘দ্বিজ’ স্থলে ‘দীম’ পাঠান্তর ।

† ‘যেবা শুনে’ স্থলে ‘শুনে যেবা’ পাঠান্তর ।

‡ ২৯ পদের পর “ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি শিবে জপে বাদে । সুবের আঙ্কাদী

যোগীর অন্তরে যেন রাম অক্ষয় ।
 তাহারে সে রাম বোলে শুনহ কাষণ ॥ ৩৫
 কৃষ্ণে বিলাস করে রাধার সতিতে ।
 অতএব রাম নাম শুন সাবধিতে ॥
 অতি শুভ কমল নান তারক ব্রহ্ম হয় ।
 শ্রীশুক কৃপাতে পাপ সন হয় ক্ষয় ॥
 ষোল নামের সূত্র এই কহিলাম তোমারে ।
 অবনীতে প্রচার নাম জীব তরিবারে ॥
 শুর মুখে যেন না শুনে হরি নামের সূত্র ।
 তাহার হস্তের অঙ্গুলি নিষ্টা মূত্র তুল্য ॥
 হরির নাম হেন বস্তু না শুনে কর্ণ পথে ।
 চৌরাশী নরকের ভোগ ভোগে জন্ম পথে ॥
 এই সূত্র সাঙ্গ ।

প্রচলিত ‘আচার্য্য’ কে, তাহা আমরা অবধারণ করিতে অক্ষম । স্থানে
 স্থানে মহাপুরুষ চৈতন্য দেবকে যখন বর্ণনীয় বিষয়ের বক্তৃ-রূপে দেখা যাইতেছে
 তখন এই সম্বন্ধ বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা কষ্টিন্না হইতে পারে ।

বলিতে ভুলিঃছি, এই পুথি খানি চট্টগ্রাম আনোয়ারা অঞ্চলস্থ সিংহরা
 গ্রামবাগী জনৈক যোগীর (যোগী জাতী) নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে ।
 আবহুল করিম ।

প্রণয়ী-যুগল ।

কুমার উঠিল অঙ্গে রাজার মেয়েরে
 লইল তুলিয়া কোলে ;
 নিদ্রার কোমল অঙ্গে স্রব্ধ তখন ধরা
 দিবসের প্রান্তি ভূলে ।
 নিবিড় আঁধারে তারি অতি সন্ধ্যাপনে আসি
 পহছিল নদীতীরে,
 কুমার মাঝিরে থাকি বলিল ব্যাকুলকণ্ঠে
 “নিষে চল পর পারে ।”

“উঠিছে পূর্বে রবি আলোকে ছাইল দেশ
 বিলম্ব সহে না আর,
 বেয়ে চল ক্ষুণ্ণগতি এখনি দিতেছি আমি
 বাহা চাপু পুরস্কার ।”

“কটিকা বহিছে বেগে গাছের ছত্রঙ্গমালা
 সহস্র ফণীদল মন,
 কে তোমরা এ সময় সেতে চাপু পর পার,—
 কেন গো সাহস এত ?”

“ভীরু নিনীপে মোরা ছাড়িয়া রাজার পুত্রী
 আগিয়াছি ছদ্মবেশে
 প্রাণেতে জাগিয়া রাজা নাশিতে নোদের প্রাণ
 পশ্চাতে দাইবে রোষ ।

“ধরিতে পারিলে হেথা নিশ্চয় মরণ মোর
 রক্ষিতে নারিবে কেহ,
 ভাসাইয়া দিলে জলে তীক্ষ্ণ তরবারি ঘরি
 শতশত করি দেহ ।

দেখ গো সঙ্গিনী মোর কাঁপিছে ধরিয়া গলি
 কোমল ব্রতীপায়,
 মজল আনত আঁশি, চাক চন্দ্রানন তার,
 মলিন হয়েছে তার ।

উঠিছে পূর্বে রবি আলোকে ছাইল দেশ
 বিলম্ব সহে না আর,
 বেয়ে চল ক্ষুণ্ণগতি এখনি দিতেছি আমি
 বাহা চাপু পুরস্কার ।”

“হোক বড় বজ্রপাত নিয়ে বাস পরপার
 নাহি চাহি পুরস্কার,
 তব প্রেমসীর স্নান সজল নয়ন ছুটী
 বাকুল করেছে প্রাণ ।”

“ওগো চল বেয়ে তরি থেক না এখানে আর”
 বলিল ডাকিয়া বালা,

“ক্রোধাক্ষ গিতারে ডরি নাহি ভীত দেখি এই
উদ্ভাল তরঙ্গমালা ।”

অনিচ্ছায় কর্ণধার কাতর মিনতি শুনি
চলিল বাহিয়া ডরি ;

গর্জিল আকাশে মেঘ ভীম প্রভঞ্জন বেগে
বহিল হকার ছাড়ি ।

কৃণ ছাড়ি এল তারা অতিকষ্টে অবশেষে
গভীর নদীর বুকে,

ঘুরিতে লাগিল তরি পড়িয়া আবর্ত মাঝে,
—নাহি যায় কোনদিকে ।

ব্রথা হলো এত শ্রম যায় বুঝি ডুবে তরি
গঞ্জিনী উঠিল কাঁদি,

চিস্তাকুল যুবা তায় গাঢ় আলিঙ্গনে বুকে
ষতনে লইল বাঁদি ।

এমন সময় তথা গঠৈছে আসিল রাজা
যেন মৃত্যু-অবতার,

শোণিত-লোলুপ-অঙ্গি ঝলগিছে রবিকরে
নয়নে ক্রোধাম্বি তার ।

একটা মৃণাল-বাছ আবেগে জড়াবে বালা
প্রণয়ীর গলদেশে

সত্যে অপর ভুজ দিল প্রসারিয়া
পিতার সাহায্য আশে ।

দেখি সে করুণদৃষ্ট চিন্তিত হইল রাজা
দ্রবিল তাহার প্রাণ,

কাতরে বলিল ডাকি “ফিরে এসো কূলে স্বরা
অভয় করিছি দান ।

ক্ষমিলাম বৎসে তব প্রণয়ীর অগরাধ
এস মোহে কূলে ফিরে ।”

কিন্তু সে তরঙ্গমাঝে নারিল ফিরাতে তরি
প্রাণপণ চেষ্টা করে ।

দেখিতে দেখিতে যায় কটিকা বহিল বেগে

গভীর ছক্কাব ছাড়ি।

না পারি ঠিঠিত আর ভীষণ তরঙ্গ মাঝে

ডুবিব অতলে তরি ।

পেন আলিঙ্গন করি যুবক যুবতী ভায়

সমাধি কভিল জগে

বাথিত ছায়ে রাজা ফিরিল আপন গেষে

অলি অমুদ্রাশানলে । •

শ্রীমতী ক্রনাত মজুমদার ।

বাস্তবতার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুর্বস্থা ।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে শরীর-রক্ষণাগোষ্ঠী আহার পরিচ্ছা ও বাসস্থান সকলেরই চাই। মানুষ শুধু বাঁচিয়া থাকিতে চায় না, সুখে থাকিতে চায়। সে কোনও মতে বাঁচিয়া আছে, আর কোন সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে পায় না তাহাকেই যখন আমরা দরিদ্র বলি, তখন কোনও মতে বাঁচিয়া থাকিবার দায়, শুধু বাঁচিয়া থাকিতে যাতা চাই, তাও যার নাই, তাকে কি বলিব আমি না। উহা অপেক্ষা ছাব্বস্থা আর কিছু হইতে পারে না। এরূপ হতভাগ্য যারা, তাঁদের জীবনধারণ নিঃস্বনা মাত্র। বাস্তবতার আজকাল এই অবস্থা, এমন একেবারে না হউক, এতভায়ে চলিলে অচিরেই সে এই অবস্থা হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আত্মা, পরিশেষ গৃহপকরণ প্রভৃতি মানুষের জীবনধারণের অস্ত্র যাহা চাই তাহাই প্রকৃত মন। সে দেশে ঐ সব বস্তু বেশী আছে, সে দেশের লোকের পক্ষে ঐ সব বস্তু সহজলভ্য, সেই দেশের লোক তত ধনী তত সুখী। টাকা কড়িতে সর্করাবার প্রয়োজনীয় পদার্থ সুবিধায় মিলান যায়, তাই টাকাকড়ির আদর, তাই টাকাকড়িকে আমরা ধন বলি; নহিলে টাকাকড়ি খাইবার জিনিস নয়, পরিবার জিনিস নয়, টাকাকড়ি দিয়া ঘরবাড়ীও কেহ গড়িতে পারে না। দেশে টাকাকড়ি না থাকিলেও কোনমতে চলে, কিন্তু ভাতকাপড় না হইলে চলে না।

• একটা ইংরেজী কবিতার ছায়া লইয়া লিখিত।

এক দেশে মাসিক পাঁচ টাকা আয়ে লোকের স্বচ্ছন্দ দিন চলিয়া যায়। অল্প দেশে মাসিক ১০০ টাকাতেও সেই ভাবে দিন চলে না। কোন্ দেশকে আমরা মনা বলিব? সকলেই এক উত্তর দিবেন। টাকা হিসাবে যে মাই আর ককর তাহাতে কিছু আসে যায় না। সেই টাকাতে কি পরিমাণে আবশ্যকীয় জিনিষ পত্রাদি জোটে, তাই দেশের প্রকৃত অবস্থা নিচায় করিতে হইবে। যাহা আমাদের প্রয়োজন তাই যখন প্রকৃত ধন; টাকায় কি পরিমাণে সেই ধন পাওয়া যায় তাই বুঝিয়া যখন টাকার আদর; যখন অভাবই যখন দারিদ্র্য, টাকার অভাব নয়; যখন দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে মনবুদ্ধি করিতে হইবে। দেশের ধন না বাড়িলে, শুধু টাকাবুদ্ধি অথবা টাকা হিসাবে ব্যক্তিগত আয়বৃদ্ধিতে দারিদ্র্য দূর কখনও হইতে পারে না। মনবুদ্ধির চেষ্টা না করিয়া শুধু টাকা অর্জনে যাত্রা যত্নশীল, তাহের দারিদ্র্যও কখনও ঘোচে না। কৃষ ও শিল্প ধন উৎপাদিত হয়। বাণিজ্য উৎপাদিত ধন দেশের সকলের সম্বলসাধ্য হয়। সুতরাং কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসারে যাহারা নিযুক্ত, দেশের ধন তাহাদেরই হাতে। চাকুরী প্রভৃতি অল্প উপায় বাহারা অর্থোপার্জন করেন, তাহাদিগকে জীবিকার জন্ত অনেক পরিমাণে ইহাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই জন্য কোন প্রতিকূল কারণ নিতনান না থাকিলে স্বভাবতঃই পূর্ণবয়স পর্যন্ত বৈতনভোগী চাকুরীর অপেক্ষা কৃষ, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল।

• বাঙ্গালী কৃষিপণ্য দেশ, কৃষিকাজে প্রসারিত বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ধন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রভৃতির গুণ ক্রমকই সেই ধনের প্রধান ভোক্তা। বাঙ্গালার সেই কৃষকসম্প্রদায় প্রায়ঃ নিম্নশ্রেণীর লোক। বিদেশীয় শিল্পের প্রতিবাগিতার দেশীয় শিল্পের অনেক অনিষ্ট হইয়াছে যত, কিন্তু শিল্প না আছে তাও সাধারণঃ নিম্নশ্রেণীর হইতে। ব্যবসা বাণিজ্যও একরকম তাহারাই করে। মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায় সাধারণঃ চাকুরী বা আইন ও চিকিৎসা প্রভৃতি স্বাধীন ভদ্র ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন। বাঙ্গালার ভদ্রসম্প্রদায় অপেক্ষা চাষার অবস্থা যে মোটের উপর ভাল ইহা সকলেই আজকাল স্বীকার করেন। আবার ভদ্রমোকের নত বংশধরও আছে, চাষার তত নাই। মোটা ভাতকাপড়ে তাহের দিন বেশ যায়, কিন্তু বিলাসিতার ভদ্রমোকের অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়াছে।

চাকুরী করা কোন হাঙ্গামা নাই, নিয়মবান্না কাছড়পি করিয়া বাইতে পারিগেই

নিশ্চিতভাবে দিন কাটিয়া যাইতে পারে, তাই আরামপ্রিয় ক্লেশকুষ্ঠ শিফিত বাঙ্গালী চাকুরীই খুঁজেন। কিন্তু চাকুরী হইলে সুবিধা হয় বলিয়া কেহ কাহার জন্য চাকুরী লইয়া বলিয়া আছে? প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাকুর কেহ রাখে না। তাই চাকুরী চাহিলেই মেলে না। চাকুরী পাওয়া যায় না বলিয়া অনেকেই উকিল মোক্তার ডাক্তার কবিরাজ হইতেছেন। আমাদের আর কোন গুণ থাক আর না থাক, আর কিছুতে কষ্ট করিতে পারি না পারি, শরীরপাত করিয়া পড়িয়া পরীক্ষায় পাশ হইতে পারি, সুতরাং ইচ্ছা করিলে উকিল মোক্তার ও ডাক্তার কবিরাজ সাজিয়া বসিতে পারি। কিন্তু তাহাতেই যে দেশের লোক সব অনবরত বিবাদ বিসম্বাদ ও মানলা মোকদ্দমা করিয়া বা নানাবিধ বোগগ্রস্ত হইয়া আমাদের ঘরে আনিয়া টাকা চালিয়া দিবে, এমন হইতে পারে না। বস্ত্র ও পরিশ্রম অবস্থা-উন্নতির প্রধান উপায় এ কথা সত্য, কিন্তু বস্ত্র ও পরিশ্রম উপযুক্ত ক্ষেত্রেই কেবল সকল হয় হালগরু লইয়া গরুভূমি বর্ষণে শত জন্মে না, মরু-সাগরে জাল ফেলিলে মাছ মেলে না, পাগড় খুঁড়িলে জল আসে না। কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায়ের বস্ত্র ও পরিশ্রম করিলে, ধনবৃদ্ধি হইবে, তাহাতে লোকের অবস্থা ভাল হইতে পারে। যে সব কাজে ধনোৎপাদন বা ধনবৃদ্ধির কোন সম্ভব নাই তাহাতে যত পরিশ্রমই লোকে করুক, অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইতে পারে না। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি গবর্ণমেন্ট বড় চাকুরীগুলি বাঙ্গালীকে দেন না। তাই আমরা এত দুঃখী। কিন্তু বড় চাকুরী কয়টি আছে? খুব বেশী হইলেও ছই তিন শতের উপর হইবে না। গবর্ণমেন্ট যদি এই চাকুরীগুলি সব বাঙ্গালীকে দেন, তবে ছই তিন শত বাঙ্গালী বড়লোক হইল। কিন্তু তাহাতে এই যে হাজার হাজার সামান্ত বেতনভোগী চাকুরে, হাজার হাজার চাকুরী প্রার্থী, হাজার হাজার নিম্নঃ আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী, ইত্যাদের কি হইবে? বড় চাকুরেরা কি তাঁহাদের মাসিক বেতন ইত্যাদিগকে ভাগ করিয়া দিবেন? দিলেই বা কি? তাহাতেও এ অভাব এ দুঃখ ঘুচিবে না। চাকুরে বাঙ্গালীর অধিকাংশই নিম্ন পঁচিশ টাকা বেতনে সামান্ত চাকুরে। আইন ও চিকিৎসা প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ীদেরও অধিকাংশের আর উহা অপেক্ষা বেশী হইবে না। প্রতি বৎসর চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা এত বাড়িতেছে যে সেই সামান্ত চাকুরীও আর মেলে না। ওকালতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাবৃদ্ধি আরও বেশী। বারা আহেন তাঁদেরই অল্প জোটে না, বারা বাইতেছেন তাঁদের যে কি হইবে তাবিরা হির করা যদি না। সকলেই এ কথা বোঝেন, স্বীকার করেন, অথচ সবাই

সেই এক গোজা নিষ্কণ পথে শাসিত হইতেছেন। ইহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর দিন দিন যে কি দুর্দশা হইতেছে, তাহা ভাবিয়া কুণ পাওয়া যায় না। বর্তমানেই এই ভীষণ দুঃখবহা, ভবিষ্যতে আমাদের সম্ভাব্য সমুদ্রবর্গের যে কি উপায় হইবে তাহা মনে করিলেও হৃদকম্প হয়। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যুবক কত আশার আকাশকুসুম গাঁথিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছে, আট দশ বৎসর কত অর্থব্যয়ে বহু পরিশ্রমে শরীরপাত করিয়া, কেহ উপাধি লইয়া কেহ না সে আশায় জলাঞ্জলী দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংসারক্ষেত্রে আসিতেছে, কিন্তু তাহাদের এত পরিশ্রম, এত স্বাস্থ্যনাশ, ইহার মূল কি হইবে? কোনও মতে জীবিকা নির্বাহের উপায়ও নাই। হায়, আমাদের এই সব শিক্ষিত যুবকদের সম্মুখে এই ঘোর নিরাশার অন্ধকার কি ভয়ঙ্কর, কি মনঃস্পর্শী যাতনাময়! ইহাদের নিম্নে আবার আরও কত সহস্র প্রাণপণ চেষ্টাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভই করিতে পারিতেছে না। ইহার সকলেই চাকুরী প্রার্থী, চাকুরী করিয়াই সকলকে জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে। ইহাদের ভবিষ্যতে যে কি তাহা বর্ণনার অতীত, ধারণার বহির্ভূত! ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অসহ্য আর কি হইতে পারে? এ দারিদ্র্য শুধু সুখস্বচ্ছন্দতার অভাব নয়, কোনও মতে জীবন ধারণোপযোগী অন্নবস্ত্রের অভাব! মানব সমাজে নিকৃষ্টতম দারিদ্র্য,—মানব জীবনের অতুলনীয় দুঃখ।

ইহার উপর এই সব হতভাগ্য যুবকগণ আবার বেশীর ভাগই বিবাহিত—ছুই চারটি সম্ভাব্যসন্ততি-গ্রস্ত। যার নিজের উদরামের সংস্থান নাট, তার স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভারবহন করিতে হইলে যে কি ভীষণ কষ্টে পরিতে হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুস্থ সবল দেহ পুরুষ যে প্রকারেই হউক, কায়ক্লেশে ছোট কি বড় কাজে, সুখে কি দুঃখে,—নিজের অন্ন-বস্ত্র নিজে জুটাইতে পারে। স্বদেশে না হউক, দূর দেশান্তরে যেখানে হয় যাইবে, নানা ভয় মরিনে—মরিয়া দুঃখ বজ্রগা হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ করিবে। কিন্তু বিবাহিত ও পরিবারগ্রস্ত হইলে তার আর উণায় নাই। কাছে না থাকিলে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ চলে না। আবার কাছে থাকিয়া পরিবারকে ভাতকাপড় দিয়া রাখিবে এমন কোন উপায়ও দেখে না। আপনার দুঃখ কষ্ট মান অগম্যন লোকে সহিতে পারে, কিন্তু প্রাণপেক্ষা প্রিয়তম স্ত্রীপুত্রাদির সামান্য অন্নবস্ত্রের অভাব, সৈজন্ত পরের অধীনতা, দিবারাজি নানা গল্পনা নানা অগম্যন মানব-জীবনে অসহ্য। হায় কত যুবক যে এই অসহ্য দুঃখ বুকে সাইরা বিষময় জীবন-

যাগম করিতেছেন তাঁহার ইয়ত্তা নাই! ভুক্তভোগী ব্যতীত এ যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতে আর কেহ পারেন না। এই বাল্য-বিবাহের বিষয় ফল হতভাগ্য যুবকদের একজীবনেই শেষ হয় না। ভাষণ দারিত্র্যে প্রতিপালিত সন্তানসন্ততিগণও আজীবন উপযুক্ত শিক্ষা ও সুশিক্ষিততার অভাবে চিরদিন কষ্ট পাটয়া যায়। এই বিষয়গুণ একবার যোগিত হইলে বংশানুক্রমে মরণে তাঁর ফলভোগ করিতে থাকে! সন্তানগণের বিবাহ দেওয়ার সময় কেহই একথা মনে করেন না। মনোনা পুত্রপুত্র সহস্র সলজ্জ মুগশোভা, পোষ্যপোষ্যীর স্নেহ অকোমল স্পর্শ, সুনিষ্ঠ আশ্রয় ভাব ইত্যাদি কামা সংসারস্থ ভোগের আশায়, অথবা হতভাগ্য কন্ডাদারপ্রস্তের সর্বসংহরণ করিয়া নিজের অভাবমোচন করিবার জন্য, অনেক পিতা অল্পযুক্ত পুত্রের দুর্দশ স্নেহে চিরদিনের মত দুর্দশ সহ তাঁর চাপাইয়া যান। তাঁরা বহুদিন জীবিত থাকেন, পুত্র স্বীয় স্ত্রীপুত্রের জন্য কোন কষ্ট পায় না সত্য কিন্তু তাঁহারা পরলোকগত হইলেই হতভাগ্য পুত্র পৃথিবী অন্ধকার দেখে। বিবাহ দেওয়ার সময় অনেকে পুত্রকে ‘স্থিতি’ করিয়া বাইবার কথা বলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা পুত্রকে চিরদুঃখে ‘স্থিতি’ করিয়াই যান। বাহাদুরের একপ অবস্থা নয় যে অভিভাবকের অভাব হইলেও পরিবার প্রতিপালন করিতে পারেন, অথবা অন্ততঃ সহজে পরিবার প্রতিপালনের উপযুক্ত হইতে পারেন, তাহাদের পক্ষে পরিবার প্রতিপালনের উপযুক্ত অবস্থাপন্ন না হইয়া বিবাহ করার মত ভূগ আর নাই। এ ভুল জীবনে আর শোধরাইবার উপায় নাই। জীবন ভরিয়া এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সন্তান সন্ততিগণ বংশানুক্রমে, এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অবশ্য অনেক সময় দরিদ্র পিতা মনীষতার সঙ্গে পুত্রের বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার ভবিষ্যতে উন্নতির উপায় করিয়া থাকেন। একপ অবস্থায় বিবাহ একেবারে অবিনোদনার কার্য্য একপ বলা যায় না। কিন্তু ইহাতে সমাজের আর একটা ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। ভুল্ললোকের কন্ডাদার যে ক্রমে কি ভীষণ হইতেছে তাহা আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না। অবস্থাপন্ন স্বত্ত্বের অর্থসাহায্যে পড়াশুনা করিয়া মানুষ হওয়া অনেক দরিদ্র যুবকের পক্ষে সুবিধা জনক সন্দেহ নাই, কিন্তু এক সর্ব বিষয়ে পরমুপায়েকো বাজালা ছাড়া একপ সুবিধা পৃথিবীর আর কোথাও বড় দৃষ্ট হয় না। সে সব স্বামেও অনেক দরিদ্র যুবক নিজের চেষ্টায় বড় হইয়া থাকেন। বাজালাতেই বরং স্বত্ত্বের রাশি রাশি অর্থ ধ্বংস সত্ত্বেও, অনেক যুবক যেমন তেমনিই থাকেন।

বাঙ্গালী ভ্রম সন্তানগণের দারিত্র্যের সে সব কারণ উল্লিখিত হইল, ইহা

কার্তিক, ১৩১০ সন।] বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুঃবস্থা ২২৯

ব্যতীত আরও দুই একটা আছে। যে কারণেই তটক দিন দিন আহার্য্য প্রাকৃতিক মুখ্য বৃদ্ধ হইতেছে। আগে যে পরসায় যে পারমাণে জ্ঞানপত্র মিলিত এখন সে পরসায় আর তা বেলে না। বিশ পাঁচশ বৎসর পূর্বে যা ছিল প্রয়োজনীয় জিনিস গজের মূল্য তাহা অপেক্ষা তিন চারগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার উপর দ্বিতীয় শিক্ষা ও সমাজের ক্রমবিকাশে আমাদের নানাপ্রকার বিগণিতা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে বড় চাকুরীদেরই অনেক সময় অভাব ঘোচে না স্ত্রীতে পাওয়া যায়। ছোট বিশ পাঁচশ বা দশ গনের টাকা বেতনের চাকুরীদেরও কথাই নাই। যদি জিনিসপত্র আগের মত সম্ভার মিলিত, বিগণিতার বাজেরচ এত না বাড়িত, তবে অন্ততঃ যাহারা চাকুরী করেন কোনও মতে তাহাদের এক রকম দিন চালাত। পঞ্চাশ বাট বৎসর পূর্বে আমাদের গিঠানদের আমলে বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানদের অবস্থা এত হীন ছিল না। তখন ভদ্রলোকগণ সকলেই একেবারে চাকুরীর উপর নির্ভর করিতেন না। অনেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় আহার্য্য নিজেরাই অনেক উৎপাদিত করিতেন। ভদ্র গৃহস্থগণের সকলেরই প্রথমতঃ এই প্রধান লক্ষ্য ছিল, যাহাতে কিছু ক্ষেত খামার করিতে পারেন যে বৎসরের প্রধান খাদ্য চাউল ও কলাই না কিনিতে হয়, ইহা ছাড়া গৃহস্থদের নানাপ্রকার আহার্য্য জন্মাইবার প্রবৃত্তি ও যত্ন ছিল। এই প্রবৃত্তি ও যত্নকলে বসতবাটীসংস্থষ্ট বাগানে নানাপ্রকার ফল ও তরীতরকারী জন্মিত, পুকুরে অনেক মাছ পাওয়া যাইত গৃহপালিত গাভী দুগ্ধ দিত, গৃহীণীরা সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত মাখনাদিও প্রস্তুত করিতেন। সুতরাং আহার্য্য পদার্থ ভদ্র গৃহস্থের মধ্যে অনেকের অতি কমই কিনিতে হইত। যাহা কিনিতে হইত তাও অনেক স্থলে মিলিত। এইসব কাজ কর্ম্ম দেখিবার জ্ঞান কেহ না কেহ বাড়ীতে থাকিতেন। কিন্তু এখন বাড়ীতে থাকিয়া গৃহস্থালী করিবার প্রবৃত্তি কাহারও বড় নাই। সকলেই বিদেশে বাইরা চাকুরী করিবার জ্ঞান বাক্ত। এখনও বাঙ্গালার অনেক স্থলে ভদ্র গৃহস্থগণ নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিয়া ক্ষেত খামারের চাষাবাস, বাড়ীতে বাগান, পুকুর, গাভী ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করেন। ইহার শিক্ষিত চাকুরে না হইলেও, অন্তঃসারশূন্য সম্ভার বার্ষিক চাকুরী ইহাদের মধ্যে না থাকিলেও, বাঙ্গালার ভদ্রলোকদের মধ্যে ইহারা ইহাদের অবস্থা ভাল, বর্তমানের ভীষণ দারিদ্র্য ইহাদিগকে এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

তারপর এখনকার নব্য বাবু ও বাবুগৃহীণীগণের মত তখনকার প্রামাণ্য গৃহস্থ

ও গৃহিণীগণের এত বিলাসিতা ছিল না—এত নানানিধি কাপড়, জামা, জুতা, অলঙ্কারাদি লাগিত না । বাজার করিতে চাকর দরকার হইত না, ঘরের পেড়ার একটা বাঁশন ছিঁড়লে ঘরামী লাগিত না, লাউ-কুমড়া গাছের গোড়ার একটু মাটি দিতে কৃষাণ লাগিত না ; বামুন না হইলেও পাক হইত, খি না থাকিলেও বাসন মাজা হইত, দেশলাই ছাড়া প্রদীপ জলিত ; বার্ডমাই মিলিত না, ফুটবল ক্রিকেট ছাড়াও চেলেনের পেনা হইত, চা-পান ব্যতীত শরীর সুস্থ থাকিত, সোডা-লেমনে'ড ছাড়া হজম হইত ; কুস্তগীন বিনা কেশ-বিশ্রাস চলিত, অডিকোলন-ল্যাভেণ্ডার ছাড়া মাথা ঠাণ্ডা থাকিত, কত আর বলিব ? দারিদ্র্য হুঃখ কি এক রকমে বাড়িয়াছে ? এক রকমে কি আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে ? আমরা কাচের চাকচিক্যে সোনা ছাড়িয়াছি ; চক্ষু নষ্ট করিয়া চশমা পরিয়াছি ; নদী সৈচিয়া রাস্তা বাঁদিয়াছি ; কীর্জন ছাড়িয়া বল নাচিতেছি ।

বাকালী ভদ্র সম্প্রদায় দরিদ্র, তাই তারা হুঃখী । কিন্তু যে সব গুণে মানুষ মানুষ নামের যোগ্য সে সব গুণ যদি তাহাদের থাকিত, তবে এই হুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও তাহারা মানব সমাজের মধ্যে আদৃত হইত । হীন অপঃগতিত জাতি বলিয়া জগতে হেয় হইয়া থাকিত না । যে কারণে তাহারা দরিদ্র, ঐগব গুণ থাকিলে যে কারণ দূর করিয়া তাহারা দারিদ্র্য ঘুচাইতেও পারিতেন । নিজের বুদ্ধি ও প্রকৃতির দোষে যেখানে লোকে হুঃখ পায়, সেখানে আর প্রতিকারের উপায় নাই । প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা স্বত্বেও প্রতিকূল ঘটনা-প্রভাবে লোকে নিজ হুঃখ দূর করিতে অসমর্থ হইলে সে স্বতন্ত্র কথা । সেজন্য হুঃখীকে সকলেই সহানুভূতি করে, কেহ দোষ দেয় না । দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক অশেগতিও বাকালী ভদ্রগণ্তানের দুরবস্থার আর একটা প্রধান কারণ । সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ এবং শ্রমক্লেণ-সহিষ্ণু দেহ মানবজীবনের প্রধান কাম্য বিষয় । জীবনের কর্তব্য পালনের জন্যই হউক অথবা সুখভোগের জন্যই হউক, এরূপ শক্তিসম্পন্ন দেহ ব্যতীত মানব-জীবন বার্থ । বাকালী ভদ্রগণ্তান সাধারণতঃ নানা রোগক্লিষ্ট, ক্ষীণ, দুর্বলদেহ । বাল্যাবধি বাকালী ভদ্রগণ্তান এরূপ অবস্থায় পরিবর্তিত হয় যে সুস্থ, সবলদেহ-সৌভাগ্যলাভ তার পক্ষে বড়ই দুর্ঘট । অতি শৈশবেই বালকগণ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয় । আমাদের গরম দেশ, তাই বরাবর নিয়ম ছিল প্রাতে ও অপরাহ্নে লোকেইকাজ করিত, মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিত । প্রাচীনকালে রাজসরকারে কাজকর্ম্মের ঐ ব্যবস্থা ছিল অনিবার্য । এখনও সেকলে দেশীভাবে যেখানে কাজকর্ম্ম হয়, অর্থাৎ জনিবারসরকারে, টৌলে ও গাঠশালা প্রভৃতিতে ঐ নিয়ম

দেখা যায়। শীতপর্বনদেখানায় উৎকল রাজার নিয়মাক্রমে এখনও উপলব্ধি
 হইয়া গিয়াছে। শিক্ষা বিভাগের হটতে প্রাপ্তির আফিস কাছারী প্রভৃতি
 সবই ছপুরে বন্ধ। ছপুরের পরে বাগকর্ণকে উপযুক্ত আশ্রয় ও বায়ু চলাচল
 পিত্তন ক্ষুদ্র বিদ্যালয় গৃহে চারি দিক ঘাটা আশ্রয় থাকিতে হয়। পাঠ্য বিষয়
 ও পুস্তকাদি তাদের কোমল মস্তিষ্ককে পক্ষে নিতান্ত হ্রাস এবং ভ্রমের কারণ।
 শিক্ষাদান প্রণালীও যেই ভ্রমের কারণের উপর কঠোর আবর্তিত। অনেক
 আভ্যন্তরীণ তত্ত্ববুদ্ধি ও মানসিক শক্তি যেই কঠিন আবর্তে জড়নিষ্কেষ্টতার
 পরিণত হয়। অতি অল্পমাত্রায় বাগকর্ণের প্রকৃত বিদ্যাভ্যাসের মাপকতা দৃষ্ট
 হয়। কেবল অল্পাংশ শরীর ও মস্তিষ্ককে ক্ষয়ই একমাত্র মর্স্ব্যাপী কল দেখা
 যায়। ছেলেরা স্কুলে যাক, রাতদিন পড়ুক, ভাগ্যপাশ কক্ষক, আনন্দ এই
 চাই। কিন্তু তাদের প্রত্যেক দিকে আমাদের দৃষ্টি একবারেই নাট।
 অতিরিক্ত মস্তিষ্কগণনের ক্রান্তি দূর করিবার জন্য এবং তাই মনে দেই গঠনের
 অল্প ব্যয়মাত্র ক্রিয়ায় এবং পুষ্টিকর আশ্রয় নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু সে বিষয়ে
 আমাদের দৃষ্টি একবারেই নাট। বাগকর্ণের প্রকৃত ও বাস্তবশক্তি আনন্দ
 বড় ভাল চক্ষে দেখি না। বৈকালে স্কুল হইতে আসিয়াই আবার মস্তিষ্ক
 যদি ছেলে পড়ে, মোটে বাড়ীর বাহির না হয়, তাহা হইলেই আমরা মস্তিষ্ক
 হট। আমাদের ভাল ছেলের প্রধান লক্ষণও তাই। কিন্তু এই ভাল ছেলে
 যে কালে নানা ব্যাপিন্দ্রিয় ও মর্স্ব্যকর্ম অক্ষয় হইয়া চূর্ণময় দেখতার কোনও
 মতে বহন করিয়া সূত্রবৎ জীবন ফাটিয়াছে, তা আনন্দ একবারেই নিবেচনা
 করি না। বাগকর্ণের ব্যয়মান সম্বন্ধে মেরুণ, তাদের উপযুক্ত আহার সম্বন্ধেও
 আমরা তজ্জগ উদ্যোগী। অনেক দারিদ্র্যজনিত সমস্যার উপযুক্ত আহারের
 ব্যবস্থা করিতে পারেন না, একই কথা। কিন্তু দ্বারা পারেন তাঁরাও করেন
 না। মর্স্ব্য নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক শক্তি চালনার জন্য আমাদের
 শরীর ও মস্তিষ্ক মর্স্ব্যের ক্ষয় হইতেছে। একমাত্র উপযুক্ত আহারেই সেই ক্ষতির
 পরিপোষণ হইতে পারে। স্বাস্থ্যনীতির এই গুণতত্ত্ব আমরা জানি না, জানিয়াও
 বড় গ্রাহ্য করি না। মিতব্যয়ী গৃহস্থ আহারের সাময়িক্যে বা কিছু নিত্যব্যয়িত্ব
 দেখান। অল্পাংশ ক্রিয়াকর্ম, ভ্রমোচিত চাল চলন, বেশভূষা সবই অতিবাজার
 চলিতে থাকে। “শরীরবাদ্যং খণু বর্ষনাধনম্” ইহা হিন্দুশাস্ত্রেরই উপদেশ।
 এই মর্স্ব্যপ্রধান বর্ষ বজায় রাখিয়া বা আনন্দ বীচাইতে পারি তাই অস্বাস্থ্য কার্য
 করা উচিত। কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা সামান্যতঃ এই ধর্মের ব্যক্তি

করিতা অস্ত্রাভ কাঞ্চকর্ণের জন্ত অর্থ সংকর করি। যা দ্বিরাই চটক কোনও মতে ছুৎলা পেট ভরিতে পারিলেই আমরা মনে করি, যথেষ্ট আহার হইয়াছে। কিন্তু আহারের উদ্দেশ্য যে শরীর পুষ্টি, কেবল উদরপুষ্টি নয়, একথা আমরা মনেই করি না। এই উদ্দেশ্য এবং ইহার অত্যাৱশ্যকতা যদি আমাদের মনে সর্বদা জাগরুক থাকিত, তবে অবশ্য ভ্রূণলোকের চালচলন ইত্যাদি ছাড়াও—চাষার মত থাকিতাও—দেহ-রক্ষা-ধর্ম আমরা পালন করিতাম। প্রথম বয়স—যে বয়সে লোকের শরীরপুষ্টি ও শরীরগঠন হয়, সে বয়স আমাদের এইভাবে কাটে, তারপর পাঠ্যভাষা ছাড়িয়া যখন সংসারে প্রবেশ করি, তখন উদরারের জন্ত চাকুরী অধ্যয়ন, সেই চাকুরীতে রাত্রিদিন বহুগৃহে মস্তিক চালনা, দারিদ্র্যজনিত নানাবিধ হুঁচক্কা, আহারের অভাৱ, শরীর চালনার শৈথিল্য ইত্যাদি কারণে পাঠ্যাবস্থায় তথ্য-স্বাস্থ্য, জীবনে আর শোণপ্রতিতে পারি না। ইহার উপর বিলাতী সভ্যতার বাহ্যিক চাক্চিক্য আমরা মজিয়াছি, বিলাতী বিলাসিতার একেবারে গা ঢালিয়াছি। বিলাসিতা আমাদের বিশেষ কোন উপকারে আইসে না, তবে যদি তাহাতে শরীর অকর্মণ্য না হয়, তবে স্বচ্ছন্দ টাকা থাকিলে তাহাতে বিশেষ কোন হানিও দেখা যায় না। সাহেবদের টাকা আছে, তারা বিলাসীও যুব। কিন্তু এই বিলাসিতা সত্ত্বেও সাহেবরা সুস্থ, সবল ও কর্মঠ। বিলাসী সাহেব অনেক কাজ করিতে পারে—তার শরীরে অনেক সয়। বিলাসবিহীন সেকেলে পল্লী-গৃহস্থও অনেক কাজ করিতে পারে, তার শরীরেও অনেক সয়! কিন্তু সাহেবী বালালীয়াবু না এদিক না! তদিক। তাঁর শরীর যে কি কাজের উপযুক্ত, তাঁর শরীরে যে কি সয় তা ভাবিয়া পাই না। হু পা চলিতে যথাস্থ কলেবরে ইঁপাইয়া তাঁকে পাখার বাতাস পাইতে হয়। স্নানেন নহিলে তাঁর গায় ঠাণ্ডা লাগে, জুতা মোজা না হইলে পায় ঠাণ্ডা লাগে, ছাতা না হইলে মাথায় রোজ সয় না, চা না খাইলে শরীরে ক্ষুধা হয় না। ইহাতে কোথায় কার শরীর ভাল থাকে? সুস্থ শরীরে হাওয়া, রোজ, বৃষ্টি সব সহিলে, সুস্থ শরীর সকল কার্যে সমর্থ হইবে। শরীর সুস্থ করিতে হইলে তাহাতে হাওয়া, রোজ, বৃষ্টি সহাইতে হয়, বাহাতে তাহা সর্বকার্যে সমর্থ হয়, তাই করিতে হয়। ভূমিট হইয়াই শিশু স্নানেনে জড়িত হয়, স্নানেনে জড়িত হইয়াই পরিবর্জিত হয়। গরম দেশে অত সহিবে কেন? সর্বদা বসনাবৃত দেহ বখনই উন্মুক্ত হয়, তখনই ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুস্থ হয়। শরীরিক স্বাস্থ্য আদ্য ও পরিচ্ছন্নতা কিছুই আমাদের দেশে এক

কাপড় লাগে না। ব্যবহার করিয়া অথবা অর্থব্যয়ও হয়, সঙ্গে সঙ্গে আবার শরীরটিও অকর্মণ্য করিয়া ফেলি। আবার পুনঃ পুনঃ স্বৈরাচারি হুগ্গক ইত্যাদি করা সার্ট কোটে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা যে কতদূর রক্ষা হয়, তাহা আর বলবার প্রয়োজন নাই। নানা কারণে স্বাস্থ্য নাশে এবং ভোগবিলাসিতার প্রাণ অসংকীর্ণে বাঙ্গালী-দেহে পুরুষাচর বলশীলতা, মানসিক, হৃদয়, কর্মকুশলতা, শ্রম-ক্লেশবহিষ্কৃত ভ্রম এতদ্বারা বৈতনিক নাই। যে দেশে মাতৃকাচার শিশুভ্রমের দেহাব্যবস্থায় পালন হয় তাহা হইল; যে দেশের কবিশ্রম কালিদাস বা চণ্ডীদাস স্বয়ংকৃত শ্রম প্রাপ্ত মতান্তর। প্রত্যেক বিশেষণে পুরুষকর্মের আদর্শ বর্ণনা করিয়াছেন; যে দেশের আদর্শ রমণী মূর্ত্তমতী কোমলতা মীরা চিত্রাক্ষিত্যের “দেহ সোভাগ্যেণ অশ্রাদ্দমুদ্রিতমসকরসরাসং” মূর্ত্তদেবীর মুখ হইয়াছিলেন, সেই দেশে শিশুরাও উষার সেকালীনৎ স্নিগ্ধবর্ণাময় নদীর কোমলদেহে বাঙ্গালীপুরুষের দেহ-সোভাগ্যের চরম আদর্শ হইয়াছে। বাঙ্গালীর দেহ যেন বিপাত-কুহন-শস্যার স্নিগ্ধ আরাম উপভোগের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন, পুরুষাচর কোন কার্যের জন্য নয়। দীন বাঙ্গালী ক্ষীণ, দুর্বলদেহ, অসমর্থ, ক্লেশকুষ্ঠ। অল্প বাঙ্গালী সর্বকাধ্যে উৎসাহ ও উদ্যমবিশীন, ভোগবিলাস ও আরাম-বিরাগে একবারে গা ঢাকা। হীন বাঙ্গালী নিজের ধন, প্রাণ, মান, সম্মান, সুখ স্বার্থ প্রভৃতি মানবজীবনে যা কিছু কাম্য, সমস্ত রক্ষার ভার পরের হাতে সঁপিয়া নিশ্চিত। পরে শিক্ষা দিলে বাঙ্গালী শিখিলে, পরে খাইতে দিলে খাইবে, পরে মান রাখিলে তার মান থাকিবে, পরে ধরিয়া তুলিলে উঠিলে, ফেলিয়া দিলে পড়িয়া থাকিবে, পড়িয়া পড়িয়া গালি দিলে। ইংরেজের অশীন বাঙ্গালী, ইংরেজ বা করিতে দিবে না, তা করিতে পারে না। তাই বলিয়া বা পারে তাই-বা করে না কেন? সকল কাজে-ত ইংরেজ-রাজা আসিয়া আমাদের হাত চাপিয়া ধরে না? কেত পড়িয়া আছে, চাষতে গেলে ইংরেজ হালগর কাড়িয়া লইবে না। জলকট হইয়াছে, আমরা পুকুর কাটিলে ইংরেজ গে জল সঁচরা ফেলিবে না। দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, আমরা ক্ষুধার্ত্তকে ভাত দিলে ইংরেজ তার মুখ চাপিয়া ধরিবে না। আমাদের ছেলপিলেকে আমরা মনোমত লেপাণড়া শিখাইলে ইংরেজ বাহনকে তাহা ভুগাইতে পারিবে না। আমরা গিয়া গাহে-বর দোকানের ব্যবসায়ী জিনিষ না কিছিল তারা বাড়ী বহিয়া দিয়া থাকিবে না। আমরা কোমল মুক্তি পাইলে মা-কটক বর্ণিত তাহা কতদূর হইয়া তাদের কাপড় পরাইয়া দিলে

আমরা কেরানীগিরি না করিলে টংরেজরা আমাদের গণ্যমান্য দিরা তাদের অফিসে টানিয়া নিবে না। শান্তিপূর্ণ টংরেজরাই টংরেজ শিক্ষা ও টংরেজ সভ্যতা বিস্তারে আমরা বড়ই উন্নত ও সভ্য হইয়াছি বলিয়া মনে করি। সর্বাঙ্গ সুশিক্ষিত মহতঃ মহতঃ দলক ও যুগের বিদ্যালয়, সভা সমিতি, বক্তৃতা আন্দোলন, প্রভৃতি সংবাদ পত্রে গভীর গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশ, সরস ভীম প্রিজ্ঞাপত্র ভাষায় শাসননীতির জন্য সমালোচনা, এই সব দেখিলে সভ্য সভ্যত মনে হয়, আমরা যেন কত গড়ই হইয়াছি। কিন্তু সবই নাকাল কালের রাজক শোভা, — ভূমণ্ডী বাজীর কীকা কীকাশ আশুপের বাড়ি। আমরা টংরেজের মত ভাবিতে পারি, লিখিতে পারি, কথা কহিতে পারি; পারি না কেবল টংরেজের মত কাজ করিতে, টংরেজের মত নিজের গায়ে নিজে দাঁড়াইতে। টংরেজের মত সাজিতে শিপি-য়াছি, ইংরেজের চাল চলনে চলিতে শিপিরাছি; শিপি নাই কেবল টংরেজের মত সামান্য কর্তব্যে সার্থক বলা দিতে, মহতঃ সাধনে পরীতগত করিতে। বাজারের বা কিছু উৎসাহ উদ্যম ছাত্রজীবনেই দেখা যায়। সভাসমিতি আন্দোলন যেখানে যাই হউক, অল্পপুষ্টি ছাত্র-গন্যবেশেই হয়। ছাত্র বাদ দিলে কিছু কিছু থাকে না। ছাত্রজীবনে অনেক সভাসমিতি ও আন্দোলনে উৎসাহ উদ্যম দেখাইরা, কত উচ্চ আশা, উচ্চ সংকল্প বৃদ্ধি লইয়া বৃদ্ধগণ সংসারে প্রবেশ করেন। খড়ের আগুন বখন জ্বলে, বেশ দেখায়, তলে দগ্ধ করিয়া পড়িয়া যায়। চাকুরে বৃদ্ধ চাকুরীর নিশ্চিন্ত অল্প সন্তোষের আশ্রয়ে আলোচনার নগণ্য মুখে লটয়া তাকিয়ায় গা ঢালিয়া একবার নয়ন মুদনে ভারতমাতার জীবন্ত জাগ্রতমূর্ত্তি জনে বপ্নের ফীণছনি হঠতে ফীণতর হইয়া কোথায় নিশাটয়া যায়! তখন সাতের ঠেকান হাতের লাঠি সাহেবের পঞ্চাঙ্গ-কারী হীন মেটিবের পৃষ্ঠে পড়ে। সুসদৃশ হস্ত কোমল হইয়া সাহেব চরণের আশ্রয় সাধন করে। ওজস্বিনী বক্তৃতাগরী রসনা সাহেব তুষ্টির মিত্তি রস বর্ষণ করে। উপার্জিত অর্থ সাহেব বণিকের অর্থকোষ পূর্ণ করে। জীবনের সমস্ত শিক্ষা, গরম সংকল্প নিজেব পদোন্নতি, ও পুত্র জ্ঞানাতর চাকুরীপাশে উদ্বেগ প্রবৃত্তি হয়। নিজের দোষ আমরা দেখি না, দেখিতে চাই না, কিন্তু দেখিলে কারীরা শেখ করা যায় না। গভর্ণমেন্ট হইা করিল না, তাহা করিল না বলিয়া কানি দিই। কিন্তু এমন হতভাগী অসারগত আতির উত্তিসাধন প্রভৃতি সর্বসাধারণের বহু রাসচর্য রাসা হইলেও করিতে পারিবে না।

কাঙ্ক্ষিত, ১০১০ বন।] বাঙ্গালার সমাজিক দৃষ্টান্তের দ্রষ্টব্য ১০০

আজ্ঞারিত সাধনে যত্নশীল ব্যক্তি বিপদে অজ্ঞের সাহায্যে উপকৃত হইতে পারে।
অন্য ভিত্তির তাতে কুৎসার গন-গণনা দিগেও ছুদিন গরে গেবে ভিত্তির
সেই ভিত্তির ততবে।

বাকালীর এই অসংগত অনুষ্ঠান বহুগুলি কারণ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে,
সকলের মূলে একটি গুঢ় কারণ নিহিত আছে, সেই কারণটি বাকালীর প্রকৃতিগত
নিশ্চেষ্টতা, অসংগতের ক্রোধকৃত্ততা! সহজে অজ্ঞদারা কাজ চলিয়া গেলে
বাকালী নিজে কষ্ট করিতে চায় না। কোন অজ্ঞানায় না গিয়া কোনও মতে
আরাম বিরামে দিন কাটাতে পারিলে বাকালী, জীবন কৃতার্থ মনে করে।
বাকালী চিরদিনই চতুর, বুদ্ধবুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু এই অজ্ঞান প্রকৃতিগত
দোষে বাকালী কোনদিনই জাতীয় গৌরবে বড় একটা গৌরবান্বিত হয় নাই।
বাকালীর গল্পগুলি বাকালীর সামাজিক জীবনপটের প্রদান ক্ষেত্র, পূর্বে গল্প-
বাকালী বাকালীগৃহস্থ চাকুরীলালসার সহরে বড় বাইত না। নিজেদের ক্ষেত্র,
খানার, বাগান, পুকুর, গোশালা প্রভৃতির কার্যতত্ত্বাবধানে পরিবার প্রতিপালনের
চেষ্টা করিত অর্থাৎ নিজেরাই দেশের উৎপাদিকা শক্তির সাহায্যে নিজেদের
জীবিকার্জনের চেষ্টা করিত। বিলাসী সভ্যতার আয়ুর্নাস্তিক বিলাসিতার ব্যয়ও
ছিল না। তাই বাকালী একটা দারিদ্র্য ভ্রমে পীড়িত কখনও হয় নাই। চাকুরীর
উপায় স্বরূপ বিলাসীজীবনের জন্ত বা চাকুরীর জন্ত শারীরিক ব্যস্ততার প্রতিকূল
অবস্থার মধ্যে কঠোর যত্নসঞ্চালনা করিতে হইত না। অথবা দেহসজ্জা ও
গৃহসজ্জার জন্ত অস্বাভাবিক শরীর নষ্ট করিতে হইত না। স্বদেশিক দুর্গত বস্ত্রাবৃত
দেহে অলপ সত্বের দূষিত বস্ত্রবাস্ত্র মধ্যে, নিম্নলিখিত শ্রেণী চাপন না
করিয়া, সজীব প্রকৃতির গীলাভূমি গল্পের মুক্ত নির্মল শীতল বায়ুতে নিম্ন নয়দেহে
সফল শ্রমে দেহচালনা করিত। তাই বাকালীর স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। পুরাতন
ধর্ম ও সমাজশাসনে বাকালীকে অনেক সময়ে কঠোর আত্ম ও সমাজ হিতকর
কার্যেও ব্রতী হইতে হইত। তাই বাকালী আত্মসম্মান, আত্মভোগবিলাসে গা
ঢালিয়া এত বীন কখনও হয় নাই। এখনও বাকালী চতুর ও বুদ্ধবুদ্ধ বলিয়া
বিখ্যাত। ইংরেজী শিক্ষার বাকালীর মত ভারতের আর কোন জাতি এত শীঘ্র,
এতদূর অগ্রগত হয় নাই, কিন্তু এই উচ্চ শিক্ষা পাইয়াও, প্রবলশক্তিশালী
ইংরেজের জাতীয় গুণ সমূহের শত শত উদাহরণ চক্ষুর সমক্ষে দেখিয়াও, বাকালী
যে প্রকৃত পক্ষে কোনও উন্নতি লাভ করে নাই—বরং ইংরেজী সভ্যতার বাহ্যিক
চাকুরীকে ডুলিয়া পুরাতন বা কিছু ভাল ছিল সব ছাড়িয়া, ইংরেজের চালচলন

অনলম্বে যতদূর হীন অস্থায় পড়িতে হয় পড়িয়াছে ; তাহার কারণও বাঙ্গালীর সেই প্রকৃতি গত প্রমাণ দোষ । প্রকৃতি-গত দোষ পরিহার করা কঠিন সম্ভব নাট, কিন্তু কঠিন হইলেও অসম্ভব নয় । দৈব ও প্রকৃতি নতই বলনং হউক পুরুষকারের বলও কম নয় । অদূরৈবদে প্রবল আস্থা বলিয়া অনেকে হিন্দুর অশতপতনের কারণ নির্দেশ করেন বটে, কিন্তু নিচক্ষণ হিন্দুশাস্ত্রকারগণ দৈবের নিয়ে কখনও পুরুষকারের স্থান দেন নাই । দৈব যতই প্রতিকূল হউক, প্রকৃতির প্রভাব যতই বলবান হউক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞের পুরুষকার সফল বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় । নিজের ভীমান্বিতা বুঝিয়া বাঙ্গালীর মনে বহি আন্তরিক শিকার জন্মে ; নিজের উন্নতি নিজের চেষ্টায়াপেক্ষ এই মহাসত্য সত্যক্ উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালী যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে নিজের উন্নতিসাধনে ব্রতী হয় ; প্রকৃতিগত নিশ্চেষ্টতা, দৈব প্রতিকূলতা সকল বাধা পদদলিত করিয়া বীরের মত বাঙ্গালী সেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেনই হইবে । বাঙ্গালীকে আত্মনির্ভর হইতে হইবে ;—আত্মনির্ভরতার সকল কষ্ট সহিতে প্রস্তুত হইতে হইবে । তাহার পর ঠিক পথটি ধরিয়া চলিতে হইবে ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ।

অগ্নিপরীক্ষা ।

লম্বয় এসেছে এসে, আর বাক্যজালে
জ্বরের দুর্বলতা ঢাকি সম্বতনে
রাখিতে নারিলে কেহ । সরম আড়ালে
জুকারে স্বার্থের তৃষ্ণা অতি সজোপনে

আসিছে সম্মুখে এক প্রলয় ভীষণ,
হইতেছে বনোদ্ধৃত কৃষ্ণ মেঘ রাশি,
তাই দেখি করিতেছে দূরে পলায়ন—
কণ্ট দুর্বল বারা বশের প্রত্যাশী !

কে পারে দেশের পূজা লভিতে কখন ?
মিছে ভাগ প্রভারণা হবে ভ্রমোদ্ধৃত
অগ্নি পরীক্ষার শুক তৃণের মতন,
লজ্জায় গর্জিত শীর্ষ হবে অননত !

নিফাম সাধক বত বীরের সন্তান
উন্নতি সংগ্রামের দেখি আরোজন ;
দেশের কল্যাণে তার সমর্পণ প্রাণ
দিব্যধামে সহোম্মানে করিবে গমন ।

আব্রতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ।

ষষ্ঠ বর্ষ । } ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ । } একাদশ সংখ্যা ।

কালীধানের আধ্যাত্মিক ভাবার্থ ।

সাকারবাদী হিন্দু ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর নিকট পৌত্তলিক বলিয়া অনজ্ঞাত । কিন্তু নিরাকারই যে সাকার, এ সুস্পষ্টই অনেকেই বুঝিতে চেষ্টা করেন না । “মুখ্যর আধারে চিহ্নরো দেবী” যিনি এ তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তিনি সাকারবাদীকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখেন না ।

“নিরাকারাপি সাকার মায়য়া বহরূপিণী”

(মতানির্ধারণতঃ)

নিরাকারাই সাকার। এবং তিনি আত্মমায়ী দ্বারা বহরূপে প্রতীয়মান হন ।

“একোহং বহুমাং” ইত্যাদি ।

(শ্রুতি)

একমাত্র আমিই বহরূপ ধারণ করি, ইত্যাদি শ্রুতিতেও বহরূপের আভাস আছে ।

ধর্ম্মজগতের সারভূত শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন,—

জানযোগে নিরাকার নিগুণ পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার দ্বারা জ্ঞানী সাধক অমৃতত্ব লাভ করে, আবার ভক্ত সাধক সাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারাও মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে । কিন্তু,—

অব্যাক্তোহি গতির্ভূতঃ দেহবস্তিরবাপাতে ।”

দেহধারীর পক্ষে অব্যক্ত পরমব্রহ্মে চিত্ত স্থির করা বড়ই ক্লেশকর ।

অপিচ—

“অবদানন্তি মাং মুচ্যে মানুযী তপুশ্চাশ্রিতঃ

পরং ভাবদানন্তো নন তুত নহেৎবাং ।”

অন্যেকের ন্যক্তিগণ আমার সর্বভূত মহেশ্বর স্বরূপ পরমাত্ম না জানিতে পারিয়া আমার মাহাত্ম্য ত্রুটিতে অবজ্ঞা করে ।

এইরূপ ভাবে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র দর্শন প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই নিরাকার, সাকার, যগুণ, নিগুণ এই উভয় ভাবেরই বস্তু নিরূপিত আছে ।

ব্রহ্ম—“একমেবাদ্বিতীয়ং”—চৈতন্য পুরুষ-প্রকৃতি, পরমব্রহ্ম-মায়া, পরমায়া-উচ্ছাশক্তি, মহাকাল-মহাকালী, পরমেশ্বর-আত্মশক্তি, ব্রহ্ম, রাণী ইত্যাদি নানা সংজ্ঞায় অভিহিত ।

প্রকৃতিগণের প্রকৃতিপুরুষাত্মকব্রহ্ম, শক্তি শক্তিমানের অভেদ কল্পনা দ্বারা “এক” ।

এই প্রকৃতি পুরুষাত্মক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ চৈতন্য* কাশ্মির মতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়স্বরূপী । এবং দেবীভাগবৎ মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতি কতিপয় শাস্ত্র গ্রন্থেও আত্মশক্তি মহামায়াকেই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ।

আবার বেদান্তবাদীগণ এবং বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদভাগবৎ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি পুরুষ প্রাধান গ্রন্থে পরমাত্মা বা পরমপুরুষ বিষ্ণুকেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা স্থির করিয়াছেন ।

বস্তুতঃ শক্তি শক্তিমানের অভেদ কল্পনা করিলে মূলে কোনট দোষ ঘটে না ।

নিরাকারবাদী পরমব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে সংশয়ঃ অবশেষে “সম্রামাত্রং নির্দিশেষং নিরুচং,” “অবাঙ্ মনসোগোচরং,” “অস্তিত্ববৎ,” “নিজস্বোপকরণং,” “সচ্চিদানন্দং”—ইত্যাদি অব্যক্ত রূপে রিয়াছেন ।

আবার সাকারবাদীগণ বিরাপ চৈতন্যে চৈতন্য করিয়া অনন্তরূপের বর্ণনা করিয়াছেন । বস্তুতঃ যিনি ভাবপ্রসবন, তাঁহার রূপের বর্ণনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে ।

সাকারবাদীগণ প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্মের উভয় ভাবকেই তুল্য মনে করিয়া প্রত্যেক ভাবেরই বহুরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন ।

কার্যবিশেষে ভগবান যতপ্রকার রূপ ধারণ করিয়াছেন, সাকার-বাদী সাধকগণ তদনুযায়ী যে রূপে প্রজ্ঞাবান সে সেই রূপেই উপাসনা করেন । কিন্তু একটি প্রাণী চৈতন্য বহু প্রাণী প্রজ্ঞালিহ হইলে যেমন প্রত্যেকটির উচ্ছাশক্তি

* ঋষিগণমধ্যে কেহ কেহ পুরুষের প্রাধান ও কেহ কেহ প্রকৃতির প্রাধান্য

অ দাহিকশক্তি তুলা হয় । একমাত্র উৎসব জাগ দিয়া ছুঁতে চাওঁনি যেমন
হাতী, ঘোড়া, ময়ূষা, পক্ষী প্রভৃতি নানা আকারে প্রতীয়মান হইলেও মষ্টোষাদাদি
শুণের কোন তারতম্য হয় না, শুধু একমাত্র ব্রহ্ম প্রয়োজনানুসারে নানারূপ
পরিগ্রহণ করিলেও মূলের কোন অণুচয় হয় না ।

সাকারবাদীগণ যে সমস্ত ক্রমের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেক
ক্রমের পূর্বক পূর্বক দ্যান আছে । ইহার আদ্যশক্তি বা মনমহাদিয়ার “আদ্যা”
কালীর দ্যান এই প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় ।

ভিন্নধর্মাবলম্বীগণ বা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত ও মার্ক্সিজত্বকি চিন্তা যুবকগণ
কালীর দ্যান পাঠ করিয়া শান্ত ভক্তগণকে নানারূপ উপহাস করিয়া থাকেন ।
কিন্তু ষাঁড়ার অকুর্দ্ভিতে কালীরূপের অপূর্ণ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহার
কৃতার্থত্ব চিত্তে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন । আনি মানকও নহি, ভক্তও
নহি, অথচ ঈশদাবুদ্ধিও বৈরাগ্য নাই, সুতরাং কালীর দ্যানের মূর্ত্তা তবু কি বুঝাই
তবে দয়াময়ী দয়া করিয়া যে টুকু বুঝাইয়াছেন, তাহাই আজ আলোচনা করিয়া
আমের আবেগ মিটাইব ।

কালীদ্যানং মতী,—

“করালদমনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং কালিকাং দক্ষিণাং দিয়াং
মুণ্ডমালা-বিন্ধ্যবীণাং সদাশ্রমিনীং গজাং নানাপোদ্ধ করাসুজাং অভয়াং বরদকৈশ
দক্ষিণাপোদ্ধিবাণিকাং মহামেনপভাং শ্রীমাং তটেশচ দিগম্বরাং কণ্ঠাবলম্ব
মুণ্ডালীগলফ্রদিরুচিঁতাং কর্ণাবলম্বিতানীশবল্লভাভয়াকং ঘোরদংষ্ট্রাং
করালভাং পীনোরতপয়োবরাং শবানাং করমংবাটঃ ক্রুরাকাশীং হমসুণীং
অক্লব্রগলত্রুতধারাবিন্দু রিতাননাং ঘোররাবাং মহারোদ্রীং আশানালগ্ন বাসিনীং ।
বালকং মণ্ডলাকারলোচনত্রিভয়াং দম্বাং দক্ষিণবাণি মুক্তালম্বকচোচ্চরাং
শবরুগ্নমহাদেবজ্বরোপরিমংস্থিতাং শিবাভির্ঘোর-রাবাভিচতুর্দিকু সমংস্থতাং
মহাকালেন চ মনং বিপরীতরতাতুরাং সুখশয়ন বদনাং মেরাননমরোরুহাং এবং
মংচিক্তয়েৎ কালীং সর্গকামফলপ্রদাং ॥”

অর্থার্থ । দক্ষিণা কালিকাদেবী করালদমনা, ভয়করী, আলুনারিতকুন্তল,
চতুর্ভুজা, পরমরূপবতী, মুণ্ডমালা পরিশোভিতা, বানভাগেয় অপোহস্তে
অভয়া, ও উর্দ্ধহস্তে বরমুদ্রা, দেবী মহা মেঘপ্রভা, এবং শ্রীমা ও দিগম্বরী
(মহা) দেবীর গলদেশস্থিত মুণ্ডশ্রেণী হইতে বিগলিত ক্রিমিরূপার সর্গক
মহাশক্তি । শবমুণ্ড কর্ণভূষণ, দেবীররূপ আভি ভয়ানক, ভীষণ

করালমুণ-বিনয়, স্থূল অথচ উন্নত স্তনধর, এবং কটিদেশে নরকরকাঞ্চী বিরাজমালা দেবীর মুখমণ্ডল হস্তযুক্ত ওষ্ঠপ্রান্ত হঠতে বিগলিত রুদ্রিধারায় বদন উদ্ভাসিত, দেবীর স্বর অতি ভয়ঙ্কর, এবং মহারুদ্রভাবাপন্ন। (প্রকৃতি অতি উগ্র) দেবী সর্বদা আশানে বাস করেন । দেবীর নয়নজয় প্রাণতঃস্বর্গোর ছায় প্রভাবিশিষ্ট, দন্তশ্রেণী উন্নত এবং নভির্গত, আলুলায়িত কেশপাশ দক্ষিণাংশব্যাপী । দেবী শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োগরি অবস্থিত। চতুর্দিক ঘোর-নির্নাদিনী শিবাকুল পরিবেষ্টিত । দেবী মহাকালের সহিত বিপরীত ক্রান্তুরা (মৈথুনাশক্তা) দেবীর বদনমণ্ডল আনন্দোৎফুল্ল, এবং মুখগন্ধজ হস্তযুক্ত সর্বকাম ফলপ্রদা কালীকে এইরূপ ভাবে চিত্রা করিলে ।

এইত ধ্যানের বাক্যগত সরলার্গ । কিন্তু এই অর্থট যদি ধ্যানের প্রকৃত অভিপ্রায় হয়, তবে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণ অবশ্যই আনাদিগকে আদিম অসম্ভাবুগের কুসংস্কারাগ্নি প্রোতোগাসক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারেন । পাশ্চাত্য শিক্ষালোকে সাক্ষিৎকৃতি যুবকগণও নাগাকৃষ্টিত করিতে পারেন । কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই ধ্যানের তাৎপর্য্যার্থ কখনই এইরূপ নহে ।

কারণ ; অনন্তজ্ঞান-সমুদ্র-দেবাদিদেব শব্দরকে যদি তন্ত্রমুক্তা বলিয়া স্বীকারলাভ করি, তথাপি এই তন্ত্রোক্ত ধ্যানের সংস্কৃত পদগুলি যে ব্যক্তি নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার যে উপক্রম উপসংহারের সামঞ্জস্য বিধানের জ্ঞান অনুমাত্র হইল না, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

অর্থাৎ যে দেবীর করালবদন অতি ভয়ঙ্কর, বাহার উন্নত ও নভির্গত দন্তশ্রেণী অতি ভীষণ, বাহার কেশপাশ আলুলায়িত, স্তম্ভরয়ে বিগলিত রুদ্রিধারায়, নরমুণ্ড-নরকর বাহারভূষণ, যিনি মহারুদ্রভাবাপন্ন, করে অগ্নিমুণ্ড, সর্বাঙ্গ রুদ্রিরে অল্লিষ্ট, তিনি কিরূপে স্কন্ধগা (দিব্য) প্রসন্নবদনা, হস্তমুখা স্কন্ধলক্ষণা (শ্রামা) এবং বরাভয়দায়িনী হইতে পারেন ?

করালবদনা বিকট-দশনার (ঘোর দংষ্ট্রা করালার্ভা) পক্ষে মুখ প্রকৃষ্ট মুখকমল সতত হস্তযুক্ত (স্মরানন সরোক্রহাং) বড়ই বিনদ্য এবং আলোক প্রস্রাবের একত্র সমাবেশের ছায় অসম্ভব ।

একপ রণোন্নতা বেশে ঘোরনাদিনী-শিবাকুল পরিবেষ্টিত হইয়া শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োগরি উপবিষ্ট হওয়া বা মহাকালের সহিত বিপরীত ক্রান্তুরা হওয়া প্রভৃতি বাতাবিক ভাষা সব্বদেই বুঝিতে পারা যায় । বিশেষতঃ ইহা দেবীর

সমক্ষে একরূপ বিসদৃশভাব চিন্তা করা ভক্তগাথকের পক্ষে কষ্টদূর সম্ভব, তাহাও পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অতএব কালীর ধ্যানের অবশ্যই কোন নিগূঢ় অর্থ আছে। অনন্তরূপা অনন্তভাব-প্রদর্শন পরমাপ্রকৃতির লীলারত্ন মানববুদ্ধির অগোচর। ইহার প্রকৃতার্থ ভক্তগাথক ভিন্ন আর কে বুঝিলে ?

তবে দয়াময়ী কৃপা করিয়া এক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বহুটুকু বুঝাইয়াছেন, এ স্থলে তাহাষ্ট প্রকাশ করিতে শরদ্ব হইলাম।

প্রথমতঃ আদ্যাশক্তি “কালী” শব্দের ব্যুৎপত্তি কি ? তাহাই দেখা যাউক,— “ভবরূপ মহাকাল জগৎ-সংহারকারক। মহাসংহার সময়ে কালঃ সর্বংগ্রাসিষ্যতি কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ কালংগ্রসনাত্ “কালো” সর্বেষামাদি-রূপিণী তোমার অন্ততররূপ জগৎ-সংহারক মহাকাল মহাপ্রলয় সময়ে সমস্ত-কলন (গ্রাস) করিবেন। সর্বভূতকে কলন করেন বলিয়া তাঁহার নাম মহাকাল, তুমি সেই মহাকালকে কলন (গ্রাস) কর বলিয়া তোমার নাম “কালী” অতএব তুমিই শূন্যের আদিরূপ। অর্থাৎ কালে সর্বভূত (মস্তস্ত্বাদি পর্য্যন্ত) তোমাতে লয় হওয়ায় প্রকৃতিরূপা তুমিই একমাত্র অবশিষ্ট থাক।

“সৃষ্টেরাদৌ স্বনোগসি স্তনোগ্রগনগোচরং স্বভোজাতং জগৎ সর্বং পরব্রহ্ম সিস্থং মহাত্ত্বাদি ভূতাত্ত্বং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ। নিমিস্তমাত্রং শুদ্ব স্ত সর্বকারণকারণং ॥ তত্ত্বোচ্ছ্রামাত্রমালম্ব্য স্বঃ মহাবোগিনী পরা। করোগি গাসি হংস্রস্তে জগদেতচ্চরাচরং ॥” (মহানির্বাণ তন্ত্র)

সৃষ্টির আদিতে তুমিই একমাত্র তমো অর্থাৎ প্রকৃতিরূপে বিস্তারিত ছিলে, তোমার সেই তমোগয়ী রূপ বাক্য ও মনের অগোচর। পরমব্রহ্মের সিস্থ্যাহেতু চেতনা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইতেছে। “মহত্ত্ব হইতে স্থল পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্ব তোমা হইতেই উৎপন্ন সর্বকারণের কারণ সেই পরমব্রহ্মকে বল নিমিত্ত মাত। তুমি পরাৎপরা মহাবোগিনী তুমি পরমব্রহ্মের ইচ্ছা মাত্র অবলম্বন করিয়া এই বিশ্বজগৎ সৃজন করিতেছ, পালন করিতেছ, পরিশেষে সংহার করিতেছ। এক্ষণ দেখিতে হইবে, কালী কেবল অস্রনাশিনী নৃশংখমালিনী অথবা আদিম অমৃত্যু যুগের আম-মাংস বা শোণিত-লোলুপা রাক্ষসভাবাপন্ন নর-নারী নহেন। ইনি পরমশূন্যের পরাপ্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণাক্রিয়া গাংগায়া কাশি সতে “গুণত্রয়ঃ সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।” গদ্ব, রজঃ, তমঃ এই জগৎত্রয়ের সামান্যতার নাম প্রকৃতি। গদ্ব, রজঃ, তমঃ অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়

কারণ স্বরূপ প্রকৃতিই শাস্ত্রাস্তরের মায়ী, ঈশ্বরের স্বজনীশক্তি, প্রাধানিক, অব্যক্ত, অগম্যমান, বিক্ষেপশক্তিই আদি। মাকারবাদিগণ এই বিশ্ববীজ মূল প্রকৃতিকেই আদ্যাশক্তি “কালী” নামে অভিহিতা করিয়াছেন। উল্লিখিত কালীর ধ্যানেও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গদ্য রসঃ তগঃ এই গুণত্রয়ের স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে।

“ভাগীদেবং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং ॥ (মহু)

সৃষ্টির আদিতে এই জগৎ তমোময়ী প্রকৃতিতে বীন ছিল, এবং প্রত্যক্ষ অমুমান ও শব্দজ্ঞানের অতীত ছিল। সুতরাং প্রকৃতি প্রায়শ্চিকার স্বরূপ তমোময়ী। অতএব “দোরং” ভয়ানকঃ।

সে সময় “নাতোনর্গজিন্-ভূমরাগঃ। * * * *

প্রাধানিকং ব্রহ্মগুমাংস্তদাগীৎ।”

দিবা নাই, রাত্রি নাই, ভূম নাই, জন নাই, তজ্জ নাই, সূর্য্য নাই, বায়ু নাই, কেবল গাঢ় তমগাচ্ছন্ন, অনন্ত অন্ধকার সে অবস্থা অতি ভীষণ। তৎকালে একমাত্র প্রকৃতি এবং পরমব্রহ্ম অথবা (প্রকৃতি পূর্ব্ববাত্মক ব্রহ্ম) এই বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং প্রকৃতিরূপা আদ্যাশক্তি কালীকে “দোরং” বলা হইয়াছে।

সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যখন প্রায়শ্চিকারে তমোগুণ প্রদানা হইয়া বিশ্বগ্রাসিনী সংচরিতী যুক্তি পরিগ্রহ করেন,—তখন তাঁহার করাল-মুখনিবরে অতিবেগে সর্ব্বভূতময় চরাচর বিশ্ব প্রবেশ করিতে থাকে। তখন সেই ভীষণস্তর ভৈরব চর্কণে অগচ্ছূর্ণীকৃত হইয়া প্রকৃতির বিশাল উদরে বিলীন হইয়া যায়।

সহস্রংহার সময়ে যখন সচাকাল সমস্ত জগৎ কলন করিতে থাকেন, তখনকার অসহ্য বিরূপ ভয়ানক ভাটার কিরণে রোগে আভাষ গীতায় বিশ্বরূপ প্রদর্শনোপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

“ব্যাহীননং দীপ্তবিশালনেত্রং

* * * *

দংষ্ট্রাকরালানিচ তে মূণানি

দৃষ্টেব কাশানলমগ্নিভানি।

লেলিহঃসে প্রমদানঃ সমস্তা

লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জলন্তিঃ ॥

ভোমার বিষ্কারিতানন বিশাল প্রদীপ্ত মেত্র, করাল দন্তশ্রেণী, কালানল
সদৃশ ভাতি ভয়ানক, তুমি অগস্ত বদন বাদান করিয়া সমস্ত লোক গ্রাস
করিতেছ ।

এক্ষণ দেখিতে হইতেছে, সর্বসংহারক মহাকালকে যিনি কলন (গ্রাস)
করেন, সেই ভোরূপা সংহাররূপিনী কালীকে “করালবদনাং ॥ “ঘোরায়ং”
“ঘোররাবাং” “দন্তবাং” “মহারৌদ্রীং” প্রভৃতি ভয়ঙ্কর বিশেষণে বিশেষিত না
করিলে স্বরূপ বর্ণন হয় না । মহাকাল প্রাণিনী কালীর যে ব্যাভ্যন্তরন সমস্ত
জগৎ গ্রাস করিতে সমুদ্রত, সে মুখের বিশেষণ “করাল” ভিন্ন আর কি হইবে ?
সেই জন্তই কালী “করালবদনা” ।

যে ভীমদন্তের ভৈরব চর্চণে অগৎ চূর্ণীকৃত হয়, তাহার বিশেষণ “ঘোর
দংষ্ট্রা”ই স্বাভাবিক ।

যিনি বিশ্বসংহারিণী, তাঁহাকে “মহারৌদ্রী” না বলিয়া আর কি বলিব ?

যখন অনন্ত অগৎ প্রাণীহীন, নিখ শূন্যসয়, তখন তাহাকে মহাশ্মশান ভিন্ন
আর কি বলা যাইতে পারে ? সেই সত্তাশূন্য অনন্ত শ্মশানরাজ্যে যিনি
পরমপুরুষসহ বিরাজিতা তিনিই “শ্মশানালয়বাসিনী” ।

যখন ভোরূপা কালী লোকক্ষয়ে আবৃত্তা, যখন শ্মশানালয়বাসিনী, তখন
তাঁহার নৃসুণ্ডাগুলিনী, নরকর-কাঞ্চী বিভূষণ, নরশীরকুণ্ডলা, নাগই উপযুক্ত ।

কালী, শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা কেন ?

এ স্থলে “মহাদেব” পরমপুরুষের নামান্তর । পরমপুরুষ “সদৈকরূপং চিন্মাত্রং
নির্নিপুং সর্ববস্তু, ন করোত্মি ন চাপ্রাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি ॥”

চিন্মাত্র পরমপুরুষ সমস্ত বিষয়ে নির্লিপ্ত, তিনি ভোজন করেন না, গমন
করেন না, কোন পদার্থে অবস্থিত করেন না । তিনি কিছুই করেন না,
অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়,—শবপ্রায়” ।

অতরাং শবপ্রায় (নিষ্ক্রিয় পরমপুরুষ) মহাদেবের হৃদয়োপরি প্রকৃতিরূপিনী
“কালী” সংস্থিতা ।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ঐজর্গাদাস ঠাকুর ওষরত্ন ।

প্রত্যাখ্যাতা ।

মজ্ঞাতলে উপেক্ষিতা কহিলা সুন্দরী
প্রদীপ্ত সতীত্ব গর্বে প্রীতি উচ্চ করি
ক্রুদ্ধা রাজহংসী সম, “একি মহারাজ ?
রমণী কি আসিয়াছে তেরাগিণে লাজ
বিন্দু করুণার আশে হয়ারে তোমার ?
ভেবে দেখ মহারাজ, ভাব আরবার
শত অভিজ্ঞান-স্মৃতি, পড়ে না কি মনে
উভয়ের আত্মাহুতি প্রথম দর্শনে
নব-মুকুলিত পুষ্প সজ্জিত-শোভিত
শ্রীমল সে বনচ্ছায় কোকিল-কুজিত !
সেদিন রজতরেখা-পবিত্রামালিনী
গেয়েছিল আমাদের মিলনমাগিণী !
কোমল নলিনী দলে গুঞ্জরি ভ্রমর,
বলেছিল সে কাহিনী মনোমুগ্ধকর !
প্রিয়স্বদা অমুখ্য পল্লব আড়ালে
দাঁড়াইয়া দেখেছিল ফুল কুতূহলে
আমাদের হৃৎকনের প্রথম চূষন,
শঙ্কিত সম্রস্ত দৌহে লজ্জায় মগন
নিশার শিশির-সিক্ত সেফালীর প্রায়
শিথিল, পড়িছে ঢলে কম্পিত লজ্জায়
তোমার ও বন্ধপ্রাস্তে, আগি অভাগিনী !
কে জানিত ছলনার মজিহু তগনি !
আরো মনে করে দেখ, যবে একদিন
উত্তরে প্রেমের মোহে আছিহু নলীন
দীর্ঘাপাঙ্গ মৃগশিশু এসেছিল ছুটে
তুষার্ত্তুর পরিশ্রান্ত, পদ্মপত্র পুটে
ছিল তব বারিরাশি, মুখ ফিরাইয়া -
চাহিল সে মোর গানে অধীর হইয়া !

সম্মেহে আদর করি দিহু তারে জল,
আনন্দে সে ছুটে গেল হইয়া বিহ্বল !
জঁয়ৎ ছাগিয়া তুমি বলিলে তখন
আত্মজন সকলেরি বিশ্বাসভাজন !
আজ তুমি নরনাথ কেন জ্ঞানহারা ?
কহিছ প্রলাপ একি হয়ে আত্মহারা ?
হায় ! পুরুষের প্রেম ! অলির মতন,
নিত্য নব মধুলোতে করে বিচরণ
ফুলে ফুলে রসালাপ—কেবল ছলনা !
কেবল প্রেমের ফাঁদ ভূলাতে ললনা !
ধূর্ত্ত তুমি করিয়াছ বঞ্চনা আমার
ধর্ম্ম কল্লুর মত দুষ্ট শঠতার !
ধর্ম্ম সাগরী নৃপনার সাগরী সখীদ্বয়
গন্ধর্ব্ব বিধানে বনে ছদি বিনিময়
তোমার আমার ! আজ নির্লজ্জের প্রায়
তবে কি, এসেছি রাজা সেবিত্তে তোমায় ?
দিক্ দিক্ নগরের ঘণা আচরণ ?
কলুষ কুরেনি স্পর্শ পুণ্য তপোবন !
চেয়ে দেখ চিত্ত মোর শুভ্র অনাবিল,
বন জোছনার মত,—হয় নি পঙ্কিল !
কোথা আছ দেখা দাও জননী আমার
মাগিছে আশ্রয় মাগো ! চরণে তোমার
উপেক্ষিতা শকুন্তলা ?—তিজিল বন্ধন
অশ্রুজলে, অকস্মাৎ ভাঙিল ভূতল
দিব্যরূপে মেনকার—সজ্জিত্তত্ব তা
উড়িলা বিমানপথে মহিমামতিত্ব !

শ্রীমোগেননাথ ঠাকুর

সামাজিক উপন্যাস ।

[“লহরী”]

গত আশ্বিন মাসের “আরতি”তে আমরা “নাটক উপন্যাস ও ইতিহাস” এর পরম্পর সহকারিতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। উপন্যাস চর্চাতে ভ্রতকালের সমাজের যে একটি জীবন্তচিত্র লাভ করা যাইতে পারে এবং মানবচরিত্র বিশ্লেষণ দ্বারা কি মহোচ্চ শিক্ষা লাভ করা যায় আমরা অদ্য তাহারই আলোচনা করিব। গতবারে উৎকৃষ্ট সামাজিক উপন্যাসের কথা লিখিতে আমরা প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত প্রণীত “লহরী” উল্লেখ করিয়াছিলাম। এখন দেখা বাউক, এই নূতন সামাজিক উপন্যাসে সমাজ ও নৈতিকচরিত্র কিরূপভাবে প্রতিনিধিত্ব বা পরিস্ফুট হইয়াছে।

আজকালকার অধিকাংশ অসার উপন্যাস, নবজ্বালের দিনে অমর বাবুর ‘লহরী’ খানা অতি উপাদেয় বস্তু। ইহা পাঠক, চক্ষুকর্ণের নিবাদ ভাঙ্গিয়া পড়িলেই স্বয়ং বুদ্ধিতে পারিবেন। আমরা নিম্নে বৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই সমুদ্রে হইব। ‘লহরী’র গল্পাংশ এই :— উৎপল বাবু স্বরূপগঞ্জের একজন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। ‘লহরী’ তাঁহার ভাৰ্য্যা। একটা নবজাত শিশুর মৃত্যুতে লহরীর শরীর অসুস্থ বলিয়া স্থলের বাগা পরিভাগ করিয়া দাম্পত্য নদীবক্ষে বজায় বাস করিতেছেন। কিছুদিন এইরূপ চলিয়াছে। বর্ষার নদীর মত দাম্পত্যপ্রেমের ছটকুলবাহী স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়াছে। ইতিমধ্যে উৎপল বাবুর বাল্যবন্ধু, পাঠ্যবস্থার সহচর, অকুমাৰ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরূপগঞ্জে ওকালতী করিতে আসিলেন; আসিয়া উৎপল বাবুর শুল্কবাসায় আবাস গ্রহণ করিলেন। কিন্তু লহরীর অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে তাঁহার চিত্তের শান্তিভঙ্গ হইল। লহরীর প্রতি তাঁহার পাপদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল এবং কিরূপে লহরীকে আরত করিবেন এই পাপ-বাগনা অল্পদিন ছয়ই পোষণ করিয়া দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কিকে টাকা দিয়া বশীভূত করা হইল। কিন্তু তাঁহার প্রলোভন-চিহ্নগুলি উৎপলবাবুর প্রতিপালিত ঈশ্বর নামক একটি বালকের দৃষ্টগত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে লহরীর পিতার স্বগামবাগী পরোপকারত্ব, নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী, দেহবহনিকামধর্ম, যশুখুড়া উৎপলবাবুর বাগার লহরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। উৎপলবাবু কাৰ্য্যোপলক্ষে মফস্বল গিয়াছেন—যশুখুড়া পাপিত্তের সেই চিহ্নগুলি লইয়া

ভাটার নিকট ঠিকঠিক রাখা হইতে গিয়াছেন। অন্ধকার রাত্রি, ঘুমলথারে
 স্মৃতি ও প্রাণলব্ধ; পাণিষ্ঠ সুকুমার পাগ-ইচ্ছা নবপুঙ্ক চরিতার্থ করিতে
 লহরীর নির্জন মন্দিরে উপস্থিত, এমন সময় কশাট ভাঙ্গিয়া যন্তুখুড়া, উৎপলবাণ
 ও চক্র ইত্যাদি উর্দ্ধাঙ্গে প্রবেশ করিয়া লুপ্তেশ্বরের লাঞ্ছনা হইতে লহরীকে
 রক্ষা করিলেন। যন্তুখুড়ার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে চিরনাগ সুকুমার পাণের প্রথম
 প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিল। লহরী প্রথমভাগে বা “প্রতিফল” এইরূপে শেষ
 হইয়াছে। তারপর “পতিদান” বা দ্বিতীয়ভাগ

অতুল ঐশ্বর্যশালী উৎপলবাণ কলিকাতা লহরীর পিতৃদত্ত প্রাঙ্গণে বাস
 করিতেছেন। ডেপুটিগিরি ছাড়িয়া স্বামীনাথ বাবসায় আরম্ভ করিয়াছেন।
 ভাটার সম্পত্তি মগদ ৩৮ লক্ষ টাকা মারোয়ারী ল্যাঙ্কে মজুত। কিন্তু বাবসায়ীর
 স্মৃতি অনুসারে তিনি চারি লক্ষ টাকা খণ্ড করিয়া বাবসায় পাতিয়াছেন।
 সুকুমারের পাগ-চক্রান্তে চঠাং ভরণটাদ দেউলিয়া হইয়া গেল। কত লোকের
 সঙ্গে সঙ্গে উৎপলবাণ দেউলিয়া হইয়া প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু লহরী
 রাজপ্রাসাদের ভোগ, বিলাস ঐশ্বর্য ছাড়িয়া কেবল শাখা সিংহা লইয়া বিপুল
 ‘পিতৃপ্রাসাদ’ পরিত্যাগ করতঃ আজ কাশ্মীর স্বামীর অঙ্গুগামিনী হইলেন।
 সামান্য কুটারে, আজন্ম-স্বপ্ন-বর্জিতা বনি-কুমারী নবজাত শিশুটি ও স্বামী
 যেনার স্বর্গস্থ লাভ করিতে লাগিলেন। এদিকে পাণিষ্ঠ ‘সুকুমার’ সেনাগী
 করিয়া সেই পিতৃপ্রাসাদের অধিকার লাভ করতঃ তাহাতেই বাস করিতে
 লাগিলেন এবং প্রতিদিন প্রাঙ্গণ চরিতার্থ হইল বলিয়া আনন্দিত হইতে
 লাগিল। এদিকে মহাপুরুষ ভাস্করানন্দের কুণার উৎপলবাণ প্রেরণ
 দাক্ষিণ আক্রমণ হইতে স্মৃতি ও পিতৃপ্রাসাদের সহিত মঠেশ্বর্য লাভ করিলেন।
 চত্বতেও নিপদের চিরাবলগন যন্তুখুড়া গহায়। পাণিষ্ঠ সুকুমার এগার চিরকর্ণ
 হইয়া পাণের শেষ প্রায়শ্চিত্ত লাভ করিল। আর সাধুর পরিত্রাতা, হৃদয়কারী
 বিলাসক, মিকারধর্মরূপী যন্তুখুড়া বা যোগজীবন অনন্তদানে চলিয়া গেলেন।
 ইহা লইয়া প্রহকার ‘লহরী’ শেষ করিয়াছেন।

উপভাস শানি আধুনিক শিক্ষিত বঙ্গসমাজের ধনগৃহের একখানি আদর্শ
 চিত্র। ‘লহরী’ ধনি-কল্পা, বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী, পিতৃপ্রাসাদের
 মেঘে, স্বামীর সোহাগ-পালিতা; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা পায় নাই; কিন্তু
 প্রাচীন দ্বন্দ্বগৃহে শিক্ষিতা, আধুনিক কলা-বিদ্যা-ভূষিতা। প্রাচীন দ্বন্দ্বগৃহের
 স্মৃতিস্মরণীয় স্থিতির নবীন স্মৃতি চারিদিকে, প্রাচীণ সভ্যতার আলোকরশ্মি

নিকর হটরা “উজ্জ্বল মধুসূদন” অপরূপ সংমিশ্রণ করিয়াছেন। শিল্প-বদ্বা ভাষা
 আশ্রিত জীবিত, রক্ত-কুশল, গৃহ-কার্যাদিকা লহরী দেখানেনই নয় দেখানেনই
 ফুর যুগী লহরী মত গোরতে চতুর্দিক মোহিত করে, হেই-সোতে শারদ-
 চন্দ্রিকার মত গিরিনদী-বন কুণ কুণে স্নানিত করিয়া রাখে। চন্দ্র সেমন
 মঙ্গল সুখাবধী, লহরীও তেমনি ভাট-বঙ্গ, দামদামী, আশ্রায়-স্বপ্নে
 সমভাবে যের-বর্ণিত। জনর, স্বপ্ন-মুখীও হিন্দুগৃহের চিত্র। কিন্তু তাহাতে
 কবির উদ্দেশ্য অত্রকণ; ভ্রমর আসিতে দেবনা ভক্তি ও মরণ বিশ্বাসের
 সূত্র। স্বপ্ন-মুখী পতির সেবার নীরব আশ্রয়িতার সঙ্গী চিত্র। এই উভয়ে
 কবি—গর্ভ-ভাষ্যনী স্নেহ-মৃত্যু নিকাশ দেখাতে প্রয়াস পান নাই।
 কিন্তু অমর্যাবু লহরীতে মনগুলি রমণীমুদ্রির কোনন নিকাশ দেখাইতে চেষ্টা
 করিয়াছেন এবং আশ্রয়িতার মতে মেন কৃতকাব্যও হইয়াছেন। এক কথায়
 বলিতে হইলে অনিন্দ্য-স্বপ্ননী “লহরী” ত্রিসোতা ভাগিরথীর আশ্রয়িতা, পতি
 এবং পুত্র ও দামদামীতে স্নেহের ত্রিধারা প্রবাহিত করিতেছে। তাহার
 গুরুভক্তির মন্দাকিনী, মা ও মণ্ডুদায়; গেমের অলকানন্দা স্বামীতে;
 আর বাৎসল্যের ভোগ্যনী শিশুতা, ঠাকুর ও দামদামীতে। কেবল ইহাই
 এই ককুপাক্ষণী নিপন্নো মাহাত্ম্যে মৃত্যুত। অদূর চট্টগ্রামের বাহ্য-পীড়িত
 দরিত্র ও তাহার নীরব দানের পাত্র। এইরূপে রূপগুণের চৌদক শক্তি দিয়া
 লহরী গড়িয়াছেন। সে রূপের চটায় পাগঠ স্বকুমার “গহ্বর-বহুবল
 নিবন্ধুঃ” সেই রূপের নিকট হাসিন্টনের অলঙ্কার-ভূষিতা অনুরূপ লজ্জাবনত-
 মুখী। প্রহ্লাদারের ভাষায় “লহরীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিরন্তরনা মতাবতী
 ভিন্ন সকলেই মনে করিতেছেন, অলঙ্কার গৃহে রাখিয়া আসিলে স্বপ্নোদয়ের
 কাব্য হইত।”

যে রূপগুণের রাশি দেখিয়া গম্ভীর্য ভাষ্যবানু ভাবিয়াছিলেন, “না
 কারনে কেন? লহরীর মত রূপগুণে কী পাইলে লোকে কি না করিতে
 পারে?” সেই লহরীকে দেখিয়া বৃক হরনাথ, আটীন হিন্দু হরনাথ, লহরীর
 বিদ্যাদিনে বিজয়াদেশীর বিমর্জিত-চিত্র মনে করিয়া বলিয়াছিলেন “না,
 আবার এসো।” বঙ্গের মাঝি-মাল্লাও কিছুদিন লহরীমত বঙ্গের অনিন্দ্য
 বাটতে পারে নাই। বঙ্গের অতিমাহীন বেদীর আশ্রয় এক উদাসভাব ব্যক্ত
 করিয়াছিল। আনরাও বলি, “আদর্শ-হিন্দু-মহিলা-লহরী, তুমি যুগে যুগে
 হিন্দুর বরে, “আবার এসো।”

‘চাঁপন’ ‘বগুড়া’ : দেবী চৌধুরাণীর ‘প্রকৃতির’ মত, সীতারামের ‘প্রকৃতির’ মত, কুরুক্ষেত্রের ‘কুরুক্ষেত্র’ মত বগুড়া নিকানমণ্ডের অন্তর্গত।

“পরিজ্ঞান সাধনাং বিনাশায় চ তদুদ্যমঃ।

ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সন্তানসি যুগে যুগে ॥”

তাই বগুড়া আমার জন্মগৃহণ করিয়াছেন। নির্ভীক সন্ন্যাসী বগুড়া।
কি জী, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি বৃদ্ধ সব সময়েই সমভাবে গিয়া। আপনাতঃ
চরিত্রের প্রভাবী আলোকে সকলই হস্তময় ও সকলই প্রদীপ্ত করিয়াছেন।
তিনি সুপের মহাচর; আমোদের সজী; ক্ষেত্রের প্রাণময়; প্রাণীর বিশ্বস্ত;
অন্ধ এবং হৃৎকাতের আশ্রয়তর। কিন্তু তাই বলিয়া বৃন্দে হইবে না—
বগুড়া একটি রূপক মাত্র। তাঁহার ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট আছে। মণ্ডের ভার
তাঁহার গতি স্বয়ং হৃৎকাত। প্রয়োজন মত তিনি আসিয়া উপস্থিত হন।
প্রয়োজন সাধন হইলে তিনি আমার কোণায় উপস্থিত হন। তিনি “অপকণ্ঠী
শব্দের মত।” তাঁহার স্বরের উদাহরণগুলি “প্রজ্ঞাদিগি কঠোরগি, মৃদুনি
শিরীষাদিগি।” তিনি সুকুমারে অশনি-সম্পাত, বিভূষণের হৃৎকাত রৌদ্রকমান
বালক। তিনি জ্বরের অবতারস্বরূপ, মহাত্মা ভাস্করানন্দের শুভ বাগনার
অভিযাত্রী। শতবিধ অতিক্রম করিয়া জীবন সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত। তিনি
বাহ্য ভাষা ও সকল বলিয়া বোঝেন, কিছুই তাঁহাকে সেই লক্ষ্যে চেষ্টে
ব্রতী করিতে পারে না। বগুড়ার অমতেও তিনি বিভূষণকে রেণুকার নিকট
লইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রাণ দিয়া দিলেন। উদাত্ত বটিকাঙ্কর অক্ষকারে দুর্গম
প্রান্তর পারি দিয়া উৎপলের সতীত সাক্ষ্য করিয়াছিলেন। কর্তব্যের অজুরোণে
বালকের তীব্র লাঞ্ছনা সহ করিয়াও ইন্সপেক্টরের ভ্রান্তি অগম্য হইলে
তাঁহাকে গেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রাসাদ হইতে কুটার—সর্বত্রই
তাঁহার অবাধ্য গতি। এমন সুন্দর লৌকিক অলৌকিকের মিশ্রণ—এমন
অস্বাভাবিক মত নির্ভর, পর্কট-বাহু মত সুকণ্ঠ, গিরিনদীর মত স্বচ্ছ,
বৃক্ষের মত পরোপকারী চরিত্র বাজাল-মাতিতো অতি অল্পই দেখা যায়। এই
বাহু ও অতি বাহুর সংমিশ্রণ টেনিসের আঁধারে আছে, বাঁহুরাণের
Prim's progress-এ আছে, এবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের প্রথম দৃশ্যে
আছে।

সমস্তই এই রঙের প্রাণ-চরিত্র। উৎপলার সর্বত্রই অমর্য্য পারী
দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিশেষ কিছু নাই। সমস্তই এই

সাহাইবার একখানা গোণার পাঁচ মাত্র—ইংরাজীতে বলিতে হইলে—a good
oil to set off the gem Lahari. সংস্কৃত অঙ্কুরের ভাষায় তিনি
“বীৰলিত” নামক—কিন্তু এই পর্য্যন্ত।

পাপ সেমন আপাত মধুর অথচ পরিণাম দাণী, অকুসুমের তেমনি মধুরাকৃতি,
মিষ্টভাবী, চতুরালপী বৃন্দ। কিন্তু পরোমুখ বিষকূট। মিন্টনের মরণান কিবা
সেফপীররের 'Ingo's' মত পাণের জন্ম পাপী নহে। কিন্তু বহিমচক্রে
গজারামের মত প্রবৃত্তির দাস। “স্বকার্ষ্যমুদ্বারং প্রাজঃ কৌশলেন নলেন বা”
ইহাই তাহার জীবনের মূল মন্ত্র। অকুসুমের নীতিজ্ঞান শূন্য হৃদয়, জগদীন
সাহারা।

ইহু বালক। বালকের চরিত্র আরো একটু পরিষ্কৃত হইলে আমরা স্থণী
হইতাম। কিন্তু উক্ত বালকই অসুকরণ প্রবৃত্তির অধিক দূর যায় নাই।
চতুরা পুত্রান পাপী আর নিকট চটতে অকুসুমের পত্রগুলি আত্মসাৎ করা
ত্ৰিক বালকের কৰ্ম্ম কি না জানি না। তবে বালক হইলে কতকটা চটকে
পাকা মন্দেই নাই। আমাদের প্রিয় ইহুকে ত্রিক জটী বালক না মাজাইলেই
ভুল হইত। কারণ অকুসুমের একরূপ চিহ্নি জমাইয়া রাখা ও অসুসুমের
অপেক্ষা করা অগ্রগম্য অতটা বিবেচনা করা একটু পরিণত বয়সের আত্মসংযম
ব্যতীবেক সম্ভব বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। নিশাচর অকুসুমকে গাই
হইতে নামিতে দেখিয়া বোধ হয় বগুখুড়াও হুজুর মত চুপটী করিয়া থাকিতে
পারিতেন না।

এই গেল লহরীর চরিত্রাঙ্কন। এখান ভাবা মতই হই চারিটা কথা বলিয়া
আমরা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আজকালকার বাঙ্গালার
উন্নত বৈপ্লব মনে হয় পাশ্চাত্য ভাষা-সংস্কৃত বাঙ্গালী ক্রমেই নূতন জীবনীশক্তি
লাভ করিতেছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় মধ্য বাঙ্গালীই সর্বশ্রেষ্ঠ একজন
পত্রিকার কবিগণ থাকেন। অন্তঃ মনোজগতে এমন কয় ভাবই আছে যাহা
বাঙ্গালীয় অক্ষররূপে প্রকাশ করা যায় না। বাঙ্গালী প্রেমশীলিনী সংস্কৃতভাষার
কবিগণ, তাহাতে পাশ্চাত্য-ভাষাভাষী তাহার অঙ্গরাগ সাক্ষিত করিয়া অসম্ভব
করিয়া দিলেন। অতঃপরে বাঙ্গালী ভাষায় অনূর্ণ ই হইবে ইহা ভাব
আশ্চর্যের বিষয় কি? বহিসের পর আধুনিক লেখকগণের শীর্ষস্থানীয় লেখক
দয়ালু, সত্যকথ, সত্যিক গাওঁ নিকট। অমরবাবু এমন পরিদর্শিত
কবিগণের প্রাধান্যের নিমিত্তে পাইলেন আমরা যেহেতু বলাই ই

হইয়াছিল। সতীশচন্দ্রের ভাষার সম্বন্ধ তিনি যাহা মিসিরাজেন, তাঁহা তাঁহারই নিজ ভাষায় প্রতি প্রযোজ্য :—“তাঁহার বাক্যাদি গিগিরার ক্ষমতা অসামান্য। সরগভাষায় সংক্ষেপে গল্পীভাবে বিস্তারিত করিবার এক্ষণ ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই দেখা যায়।” লহরীর ভাষাটা তেমনিই। স্থানে স্থানে উহা “ছন্দময় কবিতা”। ছুট একটি নমুনা দিওঁ :—

“লহরীর কথার সঙ্গে কচুয়ী বেশ মৃদুচেহ, চাহরীর সঙ্গে চম্‌চম্‌ চমৎকার ;
নগিকতার সঙ্গে রমণীয়া রম্যতয়া ; সমতার সঙ্গে মোহনভোগ অতিনিষ্ট ;
জাদুর সঙ্গে ফরসী আম—খণ্ডে খণ্ডে কি অরাম ; ভক্তি ও প্রীতির সঙ্গে
জগ ও গান সুখাতল ও সু মষ্ট।”

আবার, “লহরী স্বপ্ন দেখিল, তাহারে নয়নের মণি চক্ৰলোকে খেঁচ
রাজহংসে চড়িয়া নধুর ভাগি ছড়াইয়া উড়িয়া বাইতেছে, সে ভাগির মুখ আঘাতে
শরতের সৌন্দর্য্য কুটিতেছে, শীতল গৌরভ ছুটিতেছে।” এ সকল হামির
কুলনা কেবল “রাশীভূতঃ প্রতিদিন মিল জাম্ববস্ত্রাট্টগমঃ।”

আবার, “সেই অরুণোদিত শ্রোতাকে শুনাওতে লহরীর হাত ছুটিল ;
পৃথক গিটকিরির সঙ্গে গগা আগিয়া যোগ দিল ; হরিদ্বারে জাহ্নবী-তীরে
দেবদারু সামগান জুগা, সাগরগঙ্গায়ে বিহঙ্গের কলধকনি তুল্য সুরে তাগে কি
নধুর মিলনা।”

অমরবাবুর উপমাগুলি এক একটা ক্ষুদ্র কবিতা। উহা রসে ভরপুর,
ব্যাকরণের সূত্রের মত অরাসরে, পিচ্ছতাগুণ ও অনবদ্য। যথা :—
“জলস্রোতে বুঝতীর অবন্ত ছবি ; জগদেবী যেন লহরীকে দেখিবার জন্ত
উঁকি দিতেছেন।”

এইরূপ ভটিনীর স্বভাব-মূহুরে মৌলিক্য প্রতিবিম্বে বিধাতার আদি সৃষ্টি
Live মুক্ত হইয়াছিল :—

As I bent down to look just opposite
A shape within the watery gleam appeared,
Bending to look on me :— P. L. Bk. VI.

৭. আবার,—“রাবী কিরণ গোমাদের আভা পাখরে অমন স্বপ্ন বিকৃতোৎসবতে
বৈতনা, আগুন ধরে বাণে।”

৮. কবিতা,—“তারার অভা নাই, ভোরের ভরসার ওজারঙনি রংহুত
কিছুকাল কেবলো সেখানে বসিয়া গিয়াছে।”

তন্মুখের “পদচারণা করিতে লাগিলেন, যেন থাকন্তার নজ্জার উপর কাটা-কম্পাগ চলিয়া বেড়াইতেছে।”

“খুড়া লাল কাল গেঞ্জি; ছদ্মকে লাগে।”

“প্রফুল্ল একটি চন্দ্রমীন কবিতা।”

তা’র পর ভাবার Assonance অথবা ছেঁকাহু শ্রীং দেখুন :—

“জিওগাফটা জঙ্গল,” হঠরী হাণ্ডার হাট, মেখেমেটিক্‌গ-ত মাখানটি জাচেই” ইত্যাদি।

অথবা,—“অষ্টিন অপেক্ষা তিনি এলিসন ভাববাসেন, যেন অপেক্ষা মনুতে তাঁহার মন আশ্রিত, সেকপায়রের নিকট যাক্স দাঁড়ায় না” ইত্যাদি।

“সামন্তার অপেক্ষা সামন্তা অনেক।”

পড়িতে পড়িতে কালিদাসের,

“স হস্তাপ নশাঃ প্রাপদাশ্রমং শ্রান্ত বাহনঃ।

সায়ং সংসগিনস্তস্ত বর্ষে সাহস্য সমঃ।”

কিংবা টেনিসনের,

“Even to the tipmost lance & top most helm”

“Then with that friendly-fiendly smile of his”

অথবা “All day the wind breaths low with mellow tone

Thro’ every hollow came & alley lone !”

মনে হয় না কি ?

লহরীতে কানোর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ধ্বনি অথবা Suggestiveness এর অভাব নাই। ছই চারিটি কথা বলিয়া পাঠকের কল্পনাকে পথ ধরাইয়া দিয়া যে কবি নীরব থাকেন, তাঁহার বর্ণনাই ধ্বনিপূর্ণ অথচ Suggestive. লহরীর গৌল্গা বর্ণনের প্রায়শ অতি অল্প ; কিন্তু পূর্বে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে কবি ধ্বনিদ্বারা কত কাজ সুন্দরভাবে সাধিয়া লইয়াছেন। উপহারও স্বরূপ, ভক্তারবাবু স্বগতোক্তি বা নিরাক্তরণা সভ্যবতীর বর্ণনা উল্লিখিত হইতে পারে। ছই একটি মাত্র কথা বলিয়া, যে একটি পূর্ণ চিত্র মানসপটে উদ্ভিত করিয়া দিতে পারেন তিনিই বথার্থ কবি।

আত্মীন স্রোতি অনুসারে অমর বাবুও “ছমে আলতা” ইত্যাদি করিয়া প্রাক্ত ভাবে লহরীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার ধ্বনিই বহুল। নৈবধকারের মত পদ্যভীরু-রূপ বর্ণনায় মোকেশ-সৌভিক না গীতিকা সাক্ষ্য

নিম্নে সংক্ষেপে হর গোপীর রূপ প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য আমরা কহি যে এক অপূর্ণ গোপব্যবস্থা করিয়াছেন :—

“প্রবুদ্ধ পানিগ্রহণং বদন্তু-

বদন্তুঃ পুত্রাতি কান্তিমগ্রাম্।

সারিণ্যযোগাদনয়োত্তমসৌ-

কিং কথ্যতে শ্রীকৃত্তান্ত তত্ত্ব।”

যেখুঁড়ার মুহূর্ত্তকালে, তাহার সদন্যতিব কথা অমরবাবু কেমন সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

“একটা নির্মল্য ভাষার পানিগ্রহণ চিত্র খুঁড়ার মুখকণ্ঠে ফুটিয়া উঠিল।”

অথবা অল্প Telepathyর তত্ত্ব কেমন হঠাৎ কথার সর্বত্র পরিষ্কৃত হইয়াছে :—

“এই প্রভাতে হেঁচকা স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। জল সর্বত্র সমান।”

এক বড় বাড়িয়া গিয়াছে ; পাঠক মনোযোগ সহকারে পড়িলে আরো কত সৌন্দর্য্য অবস্থার সজ্জিত দেখিতে পাইবেন।

অমরবাবু সর্বত্র চিত্রেও সজ্জিত হইল। তাঁহার ভাষাভাষা, বার লাঠিভাষা, উৎসাহের স্বপ্ন সাহিত্য-গল্পাট বহুসংখ্যক মুখ আধুনিক বাঙ্গালী ভাষার অনন্ত প্রাচীনত্ব। হৃৎকণ্ঠের গৃহস্থানী প্রভৃতির চিত্রগুলি কেমন প্রাচীন ও জীবন্ত। পত্নীর পর বহু সমাজের ইতিহাস লেখক ইহা হইতে আর উৎকৃষ্ট উপাদান অল্পট পাইবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই, লক্ষ্যী বাঙ্গালীর প্রতি স্বপ্নের পৃষ্ঠিত তত্ত্ব উচিত। এই গ্রন্থখানি বিশেষ চিত্রে সুবচন কল্পা, ভগিনী কিংবা ভাষার হাতে দেওয়া যায়। লক্ষ্যীর শিখা, সমাজ শিখার ভিত্তি। দাম্পত্য জীবনের চরমোৎকর্ষ হইল। মঙ্গল দলিয়াছেন এবাং হাণ্ড দেখিতে পাই :—

“সন্তোষে ভাষা তত্ত্ব। তত্ত্ব ভাষা তত্ত্ব।

বহুসংখ্যক মুখ নিত্য কল্যাণে তত্ত্ব বৈ স্বপ্ন।

সাম্প্রতিক মিষ্টনের ভাষারও,

“Harmony to behold in wedded pair

More grateful than harmonious sound to the ear.”

গভীরে প্রভাৎ অল্প। সান্নিধ্য বহুকে, অমরবাবু ব্যাপক, যোগ্য কীটকে একই সমাজ বহুসংখ্যক পড়া করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক

গাশাংচারিঅ, কনজান্ পরমজি কুংজিঅ।”

আর নিকামপদ্বীপী নও খুড়া? উঠা মনাতন পুণার চির মণ্ডাব, পাণের নিগা চরী। সেট নীর ভাষায় “বগু খুড়া ভুগি ভিগে, ভুগি আত, স্বর্ণে মর্ন্ত ভুগি।”

উপসংহারে অমর বাবু নিকট আমাদের একটি সমুদ্রোপ আছে। ৩৮ বঙ্গ টেকার মালিক মণিলকার চটলে মহাজ্ঞে চির কবিতায় বাগ করা যায়। আমরা তখন কবি উপদ্রাব দেখিরাছি যে নারক দরিদ্র অথবা মশানিত শ্রেণীরও লোক। আশা করি সেট নীর মৌভাগ্যবান কবি উঠার সরস চরিত্র ভাষায় দরিদ্র কুসীরের একখানি সুখময় চির বঙ্গ সাহিত্য কে উপহার দিলেন। “স্বর্ণিতায়” ভাষা আছে সাহস নাট। অমর বাবু লেখনার পক্ষে বিচিত্র ঘটনাময় সাহিত্য গল্পই মাথা হটবে।

ঈকামিনীকুমার গেন।

* লহরী প্রবন্ধ সমালোচক সচিব আমাদের কয়েকটি বিষয় মন্তব্য আছে। আমাদের দক্ষতা সংক্ষেপে এই স্থানেই প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। বিদ্যাগা যেমন সকল রত্নে তিল তিল সংগঠ করিয়া ত্রিলোক্যদেব দেহ গঠন করিয়াছিলেন—শঙ্করসমালোচক মহাশয়ের মতে যেমন নিখিল গুণ-সমন্বয়ে প্রাকৃতিক লহরী উপদ্রাব নিরচন করিয়াছেন। লহরী পাড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছিলাম ওখানি এই সমালোচনাটি অতিশয় অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়।

শঙ্কর সমালোচক মহাশয় লহরীর চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ অমর কবি দক্ষিণচন্দ্র প্রমথ ও স্বর্ণামুণীর চরিত্র চিত্রাঙ্কণের সচিব ভূমিকা করিয়া লেখাছেন “এই উভয়ে কবি (নাট্যচরিত্র) : কল্পনাযুক্তী স্বেচ্ছাভার প্রকাশ দেখাইতে পারায় পান নাট। কিন্তু অমর বাবু লহরীতে সমস্ত লিঙ্গ-বিশেষের কোমল পিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং আমাদের মতে বেশ কঠোর ও চটয়াছেন।”

সুখপুণ শ্রীমতী যেমন প্রাকৃতিক মনোভর চিত্রাঙ্কণ চটকে আপনার পছন্দমত এক একটি দৃষ্ট বাস্তবায়ন এবং সেট দৃষ্টান্ত চাক হুঁসকার সমস্ত সুখীকর ফুলন যেমন সুন্দর কবি, মানব-প্রকৃতি হইতে বাস্তবায়ন এক একটি মনোবৃত্তি প্রকাশ করেন এবং তাহারই বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস পান। পারিপার্শ্বিক ঘটনাকেও সেট একটি বৃত্তিকে পরিষ্কৃত করিয়া ভূমিকার জগত গৃহীত চরিত্র থাকে। বক্তব্যে অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন কবি, তাই তিনি সাধারণ লেখকের মত সকলগুলি বৃত্তি এক চরিত্রে পরিষ্কৃত করিতে প্রয়াস পান নাই। অরুণের কোন শ্রেষ্ঠ লেখকই সকলগুলি ভাষা অথবা সকলগুলি বৃত্তি এক চরিত্রে সমাবেশ করিয়া দেখান নাই। দেখাইলেও কঠোর হইতে পারেনা সত্যে। মানবচরিত্র যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ যেমন, কবিও কঠোর চিত্রাঙ্কণে বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাই, কেবলমাত্র, কেবলমাত্র

কেহ রাধিকা, কেহ কল্লী, কেহ উমা, কেহ শকুন্তলা, কেহ দেবদাসী, কেহ মিরাসী, কেহ লেডি মেকেন্স, কেহ গুয়েলারা, কেহ জুলিয়েট, কেহ রোজেলিও। প্রত্যেক চরিত্রেরই এক একটি বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেক চরিত্রেরই ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা দোষ পরিস্ফুট করিয়া তোলাই কবির উদ্দেশ্য। মহাপুরুষদিগের চরিত্রও এক একটি অসামান্য গুণের সমাবেশে সম্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কেহ সর্বশক্তি—চরিত্র, কেহ ধর্মবীর—যুগিষ্ঠির, কেহ হির-প্রতিজ্ঞ—ভীষ্ম, কেহ দাতা—কর্ণ, কেহ মহাত্মা—রাম, কেহ স্বদেশ-বৎসল—দশাচী, কেহ সর্বজনমুগ্ধ সমাসী—নারদ, কেহ তত্ত্ব-গগনচিহ্ন—প্রহ্লাদ। সকলেই মহাপুরুষ তথাপি এক একটি গুণ এক এক জনের মধ্যে সমদিক পরিস্ফুট।

আমার সুবিশ্রুত লেখক ডাক্তার জন্মস্বামী বলিয়ারেন—চিন্তাশীল প্রতিভাবান লেখক অনেক সময় তাহাদের আদর্শ পুরুষের চরিত্রেও সামান্য দৌর্বল্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এক্ষণে করবার কারণ এই, তাহাদের চিত্রিত আদর্শ পুরুষ যদি কেবল সর্বগুণ সম্পন্ন দেবত্ব লাভ করে তাহা হইলে সাধারণ লোক তাহাদের মতের অনুকরণ করিতে সাতম পায় না; নিজের অভাব এবং আদর্শ পুরুষের পূর্ণতা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই, লক্ষী-সমালোচক যে বঙ্গমচন্দ্রের ক্রটি দেখাইয়াছেন তাহা ক্রটি নয়, পরন্তু তাহাই প্রতিভার অন্যতর বঙ্গমচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয়।

প্রকৃত সমালোচক মহাশয় লক্ষী উপজ্ঞানে বাহা কিছু দেখিয়াছেন তাহাওই শুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। গ্রন্থকার, “জিওগ্রাফীটা জঙ্গল, হিটরী হাবডার হাট, মেথেমেটিক্‌স্ মাথাগাটি” লিখিতে পারিয়াছেন দেখিয়া বড়ই অজ্ঞান হইয়াছেন এবং পাঠকদিগকে ডাকিয়া Assonance-এর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। কচি শিশুর কঠিনম্ভূত অর্থহীন অব্যক্ত শব্দও যেমন স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ে স্থায়ী বর্ষণ করে তেমনি লক্ষী-লেখকের অতি অকিঞ্চিৎকর কথাটিও সমালোচক মহাশয়ের লাগে অসীম আনন্দ প্রদান করিয়াছে। তাই “মামুলা অপেক্ষা সামুলা বেশী” এই কথাটিও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং মিল্টন, কালিদাস, হেনসন প্রভৃতির কবিতা তুলিয়া তুলনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের প্রতি কথার সম্পাদক মহাশয় নিম্নরে অভিব্যক্তি হইয়া গিয়াছেন। তাই তিনি রেণুকার স্বপ্ন হইতে Telepathy তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন। আমরা লক্ষী পড়িয়াছি, লক্ষী উপজ্ঞানখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। উত্তর ভাষাও অতি সুন্দর; কিন্তু সমালোচক মহাশয় বাছিয়া বাছিয়া যে সকল স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া পাঠকদিগের লক্ষী পড়িবার বাসনা কতদূর উদ্দীপ্ত হইবে বলিতে পারি না।

পরিশেষে তিনি সর্বজন প্রাণসিঁহ “স্বর্ণলতার ভাব আছে সাহিত্যে নাই” বলিয়া অমর বাবুকে একটি নিখুঁত গাঁইছা চিত্র অঙ্কনের ভার প্রদান করিয়াছেন। কোল গ্রন্থকারকে এমনভাবে আকাশে তুলিতে আমরা কদাচ দেখি নাই। সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় পাঠক থাকি উচিত।

(সম্পাদক)

প্রাণেশচন্দ্র ।

(১৬)

দাদা মহাশয়ের ঠিক। অল্প কোথাও না বাটরা কলিকাতা চলিয়া যান। প্রাণেশচন্দ্রের এত শীঘ্র কলিকাতা বাটবার ইচ্ছা নাই। প্রাণেশচন্দ্র সাতুলগরে বাইবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন; এখন শ্রীপুর বাইতে চাহিতেছেন না—মন মাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়াছে।

প্রাণেশচন্দ্র মাকে দেখিয়া বাইবার অভিপ্রায় জানাইলে দাদা মহাশয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। প্রাণেশচন্দ্র জীবনের যে একটা বাঁধ বাঁধিয়াছিলেন তাহা শিথিল হইয়া গিয়াছে; দাদা মহাশয় তাহাকে যে ব্রতে, যে পথে চালাইতে চাহিয়াছিলেন সে ব্রতে সে পথে কাঁটা পড়িতে বসিয়াছে। এই অবস্থায় মায়ের মায়ের পড়িলে প্রাণেশচন্দ্র একবারে হারিষ্টয়া বাইবে ভাবিয়া দাদা মহাশয় বিচলিত হইলেন; আবার তাঁহার কোমল প্রাণে ইহাও উঠিতেছে—প্রাণেশচন্দ্র মাকে দেখিয়া বাইতে চাহিতেছে—তা দেখিয়া যাইবে না ?

নৌকা গোয়ালন্দ অভিমুখে চলিল; তাহার। গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহ বাইবেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গত নন্দনপুর প্রাণেশচন্দ্রের জন্মভূমি। তৃতীয় দিন অপরাহ্নে তাহার। নন্দনপুরে উপস্থিত হইলেন।

নন্দনপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই ক্ষুদ্র গ্রামে ব্রাহ্মণই অধিক। ইহাদের মধ্যে প্রাণেশচন্দ্রের অবস্থাই ভাল; তালুক আছে, খাসার আছে; তার মা ব্যতীত সংসারে আর কেহ নাই, মায়েরও এই এক পুত্র ব্যতীত অন্য সন্তান নাই। মা আনন্দময়ী একমাত্র পুত্র। দিকে চাহিয়া সংসার পরিচালন করেন, তাঁহার—মা পুত্রকে বিবাহিত করাইয়া—আঁখার ঘরে আলো জালাইবেন। পুত্র বিদ্বান—অনেক কল্লার পিতা আনন্দময়ীর নিকট আসিয়া থাকেন। ইহাদিগের অনেকেরই বিশ্বাস—প্রাণেশচন্দ্র হিন্দু মতে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন না। তাঁহার। এ কথা আনন্দময়ীকে বলিয়া থাকেন, আনন্দময়ীর বিশ্বাস—পুত্র মায়ের অবাধ্য হইবে না।

প্রাণেশচন্দ্র মায়ের চরণগুলি লগলেন; দাদা মহাশয় আসিয়া আনন্দময়ীকে আশ্বাস করিলেন।

প্রাণেশ। ইনি আমাদের দাদা মহাশয়—আর কথা কত বলোছি।

আনন্দময়ী । দেখ বাবা, বড় ভাল হয়েছে—তোমার দাদামহাশয়কে নিয়ে এসেছি, তিনি মত দিলেই সব হয়ে যায়, বিয়ে ঠিক—মেয়েটি পরমা সুন্দরী, কি বল ?

আনন্দময়ী দাদামহাশয়ের উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।

প্রাণেশ । তোমার ঐ তো রোগ—ঘরে পা না দিতেই নিষেধ কথা । দাদা মহাশয় এসেছেন—কি খেতে দিবে তাই আগে দেখো না ।

আনন্দময়ী । তুই আজ বাড়ী আসবি তা আমার মনেই বল্ছিল ; মণি বিড়ালটা তুই যেখানে বসে পেয়ে থাকিস্ সেইখানে বার বার ঘুরে ঘুরে যেন তোর আগবার কথাই বল্ছিল । পাবার—তা হুঃপ কি, বাড়ীতে গাই আছে ; কীর ক'রে রেখেছি । বাবা সন্দেহচক্রে—হাত মুখ ধুয়ে এস ।

প্রাণেশচক্রে হাসিতে হাসিতে বলিলেন “ও কি বলছো মা, দাদা মহাশয়ের নাম সন্দেহচক্রে নয়—স্বদেশ-চক্রে ।

আনন্দময়ী । আমাদের অত স্বদেশ টদেশ মনে থাকে না—আচ্ছা বগ্নো বাবা স্বদেশচক্রে ।

প্রাণেশচক্রে দাদামহাশয়কে বলিলেন “তখন স্বদেশ স্বদেশ বলে এত কথা হয় নাই, এত আগে আগনার মা মাপ কি ক'রে আগনার নাম স্বদেশচক্রে রাখলেন ?” মার দিকে চাহিয়া বলিলেন “মা তুমি একদিকে ঠিকই বলেছ—দাদামহাশয়কে সন্দেহচক্রে না বলুক অনেকে “মিঠাদাদা” বলে ডাকে ।

প্রাণেশচক্রে মা দাদা মহাশয়কে খুব আদর করিয়া পাওয়াইলেন ।

জলযোগের পর আহাৰ, আহাৰের পর গল্প—অনেক রাজিতে তাহারা নিদ্রা গেলেন । প্রাণেশচক্রে মা, প্রাণেশের বিবাহের কথায়ই দাদা মহাশয়কে আগাইয়া রাখিয়াছিলেন । আনন্দময়ী শয্যা যাইবার আগে বলিয়া গেলেন “বেস্ হয়েছে, তুমি এসেছ—মেয়ের বাপ মেয়েটিকে এই গোয়েই আমাদের এক কুটুমবাড়ী নিয়ে এসেছে, প্রাণেশ, দেখবে, তুমি দেখবে ।

দাদা মহাশয় রাজে ভাবিতে লাগিলেন—এ হলো কি ? ওদিকে মুক্তি, ঐ উপমা, আবার এই একটি উল্লিখিত, প্রাণেশচক্রে জিভুজের তিন কোণার দাঁড়ায়ে জিভুবন দেখতে হবে ।

ভোর হইতেই দাদা মহাশয় উঠিয়াছেন । তাঁর যা স্বভাব, উঠিয়াই বাড়ীর চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, কোথায় কোন্ ঘর, কোথায় কোন্ গাছ, ফলের বাগান, ফুলের বাগান, সবুজ বাগান—সব । সব ঘর খড়ের কিন্তু অতি সুন্দর—একখানি ঘরের চালে লাউ গাছ উঠিয়াছে, কচি কচি লাউ

যেন ছোট ছোট শিশুর মত খুঁটায় আছে। এক কোণে একটা খোলা পাতিল চূণ আঁকা চোক লটায়। চাপরাশির মত গাছাড়া দিতেছে। উঠান পরিষ্কার, গোয়াল পরিষ্কার, গাইগুলি নাইশ মুহূর্ণ; বাছুরগুলি বেন্দু। মর্কট লক্ষ্মীর পদচিহ্ন পড়িয়া আছে।

প্রাতে দাদা মহাশয়ও প্রাণেশচন্দ্রকে কড়া দেখান হইল। কড়াটা জ্বলিয়া। নাম—লাবণ্য। এখন প্রাণেশচন্দ্র যাইয়া ভাবুক গিয়ে—মুক্তি—না, উগমা, উপমা—না লাবণ্য, লাবণ্য—না মুক্তি।

তাঁহাদিগকে তিন দিন থাকিতে হইল, চতুর্থ দিনে তাঁহারা কলিকাতা যাত্রা করিলেন। প্রাণেশচন্দ্রের কলিকাতা যাইতে সাহসে কুণাটতেছিল না। কিন্তু দাদা মহাশয় যে স্থানে কাণ্ডারী, সে স্থানে কুন গাইতেই হইবে; তাঁহারা জাহাজে পদ্মা পার হইলেন। এ সেই জাহাজ, যে জাহাজে উগমার সঙ্গে প্রাণেশচন্দ্রের প্রথম দেখা হইয়াছিল।

জাহাজ গোয়ালন্দ পৌঁছিতে রাত্রি হইল। দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, দিগন্ত বিস্তৃত জগরাশি, জাহাজ হুর্জরবেগে ছুটিয়াছে—থাকিয়া থাকিয়া নবীনধনি করিতেছে। উপরের তালার প্রাণেশচন্দ্রের সম্মুখে উন্নতদেহ দাদা মহাশয়। উপবিষ্ট—প্রাণেশচন্দ্র উচ্চ গলায় গাইতে লাগিল—

এম গো ভক্তি-গঙ্গা—

ভগবৎ পদকমল হ'রে, হৃদয়-মক্‌ সান্নায়ে

রজতশুভ্র পুণ্য হিম্মল্য বাহিনী !

জলের উপর গান বড় জমিয়া গেল। গান শেষ করিয়া প্রাণেশ বলিলেন—
“এই ভক্তির কথা লইয়াই আনন্দমঠের আরম্ভ।

দাদা মহাশয়। না, যে ভক্তি স্বদেশভক্তি, তোমার এ ভক্তি—ঈশ্বরভক্তি। ঈশ্বরে ভক্তিই স্বদেশভক্তির মূল। ঐ কথাই তোমাদিগকে বুঝাইতে চাই।

দাদা মহাশয় বলিলেন—“অবির গাও।” প্রাণেশ অবির গাইল।

দাদা মহাশয়ের চোক হইতে জল পড়িতে লাগিল—তাঁহার মন ডাকিতেছে—
ঈশ্বর কোথায় তুমি, ভক্তি কোথায় মা। স্বদেশ! তুমি মাটি না সান্নায়ে, ফুল না ফল, জল না স্থল—তোমার জন্ত আমি কি করিলাম—স্বরণ চাই পিতা মাতাকে তিনি ভাবিতে লাগিলেন তাঁহাদের দত্ত স্বদেশচন্দ্র নাম কি সার্থক হইবে।

দাদা মহাশয় প্রাণেশচন্দ্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন; প্রাণেশচন্দ্র দাখা মহাশয়ের চির আরাধ্য বুদ্ধি বুকে মাখা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

জাহাজ গোয়ালন্দ পৌঁছিল। দাদা মহাশয় হুথানি টেলিগ্রাম করিলেন। একখানি ইনসাইনকে অপর খানি ব্রজেন্দ্র বাবুকে, রাজিভেই তাঁহার কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(১)

দাদা মহাশয় ভোরে ব্রজেন্দ্রবাবু বাণায় উপস্থিত হইলেন। চাকর উঠিয়াছে; বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া দিয়াছে। কল জল আসিয়াছে—জল বাল্‌তিতে পড়িয়া একটি মিষ্ট স্বর তুলিয়াছে। চাকরটা অল্প বাল্‌তি কল রাখিয়া ভরা বাল্‌তির জল বারেন্দ্রায়, স্নানের কুমরায় ঢালিয়া দিচ্ছে, ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিতেছে। কলতলায় বাল্‌তিতে জলের শব্দে, জল ঢালার শব্দে, ঝাঁটা দেওয়ার শব্দে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার একটা জল বাজিয়া বাটতেছে।

দাদা মহাশয় বৈঠকখানায় বসিলেন; কেহ উঠে নাই কাহাকেও দেখিতে পাঠিলেন না, কাহাকেও ডাকিলেন না।

মুক্তি অতি ভোরে উঠে। ভোরের বড় তারাজি না দেখিলে তার চলে না; ভোরের বাতাস টুকু না হইলে তার গা ঠাণ্ডা হয় না; উষার আলোক টুকু না হইলে তার প্রাণটা হামে না; তোরে ফুগের গন্ধ না শুঁকিলে, বারেন্দ্রায় টাঙ্গান পিঞ্জরায় 'বউ-কথা-কণ্ড' এর ডাকটা না শুনিলে তার ভাল লাগে না। ভোরে না হইলে তার পড়া বৈঠক হয় না। মুক্তি ভোরে উঠিয়াছে, তেতলার ছাতে বেড়াইতেছিল, টবে টবে ছুপাটটা গোলাগ ফুটিয়াছে, তার গন্ধ লইতেছিল। নানিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

মুক্তি। দাদা মহাশয় এসেছেন, আমি আগনাকেই মনে করছিলাম; কেমন মনে নয়; আপনি যে এসেছেন তা বুঝতে পেরেছিলাম; আপনার পা পড়লেই জামরা টের পাতি। রাজেন্দ্র বাবা আপনার টেলিগ্রাম পান; আপনাদের একি একটা রোগ হলো; গেলেন তা বসে গেলেন না যে।

দাদা মহাশয়। আচ্ছিকবেই বা ব'লে মেয়ে পাঁকি; আমি ব'লে নাইও না, ব'লে আসিও না। এই দেখ্ এসেছি, ব'লে এসেছি কি?

মুক্তি। আপনার নিজের বাড়ীতে কে কবে ব'লে এসে থাকে। থাক, প্রাণেশ দাকে নিয়ে এলেন না যে?

দাদা মহাশয়। সে কি মোট, সে নিয়ে আসুনো, তার-ত পা আছে।

মুক্তি। পা আছে—পাশাশার জজ। আপনি গদ্যাপার গিয়াছিলেন,
প্রাণেশ দার সঙ্গে দেখা করিতে ? আমার পত্র দিয়েছিলেন ?

দাদা ম'শায়। গদ্যাপার সাই নি। এষ্ট নে গদ্যাপারের খেঁজুরে শুড়।

দাদা ম'শায়। পকেট হুইতে শুড় বাহির করিয়া সম্মুখের টেবিলে রাখিলেন।

মুক্তি। শুড় ছুইগ না।

দাদা ম'শায়। এষ্ট নে গদ্যাপারের টুকুণ।

মুক্তি। কুণ ভূগিয়া লইল।

দাদা ম'শায়। এ পকেট ও পকেটে হাত দিতেছেন আর ভুলিতেছেন,
বলিলেন,—এষ্ট নে গদ্যাপারের হেঁতুল কাসান্দ।

মুক্তি কাসান্দ্রির ডেলা তাত্তে লইল, আস্তুলের ডগায় একটু জিনে দিয়া
অতি আরামে টুক করিয়া একটা শব্দ ভূগিয়া বলিল—“পকেট হ'তে আপনি
প্রাণেশ দাকে বেরু কর্ত্ত পারেন তবে বুঝ আপনাদের কেমন পকেট।”

দাদা ম'শায়। এ পকেটে ও পকেটে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন—“ইলি
মিলি ঝিলি, আয়—প্রাণেশচন্দ্র, আয় প্রাণেশচন্দ্র, না প্রাণেশচন্দ্র এলো না।”

তিনি একটু চাপিয়া হাসিলেন।

মুক্তি। প্রাণেশ দা এলেন না, তাঁর মনটা বুঝি বজ্র ভেঙ্গে গেছে।

দাদা ম'শায়। দীক্ষিত হ'তে না পেরে খুব ভেঙ্গে গেছিল, তবে ডাকাতের
হাত হতে মেয়েটিকে রক্ষা ক'রে তার মনে একটা বস এসেছে, ভাল কাজ
করলেই মনে বস আসে।

মুক্তি। ঐ মেয়েটির কথা ভুলবে বনেই ভাব্ছিলো। উপলক্ষ পাইয়া জিজ্ঞাসা
করিল—তাইত—আঃ ডাকাতের হাতে পড়ে মেয়েটির মনটা যেন কেমন
করছিলো। বেঁচে গেছে, প্রাণেশ দা খুব কষ্ট করেছেন। মেয়েটা দেখতে
কেমন ? বয়স কত ?

দাদা ম'শায়। বয়স তাঁর মত ; দেখতে—বিনা, সানানে অপর, বিনা
পাউডারে স্বর্গের পৈরী—বিনে আলোয় স্থল পদ্মের মত।

মুক্তি। আপনার কবিত্ব রাখুন, দেখতে কেমন ? লেখা পড়া জানে ?

দাদা ম'শায়। বলছি খুব সুন্দরী, ওরূপ সুন্দরী আমি কম দেখেছি।
লেখা পড়া জানে না। কেবল কি ঐ মেয়েটা দেখেছি, আমরা প্রাণেশদেব
বাকী গিয়াছিলাম, তার মা এক পাত্রী ঠিক করেছেন, সে মেয়েটাও দেখেছি।
তাঁর চাইতে বয়সে ছোট, ও মেয়েটাও বন্দু।

মুক্তি । এরই না নাম কি, ওরই না নাম কি ।

দাদা ম'শায় । এর নাম লাবণ্য ওর নাম উপমা ।

লাবণ্য উপমা, উপমা লাবণ্য পাঁচ বার মনে মনে উলটি পাঁচটি মুক্তি বলিল
উপমা নামটি তো বেসু । লাবণ্য—তবে প্রাণেশ দার দিয়ে—

হাসি আস্তে আস্তে মুক্তির মূখ মলিন হয়ে গেল, মূখ মলিন হ'তে হ'তে
মুক্তি হেসে ফেললো ।

মুক্তি । প্রাণেশ দাকে গেলে হতো । খুব একটা নেমস্তন্ন আদায় ক'রে
ছাড়লো । তা আপনি নিয়েই এলেন না ।

দাদা ম'শায় । “আয় প্রাণেশচন্দ্র আয় প্রাণেশচন্দ্র” ব'লে হু'গকেটে হাত
দিতে লাগিলেন বলিলেন, “তুই দেখতো হাত দিয়া ।”

মুক্তি কোতুকের ছলে হাত দিয়া বাহির করিল একটা পাকা কুল—কচু
করিয়া এক কামর খাইল ।

দাদা ম'শায় । দেখতো ঐ টেলিফোন দেরজ ।

মুক্তি কোতুকের ছলে তাহাই করিল—একটা নুনটে ইন্দুর বাহির হইয়া
পলাইয়া গেল ।

দাদা ম'শায় । দেখতো ঐ বিছানায় ।

বিছানা লেগিয়া ঢাকা ছিল । মুক্তি লেগ ভুলিয়া ফেলিল ।

হো হো হো—প্রাণেশ দা, তুমি এসেছ, লুকিয়ে ছিলে, দাদা ম'শায় তোমার
লুকিয়ে রেখে এই খেলা খেলেছেন, প্রাণেশ দা তবে তুমি আমাদের কথা সব
তুনেছ ?

প্রাণেশচন্দ্র হাসিতে হাসিতে চোক কচালিতে কচালিতে উঠিয়া আগিয়া
বসিলেন ।

দাদা ম'শায় । এই নে তোর প্রাণেশ দা । এনে দিলুম তো ।

মুক্তি । আপনার অসাম্য কিছু নাই ।

এই সময়ে ব্রজেন্দ্রবাবু উপস্থিত হইলেন । প্রাণেশচন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া অপ্রতিভ হইয়া একটু দূরে দাঁড়াইলেন ।

দাদা ম'শায় বলিলেন “রেল হইতে নেবেই এখানে আসছি, আমরা এখন
বাই, পরে আসবো ”

মুক্তি তার বাবার দিকে চাইয়া বলিল, “না বাবা যেতে দিও না, এরা
এইখান থেকে যাবেনক” প্রাণেশ দাকে ডাকিয়া বলিল—“যেতে পারিবেন
না ; এইখানে যাবেন ; আপনার কাছে আমার অনেক কাজ আছে ; বহুন,
আমি আসছি !”

মুক্তি চলিয়া গেল, দাদা ম'শায় আগেই উঠিয়া গিয়াছেন, ব্রজেন্দ্রবাবুও
চলিয়া গেলেন । মুক্তি ছাতে একখানি বই হাতে লইয়া পড়িতেছিল, বই আনিয়া
নৈতিকখানার টেবিলে রাখিয়া গিয়াছিল । প্রাণেশচন্দ্র বইখানি খুব মনোযোগের
সহিত উলটিপালটি দেখিতে দেখিতে মুক্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।

আব্রতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ।

ষষ্ঠ বর্ষ । } ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩১৩ । } ষাটশ সংখ্যা ।

কালীর ধ্যানের আধ্যাত্মিক ভাবার্থ ।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

সাংখ্যকার কপিলের মতে মহাপ্রলয়কালে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ক্রমে স্ব স্ব কারণে লয় হইয়া সমস্ত জগৎ শেষ তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হয় । এং প্রকৃতি পুরুষের সহিত মিলিতা হন ।

ইহাই কালীর ধ্যানের তমোগুণাঘিতা সংহারিণী মূর্তির আধ্যাত্মিক ভাবার্থ ।

আবার যখন মহাপ্রলয়াবসানে পরমপুরুষের শিশুগণ মাত্র অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকৃতি “কালী” স্বজনোদ্ভূপিনী হন, তখন তিনি সত্ত্বগুণাঘিতা জগজ্জননী ।

পরমপুরুষ নির্লিপ্ত, তিনি কিছুই করেন না । তাঁহার চক্কা মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিই জগৎ স্বজন করেন । কিন্তু ভৌতিক সৃষ্টিতে যেমন জী-পুরুষ সংযোগের ঐয়োজন, বিশ্ব সৃষ্টিতেও তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ আবশ্যক ।

সাংখ্যমতে,—

“দৈবাং কৃতিত্বম্বিজ্ঞাং তস্তাং যোনৌ পরং পুমান্ ।

বীৰ্য্যমাপত্তে সা-সুত মহত্ত্বং হিরণ্যং ॥”

দৈবশক্তি বশাৎ প্রকৃতির সাম্যভঙ্গ হইলে, সেই বিকোচিত-বর্শিণী প্রকৃতির যোনিতে পরমপুরুষ বীৰ্য্যাদান করিয়াছিলেন । তৎপর প্রকৃতি হিরণ্য মহত্ত্ব সংজ্ঞক সন্তান প্রসব করেন । এই মহত্ত্বই জ্ঞানস্থানীয় “হিরণ্যগর্ভ” এবং শাস্ত্রাকরের “ব্রহ্মা” ।

প্রকৃতির প্রথম উন্মেষে যে মহত্ত্ব নামক সাহিত্যপ্রকাশ আবির্ভূত হয়, তাহাই হিরণ্যগর্ভ বা অগ্নিক্রুর স্বপ্ন রেখাপাত ।

মহুয় মতেও—

“অগএব সমজ্জাদো তাম্ম বীৰ্য্যমবাস্থমং

তদগুমভবতৈকং মহসাংসুগমপ্রভং ।

তস্মিন্ বজ্জে স্বয়ং ব্রহ্মা সৰ্বলোকপিতামহঃ ।”

পরমপুরুষ বিশ্বপ্রভা সৰ্বাগ্রে জল সৃজন করিয়া তাহাতে বীৰ্য্যাদান করিয়াছিলেন, সেই প্রাকৃষ্ট বীৰ্য্য মহত্ব স্বর্ষোর প্রভাবিশিষ্ট সূর্য্যের অণুরূপে পরিণত হয়, এবং ঐ অণু হইতে সৰ্বলোকপ্রভা স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন ।

শ্রীমত্তগবদগীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বলিবেছেন,—

“সম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দদামাহং ।

মন্তব্যঃ সৰ্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ।”

“সৰ্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি য়াঃ

তায়াং ব্রহ্ম মহদযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥”

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই আমার গর্ভাদানের স্বরূপ, আমি সেই প্রকৃতিতে গর্ভাদান করিয়া থাকি । এবং তাহা হইতেই সৰ্বভূতের উৎপত্তি হয় । ব্রহ্মাদি কোট পর্যন্ত সৰ্বপ্রকার যোনিতে যে সমস্ত শরীর উৎপন্ন হয়, প্রকৃতিই তাহার যোনি (অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া) ; আমি তাহাদের বীৰ্য্যাদান কর্তা পিতা স্বরূপ ।

তদ্ব্যমতেও—আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি (মহাকাশী) পরমপুরুষ (মহাব্রহ্ম) হইতে গর্ভগ্রহণ করিয়া, প্রথমে সম্বৎসরিত ব্রহ্মাকে প্রসব করেন । দ্বিতীয়ে স্রজোগাধিত বিষ্ণুকে, এবং তৃতীয়ে তমোগাধিত শিবকে প্রসব করেন ।

উল্লিখিত মত সমূহের সাধারণতঃ পার্থক্য থাকিলেও মূলতত্ত্ব একরূপ ।

কালীর ধ্যানেও সেই তত্ত্বই প্রকাশিত হইতেছে ।

“মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং ।

সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননপরোরুহাং ।”

জগজ্জননী কালী মহাকালের সহিত বিপরীত রতাতুরা, অতএব সুখ-প্রসন্ন-বদনা, এবং মুখকমল হাস্যযুক্তা ।

এ স্থলে যিনি শবরূপে মহাদেব, তিনিই মণিকাল । এক্ষণ দেখিতে হইতেছে যে, শবরূপ মহাদেবের সহিত বিপরীত রতাতুরা হওয়া নিতান্তই অসম্ভব । সুতরাং এরূপ সাধারণ রক্তি নহে । এরূপ কামগন্ধহীন জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছা । শবরূপ মহাদেবের সহিত, অর্থাৎ নিগুণ, গিরিগুণ, নির্জর

পরমপুরুষের সহিত “বিপরীত রত্নশক্তি” অর্থাৎ নির্জিহ্ম-পরমপুরুষ হইতে বীর্ণা (চিৎপ্রভা) গ্রহণ করিয়া চিরণাগর্ভ বা জ্ঞানস্থানীয় মহত্ত্বাদিকে (ত্রিকাটিকে) প্রদান করার জন্ত মিলিত হওয়া ।

সৃষ্টি প্রাপ্তে পরমাপ্রকৃতি বিশ্বজননী (জগদম্বা) আর করালবদন নাহেন । বিশ্বপদবিনী তখন “স্বপ-পদবদনাং” আনন্দোৎকুলাননা, “স্বেরাগন সরোবরাং” হস্তযুক্ত কমলবদনা । তাৎপর্যার্থ এই যে, প্রলয়কালের তমোগুণাবস্থা মহারৌদ্রোভাব আর অবস্থায় নাই । সৃষ্টির প্রাপ্তে প্রকৃতি হস্তমগ্ন ।

বিপরীত রত্নশক্তির তাৎপর্য এই যে, রত্নার্থ পুরুষের চেষ্টাই স্বাভাবিক, কিন্তু নির্জিহ্ম নিজের পুরুষের কোনই চেষ্টা নাহি, সুতরাং নিশ্চেষ্ট পুরুষ হইতে বীর্ণা গ্রহণের চেষ্টাই প্রকৃতির পক্ষে “বিপরীত” । সুতরাং প্রকৃতির জগজ্জননী “কালী” “বিপরীত রত্নতুরাং” ।

তাৎপর্যার্থ (আধ্যাত্মিকতায়) এই যে, ত্রিগুণা স্বক প্রকৃতি যখন সম্বলুণ প্রদান হইয়া সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি নির্জিহ্ম পরমপুরুষের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বসৃষ্টির কারণরূপ বীর্ণা (চিৎপ্রভা) গ্রহণ করেন । প্রকৃতির তাত্‌কালিক অবস্থা মহাপ্রলয়ের অবস্থার দ্বায় ভয়নক নহে । তখন সম্বলুণ প্রদান প্রকৃতি হস্তমগ্ন ।

আবার সৃষ্টির পর যখন জগদম্বা রজোগুণাবস্থা বিশ্বপালিনী; তখন তিনি “দ্বিধাং” অপকৃপ ভূবনমোহিনী তরুণী । তখন তিনি “চন্দ্রমুখী” হস্তোৎকুলাননা । তখন জগদম্বা “পীনোন্নত পয়োদরাং” নিখিল জগৎ পরিপালনোপযোগী পয়ঃপূর্ণ স্তন্য, অতএব পীনোন্নত পয়োদরা । যাহাব বিশাল উরসিঃ অনন্ত প্রাণী-জগতের পাদ্যপূর্ণ অক্ষয়-ভাণ্ডার, অনন্তকাল যে পীনোন্নত পয়োদর হইতে প্রস্রাবের আয় নানাবিধ সুস্বাদু পাদ্য পেষ বিনিস্রুত হইয়া জগৎ পালন করিতেছে যে পয়োদর অকৃতই অক্ষয়ভাণ্ডার । জগজ্জননীর এই রজোগুণাবস্থা বিশ্বপালিনী মুষ্টিই “সুজলা সুকলা বলয়কশীতলা শত শারঙ্গা” ।

রজোগুণ প্রদান বিশ্বপালিনী “চতুর্ভুজাং” চারি হস্তশিষ্টা । “সদাচ্ছন্নশিরঃ খজ্জা বানাদোর্ধ্ব কৃষ্ণাং” বসভাগের অদোর্ধ্ব কঙ্করেচ্ছন্নমুণ্ড ও অঙ্গি । “অভয়ঃ রম্যক্লেষ দক্ষিণাদোর্ধ্ব গাণিকাং” দক্ষিণদিকের অদোর্ধ্ব কঙ্করে বরুণ অভয় । ইহার আধ্যাত্মিকতায় বা তাৎপর্যার্থ এই,—পালনকার্য রজোগুণাবস্থা; ভীষ্ম-কাণ্ড গুণধারাই রাজ-সংহার পূর্ণ বিশেষ হয় । সেই জন্তই রজোগুণ প্রদান

বিশ্বপালিনী “কালী” ভীমকান্ত গুণের চিত্তব্রূপ অসিমুণ্ড ও বরাভয় ধারণ করিয়া জগৎ পরিপালন করিতেছেন। ছষ্ট-দমন, শিষ্টপালনই রজোগুণের কার্য। বাঁহার স্নানিয়মে বিশ্বজগৎ পরিচালিত, তিনি ভীমকান্ত গুণবিশিষ্টা (অসি-মুণ্ড-বরাভয়-করা) না তটলে ঐশ্বর্যের পূর্ণ বিকাশ তটনে কেন ? তাঁহার অথও নিয়ম রক্ষা না করিলে অসির আঘাতে ছিন্ন মুণ্ড তটতে হইবে। সেই জন্ত বামকরদ্বয়ে অসিমুণ্ড ধারণ করিয়া পাণীর ছন্দে ভীতি সঞ্চার করিতেছেন। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শাপিত অসি হইতে নিষ্কৃতি নাই।

সেই অথও মহা নিয়মের অধীনে এই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি সমন্বিত অনন্ত গৌরজগৎ স্ব স্ব কক্ষপথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে।

“যন্তরায় বাতি বাতোপি সূর্য্য স্তপতি যন্তরায়ং ।

বর্ষন্ত তোরদাকাশে, পুষ্পন্ত তরবো বনে ।”

বাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য তাপ দান করিতেছে, বাঁহার ভয়ে মেঘগণ যথাকালে বারিবর্ষণ করিতেছে এবং কাননে তরু সকল পুষ্পিত হইতেছে। সূত্রায় জগতের স্নানিয়ম রক্ষার জন্ত বিশ্বপালিনী কালীর করে ক্রপাণ ও ছিন্নমুণ্ডের বিভীষিকা। আবার ভক্তবৎসলা জগজ্জননী তাঁহার মাধু সন্তানগণকে চতুর্ভুজ (বর্ষ-অর্থ-কাম-মোক্ষ) ফল প্রদান ও বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত দক্ষিণ করদ্বয়ে বরাভয় ধারণ করিয়া ভক্তগণকে আশ্বস্ত করিতেছেন। তাই মা কালী “চতুর্ভূজা” অসিমুণ্ড বরাভয়ধারিণী ; ভীমকান্ত গুণযুতা।

জগৎপালিনী কালী “শ্রামাং”। শ্রামা স্ত্রী বিশেষা, স্নানকণা। অথবা অশ্রু শ্রামলা। প্রাচীন আখ্যানগণ সকলেই প্রায় শ্রামবর্ণ শ্রিয়। সেই জন্ত ঐশ্বর্য্য প্রসিদ্ধ নরনারীগণ মধ্যে অনেকেই শ্রামবর্ণ। রাম, কৃষ্ণ, ভরত, অর্জুন, বাসুদেব, দ্রোণদৌ, চন্দ্রাবলী, মাতামা অভূতি শ্রামবর্ণ। আবার অনন্ত আকাশ, অনন্ত সমুদ্র, অনন্ত গিরিশ্রেণী, অনন্ত বনরাজি সমস্তই শ্রামল। তাই আদ্য প্রকৃতি কালী “শ্রামাং” শ্রামবর্ণা।

কালী “মহামেঘ প্রভাং” নিবিড় নীরদকান্তি।

“শ্বেতগীতাদিকং বর্ণং যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে ।

প্রবিশন্তি তথা কালাং সর্বভূতানি শৈলক্ষে ।”

শ্বেত গীতাদি সমস্ত বর্ণ যেমন কৃষ্ণবর্ণে লয় হয়, তদ্রূপ সর্বভূতই আদ্য প্রকৃতিরূপা কালীতে প্রবিশ্ত হইয়া থাকে। সেই জন্তই শ্বেতবস্ত্রধরা কালীর বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ (মহামেঘপ্রভা) বলিয়া কল্পিত হইয়াছে।

ঐক্যরূপা কালী “দিগধারা” নগ্নাং বিবসনা । যে প্রকৃতির নিরাট দেহ-পরিমলের অন্তরালে অন্তরালে স্বর্গা, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি সমন্বিত অসংখ্য সৌরজগৎ অবস্থিত, সেই প্রকৃতিরূপা কালীর বিশাল দেহে সে বজ্রাশ্রয়ে আবরিত হইতে পারে, একজন্য করাও অসম্ভব । সুতরাং অনন্ত শূন্যই তাঁহার বসনস্বরূপ । এই জন্তই কালী “দিগধারী” ।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহার স্থলমর্থ্য এই যে,—শুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, কিন্তু সৃষ্টিকালে বৈষম্য ঘটে । অতএব ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই শুণত্রয়ের নৈষম্যাবস্থায় যখন যে শুণের প্রাধান্ত হয়, তখন তিন তদুগুণাধিতা বলিয়া অভিহিতা হন, এবং তরু সাধকগণ তখন তাঁহার তত্ত্ব স্বরূপের শান করিয়া থাকে । কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা কালীরূপে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই শুণত্রয় তুল্যভাবে প্রকাশমান । সেই জন্ত কালীর ধ্যানে পরম্পর বিরোধী শুণত্রয়ের বর্ণিত চটয়াচে ।

“সৈবকালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবাম্বুজা ॥

স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈবকালে সনাতনী ॥”

(চণ্ডী) ।

সেই নিত্যরূপা মহাকালী মহাপ্রলয়কালে মহামারী স্বরূপে মহন্তবাদিকে প্রাণ করেন (আত্মদেহে লয় করেন) এবং সৃষ্টির সময় ভূতসমূহকে স্বজন করেন, আবার স্থিতিকালে তিনিই সর্বভূতকে পালন করেন । অপরক,—

“বিসৃষ্টৌ সৃষ্টি রূপাশ্চ স্থিতিরূপায় পালনে,

তথা সংকতিরূপান্তে জগতোহস্ত জগন্ময়ে ॥” (চণ্ডী)

সৃষ্টিকালে তুমি সৃষ্টিরূপা, পালন সময়ে তুমিই স্থিতিরূপা, আবার প্রলয়-কালে তুমিই সংহাররূপা ।

এক্ষণ বুঝিতে হইবে, আদ্যাপ্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা ; অতএব প্রকৃতিরূপা কালীর ধানে সেই সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই ত্রিগুণের প্রতি চিহ্নই প্রকটিত হইয়াছে । সুতরাং পরম্পর বিরোধী ভাবসমূহের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকিলেও মূল অসমঞ্জস্ত নাই । অর্থাৎ “করালবদনার সহিত হৃদয়বীর্য, বা “ধোর দাঁড়ীর” সহিত “শেরানন সরৌর্যহার” কোন বিসঙ্গ ভাব নাই । অথবা “মহারোজীর” সহিত “দিবার” কোন অলৈক্য নাই । যিনি ত্রিগুণধারী ; প্রকৃতিরূপা, সেই প্রকৃতিরূপা কালীর ধ্যানে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণের (ভাস্বরূপ) বর্ণন থাকিবে বাস্তবিক ।

কাশীর ধানের সংক্ষিপ্ত সর্ষ এট সে, পরমাপ্রকৃতিক্রুপা কালী ত্রিগুণময়ী । অতএব যখন তিনি সম্বন্ধগপ্রদানা, তখন তিনি “শরুপ মহাদেব-দ্রদয়োগদি সংস্থিতা, মহাকাশেনচ সমং বিপরীত রতাতুরাং, সূখ-প্রসন্নবদনাং, স্নেহানন সরোরুহাং ।”

অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির উপাদান স্বরূপ চিৎপ্রভা গ্রহণার্থ নিষ্কর পরমপুরুষের সহিত সংজ্ঞতা, অতএব সূখ প্রসন্নবদনা, প্রফুল্ল কমলাননী, বিশ্বেশ্বর-দ্রদয়োগিনি ।

আবার যখন মা আমার রজোগুণপ্রদানা বিশ্বগামিনী, তখন তিনি,—

“দিব্যাং, শ্রুত্যাং, পীনোন্নত পরোদরাং, সদা চ্ছন্ন-শিরঃ-গড়গ বাগাধোদ্ধি করাসুভ্রাং, অভয়ং বরদং চৈব দক্ষিণাধোদ্ধি পাণিকাং, ভস্মাশীং ।”

অর্থাৎ সর্ব সুলক্ষণা, পরম রূপবতী, পূর্বদোবনা, ভীমকাস্তগুণযুতা, সদানন্দময়ী প্রভুকাননা ।

আবার যখন মা আমার তমোগুণপ্রদানা প্রলয়ঙ্করী, তখন তিনি “করাস বদনাং, ঘোরাং, মুক্তকেশীং, মুণ্ডমালাবিভূষিতাং, মহামেষপ্রভাং, কণ্ঠাশক্ত মুণ্ডালী গলক্রপির চর্চ্চিত্রাং, কর্ণাবতঃশতানীতশবযুগ্মভয়ানক্যং, ঘোর দংষ্ট্রাং, শবানাং করগংঘাটঃ ক্রুতকাঞ্চীং, স্কন্ধদয়গরজক্রদারাবিন্দু রিতাননাং, ঘোররাব্যাং, মহারোজীং, শবানাগয়গামিনীং ।”

অর্থাৎ বিশ্ববিনাশিনী ভয়ঙ্করী মুক্তি ।

ঐহর্গাদাগ ঠাকুর ওষধে ।

ঈশা খার চট্টগ্রাম অধিকার ।

দেওয়ান ঈশা খাঁ সগনদ আলী বজের দ্বাবিশ ভৌগিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌমিক । তাঁহার পরিচয় আর পাঠকগণকে নূতন করিয়া দিতে হইবে না । এক সময়ে তাঁহার বীরত্ব প্রতাপে বঙ্গভূমি মুহুমুহু কম্পিত হইত । তাঁহার ছায় বীরপুরুষ বঙ্গদেশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যাধিক হয় না । বজের শাসনকর্তা সেখ ইসলাম খাঁকে পরাস্ত করিয়া ঈশা খাঁ পূর্ববজের একচ্ছত্র অধিকার প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনাকে বঙ্গদেশের স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন । বজের নানাস্থানে চতুর্দশটি স্মৃদুচ ছর্গ নির্মাণ করিয়া অনেকগুলি ছর্দান্ত সৈন্য ও বহুবিধ বুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিলেন এবং অত্যন্ত কাল মধ্যেই

উত্তরে ঘোড়াঘাট ও আগামের অন্তর্গত রাজ্যমাটি পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইলেন। বিশেষ বিশেষ স্থানে এক এক জন শাসনকর্ত্তাও নিযুক্ত করিলেন। তখনও ছাদশভৌগিকের পদ স্থষ্ট হয় নাই। নজের অত্যাচার রাজগণ কেহ বা সন্ধিসূত্রে কেহ বা ঈশা খাঁর অধীনতা গাশে আবদ্ধ হইলেন। তখন ঈশা খাঁর বিপক্ষে দাঁড়ায় তেমন ব্যক্তি কেহ বঙ্গদেশে ছিল না। জিপুরেশ্বরও ঈশা খাঁর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বঙ্গের স্থাপন করিলেন।

ঈশা খাঁর একগু প্রদীপ্ত প্রতাপ ও স্বাধীনতার বার্তা অচিরেই দিল্লীশ্বরের কর্ণগোচর হইল। সম্রাট অবিলম্বে তাঁহার সূক্ষ্ম সেনাপতি সাহাবাজ খাঁকে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সহ ঈশা খাঁকে দমন করিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ সৈন্যে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত আসিলে পর ঈশা খাঁ অগ্রসর হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন। উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। তিন দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর ঈশা খাঁ, বহু সৈন্য হতাহত হওয়ায় পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া রাজধানী গিজিরপুরের দিকে গলায়ন করিলেন। সাহাবাজ খাঁও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিজিরপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়দলে আবার যুদ্ধ বাধিল, এবারও ঈশা খাঁ পরাজিত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করতঃ গপরিবারে চট্টগ্রামের দিকে গলায়ন করিলেন। গিজিরপুর রাজধানী সাহাবাজ খাঁর হস্তগত হইল। ঈশা খাঁর খনরত্নাদি দিল্লীতে প্রেরিত হইল।

ঈশা খাঁ চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে পর তথাকার দিল্লীর রাজ-প্রতিনিধি, ঈশা খাঁর ভয়ে গলায়ন করিলেন। কিন্তু ঈশা খাঁর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে আরাকান-রাজ তাঁহার বিপক্ষ হইলেন এবং বৈজয়ামন্ত সহ তাঁহার নিকট আশ্রয় সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। নির্ভীক হৃদয় বীরবর ঈশা খাঁ তাহাতে অসম্মত হইলে আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঈশা খাঁ এক পর্ব্বতশৃঙ্গে সৈন্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আরাকানপতির প্রেরিত সৈন্যগণ এতাহ ঈশা খাঁর সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ঈশা খাঁ কিন্তু অচল অটল পর্ব্বতের ছায় আশ্রয়ক্ষয় তৎপর। সম্ভ্রাহকাল পরে ঈশা খাঁর দলের আহারীয় সামগ্রী প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিলে ঈশা খাঁ তদীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। প্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাষে সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া এমনি ক্ষিপ্ৰক্যারিতার সহিত বিপক্ষকে আক্রমণ করিল যে বিপক্ষগণ ভয়ঙ্কর মাত্র যুদ্ধ করিয়াই সবেগে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে গলায়ন করিল।

ঈশা খাঁর সৈন্তগণ তাঁহাদের দ্বিবিধ আক্রমণ করিয়া নহু পরিসরে আত্মীয় সামগ্রী প্রাপ্ত হইল । আরাকানরাজ তত্ৰাতে আরও উত্তেজিত হইয়া সত্বরই অগণিত সৈন্তগণ স্বয়ং আসিয়া ঈশা খাঁকে আক্রমণ করিলেন । ঈশা খাঁও অল্পসংখ্যক সৈন্ত লইয়াই এমনি প্রবল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, অবিশ্রান্ত দুই দিন যুদ্ধ করিবার পর আরাকানপতি পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন, তাঁহার অনেক সৈন্ত হতাহত হইল । নিরুপায় দেওয়া আত্মীয়বর্গ ঈশা খাঁকে চট্টগ্রামের অন্তর্গত সরকার চাটগাঁ, মালগাঁ, নওগাঁ, দিউগাঁ, সেকপুর প্রভৃতি পরগণা প্রদান করিয়া এবং সর্ববিষয়ে ঈশা খাঁর সহায়তা করিবেন অঙ্গীকারে সন্ধি স্থাপন করিলেন । ঈশা খাঁ চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়া অনেক দুর্দান্ত সৈন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং আরাকানরাজের নিকট তত্ৰাতে আরও অনেকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্ত লইয়া পুনরায় রাজোজ্ঞারের নিমিত্ত বঙ্গদেশাভিমুখে গোপনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ।

এদিকে সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁকে পরাস্ত করিয়া রণক্ষয় সংবাদ দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছেন । দিল্লী তত্ৰতে দ্বিতীয় আদেশ না আটগা পর্যন্ত তাঁহাকে বঙ্গদেশেই অবস্থান করিতে হইবে । প্রবল পরাক্রান্ত ঈশা খাঁর রাজধানী তত্ৰগত হইরাছে ; সুতরাং আশ্রয় আশ্রয়লাভের সীমা নাই । দিল্লীখবরের কর্তব্য পরায়ণ সৈন্তসামন্তগণ আজ তাঁহাদের কর্তব্য বিষ্মত হইয়া শুধু আশ্রয় আশ্রয়েই গা ঢালিয়া দিয়াছেন । এদিকে সুচতুর ঈশা খাঁ সুযোগ পাটয়া অকস্মাৎ ভীষণ অজ্ঞানতার দ্বার গঠিয়া আশ্রয় সাহাবাজ খাঁকে আক্রমণ করিলেন । এইবার দিল্লীখবরের সুদক্ষ সেনাপতি অশঙ্কিত ও অসতর্ক থাকি বিধায় স্বীয় শরণগীরব রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইলেন । তাঁহার অধিকাংশ সৈন্ত হত হইল এবং নিজেও আহত হইয়া প্রবলবেগে অশ্রবণনা করতঃ পলায়নপর হইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন । অনেক যুদ্ধসামগ্রী ঈশা খাঁর হস্তগত হইল । ঈশা খাঁ চতুঃপাশ্বেদেবের সহিত পুনরায় পরিত্যক্ত রাজধানী অধিকার করিলেন । কিন্তু অবিলম্বে সেই ভয় রাজধানী পরিত্যাগ করতঃ সোনারগাঁয়ে নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়া, প্রবল পরাক্রমে, স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ।

সৈয়দ-সুন্দর-হোসেন ।

শট্টৈশচর ।

বিশ্বরাজ্যের নৈচিত্র্য ও সৃষ্টিকৌশল নিশ্চিহ্নচিত্রে দর্শন করিলে বিশ্বয়ে প্রাণ অভিভূত হয় ; ভগবদ্ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হইয়া যায় । প্রাণী-জগতের কপাই বল আর জড়রাজ্যের কথাই বল, যে বিষয় অভিনিবেশ পূর্বক গর্হ্যাবেক্ষণ করা যায় সেই বিষয়েই বিশ্বনিয়ন্তার অপার কৌশল ও মহানুদ্ভেদ্য পরিব্রাজ্য দেখিতে পাওয়া যায় । আমরা বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যে সামান্য অংশের তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই তাহাতেই অভাবনীয় নিগূঢ় রহস্য দেখিতে পাই ।

বিজ্ঞান, ভগবানের বিচিত্র চিত্রশালার সুশোভন কক্ষগুলি একটী একটী করিয়া উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে । কত অচিস্তনীয় তথ্য, কত দুস্তর রহস্য দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে । নিত্য নূন নূন আবিষ্কৃত ভগবানের অপার কৌশল জগতে ঘোষণা করিতেছে ।

পরিকার অন্ধকার রজনীতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় । যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, মানবমণ্ডলী এই জ্যোতিষ্কসমূহ দেখিয়া আসিতেছিল কিন্তু কেহ তাহাদের স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় নাই । অনন্ত আকাশের অগণিত গ্রহনক্ষত্রাদি যদিও আদিম মানব অধিবাসিগণের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিয়াছিল তথাপি তাহারা ঐ সকল জ্যোতিষ্কগুঞ্জের অত্যাশ্চর্য্য তথ্য অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই । সুদীর্ঘ অনন্ত আকাশের পর ঐ যে অসংখ্য অক্ষরগুলি লিখিত রহিয়াছে উহাদের ভিতর যে কি অশ্রুতপূর্ব রহস্য পরিব্রাজ্য আছে তাহা বহুদিন গর্হ্যাস্ত কেহ পাঠ করিতে সমর্থ হয় নাই । এখনও যে সৃষ্টিরহস্যের বহুজ্ঞাতব্য তথ্য অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । পণ্ডিতেরা বলেন— “আমরা এইমাত্র জানিয়াছি যে আমরা কিছুই জানি নাই ।”

পূর্ব প্রবন্ধে বৃহস্পতির কথা বলিয়াছি, এই প্রবন্ধে তৎপরবর্তী গ্রহ শট্টৈশচরের কথা বলিব । শুধু চক্ষুতে সকল গ্রহকেই প্রায় একরূপ দেখায়, কেবল ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য । কিন্তু উহাদের আকৃতিগত পার্থক্য ও কম বিচিত্র নয় । আজ সর্বাঙ্গোপেক্ষা নৈচিত্র্যপূর্ণ, অত্যাশ্চর্য্য গ্রহটির সম্বন্ধে কিছু বলিব । শনির মত এমন অদ্ভুত এবং কৌতুহলোদ্দীপক গ্রহ আর দ্বিতীয় নাই ।

শনি নামটী হিন্দুর নিকট সুপরিচিত । শনির নামটী শুনিলে হিন্দুগোত্রই কিছু বিচলিত হইয়া থাকেন । যত দোষ এই শনি বেচারির ঘাড়ে । আমাদের

পূর্বাণেতিহাসে শনি-দৃষ্টি সম্বন্ধে অতি ভীষণ কাহিনী সকল লিপিত আছে। শনি কত জনকে কত লাঞ্জনাই না করিয়াছে ! শৈশবে শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান শুনিয়া নীরবে কত অশ্রুপাত করিয়াছি। শনির কোপ দৃষ্টিতে গড়িয়া পরম-সাধু শ্রীবৎস কি নিদারুণ কষ্টে, কি কঠোর সন্তাপীড়াই না ভোগ করিয়াছিলেন। এমন নির্ঘাতন কি কেহ কখন ভোগ করিয়াছে ? শনিই নাকি বত অমঙ্গলের নিদান। নূতন পঞ্জিকায় যে বৎসর শনি রাজা হইয়াছেন প্রকাশিত হয় সে বৎসর হিন্দুগণ কত আশঙ্কা, কত উদ্বেগ, কত হুশিষ্টা মনে স্থান দিয়া থাকেন। ঐতিবৃহত্তে অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহারা ত্রিযমান হন। শনির এই নিশ্চয় নিষ্ঠুরতার কথা পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ইউরোপেও শনির অভ্যচার সম্বন্ধে অনেক কুসংস্কারপূর্ণ গল্প প্রচলিত আছে।

খালি চক্ষুতে কোন গ্রহেরই আকৃতিগত পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। দূরবীক্ষণ ব্যতীত শনির অসামান্য সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করা যায় না। শনিকে খালি চক্ষুতে দেখিলে একটি প্রথমশ্রেণীর নক্ষত্রের স্থায় বোধ হয়। প্রাচীন জ্যোতির্-বিস্তরণ শনির অত্যন্তুৎ দেহটি দেখিতে না পারাতে তাঁহারা উহার অঙ্গ-সৌষ্ঠবের পরিচয় পান নাই। আকৃতিগত বৈচিত্র্যে শনি সকল গ্রহের শ্রেষ্ঠ।

গেলিলিওও সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণদ্বারা শনিগ্রহটি পর্যবেক্ষণ করেন। গেলিলিও তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি শনিরদিকে নির্দেশ করিয়া এক অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার অবলোকন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, শনিকে খালি চক্ষুতে একটি উজ্জ্বল পিণ্ডের স্থায় দেখা যায় উহা কেবল একটি পিণ্ড নহে। গেলিলিও দেখিলেন শনির দুই পার্শ্বে দুইটি পিণ্ড এবং মধ্যস্থলে আর একটি সুসূক্ষ্ম পিণ্ড। গেলিলিও এই অসীম রহস্যপূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া ইহার কথা সর্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিলেন।

ইহার কিছুদিন পর তিনি আবার দূরবীক্ষণ দ্বারা শনির দেহ পর্যবেক্ষণ করিতে বসিলেন। তখন দেখিলেন দুই পার্শ্বের পিণ্ডদ্বয় ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া যাইতেছে। এই অভিনব ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া তিনি আরও বিস্মিত এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। আবার কয়েকদিন পর তিনি দূরবীক্ষণ লইয়া দেখিতে বসিলেন। সেই দিন তিনি দেখিলেন দুই পার্শ্বের পিণ্ড দুইটি একবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সেই নূতন কাণ্ড দেখিয়া গেলিলিও অবাক হইলেন। তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন “হায় ! এ কি হইল ! পিণ্ড

ছটটি কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িল। আমি যে নূতন ছইটি গিও আবিষ্কারের কথা সকলের নিকট প্রচার করিচ্ছি এখন উহাদিগকে দেখাইতে না পারিলে লোকে যে মিথ্যানাদী বলিবে। এই বিপদের উপায় কি ?” তিনি এই চিন্তায় অতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন। গেলিলিও মনে ভাবিতে লাগিলেন—“Hins saturn devoured his children ?” শনি কি তাহার আপন সন্তানকে উদরস্থ করিয়াছে !

আশাবাস্যো পণ্ডিত গেলিলিও এই অভাবনীয় বাণরের কারণ নির্দেশের জন্য অতি নিব্বিড়িত্তে শনিকে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন ; আশ্চর্যের বিষয়, কিছুদিন পর সেই ছই গিও আবার ছই গাশ্বে দেখা দিল। গেলিলিও ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

গেলিলিওই সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ সাহায্যে গ্রহনক্ষত্র ইত্যাদি গণ্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন তাই তিনি অনেক অভ্যুত্পন্ন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। গেলিলিওই সর্বপ্রথমে সূর্য্য-কেন্দ্র দর্শন করিয়াছিলেন ; তিনিই চন্দ্রের গাছাড় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, শুক্রের কলার হ্রাসবৃদ্ধির কথা প্রচার করিয়াছিলেন, তিনিই বৃহস্পতির চন্দ্রচতুষ্টয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এই গেলিলিওই সর্বপ্রথম শনির সমগীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ আকৃতির কথা জনসাধারণের নিকট প্রচার করেন। কিন্তু তিনি শনির অবয়বের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়া যাউতে পারেন নাই। গেলিলিও যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তিনি শনিকে কেন একরূপ দেখিয়াছিলেন এবং উহার দেহগঠন কিরূপ তাহা নির্ধারণ কারতে সমর্থ হন নাই। না পারিবার কারণ এই যে, তিনি যে দূরবীক্ষণ ব্যবহার করিতেন তাহা অতি সামান্য ছিল, তজ্জপ নিকট দূরবীক্ষণ আজকাল কোন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতই ব্যবহার করেন না। সুতরাং তাহার যন্ত্রদ্বারা বহু দূরবর্তী শনিকে তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পারেন নাই।

গেলিলিওর মৃত্যুর প্রায় অর্ধ শতাব্দির পর এক জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত (Huyghen) শনির যথার্থ আকৃতির বিবরণ বাহির করেন। শনি একটা প্রকাণ্ড গোল গিও। একটা বিশাল বলয় ঐ গিওকে ঘেঁষন করিয়া রহিয়াছে। উকিলের শাম্লা পরিহিত মস্তকটি যেমন দেখায় শনির চেহারাটিও প্রায় তজ্জপ। বাস্তবিক বিপ্লবকারী শনি এবং উকিলের শাম্লা মস্তক এই উভয়ের মধ্যে বড়ই সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ্য আছে কি না তাহা আমি বলিতে অসমর্থ।

শনিদেহে গেলিলিও কেন তিনটি গোলাকার পিণ্ড দেখিয়াছিলেন তাহাই এখন বলিতেছি । যদি একটি লোক শামলা পড়িয়া দাঁড়ায় আর আমরা খুব দূর হইতে তাহার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখি, তাহা হইলে মাঝখানে গোল মস্তকটি বৃহৎ পিণ্ডের আয় দৃষ্টিগোচর হইবে ; আর শামলার বার্কিত বাদামী ছুটপ্রান্ত ও দুইটি ক্ষুদ্র পিণ্ডের আয় বোধ হইবে । গেলিলিও বহুদূরস্থিত শনির বলয়টি নিকটে দূরবীক্ষণদ্বারা স্পষ্ট দেখিতে পান নাই । তাই দুই প্রান্তকে পার্শ্ববর্তী দুইটি পিণ্ড বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন । আবার যদি শামলা পরিহিত মস্তকে একটি লোক সম্মুখ দিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে দুই পার্শ্বের বার্কিত অংশ দুইটি দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে না । গেলিলিও যখন দেখিয়াছিলেন দুই পার্শ্বের পিণ্ডদ্বয় অদৃশ্য হইয়াছে তখন শনি ঘুরিয়া গিয়াছিল । ‘হিউগেন’ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন একটি বিশাল বলয় শনিকে বেঁঠন করিয়া রহিয়াছে ; সেই বলয়টি দেখিতে শামলার মত ।

এই সকল অত্যন্ত ব্যাপার প্রচারিত হইবার পর বৈজ্ঞানিক জগতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল । সকলেই দূরবীক্ষণ দ্বারা সূক্ষ্ম পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন । পরিশেষে আবিষ্কৃত হইল বাস্তবিকই একটি বলয় শনিকে বেঁঠন করিয়া রহিয়াছে ।

শনি এবং তাহার বলয়টি সাধারণ দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন একটা উজ্জ্বল বলের আয় কোন পিণ্ডের ন্যাদিয়া একটি উজ্জ্বল শলাকা দুইপ্রান্তে বার্কিত হইয়াছে ।

সার উইলিয়ম হর্শেল দশ বৎসরকাল কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত তাহার উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণদ্বারা পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন, শনির বলয় একটি নহে, দুইটি । বাহিরের বলয়টির ভিতর আর একটি উজ্জ্বল বলয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । বাহিরের বড় বলয়টি ভিতরের বলয় হইতে একটি কাল রেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন । এই সকল ব্যাপারও সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং অতিশয় বিস্মিত হইলেন ।

ইহার কিছু পরে আবার আর একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত (Prof Bond) আবিষ্কার করিলেন পূর্বোক্ত বলয় দুইটির ভিতর আরও একটি বলয় আছে । এই তৃতীয় বলয়টিও অস্ফটিকপে স্থিরীকৃত হইল । ইহার পরও আবার অনেক জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত বলিতেছেন ঐ বলয়গুলির ভিতর আরও অনেকগুলি বলয় আছে । এই সকল কথা শুনিয়া মনে হয়, পেয়াজের খোসার মত শনির বলয় হইতে কেবল বলয়ই বাহির হইবে । এই ভেদে গেল বলয়ের সংখ্যার কথা এখন বলয় জিনিগটা কি বুঝিতে হইবে ।

বলয়গুলি সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে, উহার কঠিন পদার্থও নয় এবং তরল পদার্থও নয়—এই দুইটির মধ্য স্থানীয়। শনির বলয় এবং শনি স্বয়ং এই উভয়ই অর্থাৎ আলোকিত হয়; কাহারও নিজের আলোক নাই।

বলয়গুলির উপর শনির গোল গিণ্ডের ছায়া পতিত হয়। এবং বলয়ের ছায়াও শনির উপর পতিত হয়। আরও বিশ্বাসের কথা এই বলয়গুলি শনিকে কেবল দেখান করিয়া রহিয়াছে তাহা নয়; বলয়গুলি নিশ্চল নহে। উভয়েরও গতি আছে। বলয়গুলি অবিরাম ঘুরিতেছে আবার শনিও ঘুরিতেছে।

বাতিরের বলয়টা প্রতি সেকেন্ডে ১০ মাইল বেগে ঘুরে

মধ্যের বলয়টা " " ১১ " " "

ভিতরের তৃতীয় বলয়টা " " ১৩ " " "

শনি গ্রহ " " ৬ " " "

এই অসামান্য রহস্যপূর্ণ গ্রহটির আকার ও গতির বিষয় একবার কল্পনা করিয়া মানসেন্দ্রে দর্শন করিলে বিশ্বনিয়ন্ত্রার সৃষ্টিকৌশল কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইবে। জ্যোতির্বিদগণের অসামান্য অধ্যবসায়, প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা এবং সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার কথা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

প্রাচীন আর্ধ্য-জ্যোতির্বিদগণ শনির আকৃতিগত অভাবনীয় বৈচিত্র্যের কথা অবগত ছিলেন না। কারণ তখন দূরবীক্ষণ ছিল না। কিন্তু খালি চক্ষুতেই তাঁহারা ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরস্থিত জ্যোতিষ্কে চিনিয়াছিলেন। শনিকে দেখা এবং গ্রহ বলিয়া প্রথমে স্থির করা অতিশয় দুর্লভ ব্যাপার। অধ্যবসায় সহকারে বহুবর্ষ পর্যবেক্ষণ করিয়া যে আর্ধ্য জ্যোতির্বিদগণ শনির পরিচয় পাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ শনি খুব উজ্জ্বল গ্রহ নহে। বুধ, শুক্র ও বৃহস্পতি শনি অপেক্ষা অনেকটা বড় দেখায়। আবার উজ্জ্বলতার বুধ ও মঙ্গল শনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়তঃ শনির গতি অতি মৃদু। শনৈঃ শনৈঃ গমন করে বলিয়াই উহার নাম শনৈশ্চর হইয়াছে। নামটীতেই বুঝা যাইতেছে যে প্রাচীনকালের আর্ধ্য জ্যোতির্বিদগণ উহার গতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। নক্ষত্র হইতে গ্রহকে চিনিয়া লইবার একটা কৌশল এই, গ্রহ ক্ষণভাগী; নক্ষত্র ধীরগতি। কোন নির্দিষ্ট গ্রহকে অতিক্রম করিয়া যখন কোন জ্যোতিষ্ক তাড়াতাড়ি চলিয়া যায় তখন তাহাকে আমরা গ্রহ বলিয়া চিনিতে পারি।

শনি প্রতি সেকেন্ডে ছয় মাইল মাত্র গমন করে। পৃথিবীর গতি ইহার

তিনগুণ অধিক সূত্রাং শনিকে পূর্বোক্তরূপে গতি দেখিয়া চিনিয়া লওয়া কিছু কষ্টসাধ্য ।

শনি ১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিটে একবার আগন গেরদণ্ডের উপর একপাক ঘুরিয়া থাকে । অর্থাৎ ১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিটে শনির এক দিন ।

শনির ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের ৫ অংশ মাত্র । পৃথিবীতে যে জিনিসটার ওজন ১ গণ হইবে শনিতে সেই জিনিসের ওজন ৫ সের মাত্র হইবে । গম পরিমাণ জল অপেক্ষাও শনি ওজনে লঘু । শনিকে যদি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা যাইত তাহা হইলে উহা ভাসিয়া থাকিত । কিন্তু শনিকে বক্ষে ধারণ করিতে পারে এমন বৃহৎ সমুদ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আছে কি না জানা যায় নাহি । পৃথিবী অপেক্ষা ওজনে শনি মাত্র ৯০ গুণ অধিক ভারি । কিন্তু শনি পৃথিবী অপেক্ষা আকারে (Volume) ৭০০ শত গুণ অধিক । শনির ঘনত্ব অপর সকল পরিচিত গ্রহের ঘনত্ব (Density) অপেক্ষা কম । শনি পৃথিবী অপেক্ষা আকৃতিতে ৭০০ গুণ বড় হইলেও ওজনে মাত্র ৯০ গুণ অধিক । সূত্রাং পৃথিবীর উপাদান অপেক্ষা শনির উপাদান যে লঘু তৎবিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ততবার কোন কারণ নাই । তাই অনেকে অনুমান করেন যে শনির উপাদান কোন কঠিন পদার্থ নহে । আবার জল অপেক্ষাও শনি ওজনে লঘু ।

শনির চতুর্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল সর্বদা সেবে আচ্ছন্ন থাকে । “In fact for any thing which is certainly known, Saturn may have no solid globe at all ; for nothing fixed has ever been recognised in Saturn.”—Proctor.

স্তরে স্তরে সেবে শনির দেহকে আবৃত করিয়া রাগিয়াছে । এক স্তর তিরোহিত হইলে আর এক স্তর দৃষ্টিগোচর হয় । ইহাতে প্রতীয়মান হয় বৃহস্পতির ভায় শনিও উত্তম রহিয়াছে এবং স্বীয় দেহ হইতে তাপ নিকীরণ করে । সেই তাপে জল বাষ্প হইয়া সেবে হয় । সেবে বৃষ্টিরূপে পরিণত হয় । বৃষ্টিধারা পতিত হইতে না হইতেই আবার বাষ্প হইয়া পড়ে ।

আমরা বলিয়াছি পৃথিবী ব্যতীত সজল ও বৃহস্পতির চন্দ্র আছে । পৃথিবীর এক চন্দ্র, সজলের দুই চন্দ্র, বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, কিন্তু শনির আটটা চন্দ্র । ভগবান সকল বিষয়েই শনিকে অধিক সম্পদশালী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন । কিন্তু মানুষ যত দোষ সব তাহার স্বক্ষে চাপায় ।

ঐনতাজনাথ সঙ্কসদার ।

নবযুগ ।

(৩)

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ শতৈঃ শতৈঃ সম্মিলনের দিকে অগমর হইতেছে। বৈদিক যুগের অবসানকালে হিন্দুস্থানে অতি ভয়ানক বৈষম্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সম্পূর্ণ দ্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মণের জাতিরা মানুষের যে জৈবদত্ত সাধারণ স্বত্ব তাহা হইতেও বঞ্চিত হইল। আত্মকমাহে হিন্দুসমাজ দুর্দশ হইয়া পড়িল। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা শিক্ষার অভাবে নীচ পশুর ভাষা বিবাজ করিতে লাগিল।

এই সময়ে সাম্যের অবতার মতাম্মা শাকাগিংগ আবির্ভূত হইলেন। তাহার সামান্যোতি গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষ মিলনের পথে বহুদূর অগ্রসর হইল। বৌদ্ধধর্ম যদি ভারতবর্ষে স্থায়ী হইত তাহা হইলে এ দেশে সাম্য ও ঐক্য চির প্রতিষ্ঠিত হইত। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন—“ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-মতাদিগের অধীনে একচ্ছত্র প্রায় হইয়া একবার দেখাইয়াছিল, আগনার বীৰ্য্য ও প্রভাবশালিতা এবং মতিমা কেমন অপরিমেয়। কিন্তু বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের এবং হিন্দুরা বৌদ্ধদিগের পীড়ন করিতে লাগিল। স্বজাতিবিদ্বেষ সংপরোনাস্তি প্রবল হইয়া উঠিল। সেটুকু সম্মিলন জন্মিয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইল না। শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামীকর্তৃক বৌদ্ধ নিয়মনুসারে প্রমাণীকৃত হইল যে, তখনও ভারতবর্ষের তাদৃশ একতা সাধন হইবার কাল উপস্থিত হয় নাই।”

মুসলমান শাসনকালেও ভারতবর্ষ স্বীয় গম্ভ্যপাথ হইতে নিচূত হয় নাই। মুসলমানেরা ভারতবর্ষের মিলনের পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষ একচ্ছত্র হইয়াছে। ইংরেজের অধীন হওয়াতে কিরূপে উত্তর উত্তর ঐ সম্মিলন-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। ভারত-রাজলক্ষ্মী যে ইচ্ছা করিয়া ইংরেজকে ডাকিয়া আনিয়া স্বীয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ইহাতে মঙ্গলময়ের মঙ্গলেক্ষা রহিয়াছে। ভারতবাসী একদিন মহাজাতিতে পরিণত হইবে, ভগবান কোশলে তাহারই উপায় করিয়া দিয়াছেন।

ইংরেজ যখন ভারতবর্ষের রাজা হইয়া বসিল তখন এ দেশবাসী মাত্রই অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। আত্মকলহ-বিষে এ দেশের লোক জর্জরিত হইয়া

কোথা শাস্তি, কোথা শাস্তি বলিয়া ব্যাকুলহৃদয়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। ইংরেজ সকলকে ডাকিয়া ঘোষণা করিল “আমরা এ দেশে শাস্তি স্থাপন করিব, গায়া প্রতিষ্ঠা করিব, সকলকে সমান অধিকার প্রদান করিব, কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিব না। ইংরেজের সুমধুর আশ্বাস-বচন সকলের হৃদয়ে সুখা বর্ষণ করিল—সকলেই মুগ্ধ হইল। ইংরেজ আরও বলিল, আমরা রাজত্ব করিতে আসি নাট, আমরা তোমাদের জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছি। ইংরেজের উদারতা এবং সৌজাত্য দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিল। বাস্তবিক ইংরেজ যে তাহার সাধু-সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিলে না, উহা যে কেবল ভান, কেবল ছলনা, Mere political hypocrisy তাহা আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে স্থান দিতে পারি নাই। যোগ্য হয় তৎকালীন মহান্য উদারচেতা ইংরেজগণও এরূপ জঘন্য প্রতারণার ভান অস্তুরে পোষণ করিতেন না। ব্রিটিশরাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় ইংরেজ এত নীচ ছিল না, ইংরেজ তখনও চরিত্রের মহত্ব হারায় নাই !

সকলে বলিয়াছিলেন যে, যে দিন ইংরেজ ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলে সেই দিনই ইংলণ্ডের ঐতিহ্যগের একটি অমরীয় দিন হইবে। বাস্তবিক ইংরেজের মহানুভবতা সম্বন্ধে পূর্বে কেহ সন্দেহ করে নাই। ইংরেজ স্বাধীনতা প্রিয়, ইংরেজ উদার, ইংরেজের অধীন হইয়া ভারতবাসী একদিন উন্নতির উচ্চশিখরে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইবে এই আশায় সকলেই মাতোয়ারা হইয়াছিল। এই ইংরেজ আফ্রিকার নিগ্রো ক্রীতদাসদিগের দাসত্বদশা মোচন করিবার জন্য অল্পস্ব অর্থ বর্ষণ করিয়াছিল। এই ইংরেজ স্বাধীনতার জন্য আপনার দেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী কি কঠোর, কি ভীষণ সংগ্রামেই না মগ্ন হইয়াছিল। স্বাধীনতার জন্য এই ইংরেজ আপন ভাইয়ের রক্তে জন্মভূমিকে রঞ্জিত করিয়াছিল। আপন রাজাকে আক্রমণ করিয়া ইংরেজ তাহার নিকট হইতে স্বায়ত্তশাসন আদায় করিয়াছিল। প্রজাস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া এই ইংরেজ, রাজার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছিল। আজন্ম পরাধীন বান্ধিও এই ইংরেজের দেশে পদার্পণ করিলে স্বর্গীয় স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। তাই, ইংরেজের অধীন হইয়া এ দেশবাসী উল্লাসে অধীর হইয়াছিল। হায় ! কত আশাই আমরা অস্তুরে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। এখন দেখিতেছি সবই অলীক স্বপ্ন, অসার সায়া, মিথ্যা প্রবঞ্চনা। হায় ! আমরা নীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়াছিলাম।

ইংরেজ আমাদিগকে প্রচরিত করিলে আমরা তাহা বসনাও করিতে পারি নাট। ইংরেজ বলিয়াছিল তাহারা প্রজার অভিভূত নান। আমরা দেশ লাগনে অসমর্থ তাই তাহারা রাজত্বের গ্রহণ করিয়াছে। যখন আমরা উৎসুক হইব, ভাল মন্দ বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারিব তখনই এই নাবালকের সম্পত্তি তাহারা ফিরাইয়া দিবে। তখন ইংরেজের কোন ছুরতিমস্কি ছিল তাহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু শক্তির এমনই মতিমা যে মানুষ একবার শক্তি নিজ হস্তে প্রাপ্ত হইলে তাহা আর পরিত্যাগ করিতে চায় না।

ইংরেজ যখন দেখিল ভারতবাসী তাহাদের শাসনাধীন হইয়া দিন দিনই নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছে, তাহাদের স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির জন্ত তাহারা তেমন ব্যাকুল এবং সচেষ্ট নয়, তখনই তাহারা পূর্ব প্রত্যাশা বিস্মৃত হইল। দায়িত্ব চির-বিসর্জন দিল, নীতির বন্ধন ছিন্ন করিল, ধর্ম পদদলিত করিতে আরম্ভ করিল।

ইংরেজের প্রাণে পূর্ব চেষ্টেই আমাদিগকে চির পরাধীন এবং দাসের অশেষাও অধম করিয়া রাখিবার বাসনা জাগে নাট। আমাদিগের দায়িত্ব-ভীনতা, উদাসীনতা এবং আত্মপ্রতিব প্রতি অবিশ্বাসই ইংরেজের হৃদয়ে ছুরাকাজ্ঞার অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে।

অতুল বিভবশালী নাবালকের অভিভাবক হইয়া আশাভীত সুযোগ প্রাপ্ত হইলে মাধু ব্যক্তিরও যেমন সময় সময় মতি-ভ্রম হয় এবং ছুরোভ বশতঃ তিনি অভিভাবকের দায়িত্ব বিসর্জন দিয়া সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে যত্নশীল হন, তেমনি ইংরেজও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে নিরাত সাম্রাজ্য চির প্রতিষ্ঠিত করিবার ছুরাকাজ্ঞা প্রাণে স্থান দিয়াছিল। যখন আশা জাগিল তখন সফলতার উপায় চিন্তাও আরম্ভ হইল।

ইংরেজ দেখিল ভারতবাসীকে মোহে অভিভূত করিয়া রাখিতে না পারিলে আর কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। বাস্তবে আমাদের হৃদয়ে আর স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিবাসল্যা অকুরিত হইতে না পারে ইংরেজ সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। সচেষ্টই তাহারা আমাদিগকে মোহে অভিভূত করিতে মনর্থ হইল। কয়েকজন মহাত্মা ঐতিহাসিকের উচ্চ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন— ভারতবর্ষ চিরদিনই অরাজকতায় গবিপূর্ণ ছিল। স্বশাসন এবং স্বত্ব স্বত্ব ইংরেজ আগমনের পূর্বে কোনদিন ভারতবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কেবল অশান্তি অত্যাচার উৎপীড়ন এবং অশান্তির কাহিনীতে

পূর্ণ। ঐ সকল সত্যের অবমাননাকারী প্রভাবকদিগের উদ্ভিগ্নতা পাঠ করিয়া সকলেই বিশ্বাস করিতে লাগিল বাস্তবিকই ভারতবর্ষ চিরদিন অরাজকতার আশঙ্কিত ছিল ; ইংরেজের নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন নিবারণ করিয়া এদেশে প্রথম শান্তি স্থাপন করিয়াছে। ঐ সকল অনুভবী ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই আমাদের দেশের সর্বসাধারণ শিথিল এদেশবাসী চিরদিন দুর্বল, চিরদিন কাপুরুষ, চিরদিন পবনদগ্ধে লুপ্তিত। ভারতবাসী কোন দিন দেশ শাসনরূপ গুরুভার বহন করিতে সমর্থ ছিল না।

ইংরেজের কথা বিশ্বাস করিয়া আমরা আত্মসমর্পণাদি, এবং আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস হারাতিয়া বসিয়াছি। ইংরেজ কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াই আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে আমরা চির পরাধীন জাতি। এবং রাজা শাসন করিতে আমরা চিরকাল অপারগ। বহু বৎসরের চেষ্টায় ইংরেজ সফল মনোরথ হইয়াছে,— দিন দিন ভারতবাসীর হৃদয়ে একটা মিথ্যা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে ইংরেজ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে আর ভারতবাসীর গতি নাই। আমার ভারতবর্ষে অরাজকতা আসিবে, এদেশের লোক মারামারী কাটাকাটি করিয়া একবারে সংশ্লে লোপ পাইয়া যাইবে। ইংরেজ কি উদার, ইংরেজ কি দয়ালু,—কেবল আমাদের মঙ্গলের জন্তই তাহারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। কি ভীষণ মোহ, কি দারুণ মায়ী, কি সন্মোহন উল্লেখ্য মন্ত্র !

মোহশাস ছিন্ন হয় না, মায়ী কাটে না। যখনই একটু চৈতন্য হয়, লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসে তখনই ‘মায়ানী’ মন্ত্রপুত বারি গিঞ্জন করিয়া উদ্ভুদ্ধ সংজ্ঞা ও শক্তিকে অপহৃত করিয়া লয়।

ভাস্পায়ার বাধুর যেমন আগুন পক্ষপুট বাজনে আক্রান্ত প্রাণীকে হতচৈতন্য করিয়া মহোরাগে তাহার শোণিত পান ক্রুরে তেমনি বণিক ইংরেজ ভারতের শোণিতে স্বীয় দেহ পরিপুষ্ট করিতেছে। আমরা দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। আমাদের ককাল মাত্র মার হইয়াছে। সোনার ভারত এখন ভীষণ অশানে পরিণত হইয়াছে।

ইংরেজ কোশলে আমাদের মূর্ত্তিবদ্ধ করিয়া লইয়াছে। আমরা ইংরেজকে সন্দেহ করি নাই তাই আত্মরক্ষার প্রয়াস কেউ করে নাই।

রাজাকে সন্দেহ করা ভারতবাসীর ধর্ম ও সংস্কার বিরুদ্ধ। এদেশে রাজা ভগবানের অবতার বলিয়া চির পূজিত। চির দিনই এদেশের প্রজা রাজার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া সুখী। রাজশক্তির বিরুদ্ধে কোন দিন প্রজাশক্তি

দণ্ডায়মান হয় নাই। রাজা বাহা করেন সকলই প্রজার মঙ্গলের জন্ত এই একটা নিষাঙ্গ ভারতবাসীর হৃদয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

বনদৃশ্য স্বার্থপর ইংরেজ সেই বংশ পরম্পরাগত সংস্কারের মূল উৎপাটিত করিয়াছে। এখন আর রাজার প্রতি এদেশের প্রজার সেই সরল বিশ্বাস ও ভক্তি নাই। রাজস্রোতট বন আর যাই বন তহা ক্রম গতা যে এখন ভারতবাসী প্রজার হৃদয়ে রাজভক্তি নাই। যে বলে যে ইংরেজ শ্রায় পরায়ণ ও পক্ষপাত শূন্য সে মিথ্যানবাদী; স্বার্থের মোহে পড়িয়া সে রাজপুরুষের চিত্ত বিনোদন করিতে প্রয়াসী।

এই যে রাজভক্তি শিথিল হইয়া গেল, এই যে প্রজা আর রাজদ্বারে প্রতিকার আশায় বাইতে চায় না এই দোষ কাহার? দোষ যথেষ্টাচারী রাজপুরুষদিগের। যত অত্যাচার, যত অবিচার, যত পক্ষপাত ইংরেজ রাজপুরুষেরা প্রতিদিন করিয়াছে তাহা কিছুই হারায় নাই, সকলই জাতির হৃদয়ে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই তীব্র সন্দেহালাসমী স্মৃতি প্রতি মুহূর্ত্ত প্রাণে দংশন করিয়া অত্যাচারী রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে সকলকে উত্তেজিত করিতেছে।

বহু বৎসর যাবত দেখিতেছি খেণ্ডের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গের কৃষ্ণ প্রাপ্ত ঘটিলে তাহা কৃষ্ণাঙ্গেরই অঙ্গের দোষ। একসিডেন্টের দোহাই দিয়া আটনেকে ফাঁকী দিতে পার বটে কিন্তু বিচার ব্যভিচার দেখিয়া এদেশের লোকের প্রাণে যে ক্ষোভ রোষ ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নীরবে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা নিবারণ করিব কিরূপে? হে ক্ষমপ্রাপ্ত রাজপুরুষগণ! তোমাদের অত্যাচার সহস্র জিহ্বা বাহির করিয়া তোমাদেরই বিরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত করিতেছে।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া মানব প্রকৃতির মর্ম্ম। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অতৃপ্তির ভীষণ অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। সেই অনল যদি ভারতবাসী ভীষণ দাবানলে পরিণত হইত তাহা হইলে বাপার কিরূপ দাঁড়াইত তাহা লিখিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। তখন মহারাণীর ঘোষণা প্রচারিত হইল— তিনি জাতি, মর্ম্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই সমান অধিকার দিবেন এবং উপযুক্ততা অনুসারে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। শাস্তিবারি সিঞ্চনে সেই অতৃপ্তির অনল নির্বাপিত হইল।

এই ঘোষণা পত্রকে ভারতবাসী পবিত্রমেগনাকার্টা বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিল। এই ঘোষণা গজ পাইয়া ভারতবাসী আনন্দে আত্মহারা হইয়া

গিয়াছিল । এষ্ট ঘোষণাই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । সকললেই মনে করিয়াছিল, বাস্তবিকই উহা কার্য্যে পরিণত হইবে । কিন্তু স্বার্থপর অভ্যচারী রাজপুরুষগণ প্রতিপদে আমাদের মেগ্নাকার্টার অবমাননা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে উহাতে কোনই পদার্পনাই । এখন উহারা খুলিয়াই বলিতেছেন এ ঘোষণাপত্র Political Hypocrisy মাত্র ।

ইংরেজের মেগ্না কার্টা প্রজাশক্তি রাজার নিকট হইতে জোর করিয়া আদায় করিয়াছিল এবং পাছে উহার স্বত্বসংরক্ষিত না হয় এই ভয়ে সমগ্র ইংরেজজাতি সমস্ত হস্তা দিনরাত্রি পাতড়া দিতেছে ।

রাজা বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রজাকে, যে স্বত্ব প্রদান করে প্রজা যদি সেই স্বত্ব স্বীয় শক্তিতে সংরক্ষণ করিতে না পারে তবে রাজা সুবিধা পাইলেই তাহা হরণ করে । ইংরেজরাজ অনুরূপ করিয়া যে অধিকার দিয়াছিল তাহা রাখিবার শক্তি আমাদের নাই বলিয়া ইংরেজ আবার কাড়িয়া লইয়াছে ।

অনুগ্রহ-প্রাপ্ত ক্ষমতা ক্ষমতাই নয় তাহা আমরা বহুদিন বুঝিতে পারি নাই । সেই ক্ষমতাই আত্মশক্তি বিকাশের প্রয়াস না করিয়া আমরা ভিক্ষার কুলি লইয়া রাজার দ্বারে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি । যদি এতদিন শক্তিসাধনা করিতাম তাহা হইলে আজ আমাদেরকে যথেষ্টাচারমূলক শাসননীতির নিকট মস্তক অবনত করিতে হইত না এবং ইংরেজ আমাদেরকে পশুর জ্ঞান করিত না ।

এখন বুঝিয়াছি ইংরেজ আমাদেরকে এমন কিছুই দিবে না বাহা পাইলে আমরা মাহুস হইতে পারিব । ইংরেজ চায় আমাদেরকে খেলনা দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে । দেড়শত বৎসর ইংরেজের অধীন থাকিয়া আমরা কেবল গোলাগীরই উপযুক্ত হইয়াছি ।

চক্ষু ফুটিয়াছে, গোধনশ ছিন্ন হইয়াছে, * ভ্রম দূর হইয়াছে । ভগবান আমাদেরকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া গন্তব্যপথ দেখাইয়া দিয়াছেন । আর সন্দেহনাই, দ্বিধা নাই, ভয় নাই । আমরা অভয় পাইয়াছি ।

তাই চারিদিকে নবজীবনের বিকাশ দেখিতে পাইতেছি । এক নবযুগ বাঙ্গালার আবির্ভূত হইয়াছে । এ যুগের সাধনা—আত্মশক্তির বিকাশ ; মন্ত্র—বন্দে মাতরম্ ; গণ—জীবন মর্কস ; ফল—জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা ।

শ্রীবতীন্দ্রনাথ মজুমদার ।

বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস ।

বৈদিকযুগে যখন আৰ্য্যগণ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা

পশ্চিমে অধোমান গিরিশ্রেণী এবং পূর্বে গবিত্র মালিকা

বৈদিকযুগ । গঙ্গাযমুনার পূণ্য সঙ্গম, উত্তরে তুমারশুভ্র হিমালয়

তটতে দক্ষিণে সিদ্ধুসঙ্গম পর্য্যন্ত, প্রাক্কর্ষিত এই লীলা

নিকেতনের মধ্যেই তাঁহাদের বাসস্থান সীমান্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ।

আৰ্য্যগণের অধিকৃত এই ভূমিখণ্ডট আৰ্য্যাবর্ত নামে অভিহিত । তাঁহাদের

আগমনের পূর্বে এই সমুদয় স্থান অনাৰ্য্য অদিবাসীদ্বারা অধিকৃত ছিল ।

আৰ্য্যগণকর্তৃক পরাজিত হইয়া অসভ্য প্রাচীন অদিবাসীবৃন্দ বন হইতে বনান্তরে

আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল ।

বৈদিকযুগে আৰ্য্যগণ কেবল আৰ্য্যাবর্তেই বাস করিতেন, তাঁহারা উচ্চ

শক্তিভূত অথচ কোনও স্থানের বিষয় অবগত ছিলেন কি না, বেদে তাহার

উল্লেখ নাই । কাজেই বেদ হইতে বঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কোনও বিষয়

জ্ঞাত হইতে পারি না । *

মহুসংহিতা । বৈদিক প্রভাবের পর সংহিতার আদির্ভাব । মহুসংহিতার

বঙ্গদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ; তখন বঙ্গদেশ অরণ্যানীমকুল ও অনাৰ্য্যগণের

রামায়ণ ও আবাগভূমি ছিল । এতদতিরিক্ত সংহিতাতে বঙ্গদেশের

মহাভারত । বিষয় কিছুই লিখিত নাই । উচ্চর পর রামায়ণ ও

• মহাভারতের সুগ । রামায়ণ ও মহাভারতে বঙ্গের

বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে † । কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনাপাঠে

আমরা বঙ্গ সম্বন্ধে যে ভৌগোলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহাতে তখন পূর্ববঙ্গের

অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহান হইতে হয় । পৌরাণিক বা বৌদ্ধযুগের আলোচনাদ্বারা

ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সেই সময়ে সমগ্র পূর্ববঙ্গ, ঢাকা বিভাগ সহ, অসীম

অনন্ত সাগরের অতল বারিরাশির মধ্যে নিমগ্ন অবস্থায় ছিল । অতএব রামায়ণ,

মহাভারত এবং পৌরাণিক ও বৌদ্ধযুগে বঙ্গের অস্তিত্ব থাকিলেও পূর্ববঙ্গ বা

* See R. C. Dutt's History of The Civilization of Ancient India Page 65.

† রামায়ণ অধ্যায়িকাণ্ড, ১০ম অধ্যায় । মহাভারত আদিপর্ব ১০৪ অঃ ।

বিক্রমপুরের অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমান সময়ে যে গ্রামল বনরাজিলীলা, শস্ত্রসম্পদশালিনী ভূমণ্ড ও বহুলোকের আবাসভূমি, পূর্বে যে তাহা সাগরের অতল বারিরাশির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তদ্বশ্যে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ এখনও অনেকে বিক্রমপুরে পুকুর ইত্যাদি খনন করিতে নান। প্রকারের জলবানের ভগ্নাবশেষ পাইয়া থাকেন।

নবম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগরের তটবাসী কতকগুলি স্থান সমতট বলিয়া পরিচিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থংসঙ্গের

নবম শতাব্দীতে ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তখন বিক্রমপুর ও এই সমতটখানা প্রাপ্ত স্থানসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মিঃ বিভারেন্দ্র প্রণীত বাথরগঞ্জের ইতিহাস পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সমতটখানার পূর্বে বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভূগুণ পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল *। মধ্যে মধ্যে কেবল দুই একটি দ্বীপের ভ্রাম্য স্থান লোক-চক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইত। ইদিলপুর, চন্দ্রদ্বীপ, সাহাবাজপুর, হাতিয়া, সনদ্বীপ প্রভৃতি স্থান যে এইরূপ চড়া পড়িয়া উৎপন্ন হইয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ।

সনকট সাকাট
ও সকাট।

স্বিনহাজ-ই-সিরাজ তৎপ্রণীত “তব-কতই নাশিরি” নামক পুস্তকে সমতটকে কোনস্থানে সনকট কোথাওবা সাকাট বা সকাট এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। যে সময়ে নবদ্বীপ, গোড়, সোণারগাঁ,

বিক্রমপুরের
প্রাচীনত্ব।

সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান সমূহের নাম জনসাধারণের নিকট পরিচিত হয় নাই, তাহার অতি পূর্বে বিক্রমপুর শিক্ষায়, সভ্যতায় ও উন্নতিতে সর্বজন পরিচিত ছিল।

ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বর্তমান প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুরের বহুদূরে খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

* হিউএন্থংসঙ্গের সময়ে মেঘনাদ (মেঘনা) নদ রামপালের নিকটেই বোধ হয় সাগর দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে বঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যে সাগরশাখা বিস্তৃত ছিল। হিউএন্থংসঙ্গের অন্তান একশতাব্দী পরে যখন খ্রীষ্ট, আদিশুরের রাজবাটিতে উপস্থিত হন তখনও তিনি রাজধানীর নিকটেই সমুদ্র দর্শন করিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি কখনই অর্ণব বর্ণনা করিতেন না।

বান্দ্য, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ১২৮২।

আমরা এখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকাগণের
বিক্রমপুরের নামোৎ- কোতূহল পরিভূপ্তির জন্ত তাহার উল্লেখ করিলাম।
পত্তির কারণ। (১) বিক্রমপুরে এক্ষণে একটা জনগণাদ প্রচলিত

আছে যে ভাড়া ভর্তুকির সত্তিত কোনও কারণে রাজা
বিক্রমাদিত্যের মনোমালিন্ত হয়, তাহাতে তিনি ক্রোধিত হইয়া সত্যোদয়ের পাকি
রাজ্যভার অর্পণান্তর দেশভ্রমণে বহির্গত হন, এবং সাগরতীরবর্তী সমস্তট প্রদেশের
স্থান বিশেষের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিনের জন্ত তথায়
অবস্থিতি করেন। তাহার নামানুসারে উচাই বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত
হইয়াছে। এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়, কারণ
উজ্জয়িনীর নিপাত রাজা বিক্রমাদিত্য যে কখনও পূর্বাঞ্চলে আগমন
করিয়াছিলেন তাহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। (২) অতি প্রামাণিক
প্রাচীন “বিশ্বকুল-কল্প-লতিকা” পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেনবংশীয় রাজজ-
বর্গের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ নিভুজ সেন, বীরসেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে
আগমন করেন। তাহাদের বংশধর বিজয় সেন বিক্রমপুর নগরের স্থাপনিত।
আমাদের মতে ইহাই সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পাঠকের কোতূহল
ভূপ্তির জন্ত আমরা উক্ত গ্রন্থের স্থলবিশেষ এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

“দাক্ষিণাত্য বৈজ্ঞান্যজৈকোহস্থপতিসেনকঃ।

তদ্বংশে জনিতশস্ত্রকেতুসেনো মহাধনঃ ॥

তদ্বংশে বীরসেনো ভূপঃ পর পুংজয়ঃ।

তদ্বংশে বিক্রমসেনোজাতঃ পরমশাস্ত্রিকঃ ॥

কৃতবান্ বিক্রমপুৰীং স্নানাত্তিহিতাং সুধীঃ।

কেহ কেহ আবার এই মতও প্রকাশ করেন যে সেনবংশীয় নৃপতিগণ যে
স্থানে বাস করিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করেন, সেই প্রিয়তম স্থানকেই
‘বিক্রমপুর’ এই অতি গৌরবজনক নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে
যে পাঠকের মনে বাহা অভ্যস্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে তিনি তাহাই গ্রহণ
করিতে পারেন।

অগ্রসিদ্ধ সেনরাজগণ বঙ্গে রাজ্যস্থাপন ও বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন
করিয়া ভারতের বিভিন্নাংশেও স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাদের শাসন সময়ে
বিক্রমপুর শিক্ষার, সভ্যতার ও বৈদ্যব্যবস্থার ভারতের

গৌরবের সামগ্ৰী ছিল। সে বিক্রমপুর একদিন দেশে বিদেশে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার পূর্বক স্বাধীনতা ও নীরস্ত্রের লীলাক্ষেত্ররূপে জগতের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল; সেই বিক্রমপুর বর্তমান সময়ে নিশ্চিন্ত ও মলিন। তায়! যে মহিমাশক্তি স্বরম্য ও সুশীল রাজশাসাদ একদিন উন্নতশীর্ষে সেনরাজগণের ধন-গৌরব জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছিল, যে তদ্ব্যবৃত্ত আনন্দ-কোলাহল-মুগ্ধরিত রাজধানী একদিন সেনরাজ্যের অর্থ-মঙ্গলির দার্দ্র্য দেশ দেশান্তরে প্রচার করিয়াছিল, তাহা আজ কপি কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। সময়ের কি অচিস্তানীয় পরিবর্তন।

প্রাচীন সীমা। বর্তমান সময়ে পদ্মার ভীষণ আক্রমণে বিক্রমপুর বেগন হতশ্রী এবং পূর্বগৌরব-বিভব শূন্য হইয়াছে, পূর্বে এইরূপ ছিল না। তখন প্রাকৃতিক বৈষম্য হেতু বিক্রমপুর দুই ভাগে বিভক্ত হয় নাট।

থাকবস্তুর ক্ষয়িত্ব হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ গণন রণভাওয়াল হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত একটা মাপ প্রস্তুত হয়, তখন কৌন্তিনাশার (পদ্মা) কোনও উল্লেখ উহাতে ছিল না। পূর্বে ক্ষয় পরিসরী কালীগঙ্গানদী* বিক্রমপুরের মধ্যদিয়া

* ১৭৮১ সনে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, বোর্ড অব ডাইরেক্টরগণের অনুমতানুযায়ী তৎকালীন বঙ্গদেশের মার্কেয়ার জেনারেল জেমস বেনেল, এক, আর, এম, সাহেব ঢাকার ও তত্ত্বকটবর্তী স্থান সমূহের যে মাপ অঙ্কিত করেন, তাহাতে কালীগঙ্গার উল্লেখ আছে। সে সময়ে কালীগঙ্গা পলেশ্বরী নদীর দক্ষিণাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিক্রমপুরের মধ্যাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া পদ্মার মতিত মিলিত হইয়াছিল। তখন ১ টেজাপুর, (মুন্সীগঞ্জ) ২ ফিরিঙ্গিবাজার, ৩ আবজুরাপুর, ৪ মীরগঞ্জ, ৫ মাঝহাটি, ৬ সেরাজদী, ৭ রাজাবাড়ী, ৮ সেকেরনগর, ৯ ভাসারী, ১০ বোলঘর, ১১ বারটখালি, ১২ হুতপুর, ১৩ ঠাউদিয়া, ১৪ বাগীয়া, ১৫ ইনকিশর, ১৬ রাজাবাড়ী, ১৭ চণ্ডীপুর, প্রভৃতি স্থানগুলি কালীগঙ্গার উত্তর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বর্তমান আটরলনিল তৎসময়ে চুরাটন নিল নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তটবর্তী স্থান—১ মুলফংগজ, ২ করাভীকাল, ৩ জগসা, ৪ কান্দাপাড়া, ৫ শ্রীগঙ্গাপুর ও খৌলগাঁ, ৬ মারেকা, ৭ চিকন্দী, ৮ গঙ্গানগর, ৯ রাধানগর, ১০ বাগটিয়া, ১১ সমকোট, ১২ রাজনগর, ১৩ লড়িকুল ইত্যাদি।

মেঘনাতে, কালীগঙ্গার দক্ষিণ—১ বুহার, ২ জানঘাটা, ৩ কার্তিকপুর, ৪

প্রবাহিত হইয়া শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করে এবং খাদ্যাদ্যাদির প্রাচুর্য্য বিধানের
বশেষে সম্ভারতা করিত। উহাব উভয় তীরবর্তী পল্লী সমূহের আশ্রয় গৌন্দগা
ও শান্তপ্রাশ্রয়। ক্ষেত্রানচয়ের মনোমোহন দৃশ্য বিক্রমপুরকে নিদেশী পর্য্যটকের
নিকট স্বর্ণ-কিরীট-মণ্ডিত কমনার আশ্রয়ভূমি বলিয়াই প্রতিপন্ন করিত। সে
শোভা-সম্পদ সর্ব্বধ্বংসকারী পদ্মার তরঙ্গ প্রচারে কসি কল্পনায় পর্য্যবসিত
হইয়াছে। তখন পশ্চিমে পদ্মা, পূর্বে উত্তরে ধলেশ্বরী, দক্ষিণদিকে আরিয়লনদী
ও কৃষ্ণগণিল মেঘনাদ নদের সম্মিলিত, সাগরোৎস,—এই চতুঃসীমামধ্যবর্তী
স্থানই বিক্রমপুর নামে সর্ব্বজন পরিচিত ছিল।

লালা রামগতি রায় তাঁহার রচিত 'মায়া তিমির চঞ্জিকা' নামক পুস্তকে

যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেও
মায়া তিমির চঞ্জিকা ও কীর্তিনাশা নদীর কোন উল্লেখ নাই। এই
বিক্রমপুর। 'মায়া তিমির চঞ্জিকা' দেড়শত বৎসরের পূর্বে
রচিত হয় নাট, অতএব ইহাই স্পষ্ট প্রতীকমান

ডুলুই, ৫ বামগাঁও, ৬ ভয়রা, ৭ মাদকপুর, ৮ শ্রীরামপুর, ৯ পাতলাডাঙ্গা, ১০
সিরান্দী, ১১ জুইলিয়া, ১২ সননদিয়া (সিলনদী), ১৩ লজারদিয়া, ১৪
চেউখালী, ১৫ ছোট বাগুয়া, ১৬ গাজিয়া।

পদ্মাতটে কালীগঙ্গার দক্ষিণে—১ দীনারিপাড়া, ২ রাজাপানী, ৩ ভাঙ্গাপাড়া,
৪ কলারগাঁ, ৫ বালীসার, ৬ বদরশাণ (বদরাসন), ৭ মাছুয়াখালী, ৮
গজারিয়া, ৯ সোনাপাড়া, ১০ সনরপুর, ১১ সলুয়ারভাট, ১২ বগাও, ১৩
কুশারিয়া, ১৪ ইসলাচর, ১৫ মেন্দিগঞ্জ, ১৬ আবছল্লাপুর, ১৭ সুলতানী, ১৮
কন্দর্পপুর। এই কন্দর্পপুরের নিকটই মেঘনা ও পদ্মা মিলিত হইয়াছিল।
হায়! কালের অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্তনে এই প্রায় ১২৫ বৎসরের মধ্যে বিক্রম-
পুরের এসন পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত
হইতে হয়। স্থলভাগ জলে এবং জলভাগ স্থলে পরিবর্তিত এবং এক নদীর স্থানে
অন্য নদীর প্রবাহিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ নূতন এদেশ স্থাপিত হইয়াছে।
এই সমুদয় বিষয় মানচিত্রের সাহায্য ব্যতীত অবগত হইতে পারা অসম্ভব।
কালীগঙ্গার বর্তমান নাম পড়া ক গোড়াগঙ্গা। অদ্যাপিও বিক্রমপুরে উহার
সকর্ণপাত দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যপাড়া জৈনসার প্রভৃতি গ্রামের নিকট
দিয়া এখনও উহা ক্ষুদ্র দেহে প্রবাহিত হইয়া বিশ্বপতির লীলাকোশল প্রকটিত
করিতেছে। বর্ষার সময় ভিন্ন ইহাতে নৌকা চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণ জলও
থাকে না। উত্তর বিক্রমপুরে যেমন ইহার নাম পর্য্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া পোড়া
গঙ্গার পরিণত হইয়াছে, দক্ষিণ বিক্রমপুরে তরুণ হয় নাই; এখনও সেখানে
কালীগঙ্গার ক্ষুদ্র পাতকে কালীগঙ্গাই বলিয়া থাকে।

হয় যে, যে সময়েও 'কীর্তিনাশা' নামক কোন নদীর অভিস্রব ছিল না। গোটেই উপর রাজবল্লভের কীর্তি সমূহ ধ্বংস করিয়াই যে গঙ্গা এই অগ্ন্যম লোক করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থপাঠে জানিতে পারা যায় যে মোগল রাজত্বের সময়ে বিক্রমপুর সরকার, সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত পরগণা বিক্রমপুর। একটা পরগণা ছিল। তৎসময়ে সোনারগাঁয়ের মধ্যে ৫২ বারানতী মঠাল ছিল; যথা (১) অন্তার, মাতাপুর, (২) আনচাগ, (৩) অন্তার ও সমানপুর, (৪) বিক্রমপুর, (৫) দেওয়ান, (৬) বলাদাখাল, (৭) বোয়ালিয়া (৮) গারচাঁদে, (৯) বাটখারা, (১০) পলাশবাড়ী, (১১) চরদিয়া, (১২) কুলুরী, (১৩) গানহাটী, (১৪) ভাটরা, (১৫) ভাঙ্গপুর, (১৬) তিরকী, (১৭) বোয়ালীদিয়া, (১৮) জেওয়ার বন্দর, (১৯) চোকেন্দী, (২০) চণ্ডীহার, (২১) চাঁদপুর, (২২) চাঁবেলী সোনারগাঁ, (২৩) মরুগছর (২৪) খিজিরপুর, (২৫) দৌল্লার (২৬) ডানডেরা, (২৭) দেখান সাহপুর, (২৮) দেওয়ানপুর, (২৯) দেকান ও সমানপুর, (৩০) রায়পুর, (৩১) সুখারগঞ্জ (৩২) সেলিমপুর, (৩৩) সেলিমসি, (৩৪) সরজলকর, (৩৫) সুকাওশা, (৩৬) সেবারচল, (৩৭) শমসপুর, (৩৮) নাড়াপুর, (৩৯) গবদী, (৪০) কীর্তিকপুর, (৪১) কঁদী, (৪২) কোলহরি, (৪৩) ঘাটী জুলাই, (৪৪) মারকোর, (৪৫) মজুমপুর, (৪৬) মেহার, (৪৭) মনোহরপুর, (৪৮) মাতীজল, (৪৯) নারায়ণপুর, (৫০) দেপুরা কোট, (৫১) হিমতীবাজু, (৫২) হাটঘাটা।

এই বারানত মঠালের রাজস্ব ১০,৩৩,১৩,৩৩ দাম * ছিল। তন্মধ্যে এক বিক্রমপুরের রাজস্বই ছিল ৩৩,৩৫,৫২ দান। বিক্রমপুরের রাজস্ব সর্বাংশেই অধিক ছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর গবর্নর রিপোর্টেও বিক্রমপুর পরগণার বিষয় লিখিত আছে। ইহা দ্বারা এবং আইন-ই-আকবরী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পাঠে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে মোগল রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ৩৭পূর্বের অর্থাৎ সেনরাজ্যপের সময়ে পরগণা বিভাগ ছিল না। মহারাজা আদিশূব সমুদয় বঙ্গ, রাঢ়,

* ভাস্কর—চলিশ দামে এক টাকা হয়।

বারেন্দ্র, বাগরী, বঙ্গ, মণিলা এই পাঁচ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। †

বর্তমান সময়ে আমাদের লিখিত পরগণা সমূহের অধিকাংশই ঢাকা, ফরিদপুর জিপুরা, নোয়াখালি এই চারি জেলাতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে হৈদলপুর সরকার বাঙ্গার অন্তর্গত, মনছাপ ও মাদারপুর সরকার, ফতেয়া আবাদারের মধ্যবর্তী ও বিক্রমপুর, কাঞ্চিকপুর, চাঁদপুর, ইত্যাদি পরগণাগুলি সরকার মোনারগাঁয়ের অন্তর্গত ছিল। ‡

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

† During the Adisur dynasty, the following are said to have been the ancient geographical Divisions of Bengal—Gour was the capital, forming the centre division, & surrounded by five great provinces.

1. Barendra—bounded by the Mahananda on the west; by the Padma, or great branch of Ganges, on the south; by the Korotoya on the east & by adjacent Governments on the north.

2. Banga,—or the territory east from the Korotoya towards the Barhmaputra. The capital of Bengal, both before & afterwards, having long been near Dacca, in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole.

3. Bagri—or the Delta called also Dwipa, or the island, bounded on the one side by the Padma, or the great branch of the Ganges; on another by the sea,; & other third by the Hugli river or Bhagirathi.

4. Ra-hi—bounded by the Hugli & Padma on the north & east & by adjacent kingdoms on the west & south.

5. Maithila—bounded by the Mahananda & Gour on the east, the Hugli or Bhagirathi on the south & on the west.

Hamilton's Hindustan.

I. P. 114.

‡ যদি কেহ কোনও ভ্রম প্রমাণ দর্শন করেন, এবং বিক্রমপুর সম্বন্ধে কোনও নূতনতথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন, "অরতি" আফিসের ঠিকানায় লেখকের নিকট প্রেরণ করিলে অত্যাশীত হইবে।

তুমি ও সে ।

তুমি নব-বসন্তের আশ্রু-ট নকুল,
সে সে গন্ধরাজ তায় মায় অলিকুল ।
তুমি নিদাঘের স্বচ্ছ শীতল নির্ঝর,
সে ত খর স্রোতস্থিনী বহে নিরন্তর ।
তুমি বরিষার বিশে দুর্লভ নলিনী,
ঈষৎসেতে চান্দ্রময়ী সে সে কুমুদিনী ।
শরতের পূর্ণিমায় তুমি পূর্ণশশী,
সে সে চাতকিনী কিরে জলের পিপাসী ।
তুমি হেমন্তের সন্ধ্যা সলাজ বয়ান,
সে যে তপ্ত রসিকর দহে মা'তে প্রাণ ।
তুমি শীতাস্তের তরু নব পল্লবিতা,
নিরহিণী পিকরাণী সে যে উপেক্ষিতা ।
আকুল আছান্বে তুমি টানিছ আগার,
সে যে জোর করে মোরে বুকে নিতে চায় ।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী ।

আমি কে ?

বীরপুত্র সীতারাম শিখাজী প্রতাপ,
বীরকন্যা দুর্গাবতী কৰ্ম্মদেবী বীর ;
কৃষ্ণ উপদেষ্টা বীর কিংসে পুণ্য পাপ,
দর্শনশাস্ত্র গীতা করে কৰ্ম্মের প্রচার ;
নৃসিংহমালিনী করে শাণিত কুপাণ
উপাস্তা দেবতা বীর কালী কাত্যায়নী ;
বীররক্তে স্নাত বীর পর্ত্ত পাৰ্ব্বতী,
প্রতি বন উপবন বীৰ্য্য-বিবরণী ;
বীরের কঙ্কালচূর্ণ বীর মাটিধূলি,
ঘাটে মাঠে বাটে বীর বীরের শ্মশান ;
জগতে বিখ্যাতা যিনি বীরমাতা বলি,
তিনি সে জগতপূজ্যা পুত্রা হিন্দুস্থান ;
নহি স্বপ্ন্য অবজ্ঞের দুৰ্দ্বল ভিখারী,
চিনেছ সংসার-স্রোত আমি শাক্ত পুত্র ভারি ।

